সমরেশ বসুর উপন্যাসে
রাজনৈতিক জীবন ও তার রূপায়ণ

গবেষক

মোছাঃ পারভীন আক্তার

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৪

শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত

জানুয়ারি ২০১৮

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সমরেশ বসুর উপন্যাসে
রাজনৈতিক জীবন ও তার রূপায়ণ

Dhaka University Institutional Repository

সমরেশ বসুর উপন্যাসে রাজনৈতিক জীবন ও তার রূপায়ণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত
জানুয়ারি ২০১৮

তত্ত্বাবধায়ক

ডক্টর ভীষ্মদেব চৌধুরী
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

গবেষক

মোছাঃ পারভীন আক্তার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ
ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

আমি, মোছাঃ পারভীন আক্তার, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ ঢাকা, এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, অধ্যাপক ডক্টর ভীষ্মদেব চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে সম্পন্নকৃত এই অভিসন্দর্ভ বা অভিসন্দর্ভের কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি বা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

মোছাঃ পারভীন আক্তার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ
ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোছাঃ পারভীন আক্তার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যায় বাংলা বিভাগের অধীনে একজন পিএইচ. ডি. গবেষক হিসেবে বর্তমান অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা অনুসারে অভিসন্দর্ভটি প্রণীত হয়েছে। এ গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি লাভের জন্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত হয়নি।

তত্ত্বাবধায়ক

ডক্টর ভীষ্মদেব চৌধুরী
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
বাংলা বিভাগ, বাংলা বিভাগ
ঢাকা ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ-কথা

'সমরেশ বসুর উপন্যাসে রাজনৈতিক জীবন ও তার রূপায়ণ' আমার পিইচ ডি অভিসন্দর্ভের শিরোনাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ডক্টর ভীষ্মদেব চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে আমার গবেষণা-অভিসন্দর্ভ রচিত হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা ও রূপরেখা প্রণয়নে তত্ত্বাবধায়কের নিরন্তর প্রেরণা, প্রাজ্ঞ অভিমত ও পরামর্শ আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। তিনি কিছু দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্লভ গ্রন্থ ও পত্রিকা আমাকে প্রদান করায়, আমার গবেষণাকর্মের পথ সুগম হয়েছে। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

সমরেশ বসুর উপন্যাস-গল্প পাঠে শিক্ষার্থী জীবন থেকেই আমি উৎসাহী ছিলাম। এরই পরম্পরায়, 'সমরেশ বসুর মিথিক উপন্যাসের বিষয় ও শিল্পরূপ' বিষয়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম ফিল ডিগ্রি অর্জন করি। তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন আমার শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর ভীষ্মদেব চৌধুরী। লেখা বাঞ্ছনীয়, তাঁরই উদ্যোগ, অনুপ্রেরণা ও তত্ত্বাবধানের ফসল বর্তমান পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ।

প্রতিনিয়ত পরামর্শ, উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়ে আমার গবেষণা-কর্ম সম্পাদনে সাহায্য করেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বর্তমান সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষক সৈয়দ আকরম হোসেন। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহারের সার্বক্ষণিক সুযোগ আমি পেয়েছি। তিনি আমার শিক্ষক এবং পরম আত্মীয়। তাঁর কাছে আমার ঋণ অশেষ।

গবেষণা কালে, বিশেষত পিএইচ ডি সেমিনারে উপস্থিত থেকে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, অধ্যাপক সাঈদ-উর রহমান, অধ্যাপক সিদ্দিকা মাহমুদা, অধ্যাপক বেগম আকতার কামাল, অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক রফিকউল্লাহ খান, অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক, অধ্যাপক ফাতেমা কাওসার প্রমুখ উৎসাহ ও পরামর্শ প্রদান করায় আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। এ ছাড়াও যাঁদের উপস্থিতি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে তাঁরা হলেন : অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর, অধ্যাপক বায়তুল্লাহ কাদেরী, ডক্টর হোসনে আরা, ডক্টর নূরুন্নাহার ফয়জের নেছা, ডক্টর মোহাম্মদ আজম, জনাব সোহানা মাহবুব, জনাব মুনিরা সুলতানা, জনাব তাশরিক হাবিব, জনাব মোমেনুর রসুল, জনাব রাফাত আলম মিশু ও জনাব কানিজ ফাতেমা। সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

একটি দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহে সাহায্য করেছেন সহকর্মী সুহৃদ কামরুন নাহার। প্রাক্তন সহকর্মী বন্ধু নুজহাত তাজিন আহমেদের পাশ্চাত্য সাহিত্য ও রাজনীতি-বিষয়ক আলোচনা, আমার অনেক জিজ্ঞাসার জবাব পেতে সাহায্য করেছে। দুজনকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

গবেষণা নির্বাহ কালে, আত্মজ শিশু বর্ণের অসীম ধৈর্য ও হাস্যমুখ, প্রতিবন্ধকময় সংসারের দুরূহ পথ অতিক্রমণে আমাকে নিয়ত উৎসাহ, প্রেরণা ও আনন্দ জুগিয়েছে। অভিসন্দর্ভ বিষয়ে পড়তে বা লিখতে

Dhaka University Institutional Repository

বসব বুঝে নিয়ে হাসি মুখে, বই-ল্যাপটপসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র টেবিলে গুছিয়ে দিয়ে, পরম বন্ধু সৈয়দ আজফর হোসেনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির আন্তরিক প্রয়াস আমাকে মুগ্ধ ও আনন্দিত করত।

গবেষণা-কর্ম সম্পন্ন করার আন্তর্তাগিদ ছিল আমার মায়ের। বড়ো বোনের স্নেহাশিসও ছিল অন্তর্প্রেরণা।

গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, বাংলা বিভাগের 'মুহম্মদ আবদুল হাই স্মৃতি-পাঠকক্ষ' ও আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। সহযোগিতার জন্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দকে জানাই সবিশেষ ধন্যবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রবেশক	০৯
প্রথম অধ্যায়	
বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রারম্ভ ও ক্রমবিকাশ	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	
সমরেশ বসুর সমসময় ও জীবনকথা	৪৫
তৃতীয় অধ্যায়	
সমরেশ বসুর উপন্যাসে রাজনৈতিক জীবন ও তার রূপায়ণ : প্রথম পর্যায়	৭০
চতুর্থ অধ্যায়	
সমরেশ বসুর উপন্যাসে রাজনৈতিক জীবন ও তার রূপায়ণ : মধ্য পর্যায়	১২৯
পঞ্চম অধ্যায়	
সমরেশ বসুর উপন্যাসে রাজনৈতিক জীবন ও তার রূপায়ণ : অন্ত্য পর্যায়	১৭২
উপসংহার	২৭০
পরিশিষ্ট	২৭৬
সমরেশ বসু : জীবনপঞ্জি	২৭৭
সমরেশ বসু : গ্রন্থপঞ্জি	২৮৫
সমরেশ বসু-বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি	২৮৭
সমরেশ বসু-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাবলি	২৮৮
সহায়কগ্রন্থসমূহ	২৯১

Dhaka University Institutional Repository

প্রবেশক

বাংলা কথাসাহিত্যে সমরেশ বসুর (১৯২৪-১৯৮৮) আত্মপ্রকাশ ও সৃষ্টিকাল প্রসারিত হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর (১৯৩৯-১৯৪৫) আন্তর্দেশীয় ও দেশীয় আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্রমজটিল পটভূমিকায়। সমরেশ প্রতিভার প্রারম্ভ, বিকাশ ও পরিণতি সাধিত হয়েছে—খণ্ডিত স্বাধীন ভারতবর্ষের সময়স্পৃষ্ট রাজনৈতিক স্রোত-প্রতিস্রোতের দ্বান্দ্বিক সংঘাতে।

উপনিবেশিত ও উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ তথা বাংলার রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত, মধ্যশ্রেণির বহুমুখীনতা ও সাংঘর্ষিক আদর্শের ভাঙাগড়ায় প্রগতিপথে অবিচলিত থাকা তৎকালে ছিল এক জটিল মানসক্রিয়া। ঔপন্যাসিক সমরেশ বসুর রাজনীতিক মননক্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য, জীবনবোধ ও শিল্পধারণার উৎস ও বিকাশ অনুধাবনের জন্য তাঁর বেড়ে-ওঠা জীবনের স্তরসমূহ উন্মোচন জরুরি; গুরুত্বপূর্ণ তাঁর যাপিতজীবনের নানা অভিমুখ বিশ্লেষণ। সমরেশ বসুর উপন্যাসে সমগ্র মানব অনুসন্ধানেই তাঁর শিল্পসিদ্ধি। যে-কোনো সুপ্রণীত উপন্যাসই প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে আত্মজৈবনিক। সমরেশ বসুর অনেক উপন্যাসের আভ্যন্তর সাক্ষ্যে তা অধিকতর সত্য।

'সমরেশ বসুর উপন্যাসে রাজনৈতিক জীবন ও তার রূপায়ণ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ তাঁর মানস-প্রকরণ এবং নির্ধারিত উপন্যাসের বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রতিটি উপন্যাস বিবেচনা প্রসঙ্গে সমরেশ বসুর শিল্পদৃষ্টির চারিত্র্য—আখ্যান বিন্যাস, চরিত্রায়ণ কৌশল, নৈসর্গিক পটভূমির ব্যবহার, ভাষা বৈশিষ্ট্য ও রূপক-প্রতীকী পরিচর্যার তাৎপর্য আলোচিত হয়েছে। উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের অধ্যায় বিভাজন নিচে লিপিবদ্ধ করা হল।

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রারম্ভ ও ক্রমবিকাশ' এই অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪) থেকে শুরু করে প্রাক্-সমরেশ (১৮২৪-১৯৮৮) পর্যন্ত বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের দর্শন, আখ্যান ও বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচিত হয়েছে সমরেশ বসুর রাজনৈতিক উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্য ও তাৎপর্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'সমরেশ বসুর সমসময় ও জীবনকথা'। এ অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে সমরেশ বসুর সময়-পরিসরের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও কালান্তরে উত্তরণের সংকট, অন্তর্ঘাত ও বেদনাভাষ্য। এই বাস্তব পটভূমিকায় শিকড় সঞ্চার করে সমরেশ বসু কীভাবে বেড়ে উঠেছেন—হয়ে উঠেছেন, ব্যাখ্যাত হয়েছে তার কথকতা। সমরেশ বসুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও তীক্ষ্ণ জীবনবোধ এবং কথাকোবিদ শিল্পীসত্তা কীভাবে উৎসারিত ও বিকশিত হয়েছিল তার উৎস ও স্বরূপ আলোচিত হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'সমরেশ বসুর উপন্যাসে রাজনৈতিক জীবন ও তার রূপায়ণ: প্রথম পর্যায়'। এ পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের চারটি উপন্যাস—bqbc‡ii gwU (র.১৯৪৬), DËi½ (১৯৫১) , we wU †iv‡Wi av‡i (১৯৫২) ও kxgZx Kv‡d (১৯৫৩)। মার্কসীয় রাজনীতিতে আগ্রহী, শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নের সংগঠক, কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য, ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে চাকুরিরত এবং কারান্তরালের এক বছরের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ সমরেশ বসুর উল্লেখিত উপন্যাস চতুষ্টয় বিশেষভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম 'সমরেশ বসুর উপন্যাসে রাজনৈতিক জীবন ও তার রূপায়ণ: মধ্য পর্যায়'। বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনার জন্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে gvbl kw³i Drm (১৯৭৪) এবং gnvKv‡ji i‡_i †Nvov (১৯৭৭)। উপন্যাস দুটি নকশাল আন্দোলনের উত্তাল রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত। বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট পার্টির নীতি পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সমরেশ বসুকেও ব্যাখ্যা করতে হয়েছে ওই বিপর্যয়ের প্রায়োগিক দিক; নিতে হয়েছে রাজনৈতিক স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম 'সমরেশ বসুর উপন্যাসে রাজনৈতিক জীবন ও তার রূপায়ণ: অন্ত্য পর্যায়। এই পরিসরে অন্তর্ভূত হয়েছে তিনটি উপন্যাস—hM hM wR‡q (১৯৮১), †kKj †Qov nv‡Zi †Lv‡R (১৯৮৪) ও LwÐZv (১৯৮৭)। উপন্যাস তিনিটি প্রণীত হয়েছে আশির দশকে। ঘটনাক্রম বিস্তৃতি পেয়েছে উনিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত। এ সময়ের উপন্যাস ত্রয়ে, উপনিবেশিত ভারতীয় রাজনীতির বিচিত্র জিজ্ঞাসা-জটিলতা— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, মন্বন্তর, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক খণ্ডিত স্বাধীন ভারতের স্বার্থ-সংকীর্ণ রাজনীতি, ব্যক্তি-অস্তিত্বের সংকট এবং জীবনের সম্ভাবনা ও ব্যর্থতা রূপান্বিত হয়েছে।

সময় ও রাজনীতির সংঘাত-অভিঘাতে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীজীবন কীভাবে স্বপ্নে জাগ্রত হয়েছে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়েছে, অন্তর্গহনে ক্ষরিত হয়েছে, অস্তিত্বসংকটে বিমূঢ় হয়েছে, সমরেশ বসুর উপন্যাসে—তারই বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের সারাৎসার লিপিবদ্ধ হয়েছে 'উপসংহারে'।

অতঃপর 'পরিশিষ্টে' যুক্ত হয়েছে সমরেশ বসুর জীবনপঞ্জি; সমরেশ বসুর গ্রন্থপঞ্জি; সহায়ক গ্রন্থসমূহ ও পত্রপত্রিকার তালিকা।

প্রথম অধ্যায়

বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রারম্ভ ও ক্রমবিকাশ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রারম্ভ ও ক্রমবিকাশ

দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের অবস্থান ও অস্তিত্বকামী দ্বান্দ্বিক জীবনকে কেন্দ্র করেই লোকচেতনায় রাজনৈতিক বোধের সঞ্চার হয়। প্রকৃত অর্থে, সমাজবোধ ও রাষ্ট্রীয় অধিকার-চেতনার অনুষঙ্গে এ বোধের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি। উপন্যাসশিল্প যেহেতু 'একটি দেশের ও সময়ের অর্থনীতি-রাজনীতি-অভিজ্ঞতার ভাষারূপ'[১], সেহেতু বৃহত্তর জনসমাজের রাজনৈতিক চেতনাও অনিবার্যভাবে প্রবেশ করে উপন্যাসের গঠনকৌশলে। আর্থ-সামাজিক-নৃতাত্ত্বিক ও ইতিহাসের পরম্পরা, এবং উত্থান-পতন সম্পর্কে বিবিধ শ্রেণির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যখন ঔপন্যাসিকের চেতনা-চিন্তায় সংহত হয়, ও ভাষিক কল্প-অবয়বে রূপ নেয়—বলা যায়, তখনই রাজনৈতিক উপন্যাসের সৃষ্টি। এভাবেই একজন ঔপন্যাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে তাঁর সময়, সমাজ-ইতিহাস, আন্তরঅভিজ্ঞতা ও জীবন-সংলাপ 'পাঠকৃতি'তে (Text) ধারণ করেন। এভাবেই ঘনিষ্ঠ জীবনবোধের বীক্ষণবিন্দু থেকে একজন ঔপন্যাসিক দেশকাল-ইতিহাস এবং বিশেষত বর্তমানকে নির্মাণ-পুনর্নির্মাণ ও প্রতিনির্মাণ করেন। সাহিত্যশিল্পের সঙ্গে রাজনীতির মেলবন্ধন ঘটানোর অভিপ্রায়ে, সমাজ-উদ্‌ভূত রাজনৈতিক শতমূল-চেতনাকে ঔপন্যাসিক রূপ দেন তাঁর উপন্যাসে।

পাশ্চাত্য উপন্যাসসাহিত্যের ধারায় লক্ষ করা যায়, উনিশ শতকে রাজনীতির ক্ষেত্রে ধনবাদী সমাজের উত্থান-পর্যায়ে, যখন পিকারেস্ক উপন্যাসের (Picaresque novel)[২] শুরু, তখনই সৃষ্ট হয় উপন্যাসে রাজনীতিচেতনা ও তার প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিত। এ ধরনের উপন্যাসের নায়ক প্রথাবদ্ধ সামাজিক প্রেক্ষাপটে নতুন ধারার পথিকৃৎ। প্রচলিত মূল্যবোধ ভেঙে, বিতর্কিত এক সামাজিক শ্রেণির নতুন রূপ নির্মাণে উদ্যোগী হয় এসব উপন্যাসের নায়ক। এ ধরনের উপন্যাসে পুঁজিবাদী বিপ্লবের প্রবল উত্থান-সৃষ্ট সামাজিক প্রতিক্রিয়া এবং এর নায়কের ন্যায়-অন্যায় বর্জিত ক্রিয়াকলাপ ও শক্তি-আবেগ উচ্চারণের মধ্যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকে সমাজ-পরিবর্তনের।

উনিশ শতক থেকে উপন্যাস শাখায় ব্যাপক পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পিকারেস্ক উপন্যাসের বলয় থেকে বেরিয়ে সামাজিক উপন্যাসের (Social novel) সূচনা হয়। এ ধরনের উপন্যাসের বিশেষত্ব ছিল এই পিকারেস্ক উপন্যাস যেখানে প্রথাবদ্ধ মূল্যবোধবর্জিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক অভিযাত্রিক সঙ্ঘচেতনায় উত্তীর্ণ হওয়ার কাহিনি; সামাজিক উপন্যাস সেখানে ধনবাদী ও মধ্যশ্রেণির রাজনৈতিক বিজয় ও সুস্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে, তাদের স্বতন্ত্র ও উন্নত অবস্থানে যাত্রা-শুরুর ইঙ্গিত বহন করে। এ ধরনের উপন্যাসে দেখা যায় নায়ক তার মূল্যবোধের বিরুদ্ধে, সাংঘর্ষিক শক্তির ভূমিকায় দাঁড়ানো অভিজাত সমাজের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত। শুধু তাই নয়, এখানে সে নতুন যুগের প্রতিনিধিতে পরিণত হয়, যে কাল মূলত বাণিজ্য বিশ্বের (Commercial world) সূচনা করেছে। অর্থাৎ উনিশ শতকী সামাজিক উপন্যাসের নায়ক প্রকৃত অর্থে সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিভূ।[৩]

সময় প্রবাহে ধনবাদী সমাজব্যবস্থার ভাঙনে উপন্যাস মূলত দুটো ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে—ক. ব্যক্তিক অনুভূতিনির্ভর; খ. বৃহত্তর জনসমাজ ও রাজনীতি-সম্পর্কিত। সামাজিক উপন্যাসের পরিবর্তিত রূপ সূচনা করে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের নবীকরণ। এ থেকেই 'সামাজিক পরিণতিনির্ভর' উপন্যাসের সূচনা।

Dhaka University Institutional Repository

আমেরিকার সাহিত্য সমালোচক Irving Howe (১৯২০-১৯৯৩)-র মতে 'সামাজিক পরিণতিনির্ভর' উপন্যাসের মধ্যেই উপ্ত হয়েছিল রাজনৈতিক উপন্যাসের বীজ। তাঁর মতে, রাজনৈতিক উপন্যাস সৃষ্টির মূলে রয়েছে এমন সামাজিক চেতনা যা সামাজিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে জাগ্রত হয় এবং শেষ পর্যন্ত সমাজ-সমস্যা আন্দোলিত চরিত্রসমূহ নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। ওই মতাদর্শের আলোকে তারা হয়ে ওঠে কখনো সামাজিক প্রেক্ষাপটের বিরোধী, কখনো বা সমর্থক। ব্যক্তিগত বীরত্বগাথার অবসানে গণমতাদর্শকে রূপ দিতে গিয়ে উপন্যাসে রাজনীতিচেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন উপন্যাসশিল্পী—এ বিষয়টি ফরাসি লেখক Stendhal এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন।

বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণে রাখতে হবে : ধনতান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক ইয়োরোপের রাজনীতির কাঠামো (Model) আর উপনিবেশিত এশিয়া-আফ্রিকার রাজনীতিক কাঠামো এক নয়। বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ধারণা বা কর্মকাণ্ডের দ্বন্দ্ব ছিল নানামাত্রিক। মীরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ প্রমুখ দেশীয় উঠতি বাণিজ্যপুঁজিপতি তাদের ব্যবসায় সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে ইয়োরোপীয় বণিকদের পক্ষাবলম্বন করে ১৭৫৭ সালের পূর্বেই বাংলার নবাবকে বৃত্তিভোগীতে পরিণত করেছিল। পলাশী যুদ্ধ পরবর্তীকালে, ইংরেজদের মাৎস্যন্যায় নীতির কারণে দেশীয় বাণিজ্যপুঁজিপতিরা তাদের শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[৪] ১৭৫৫ সাল পর্যন্ত ইংরেজরা বাংলায় ছিল বণিক মাত্র এবং সকল বিষয়ে বাংলার নবাবের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু ১৭৬০ সালের মধ্যে এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। এ সময় বাংলায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইংরেজদের প্রতিপত্তির ভিত্তি রচিত হয় এবং ১৭৬৫ সালের মধ্যে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ইংরেজদের রাজনৈতিক আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। দেওয়ানি লাভ করে লর্ড ক্লাইভ বাংলায় যে 'দ্বৈতশাসন' প্রবর্তন করেন, তাতে এশীয় স্বনির্ভর গ্রামীণ সমাজকাঠামোয় বিন্যস্ত, সংহতিপূর্ণ গোষ্ঠীজীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। দীর্ঘকালীন শান্তিপূর্ণ সামাজিক কাঠামো এক বিশৃঙ্খল, অনিবার্য বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়।

এই দুর্যোগকালীন পরিপ্রেক্ষিতে লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) প্রবর্তনের প্রভাবে "একদিকে খাজনা আদায় নিয়ে প্রজা-জমিদার বিরোধ, অন্যদিকে পতিত-জমিদার ও নব্য জমিদার-এর অন্তঃসংঘাত হয়ে উঠলো ঘনীভূত। ব্যক্তিপুঁজির সচলতা, ভূমিস্বত্বের নবরূপায়ণ, নতুন প্রজাশোষণ-কৌশল, প্রজাবিদ্রোহ"[৫] সমাজের উপরিকাঠামোকে রূপান্তরিত করে। সমাজকাঠামোর এই পরিবর্তিত বাস্তবতাই অনিবার্য করে তুলেছে বিভক্ত শ্রেণিসমূহের অন্তর্সংঘাতজনিত রাজনৈতিক চেতনা।

১৭৫৭ সালের পর থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে সামন্তসমাজের অধিকার এবং ভূমিনির্ভর কৃষকের বিপন্ন জীবন ও জীবিকার বিপ্রতীপে ইংরেজদের সহায়কশক্তি হিসেবে নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিকট হস্তান্তরিত হয় সামাজিক নেতৃত্ব। 'ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বাণিজ্যপুঁজি (Marchantile capital) ও শিল্পপুঁজি (Industrial capital)-নির্ভর শাসনযন্ত্র কলকাতা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের সমাজগঠন ও জীবনবিন্যাসের বস্তুগত ও ভাবগত রূপান্তরকে করে তোলে অনিবার্য। উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিচেতনায় সমৃদ্ধ এক শিক্ষিত জনশ্রেণির উদ্ভব ঘটে।'[৬] ব্যবসায়ী ও মধ্যশ্রেণি ছিল মূলত জনজীবন-বিচ্ছিন্ন, যাদের দ্বারা সীমাবদ্ধভাবে হলেও 'বাঙালির পুনর্জাগরণ' ঘটেছিল। এই শ্রেণির কাছে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইংরেজরা মুক্তির দূত হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু পরে তাদের মোহভঙ্গ হয় এবং এই উপলব্ধিতে পৌঁছায় যে—'সাম্রাজ্যবাদী শাসকবর্গ পারে কেবল পায়ের শিকল লম্বা করে দিতে—মুক্তি দিতে পারে না।'[৭]

এভাবে নবলব্ধ বোধ থেকে উল্লেখিত শ্রেণির মাঝে জন্ম নেয় স্বাধীনতা ও স্বদেশ চেতনা। কৃষকবিদ্রোহ থেকে শুরু করে সিপাহি মহাবিদ্রোহ পর্যন্ত বিস্তৃত ঘটনাধারায় এ চেতনা পরিণতি লাভ করে। স্বাধীনতা ও

Dhaka University Institutional Repository

স্বাদেশিকতাবোধকে বাংলা উপন্যাসের ধারায় প্রথম শিল্পরূপ দেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) তাঁর Avb›`gV (১৮৮২) উপন্যাসে।

ঔপনিবেশিক প্রশাসনের অংশী হিসেবে জনবিচ্ছিন্ন বাংলার যে রেনেঁসাস, তার ধারক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০–৭৮), নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯–১৮৬২) কৃষক বিদ্রোহের (১৮৭২–১৮৭৩), মধ্যদিয়ে ভারতীয়দের মনে যে স্বদেশবোধের জন্ম হয়েছিল তাতে তারা স্বাধীন স্বদেশভূমি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন লালন করতে থাকে। আধিপত্যবাদী শাসক ইংরেজ এবং নামমাত্র নবাবি-শাসনের দ্বৈততা সৃষ্ট সংকটের আবর্তে নিক্ষিপ্ত, বাঙালি হিন্দু-সমাজের জনবিচ্ছিন্ন কিয়দংশ সন্তানধর্মে দীক্ষিত হয়ে দেশপ্রেমের যে তীব্র আবেগী ও অনিয়ন্ত্রিত ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার রোমান্স-তরঙ্গিত উপস্থাপনা Avb›`gV।

১৭৭০ সাল থেকে ১৭৭২ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত সময়পর্বে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ফলে দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট মন্বন্তরের (১৭৭০) পটভূমিকায় রচিত হয়েছে এ উপন্যাস। দেওয়ানি লাভের পর ইংরেজদের একমাত্র লক্ষ ছিল বাংলা থেকে যতদূর সম্ভব অর্থ সংগ্রহ করা। এজন্য শুরু হয় বাংলার রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ চাপ সৃষ্টি করা। জমির ওপর নির্দিষ্ট হারে খাজনা ধার্য না থাকায় কোম্পানি যতদূর সম্ভব অধিক পরিমাণে খাজনা আদায় করতে চেষ্টা চালায়। রাজস্ব বিভাগের পুরোনো দক্ষ কর্মচারীদের (তহসিলদার) বরখাস্ত করে একদল নতুন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। চাকুরি স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে তাদের প্রয়োজন ছিল ইংরেজদের সন্তুষ্টি লাভ। এজন্য কৃষকদের ওপর শোষণ ও অত্যাচার চালিয়ে তারা অতিরিক্ত খাজনা আদায় করত। এভাবেই ইংরেজরা এদেশীয় জনগণের মধ্যে পারস্পরিক অনাস্থা ও বিচ্ছিন্নতাবোধের সূত্রপাত করে। বাংলার মুসলমান নবাবের পক্ষে নির্বাক নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। শুধু কৃষক নয়, এ অবস্থায় জমিদারও দারিদ্র্যের কবলে পড়েন। সমগ্র রাজস্ব ব্যবস্থায় চরম অরাজকতা ও লুণ্ঠনের ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা যখন দ্রুত পতনশীল, তখনই বিহার ও বাংলায় ১৭৬৮-১৭৬৯ সালে একটানা অনাবৃষ্টির ফলে শস্যের অভাবনীয় ক্ষতি হয় এবং ১৭৭০ সালে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) দুর্ভিক্ষ প্রবল আকার ধারণ করে।[৮] কোম্পানির কালোবাজারি ও মজুতদারি, তাদের কর্মচারী-গোমস্তাদের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর একচেটিয়া কারবার বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক তৃতীয়াংশ মানুষ অনাহারে প্রাণ হারায়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলা-বিহারের অর্থনৈতিক কাঠামোয় যে প্রচণ্ড আঘাত হানে তারই পটভূমিকায় রচিত হয়েছে Avb›`gV[৯] উপন্যাস।

গ্রামীণ ভেঙে-পড়া আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় তখন স্বতঃস্ফূর্ত জনকল্যাণের সুযোগ ছিল না, বরং ছিল ত্রিমুখী শোষণ। ইংরেজ প্রশাসনের অংশী ও মধ্যশ্রেণি অবস্থান সত্ত্বেও, ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস অধ্যয়ন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র অনুধাবন করেছিলেন ত্রিমুখী শোষণের প্রতিবাদ প্রয়োজন। প্রতিবাদের বিপ্লবপন্থার যে পথ ও আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র অনুসরণ করেছিলেন, সে সক্রিয় পন্থা থেকে শোষিত হিন্দু-মুসলমানের জীবন ছিল বিচ্ছিন্ন, প্রান্তবর্তী।

ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা, ধর্মতত্ত্ব এসব সম্পর্কে সচেতন বঙ্কিমচন্দ্র এ উপন্যাসে সন্তানধর্মে দীক্ষিত ও অদীক্ষিত সন্তানের রূপ নির্মাণ করেছেন—যারা অরণ্যচারী, ধর্ম ও স্বদেশপ্রেম-শক্তিতে সর্বত্যাগী অথচ নারীপ্রেমে স্পর্শকাতর, রিপুতাড়িত, এমনকী সন্তানধর্ম বিসর্জনেও উৎসাহী। দীক্ষিত সন্তানেরা অরণ্যের আড়ালে থেকে গেরিলা পদ্ধতিতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে। বঙ্কিমসৃষ্ট দীক্ষিত সন্তানরা গীতা স্পর্শ করে দেশমাতৃকার কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ—তারা সনাতনধর্মী, দেবী দুর্গা ও কালীর

Dhaka University Institutional Repository

উপাসক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সনাতন ধর্মাবলম্বী বিপ্লববাদী সন্তান ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধ পরিচালনা করে জয়লাভ করতে পারেনি। এর মধ্যদিয়ে উপনিবেশিত প্রশাসনযন্ত্রের অংশী বঙ্কিমের যে সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে সেটা তাঁর সময়সতর্ক, ইতিহাসজ্ঞান ও যুক্তিবাদী চেতনা এবং মানবহৃদয়ের প্রতি সমানুভূতি স্নাত শিল্পীমানসের বৈশিষ্ট্য।

বাঙালি জাতির অর্ধেক মুসলিম, হিন্দুজনগোষ্ঠীর সঙ্গে একত্র হয়ে, জাতীয় আন্দোলনে এগিয়ে যেতে পারেনি কারণ, নামমাত্র হলেও দেশের শাসনকাঠামোয় তখন ছিল মুসলমান নবাব। স্বদেশপ্রেম, 'সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্যতা', মনুষ্যপ্রেম, মানবিকতা, সহানুভূতি বঙ্কিম-মানসের বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই ইতিহাস ও কালচেতনা, হৃদয়বৃত্তি ও যুক্তিবাদের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে কখনও শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে জয় লাভ করা যায় না। সেই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন সনাতন ভারতবর্ষের শিক্ষা, ধর্মাচরণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। ইতিহাস ও কালের প্রতীক চরিত্র হিসেবে চিকিৎসক-এর কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করেন এ যুগসত্য :

সত্যানন্দ কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতনধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। মহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝিয়াছেন, এ কথা আমি তোমাকে সেইরূপ বুঝাই। মনোযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতনধর্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতনধর্ম—ম্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম বলে—তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সে-ই সনাতনধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেকদিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কাজেই প্রকৃত সনাতনধর্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতনধর্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতনধর্ম প্রচারের আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যতদিন না তা হয়, যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান, গুণবান আর বলবান হয়, ততদিন ইংরেজ রাজ্য অক্ষয় থাকিবে। ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমান —ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।[10]

উপনিবেশিত ভারতবর্ষে একদিকে শেলি, কীটস, বায়রনের রোম্যান্টিসিজম অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শোষণের বাস্তবতা—এ দ্বিবিধ রূপ বাঙালি লেখকচেতনায় সক্রিয় ছিল। অন্যভাবে বলা যায়, ঔপনিবেশিক শক্তি-উচ্ছেদের যে আবেগময় স্বপ্ন ছিল মধ্যবিত্তের মাঝে তার প্রত্যক্ষরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের Avb›`gV। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক বিপ্লবের ধারা কীভাবে ধর্মীয় প্রতিহিংসাপরায়ণতা-লুঠতরাজ ও কল্পনামুখ্য রোম্যান্সের দিকে ধাবিত হয়েছিল অনেকাংশে তারই আখ্যান হয়ে রইল এ উপন্যাস। এ প্রসঙ্গে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃদু রূঢ় সিদ্ধান্ত স্মরণীয় :[১১]

হিন্দু-মুসলমান চাষীর মিলিত সংগ্রামের দৃষ্টান্ত তাঁর সামনে শতাব্দী জুড়ে।... আসলে 'আনন্দমঠ'এক চাকুরীজীবী ঔপনিবেশিক শিক্ষায় বড় হওয়া তীক্ষ্মধী ব্যক্তির করুণ কল্পস্বর্গ, যে কল্পস্বর্গে ১৮৭০-৮০ দশকের জটিল মন নানা স্ববিরোধী ধারণায় আক্রান্ত, নির্মাণ করেছে এমন এক উপন্যাসের বয়ান যার তাৎপর্য মারাত্মক, পরবর্তী ইতিহাসে বিপর্যয়কারী। লিবারেল ও নারদবাদী ইউটোপিয়ার এক অনৈতিহাসিক, জনসমাজবিচ্ছিন্ন এ রসায়ন আমাদের বাস্তবকে অসুস্থ করে তুলছে। বঙ্কিমের সন্তানদলে ভবিষ্যতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকারীদের ছায়া।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের কী নির্মম আত্মঘাতী রক্তক্ষরণ, কী নির্মম দ্বিজাতি বিভাজন; অথচ এই বঙ্কিমচন্দ্রই রচনা করেছিলেন 'বঙ্গদেশের কৃষক', 'সাম্য' প্রবন্ধ।[১২] ঔপনিবেশিক এবং জমিদারির নির্মম শোষণ-অত্যাচারের সমসারিবদ্ধ করেন, রামা কৈবর্ত আর হাসেম শেখকে।

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও A\b›'gV উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের সাফল্য এই, তিনি সমকালীন গণমানুষের সংকট এবং আকাঙ্ক্ষাকে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। এজন্য A\b›'g‡Vর প্রতিপাদ্য স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের মূল শ্লোগান 'বন্দে মাতরম্' ভারতবাসীর কাছে দীপ্র আবেগে গৃহীত হয়। এই শ্লোগানকে ধারণ করেই ভারতের মুক্তিসংগ্রাম চড়াই-উৎরাই পার হয়ে রক্তপিচ্ছিল পথে অগ্রসর হয়েছিল বহুদূর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহির্জাগতিক-অন্তর্বাস্তবিক প্রতিক্রিয়ার শিল্পভাষ্য হিসেবে সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেছেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা, বিপ্লববাদী গুপ্তহত্যা, ১৮৯০-১৯০৭ পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট জাতীয়তাবাদী চেতনা, স্বামী বিবেকানন্দের প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনা তখন এমনভাবে দেশ-বিদেশে প্রচারিত হয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথও তখন সংকীর্ণ ভারতীয় জাতীয়তাবাদে অনুৎসাহী থাকতে পারেননি।। এ সময় তিনি ব্রাহ্মধর্মকেও উৎকৃষ্ট বলে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু,

> মানবতাবাদী চলমানতায় সুস্থির, প্রগতিপথিক, রোম্যান্টিক জীবনাগ্রহী রবীন্দ্রনাথের পক্ষে হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী ঘূর্ণাবর্তে বদ্ধ থাকা সম্ভব নয়। এ কারণেই বর্ণবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, সংকীর্ণতা ও পরস্পরবিরোধী সাম্প্রদায়িক ধর্মমত প্রভৃতি সমস্যা উপেক্ষা করে তাঁর পক্ষে নির্বিচারে অতীত ভারতীয় গৌরবে মুগ্ধ হওয়া সম্ভব হয়নি। প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণতা, ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব, স্বদেশী আন্দোলন এবং তার পরবর্তী হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও অন্যান্য দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজাগতিকতা, বিশ্বমানবতা ও সর্বধর্ম সমন্বয়বাদী অত্যুচ্চ মানবীয় আদর্শের দিকে অগ্রসর হয়েছেন।[১৩]

এ আদর্শের প্রথম দৃষ্টান্ত †gv‡iv[১৪]। বঙ্কিমচন্দ্রের A\b›'g‡Vর সন্তানদের মাঝে যে দেশমুক্তির স্বপ্ন তা ছিল হিন্দু উগ্র জাতীয়তাবাদী ও বিভেদাশ্রয়ী; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গোরার চেতনালোকে সঞ্চার করেছেন উদার মানবতাবোধ যা প্রকৃত অর্থে রবীন্দ্রনাথের আত্মদর্শন ও আত্মানুসন্ধান। "গোরার বিশিষ্টতা, গোরার দ্বন্দ্ব আসলে রবীন্দ্রনাথেরই চেতনার প্রতিফলন। উপন্যাসের শুরুতে স্বদেশপ্রেমী, আচারনিষ্ঠ হিন্দু চরিত্র গোরা শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্ব-সংস্কারমুক্তির পথ হিসেবে গ্রান্ড ট্র্যাঙ্ক ধরে যাত্রা করেছে দেশভ্রমণে। ব্রাত্যজীবন অভিজ্ঞতা ও স্বীয় রাজনৈতিক আদর্শ দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের চারিত্র এবং দেশীয় অনুচরদের লালসা ও বিকৃতি প্রত্যক্ষ করে শেষ পর্যন্ত গোরা আত্মদ্বন্দ্ব অতিক্রম করে ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করেন; এবং কামনা করেন পরাধীন ভারতের জীবনমুক্তি :"নীচের লোকদের নিষ্কৃতি না দিলে কখনোই যথার্থ নিষ্কৃতি নেই।"[১৫]

উপন্যাসের সমাপ্তিপর্যায়ে আত্মপরিচয় উদ্ঘাটিত হওয়ার পর গোরা পুরোপুরি দ্বন্দ্বউত্তীর্ণ হয়ে, প্রকৃতপক্ষে পুনর্জাত হয়, সর্বভারতীয় বোধে, বিশ্বমানবিকতায়, আন্তর্জাতিক চেতনায়। উপন্যাসের ৭৬ পরিচ্ছেদে পরেশবাবুর সঙ্গে গোরার সংলাপ অনুধাবনীয় : "আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষেরও দেবতা।"[১৬] পরিশিষ্টে আনন্দময়ীকে গোরার উচ্চারণ : "মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।—।"[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসে রাজনীতি কিংবা যে কোনো মতবাদ প্রচারসর্বস্ব হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, তা হতে হবে শিল্পরূপময়। এ কারণেই †Mvjv উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন চরিত্রের যুক্তিবাদী তর্ককে শিল্পমাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন। ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তিপ্রত্যাশী গোরা বোধে, চেতনায়, ধর্মে ভারতীয় ঐতিহ্যের মাঝে আত্মআবিষ্কারের তপস্যায় বিশ্বাসী। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ থেকে 'সর্বাস্তিবাদী মানবধর্মে' এবং আন্তর্জাতিক মানবের মহামিলনে আস্থা তাঁর—এটিই তার সাধনা। রবীন্দ্রনাথ †Mvjv উপন্যাসে রাজনীতিতে জনসংযুক্তির অনিবার্যতা এবং জাতপাত সকল ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষ ঐক্য-সংগঠনের উপর গুরুত্ব দেন। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, বাংলা তথা ভারতের সার্বিক মুক্তি সাধনের যথার্থ পথনির্দেশক; তাঁর উপন্যাসও তার শিল্পিত সাক্ষ্য। এখানে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়, অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতি—জমিদার, ধনিক ও মধ্যশ্রেণির বলয় থেকে প্রথম মুক্ত হতে শুরু করে। সকল ধর্মাবলম্বী, জাত-পাত, উচ্চ-নীচু জনগোষ্ঠী সর্বপ্রথম তৃণমূলে সম্পৃক্ত হয়ে উঠতে থাকে।। রাজনৈতিক সংগঠন—কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমিক-কৃষক পার্টি—সকল সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তারা লোকসংযুক্তির গুরুত্ব অনুভব করে।

cÖvjv উপন্যাসের পর N‡i-evB‡i[১৮] উপন্যাসে তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অনভিজ্ঞ-বিভ্রান্ত বিমলাদের মতো নারীদেরও কীভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল, রবীন্দ্রনাথ তার শিল্পরূপ নির্মাণ করেছেন। ব্রিটিশ পণ্য বর্জননির্ভর স্বদেশী আন্দোলনের শুরুতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বজায় থাকলেও শেষ পর্যন্ত থাকেনি। ১৯০৫ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে বয়কট-নীতি অসমর্থিত হওয়ার ফলে নরমপন্থা ও চরমপন্থা—এ দুই মতাদর্শের উদ্ভব হয়। তাদের মতদ্বৈধতার ফলে কংগ্রেস বয়কট-নীতি বর্জন করে। ফলত স্বদেশী আন্দোলন চরমপন্থী মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। যারা এ আন্দোলনকে শুধু "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর চাপ সৃষ্টির অস্ত্র হিসেবেই গ্রহণ করেন।"[১৯]

গ্রামের সুদখোর হিন্দুমহাজন ও ভ্রাম্যমাণ কাবুলিওয়ালাদের শোষণে নিষ্পেষিত জনসাধারণ ইংরেজদের শোষক ভাবতে পারেনি। যে দামে তারা বিলেতি পণ্য ক্রয় করতে পারত তার চেয়ে অনেক বেশি দামে কিনতে হত মুম্বাই ও আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্পের মালিকদের কাছ থেকে। গ্রামীণ জনজীবনের এই সংকট চরমপন্থী মধ্যবিত্ত শ্রেণি অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছিল। এ কারণে বয়কট-নীতি বাস্তবায়নে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে অসমর্থ হয়ে তারা বলপূর্বক ভয়-ভীতি দেখিয়ে ও অত্যাচারের মাধ্যমে বিলেতি পণ্য পুড়িয়ে ফেলত। পরিণতিতে নেতা-কর্মীরা হয়ে পড়ে জনজীবনবিচ্ছিন্ন। ভারতীয় জনসাধারণের সঙ্গে এ কারণেই সংঘাত বাধে সংকীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ চরমপন্থীদের যা শেষ পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী হয়ে ওঠে। এ পটভূমিকায় রচিত N‡i-evB‡i উপন্যাসে সন্দীপ, জমিদার নিখিলেশের বন্ধু হিসেবে, তার বাড়িতে অবস্থান করে সহিংস বিপ্লববাদী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। কৃষক ছেলের জর্মন শাল পোড়ানো, দরিদ্র পঞ্চুর ব্যবসায়ের সামান্য মূলধন বিদেশি কাপড় ভস্মীভূত করা, এবং মিরজানের নৌকা নদীতে ডুবিয়ে দেওয়ার ঘটনা তারই প্রমাণ। এ সকল কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করতে পারেনি নিখিলেশ। এ কারণে তার নামে বেনামি চিঠি পাঠিয়েছে সন্দীপ। নিখিলেশের আত্মকথা স্মরণীয় :

> এ দিকে আমার নামে লাল কালিতে লেখা একখানা, চিঠি এসেছে। তাতে খবর দিয়েছে কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ লিভারপুলের নিমকহালাল জমিদারের কাছারি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বলেছে, ভগবান পাবক এখন থেকে এই পাবনের কাজে লাগলেন ; মায়ের যারা সন্তান নয় তারা যাতে মায়ের কোল জুড়ে থাকতে না পারে তার ব্যবস্থা হচ্ছে। নাম সই করেছে, 'মায়ের কোলের অধম শরিক শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।'[২০]

গণজীবনবিচ্ছিন্ন চরমপন্থী নেতাদের কৌশলী বাগ্মিতাকে আশ্রয় করে সন্দীপ নিখিলেশের স্ত্রী বিমলাকে বিভ্রান্ত-সম্মোহিত করে তাদের দলে টেনেছে। অর্থপ্রাপ্তির উৎস হিসেবে তাকে ব্যবহার করেছে সন্দীপ।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্গা ও দেশমাতৃকার অভিন্ন শক্তিরূপিণী হিসেবে সে বিমলাকে আবিষ্কার করেছে। এ আবিষ্কারে সংসারের ঘেরাটোপে আবদ্ধ নারীও রাজনীতিতে প্রাণিত হয়েছে। নিখিলেশের সঙ্গে দাম্পত্যজীবনের প্রাত্যহিকতার মাঝে এ নারীর জীবনে সন্দীপ এসেছে ভিন্নতর জীবনরূপ নিয়ে, আন্দোলিত ও আলোড়িত হয়েছে সে। "রবীন্দ্রনাথ গণজীবনবিচ্ছিন্ন গুপ্ত-রাজনীতির অধৈর্য পন্থাকে কোনোদিন পরম বলে মেনে নিতে পারেননি"[২১] বলেই এ উপন্যাসে রাজনৈতিক আবহকে ছাড়িয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত সহৃদয়হৃদয়তার কাছেই প্রত্যাবর্তন করেছেন।

Pvi Aa¨vq[২২] উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের পক্ষে থেকেছেন। শৈশবের পারিবারিক আবহ—বিশেষ করে মায়ের কর্তৃত্বসর্বস্ব সংকীর্ণতানির্ভর মনস্তত্ত্ব এলাকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল, সে হয়ে উঠেছিল প্রথাবদ্ধ গণ্ডি থেকে মুক্তিকামী ও বিবাহবিমুখ। পরবর্তীতে কাকির আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক আচরণে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়সূত্রে বিপ্লববাদী দলে যোগ দেয় সে। তার সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বে বিমুগ্ধ অতীন্দ্রের প্রতি প্রথম আকর্ষণ বোধ করলেও দেশসেবার জন্য ইন্দ্রনাথের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এলা শেষ পর্যন্ত অতীনকেও দেশের কাজে সমর্পণ করতে চায়। এলাকে পাওয়ার জন্যে যে অতীন বিপ্লবী সঙ্ঘে যোগ দিয়েছিল, সে বৈপ্লবিক পন্থায় দেশসেবা করে অতীন আত্মতৃপ্তি পায়নি, বরং 'স্বভাব হত্যার' পাপে আত্মযন্ত্রণা ও আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হয়েছে বার বার, এগিয়ে গেছে আত্মবিনাশের দিকে। অন্যদিকে এলাও বিপ্লবী দলের সহিংস বিপ্লববাদী কর্মকাণ্ডে আস্থা হারিয়েছে শেষ পর্যন্ত—কিন্তু শৃঙ্খলমুক্ত হতে পারেনি। অনাথ বিধবার সর্বস্ব লুট করে তাকে হত্যা করেছিল বিপ্লবী দল। কিন্তু এলার পাণিপ্রার্থী বটু প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে থানায় জানিয়ে দেয় অতীনের নাম। পরিণতিতে বিপ্লবী দলের 'ঈর্ষার বিষ কামের ক্লেদ এবং পৈশাচিক প্রতিহিংসার নির্যাতন থেকে' বাঁচাবার জন্য এলাকে হত্যা করে অতীন। হৃদয়ধর্ম ও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে বৈপ্লবিক পন্থায় কখনো যে মানবকল্যাণ সাধন করা যায় না এলার জীবনের করুণ ও অতীনের ট্র্যাজিক পরিণতির মাধ্যমে তারই নান্দনিক ভাষ্য হয়ে উঠেছে Pvi Aa¨vq উপন্যাস।

বঙ্কিমচন্দ্র-পরবর্তী রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে রাজনীতিভাবনা অবশ্য পুরোটাই সমাজমনস্ক। "উনিশ শতক শেষ হবার আগেই রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন সমসাময়িক ধনতান্ত্রিক ইয়োরোপ, প্রাচীন ভারতবর্ষ বা ঔপনিবেশিক আধুনিকতা, কোনটাই মুক্ত ভারতবর্ষের মডেল বা অনুকরণযোগ্য আদর্শ হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার স্পষ্ট করে বলেছেন, ভারত ইতিহাসের মূলসূত্র রাষ্ট্র নয়, সমাজ; বৃহত্তর প্রাচীন জনসমাজ। তাই রাজনীতির ধারণাও তাঁর ছিল ভিন্ন : তিনি আহ্বান করেছিলেন রাজনীতিকদের গ্রাম পুনর্গঠনের আপাত নাটকহীন কঠিন ব্রতে, কারণ ভারতবর্ষের রাজনীতি ওখানেই নির্মিত হবে।[২৩]

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন—শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুক্তির জন্য রাজনীতি নয়, সামাজিক পরিবর্তন প্রয়োজন। তিনি বিশ্বাস করতেন—রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কর্মকাণ্ড শান্তিময় কিংবা কল্যাণমূলক হলে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সেটা গ্রহণ করবে। N‡i-evB‡i উপন্যাসের সন্দীপ ও নিখিলেশের কথোপকথন ও কার্যকলাপের মধ্যদিয়েই সেটা অভিব্যক্ত হয়েছে। তাত্ত্বিকতা ছিল রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়, অভিজ্ঞতাও ছিল অসাম্প্রদায়িক গ্রামীণ জনমানুষের। রাজনীতি ও সমাজ-পরিবারের সমগ্র দৃষ্টি দিয়ে তিনি সমকালীন প্রেক্ষাপটকে চিনিয়েছেন। এ কারণেই †Mvjv, N‡i-evB‡i ও Pvi Aa¨vq-এর পরিণতিতে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও পারিবারিক দুর্বহ যন্ত্রণা সমীকৃত হয়ে প্রাগ্রসর সত্যনির্দেশক এক ভিন্নতর আখ্যান হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্র সমকালে Pvi Aa¨vq প্রকাশের পূর্বেই গুপ্ত রাজনীতির ঈষৎ অভিজ্ঞ ও কংগ্রেসী রাজনীতির প্রত্যক্ষ সংগঠক হিসেবে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচনা করেন c‡_i 'vex[২৪]। ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন-

Dhaka University Institutional Repository

শোষণের বিশ্বস্ত উপস্থাপনার সঙ্গে, তৎকালীন যুবসমাজ সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যদিয়ে পরাধীনতার গ্লানিমুক্তির যে স্বপ্নময় পথ অবলম্বন করেছিল তারই কল্পরূপ এটি। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে কংগ্রেসের প্রকাশ্য ও নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের মূলনীতি ছিল 'অহিংস নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহ ও সংগ্রাম'। অন্যদিকে বিপ্লববাদীদের উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা অর্জন। সিঙ্গাপুর থেকে চীন পরিব্যাপ্ত আঞ্চলিক বিপ্লবের নেতৃত্বদানকারী বিপ্লবীদের খণ্ড খণ্ড সংগ্রামশীল অভিযাত্রাপূর্ণ জীবনবাস্তবতা ধারণ করেছে শরৎ-সৃষ্ট অতিনায়ক চরিত্র সব্যসাচী, যিনি বহু শাস্ত্রবিদ, বহু ভাষাবিদ, ছদ্মবেশ ধারণে পারঙ্গম এবং অসাধারণ বাগ্মী ও তার্কিক।

সমকালীন রাজনৈতিক সংকটমুক্তির পদ্ধতি সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে c‡_i 'vex উপন্যাসে। সোভিয়েত বিপ্লবের অভিজ্ঞতায় এদেশের বিপ্লববাদীরা ভেবেছিল শ্রমিক আন্দোলনই জাতীয় মুক্তির একমাত্র পথ যা সব্যসাচীর 'পথের-দাবী' সংগঠনের কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীর সঙ্গে কথোপকথনে তার রাজনৈতিক দর্শন ব্যক্ত হয়েছে এভাবে :

এমন করে এদের ভালো করা যায় না, —এদের ভালো করা যায় শুধু বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে। এবং সেই বিপ্লবের পথে চালনা করার জন্যেই আমার পথের-দাবীর সৃষ্টি। বিপ্লব শান্তি নয়। হিংসার মধ্যে দিয়েই তাকে চিরদিন পা ফেলে আসতে হয়, —এই তার বর, এই তার অভিশাপ। একবার ইউরোপের দিকে চেয়ে দেখ। হংগেরিতে তাই হয়েছে, রুসিয়ায় বার বার এমনি ঘটেছে, ৪৮ সালের জুন মাসের বিপ্লব ফরাসীদের ইতিহাসে আজও অক্ষয় হয়ে আছে। কুলি-মজুরদের রক্তে সেদিন শহরের সমস্ত রাজপথ একেবারে রাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। এই তো সেদিনের জাপান, সেদেশেও দিনমজুরের দুঃখের ইতিহাস একবিন্দু বিভিন্ন নয়। মানুষের চলবার পথ মানুষে কোনদিন নিরুপদ্রবে ছেড়ে দেয় না ভারতী।...মহামানবের মুক্তি-সাগরে মানবের রক্তধারা তরঙ্গ তুলে ছুটে যাবে সেই ত আমার স্বপ্ন। এতকালের পর্বতপ্রমাণ পাপ তবে ধুয়ে যাবে কিসে? আর সেই ধোয়ার কাজে তোমার দাদার দু ফোঁটা রক্তেরও যদি প্রয়োজন হয় ত আপত্তি করব না ভারতী।[২৫]

c‡_i 'vex উপন্যাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল সুমিত্রা ও ভারতীর মতো নারীদের রাজনীতি সচেতনতা। স্বপ্নময় রোমান্সকর সব্যসাচীর 'পথের-দাবী' সংগঠনের মূল লক্ষ্যই ছিল শ্রমিক শ্রেণির আত্মমর্যাদা ও অধিকারবোধ জাগানো—যাকে আশ্রয় করে শেষ পর্যন্ত মুক্তির পথে এগিয়ে যাবে তারা। এ কাজে সব্যসাচীর সহায়কশক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে সুমিত্রা ও দোলাচলে বিচলিত ভারতী।

সুমিত্রার অসুস্থতায় অপূর্বকে নিয়ে ভারতী যখন কারখানার ভারতবর্ষীয় কুলি-লাইনে গিয়েছিল তার বর্ণনায় ঔপন্যাসিক চিরকালীন বঞ্চিত মানুষের যে জীবনরূপ অঙ্কন করেছেন তা ভারতবর্ষে শোষিত মানুষের জীর্ণ জীবনবাস্তবতার প্রতিভূ। লক্ষণীয় : "ডানদিকে সারি সারি করোগেট লোহার গুদাম ও তাহারই ওধারে কারিগর ও মজুরদিগের বাস করিবার ভাঙ্গা কাঠ ও ভাঙ্গা টিনের লম্বা লাইনবন্দী বস্তি। সুমুখ দিকে সারি সারি কয়েকটা জলের কল, এবং পিছন দিকে এমনি সারি সারি টিনের পায়খানা। গোড়াতে হয়ত দরজা ছিল, এখন থলে ও চট-ছেঁড়া ঝুলিতেছে। ইহাই ভারতবর্ষীয় কুলী-লাইন। পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, বর্মা, বাঙালী, উড়ে, হিন্দু, মুসলমান, স্ত্রী ও পুরুষে প্রায় হাজার-খানেক জীব এই ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া চলিয়াছে।"[২৬] এ সব শ্রমিকদের নেশাসক্ত, বঞ্চিত, পীড়িত, উপদ্রুত, বিকৃত জীবন এবং রিরংসা, অন্তর্কলহ ও পুলিশভীতি, প্রতিবাদের মুখে তাদের পলায়নপরতাও শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনের অভিজ্ঞতা থেকে নির্ভুল অঙ্কন করেছেন।

সময়ের অনিবার্য অভিঘাত থেকেই অহিংসা ও মানবের শুভবুদ্ধিতে বিশ্বাসী ভারতী বুঝেছিল যুদ্ধবিদ্যা ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে প্রাগ্রসর ইংরেজদের তুলনায় বিপ্লববাদীরা নগণ্য 'গোস্পদ', সে সব্যসাচীকে বোঝানোর

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টা করেছে সব ইংরেজই শোষক নয়। এ নিয়ে সব্যসাচীর সঙ্গে ভারতী বারবার মতান্তরে লিপ্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উন্মোচন করে সব্যসাচী তাকে জানিয়েছে :

তুমি তাদের সমধর্মাবলম্বী, তাদের কাছে অশেষ ঋণে ঋণী, তাদের অনেক সদ্‌গুণ চোখে দেখেচ—দেখেচ তাদের বিশ্বগ্রাসী বিরাট ক্ষুধার পরিমাণ? এ দেশের মালিক তারা, —মালিকানার তারিখ মনে আছে ত? আজ ব্রিটিশ-সম্পদের তুলনা হয় না। কত জাহাজ, কত কল-কারখানা, কত শত-সহস্র ইমারত। মানুষ মারবার উপকরণ-আয়োজনের আর অন্ত নেই। তার সমস্ত অভাব, সর্বপ্রকার প্রয়োজন মিটিয়েও ইংরেজ ১৮১০ সাল থেকে সত্তর বছরের মধ্যে কেবল বাইরে দিয়েছিল ঋণ তিন হাজার কোটি টাকা! জানো এই বিরাট ঐশ্বর্যের উৎস কোথায়? আপনাকে তুমি বাঙলা দেশের মেয়ে বলছিলে, না? বাঙলার মাটি, বাঙলার জলবায়ু, বাঙলার মানুষ তোমার প্রাণাধিক প্রিয়, না? এই বাঙলার দশ লক্ষ নর-নারী প্রতি বৎসরে শুধু ম্যালেরিয়া জ্বরে মরে। এক-একটা যুদ্ধজাহাজের দাম জানো? এর একটার খরচে কেবল দশ লক্ষ মায়ের চোখের জল চিরদিনের তরে মোছানো যায়। ভেবেছ কখনো এ কথা? দেখেচ কখনো বুকের মধ্যে মায়ের মূর্তি? শিল্প গেল, বাণিজ্য গেল, ধর্ম গেল, জ্ঞান গেল, —নদীর বুক বুজে মরুভূমি হয়ে উঠছে, চাষা পেট পুরে খেতে পায় না, শিল্পী বিদেশীর দুয়ারে মজুরি করে, —দেশে জল নেই, অন্ন নেই, গৃহস্থের সর্বোত্তম সম্পদ সে গোধন নেই, —দুধের অভাবে শিশুদের শুকিয়ে মরতে দেখেচ ভারতী।[২৭]

ভারতী আবেগজড়িত কণ্ঠে সব্যসাচীকে বিপ্লবীদের নির্মম রক্তাক্ত পথ ছেড়ে দেবার কথা উচ্চারণ করেছে : "ভারতের মুক্তি আমরা চাই—অকপটে, অসঙ্কোচে, মুক্তকণ্ঠে চাই। দুর্বল, পীড়িত, ক্ষুধিত ভারতবাসীর অন্নবস্ত্র চাই। মনুষ্য-জন্ম নিয়ে মানুষের একমাত্র কাম্য স্বাধীনতার আনন্দ উপলব্ধি করতে চাই। ভগবানের এত বড় সত্যে উপস্থিত হবার এই নিষ্ঠুর পথ ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই এ আমি কোন মতেই ভাবতে পারিনে। পৃথিবী ঘুরে তুমি শুধু এই পথের খবরটাই জেনে এসেছ সৃষ্টির দিন থেকে স্বাধীনতার তীর্থযাত্রী শত-সহস্র লোকের পায়ে পায়ে এই পথের চিহ্নটাই হয়ত তোমার চোখে স্পষ্ট হয়ে পড়েচে, কিন্তু বিশ্বমানবের একান্ত শুভবুদ্ধি, তার অনন্ত বুদ্ধির ধারা কি এমনিই নিঃশেষ হয়ে গেছে যে এই রক্তরেখা ছাড়া আর কোন পথের সন্ধানই কোন দিন তার চোখে পড়বে না? এমন বিধান কিছুতেই সত্য হতে পারে না।"[২৮]

শান্তিপূর্ণ-নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে আস্থা ছিল না সব্যসাচীর। বিপ্লবের প্রকৃতি সম্পর্কে সে ভারতীকে বলেছে : 'বিপ্লব মানেই, ভারতী কাটাকাটি রক্তারক্তি নয়। বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্তন।' 'স্বাধীনতা অর্জনের অস্ত্র' সব্যসাচীর কাছে 'কুলি-মজুর-কারিকর'। এ ক্ষেত্রে সব্যসাচীর 'কারবার শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, ভদ্র-সন্তানদের নিয়ে।' c‡_i 'vex ছাব্বিশ পরিচ্ছেদ সতর্কভাবে পাঠ করলে স্পষ্ট হয় উপন্যাসের বিপ্লবপ্রকল্পের ভিন্ন মাত্রা; ভারতীকে সব্যসাচীর বক্তব্য : ১.'দেশের ভালো করার ভার আমি নিইনি, আমি স্বাধীন করার ভার নিয়েছি'; ২.'নিরীহ চাষাভূষোর জন্যে তোমার দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই ভারতী, কোনো দেশেই তারা স্বাধীনতার কাজে যোগ দেয় না। বরং, বাধা দেয়।' এশীয় কৃষিসমাজ কাঠামোর অন্তর্শক্তিকে অনৈতিহাসিক ধারণায় তুচ্ছ করে কি বিপ্লব সম্ভব! অথচ বিপ্লবের বিশ্ব ইতিহাস আমাদের ভিন্ন শিক্ষা দেয় মাও জে দঙ্গ-এর কৃষকবিপ্লব ও গণচীনের প্রতিষ্ঠা।

অন্যদিকে ভারতীর বিশ্বাস ছিল ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পল্লিনির্ভর অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে সব্যসাচীর শ্রমিক আন্দোলনের চেয়ে অনেক বেশি অনুসরণীয় হওয়া উচিত কৃষকশ্রেণিকে সংগঠিত করা, তাদেরকে নিয়ে বিপ্লব সংগঠিত করা। অথচ শরৎচন্দ্র c‡_i 'vex (১৯২৬) রচনার সমকালে বিভ্রান্তিপীড়িত মন্তব্য করেছিলেন :

"হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই।...অত্যাচার থামাইবার ভার গ্রহণ করা উচিত নিজেদের এবং হিন্দু-মুসলমান মিলন বলিয়া যদি কিছু থাকে তা সে সম্পন্ন করিবার ভার দেওয়া উচিত মুসলমানদের পরে।"[২৯]

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের রাজনীতিভাবনার অন্তর্ঘাতমূলকতা বাঙালির রাষ্ট্রভাবনাকে বারবার পিছু টেনেছে। স্মরণীয়, সমাজ-অভিজ্ঞতায় শরৎচন্দ্র ছিলেন হৃদয়বাদী সংস্কারক, cjøx-mgvR তার দৃষ্টান্ত; গ্রাম্য দলাদলির নিষ্ঠুর ছবি, অন্তর্কলহ, হিংসামুখর মানবীয় পরিস্থিতি—এর মাঝেও প্রাধান্য পেয়েছে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। তাঁর 'মহেশ' একটি হৃদয়ক্ষরিত মানবীয় মিথ।

সব্যসাচী যে দেশমুক্তির কথা বলে তা নিঃসন্দেহে গভীর দেশপ্রেম ও নিগূঢ় আস্থা-উৎসারিত। বিপ্লবের দীপ্র আবেগ অপূর্ব বর্ণন-শিল্পকুশলতায় এসেছে c‡_i 'vex উপন্যাসে। অপূর্ব-ভারতীর প্রেমকথা, সব্যসাচীকে ঘিরে সুমিত্রার অপ্রকাশিত আবেগময় জীবনচর্যা ও দলত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি না-দিয়ে অতি নাটকীয় তরল আবেগে অপূর্বকে মুক্তি-দেওয়া ইত্যাদি কাহিনি সংঘটনে কিছুটা শৈথিল্য থাকলেও সমকালীন রাজনীতির বেশ কিছু মৌলিক প্রশ্ন এ উপন্যাসে উত্থাপিত হয়েছে।

তবুও, ঐতিহাসিক কারণে, তৎকালীন বিপ্লবীদের কাছে উপন্যাসটি 'Manifesto' হয়ে উঠেছিল। "সব্যসাচীর মুখ দিয়ে বিপ্লবীদের স্বপ্ন, আদর্শ, ধ্যান-ধারণা বেদনা সবই এতদিনে ব্যক্ত হল। আমাদের কোন Manifesto ছিল না। সেই Manifesto এতদিনে আমরা পেয়ে গেলাম। সেদিন বহু বিপ্লবীর সমস্ত বইটাই প্রায় আগাগোড়া মুখস্থ ছিল। আমাদের মুখে মুখে উচ্চারিত হত, 'সাপ বিলাতে থেকে আসে না, কিন্তু বিনা দোষে কামড়ায় না।' দূর থেকে এসে যারা আমাদের মাতৃভূমি অধিকার করেছে, আমার মর্যাদা, আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল সমস্ত কেড়ে নিল, তারই রইল আমাকে হত্যা করার অধিকার—আর রইল না আমার।"[৩০] অথচ ১৯২৯ সালে শরৎচন্দ্র এক বক্তৃতায় ভিন্ন ভাবনার কথা বলেন :

"ভারতের আকাশে আজকাল একটা বাক্য ভেসে বেড়ায়—সে বিপ্লব।...অর্থহীন অকারণ বিপ্লবের চেষ্টায় কেবল রক্তপাতই ঘটে, আর কোন ফললাভ হয় না। বিপ্লবের সৃষ্টি মানুষের মনে, অহেতুক রক্তপাতে নয়। তাই ধৈর্য ধরে তার প্রতীক্ষা করতে হয়। ক্ষমাহীন সমাজ, প্রীতিহীন ধর্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রতি চিত্তহীন কঠোরতা, এর আমূল প্রতিকারের বিপ্লব-পন্থাতেই শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভব হবে।"[৩১]

সব্যসাচীর বিপ্লবী সংগঠনের কর্মীদের পুলিশের হাতে বিপর্যস্ত হওয়ার মাঝ দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটলেও c‡_i 'vex উপন্যাসে শরৎচন্দ্র মূলত রাজনীতির প্রতি তার অঙ্গীকারের কথাই উচ্চারণ করেছেন। দেশের কৃষকশ্রেণিবিচ্ছিন্ন জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রকাঠামো প্রতিষ্ঠার আদর্শায়িত চেতনালোকেই তিনি সৃষ্টি করেছেন সব্যসাচী, সুমিত্রা ও রামদাস তলওয়ারকর-এর মতো চরিত্র। এখানেই c‡_i 'vex উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্য ও সীমাবদ্ধতা। তবে সব্যসাচী তথা শরৎচন্দ্রের রাজনীতি-ভাবনায় অসাম্প্রদায়িক ভারতীয় জনঐক্য প্রতিষ্ঠার তীব্র অভীপ্সা নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল : "যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, পুরাতন, ধর্ম, সমাজ, সংস্কার—সমস্ত ভেঙে-চুরে ধ্বংস হয়ে যাক...কেবল এই মহাসত্যই মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করে দাও—এর চেয়ে ভারতের বড়ো শত্রু আর নেই—।"(c‡_i 'vex : পরিচ্ছেদ সাতাশ)। রাজনৈতিক উপন্যাসের পরম্পরায় c‡_i 'vexi এ রাজনীতিক দর্শন তৎকালে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

উপনিবেশিত ভারতবর্ষে ইংরেজ শক্তির শোষণের প্রতিক্রিয়ায় বিপ্লবী কর্মধারার ক্রমপ্রসার, বাণিজ্যনির্ভর নব-উদ্ভূত পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বিপ্রতীপে বনেদি সামন্ত জমিদার শ্রেণির 'অস্তাচল যাত্রা'-র পটভূমিকায় সৃষ্ট সামাজিক অন্তর্ঘাত ও বহির্দ্বন্দ্ব—জীবনবিন্যাসের এ দ্বৈতরূপের মিথস্ক্রিয়ায় রচিত হয়েছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) সমাজ-রাজনীতিবিষয়ক উপন্যাসসমূহ।

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ আইন কার্যকর হওয়ার দিন মা প্রভাবতী দেবী তারাশঙ্করের হাতে রাখি বেঁধে তার চেতনায় উপ্ত করেছিলেন রাজনীতির বীজ। কালপ্রভাবে প্রথমজীবনে জনবিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসনির্ভর

Dhaka University Institutional Repository

বিপ্লবী রাজনীতির প্রতি কিছুটা আগ্রহ বোধ করেছেন তারাশঙ্কর। রুশ বিপ্লবের প্রভাবে তখনকার তরুণদের ওপর মার্কসবাদ-লেলিনবাদের যে প্রতিক্রিয়া তাতে তিনিও আলোড়িত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে গান্ধীর অহিংস পন্থাকে পরম বিশ্বাসে গ্রহণ করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ভারতের পরিবর্তিত অর্থনীতি আঘাত করে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক কাঠামোয়। এ অভিঘাতে গ্রামীণ সমাজ-উন্মুলিত মানুষ কীভাবে শিল্পশ্রমিকে গোত্রান্তরিত হচ্ছে এবং তাদের মাঝে বিপ্লবী চেতনার জাগরণ ঘটছে, তারই শিল্পরূপ তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস ^PZvjx NwY[৩২] (১৯৩১)। জমিদার-মহাজনের শোষণে সদ্‌গোপ চাষি গোষ্ঠ জমি থেকে উৎখাত হয়ে শহরে এসে ধানকলের শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়। গান্ধীভক্ত সুরেন ও শিবকালীর চেষ্টায় গঠিত শ্রমিক ইউনিয়নের একনিষ্ঠ কর্মী হয়ে ওঠে সে। ওভারটাইম আর শ্রমিকদের মজুরিবৃদ্ধির দাবিতে আহূত ধর্মঘটের উনিশতম দিনে ক্ষুধাজর্জর শ্রমিকদের একাংশ ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা করায় দু-দলের মাঝে দাঙ্গা বাধে। দাঙ্গায় আহত গোষ্ঠ শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে মারা যায়।

সমাজজীবনের রূপান্তরের চালকশক্তি হিসেবে শ্রমিক-জাগরণকে এভাবেই সতর্ক শিল্পীমানসতায় প্রকাশ করেছেন তারাশঙ্কর। শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব তিনি তুলে দিয়েছেন গান্ধীবাদী মধ্যবিত্ত কেরানি-টাইপিস্ট শিবকালী ও সুরেনের হাতে। তাদের আবেগময় দৃষ্টিকোণের ব্যবহারে ঔপন্যাসিকের সমাজতন্ত্র বা শোষণহীন সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন উঠে এসেছে। প্রসঙ্গত সমালোচকের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে :

তারাশঙ্করের ইতিবাচক প্রত্যয় তাই এই উপন্যাসে পরিকল্পিত ছকে বিন্যস্ত হয়েছে। কালবৈশাখীর অগ্রদূত রূপে শ্রমিকদের আন্দোলন ও সংঘর্ষে 'চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণি' প্রত্যক্ষ করেছিল আদর্শবাদী রাজনৈতিক কর্মী শিবকালী। শিবকালীর এই প্রত্যক্ষণে ঔপন্যাসিকের পরিকল্পিত অভিপ্রায় প্রতিফলিত।...শ্রমিক-আন্দোলনের সাফল্য-সম্ভাবনার ব্যঞ্জনায় উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।[৩৩]

সমাজ-অন্তর্গত বহুস্তরবহুল শ্রেণিসমূহের অন্তর্সংঘাত তখন জন্ম দিয়েছিল বিভ্রান্ত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক এক চারিত্র। এই পটভূমিকায় প্রণীত হয়েছিল তারাশঙ্করের ^PZvjx NwÝ, avÎx‡'eZv[৩৪], Kwj›'x[৩৫], MY‡'eZv-cÂMvg [৩৬], gššÍi[৩৭], bew'MšÍ[৩৮] উপন্যাস।

তারাশঙ্করের 'উপন্যাসে রাজনীতি'র গুরুত্ববহ কেন্দ্রবলয় avÎx‡'eZv। গুপ্ত সংগঠনে যুক্ত শিবনাথের উপর একদা তীব্র প্রভাব ছিল Avb›'g‡Vর, কিন্তু সময়ক্রমে সুশীলের সংস্পর্শ তাকে বিপ্লববাদ-নৈরাজ্যবাদ থেকে ভিন্ন পথে পরিচালিত হতে প্রেরণা যোগায়। সে কালক্রমে দীক্ষা নেয় ব্রাত্যজনসংযুক্ত অসাম্প্রদায়িক অহিংস রাজনীতির পথ চলায়। সাঁওতাল পরগণার নিবিড় অভ্যন্তরে পূর্ণ আর শিবুর সঙ্গে সন্ন্যাসীরূপী বিপ্লব-সংগঠক দাদার সংলাপ মুখ্যত তারাশঙ্করেরই ভাবনাধ্বনি :

দেখলাম, ব্রাহ্মণ্যধর্মের জন্মভূমি আর্যসভ্যতার গৌরবময়ী ভারতের বুকে শুধু শূদ্র আর শূদ্র, অনার্য আর অনার্য। হাজার হাজার বছরের পরও এই অবস্থা। এরই জন্য বার বার—বার বার ভারতবর্ষ পরাজিত হয়েছে বিদেশীদের হাতে। এই অবস্থা নিয়ে স্বাধীনতার অভিযানে অগ্রসর হওয়ার নাম উন্মত্ততা ছাড়া আর কিছু নয়।...আর এই জন্যেই বিদেশীর নির্দিষ্ট অ্যানার্কিজ্‌ম, কি টেররিজ্‌ম আমি গ্রহণ করতে পারি না।...

[যথার্থ পন্থা] এখনও ভেবে ঠিক করতে পারি নি। তবে সেটা ওই গুপ্তহত্যা আর গুপ্তষড়যন্ত্রের পথ নয় পূর্ণ, এটা ঠিক।"(avÎx‡'eZv : বাইশ পরিচ্ছেদ)।

উগ্র-স্বদেশী পূর্ণের গুলিতে নিহত আশ্রমগুরুর অভিজ্ঞান ও স্বপ্নের সঙ্গে গান্ধীবাদী নৈতিকতার সম্পর্ক পরস্পরিত। "বঙ্কিমের উপন্যাস 'আনন্দমঠ' যদি 'ধাত্রীদেবতা'র উপরিস্তরে ক্রিয়া করে থাকে তাহলে

Dhaka University Institutional Repository

তার অন্তঃস্থলে বিরাজ করে গান্ধির স্বরাজ-স্বপ্ন।"[৩৯] স্মরণীয়, gššÍi উপন্যাসে বিজয়দা মহাত্মা গান্ধীর অনশনভঙ্গের সংবাদ শুনে আবেগে উদ্বেল হয়ে তার মধ্যে আবিষ্কার করেছে 'বশিষ্টের পুণ্যফল' ও 'সত্য ধর্মে'র প্রতিষ্ঠা, ''¨vm K¨vwc‡Uj-এর বিপরীতে 'গীতা'র সার্থকতা তিনি এখানে অন্বেষণ করেছেন।

MY‡'eZv-cÂMvg উপন্যাসে ঔপন্যাসিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির কাঠামো যেভাবে সামন্তসমাজ-গ্রামীণ সমাজকাঠামোর পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে—ভেঙে যাচ্ছে মানুষের আজন্মলালিত সংস্কার, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ—সেটা চিত্রণের পাশাপাশি যতীন-বিশ্বনাথের বিপ্লববাদী রাজনীতির সমান্তরালে কংগ্রেসীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মূলস্রোত কীভাবে জনমানসে বিস্তৃতি লাভ করেছিল তাও দেখিয়েছেন দেবনাথ-ইরসাদ চরিত্রের মাধ্যমে। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পটভূমিকে ব্যবহার করেই তারাশঙ্কর এ উপন্যাসে সমাজসত্যকে উদ্‌ঘাটন করেছেন। gššÍi উপন্যাসে বিজয়, কানাই, নেপী, নীলা প্রমুখ কমিউনিস্ট চরিত্র সৃষ্টি করলেও সংগ্রামী জনগণকে নিয়ে বৃহত্তর কোনো উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে তারা অগ্রসর হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে রচিত এ উপন্যাসে তারাশঙ্কর শেষ পর্যন্ত গান্ধীবাদী রাজনীতিভাবনার আদর্শিকতার সঙ্গে কমিউনিজমের এক স্বাপ্নিক জগৎ তৈরি করেছেন। অন্যদিকে bewMšÍ উপন্যাস মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক ধারার সমন্বয়ে রাজনৈতিক রোমান্সে পরিণত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও মাননীয়, রাঢ় অঞ্চলের সমাজনিরীক্ষণ ও তার রূপান্তরের সঙ্গে জাতীয় রাজনীতির স্রোত-প্রতিস্রোত যোজনা তাঁর জীবনদর্শনের অন্যতম স্বাতন্ত্র্য। জনবিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসচালিত রাজনীতির ব্যর্থতার উৎস নির্ণয়ে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের মন ও মনন, বাংলা উপন্যাসের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের মুক্তির প্রশ্নে উচ্চবর্ণ ও শূদ্রশ্রেণি এবং মুসলমান এরসাদদের মহামিলন-আকাঙ্ক্ষা, তারাশঙ্করের সকল রাজনীতিক আদর্শিক দ্বিধা ও দ্বৈরথকে তুচ্ছ করতে পেরেছে।

যুগ-সংকটের ক্রান্তিলগ্নে বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) আত্মপ্রকাশ ঘটে। ফ্রয়েডীয় লিবিডোতত্ত্ব এবং মধ্যশ্রেণির বিসর্পিল, অসংলগ্ন চেতনালোক ও গণশক্তির জাগরণ অভিপ্রায়—এ ত্রিবিধ প্রবণতায় তাঁর শিল্পীচৈতন্য বিকশিত হয়েছে। অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য ও বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ মানিকের বিশেষত্ব। ১৯৪৪ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার মাধ্যমে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হন। প্রগতি লেখক সংঘের অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবেও বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত বিক্ষোভ, শ্রমিক ধর্মঘট, আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার, নৌবিদ্রোহকে কেন্দ্র করে জনমনে সৃষ্ট তীব্র প্রতিক্রিয়া মানিক খুব কাছ থেকে দেখেছেন। এসব ঘটনাধারা তার চিন্তাধারায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনে—তিনি ধনবাদী সমাজের অবক্ষয় ও নিরর্থকতার স্বরূপ উপলব্ধি করে মার্কসীয় দর্শনে আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। mniZjx,[৪০] 'cY[৪১] (১৯৪৫), চিহ্ন[৪২] (১৯৪৭), Av'v‡qi BwZnvm[৪৩] (১৯৪৭), Rxqš Í[৪৪] (১৯৫০)—এসব উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃত অর্থে বলতে চেয়েছেন যে বাণিজ্যপুঁজি-শিল্পপুঁজি সৃষ্ট শ্রমিক শ্রেণিকে দিয়েই ভারতবাসীর কাঙ্ক্ষিত বিপ্লব সম্ভব। পুঁজিশোষণ থেকে মুক্তি, ধনের সমবণ্টন ও রাষ্ট্রকাঠামোর পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন গণশক্তির ঐক্য। মার্কসীয় আদর্শনির্ভর রাজনৈতিক চিন্তনক্রিয়াকে আত্মস্থ করেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ, পরিবার, ব্যক্তি ও তার মনোজগত এবং রাজনৈতিক জনসংগঠনের শক্তি ও বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করেছেন।

শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শোষিত মানুষের জীবনরূপনির্ভর আলেখ্য mniZjx উপন্যাসেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতিসচেতনতার প্রথম প্রকাশ লক্ষ করা যায়। গণশক্তির ঐক্যচেতনার উন্মেষের মধ্যদিয়ে শ্রমিকশ্রেণি সংগঠিত ও সুশৃঙ্খলিত হয়ে উঠছে এটা দেখানোর পাশাপাশি ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন মুনাফালোভী ধনিক শ্রেণির প্রতিভূ সত্যপ্রিয় শ্রমিক শ্রেণির প্রতিরোধ ধ্বংস করার জন্য কী

Dhaka University Institutional Repository

হীন কৌশল অবলম্বন করতে পারে। সত্যপ্রিয় শ্রমিকস্বার্থসচেতন যশোদার সারল্যকে ব্যবহার করে শ্রমজীবীদের ঐক্য বিনষ্ট করেছে যে পন্থায়, তাতে মুনাফালোভী শোষক-বুর্জোয়ার চিরকালীন রূপ প্রকাশ পেয়েছে। এক্ষেত্রে শ্রমিক নেতাদের যে বিচক্ষণ, সাবধানী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন—পরোক্ষভাবে এ দিক-নির্দেশনাও দেন ঔপন্যাসিক।

'cY উপন্যাসের বিশেষত্ব এই, কৃষকসমাজের সংগ্রামের নেতৃত্ব নিজেদের ভেতর থেকেই তৈরি হয়েছে এটা দেখানোর পাশাপাশি ঔপন্যাসিক নিজস্ব শিল্পবোধে সেটাকে শাহরিক পরিমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এ কারণেই দেখা যাচ্ছে কৃষকশ্রেণির প্রতিনিধি ঝুমুরিয়ার বীরেশ্বরের দ্বারা যে সংগ্রামের সূচনা তার নেপথ্যে শহুরে শিক্ষিত সূর্যবাবুর প্রসঙ্গ এসেছে এবং শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলনের নেতৃত্ব শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কৃষ্ণেন্দুর ওপর অর্পিত হয়েছে। 'cY উপন্যাসে কারখানা মালিক লোকনাথ, ঠিকাদার হেরম্ব, উমাপদ শোষক চরিত্র। বীরেশ্বর, ওসমান সর্বকালীন নির্যাতিত মানুষের প্রতীক। সমাজের অভিঘাতে সৃষ্ট বহির্বাস্তবতা ও চরিত্রের মনস্তত্ত্বনির্ভর অন্তঃবাস্তবতা অর্থাৎ বহির্জীবন ও অন্তর্জীবন—এ দুয়ের অপূর্ব সম্মিলনে সৃষ্ট চরিত্র রম্ভা। বিদ্রোহী বীরেশ্বরের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারকে ধারণ করেছে এ নারী। গ্রামীণ সমাজ থেকে উঠে-আসা রম্ভা রামপালের স্ত্রী হিসেবে কিছুদিন শহুরে জীবন যাপন করলেও তার শেকড় ছিল মাটির গভীরে। কৃষক সংগ্রাম থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেনি সে। পিতার মৃত্যুর পর তার ভাইদের আপসকামী নির্লিপ্ত মনোভাব তাকে ক্ষুব্ধ করেছে, পথে নেমে দ্রোহের প্রকাশ ঘটিয়ে বীরেশ্বরের মৃত্যুর ঋণ শোধ করেছে সন্তানসম্ভবা এ নারী। রাজনৈতিক বোধির সঙ্গে ঔপন্যাসিকের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য যুক্ত হওয়ার কারণেই রম্ভা চরিত্র বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে।

'cY উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমিক আন্দোলন দমনে কারখানা মালিকের ধীর স্থির শান্ত কৌশল যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি দেখিয়েছেন রাস্তানির্মাণের জন্য শ্রমিক সংগ্রহের প্রয়োজনে ঠিকাদার হেরম্বের পাশবিক রূপ। ঔপন্যাসিক বিশ্বাস করতেন—বঞ্চিত, অবহেলিত গণশক্তির ঐক্যের কাছে শোষকশ্রেণির ধ্বংস নির্ধারিত। এজন্য ঔপনিবেশিক ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে নয়, বাণিজ্য পুঁজিনির্ভর বাঙালি বুর্জোয়া শাসকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রয়োজন। এ বিশ্বাস থেকে তিনি ওসমান আলীর মতো মুসলিম চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যার সঙ্গে হিন্দু শ্রমিকনেতা কৃষ্ণেন্দু লোকনাথের কারখানা থেকে ছাঁটাই হওয়া মুসলিম শ্রমিকদের বিষয়ে কথা বলে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে সহজ করে। এছাড়া উচ্চবিত্ত ও শোষকশ্রেণির পারিবারিক আবহে লালিত চরিত্রের পক্ষে কখনোই যে গোত্রান্তরিত হয়ে শোষিত শ্রেণির আন্দোলনে সামিল হওয়া সম্ভবপর নয়—এ সত্য ঔপন্যাসিক হীরেন ও মমতার কাহিনিসূত্রের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য উপন্যাসে এভাবেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীমানসের সকল বৈশিষ্ট্য বৃত্তাবদ্ধ পরিণতি লাভ করেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতিসচেতনতা অসামান্য শিল্পসৌকর্যে প্রকাশিত হয়েছে ‖Pý উপন্যাসে। রূপক-সংকেতের শৈল্পিক আবহে ঔপন্যাসিকের রাজনীতিভাবনা এখানে রাজপথ, ধর্মতলার মোড়কেন্দ্রিক জনসমাবেশ এবং চলমান আবর্তিত সময়, উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এ সম্পর্কে সমালোচকের উক্তি স্মরণীয় :

> একেবারেই সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত 'চিহ্ন' উপন্যাসের কাহিনীবিন্যাসকে প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ বলা যায়। আদি, মধ্য ও অন্তে বিভক্ত, কোনো একটি বা দুটি মানুষ বা পরিবারের কাহিনী এ উপন্যাসে গতিশীল হয়ে কোনো প্লট নির্মাণ করে নি। কিংবা নায়ক-নায়িকা বা পার্শ্বনায়ক-নায়িকাকে কেন্দ্র করে ঘটনাবলি আবর্তিত ও পত্রপল্লবিত হয়েও সুনির্দিষ্ট পরিণতি অর্জন করে নি এ উপন্যাসে। চিহ্ন উপন্যাসের নায়ক প্রকৃত অর্থে রাজপথ। সেই

Dhaka University Institutional Repository

রাজপথের রাজনৈতিক সংগ্রামই এর প্লট রচনা করেছে। একটি চলমান ক্যামেরা যেন ওই সংগ্রামের নানা টুকরো চিত্র ধারণ করে উপন্যাসের কাহিনীকে সম্পূর্ণতা দান করেছে।[৪৫]

গ্রামীণ সমাজ-উন্মুলিত একুশ-বাইশ বছরের রাজনীতিবিবিক্ত তরুণ গণেশ শোভাযাত্রায় পুলিশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘট ও তাদের বিক্ষোভ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত গুলিবিদ্ধ হয়। বুলেটবিদ্ধ গণেশের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় সময়, সমাজ আর সব মানুষের স্বপ্নপ্রশ্ন :

'এরা এগোবে না বাবু?'[৪৬]

জনস্রোতের অগ্রসরমানতার জন্য তার এ ব্যাকুল প্রশ্ন সংকেতিত হয়ে উপন্যাসের সূচনা। ব্যাঙ্কের চাকুরে অক্ষয়, কেরানি অজয়, মেধাবী কলেজ ছাত্র পিতৃহারা হেমন্ত ও তার ভাই তেরো বছরের কিশোর জয়ন্ত, হেমন্তের সতীর্থ সীতা, কারখানা শ্রমিক বৃদ্ধ ওসমান, কলেজ ছাত্র রসুলসহ সর্বস্তরের জনগণ কীভাবে ওইদিনের রাজনৈতিক অভিঘাতের সঙ্গে অসাম্প্রদায়িকভাবে মিশেছিল তার খণ্ড খণ্ড চিত্রের মধ্যদিয়ে উপন্যাসের অখণ্ড আখ্যান সৃষ্টি হয়েছে। রাজনীতি কেবল রাষ্ট্র ও প্রশাসনযন্ত্রকেই প্রভাবিত করে না, বরং ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে কীভাবে আন্দোলিত করে তার মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাসও ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন ‖Pý উপন্যাসে। মদ্যপায়ী অক্ষয় সে রাতে মদ খেতে পারেনি, মায়ের স্বপ্নপূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ হেমন্ত মধ্যবিত্তের দোদুল্যমানতা-আদর্শায়িত জীবনবোধ থেকে সরে এসেছে, কেউ গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছে, হেমন্তের ছোটভাই কিশোর জয়ন্ত মায়ের স্নেহবাঁধন ও সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে শেষ শ্লোগান —'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণের জন্য গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে। তবু থামেনি এ উত্তাল বিক্ষোভ। শাহরিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সমান্তরালে ঔপন্যাসিক গ্রামীণ সমাজের ভাগচাষিদের জীবনসত্যকে চিত্রিত করেছেন গণেশের বাবা যাদবের মাধ্যমে। শোষকশ্রেণির অত্যাচারের বিপ্রতীপে কৃষকশ্রেণির ঐক্যবদ্ধ শক্তির জাগরণ অভিপ্রায় কৃষকনেতা কেশব চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষকালীন রিলিফ সেন্টার খোলার মহতী উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত চোরাকারবারি জমিদার হীন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কীভাবে দাঙ্গা বাধিয়ে ব্যর্থ করার পাশাপাশি তাকে রক্তাক্ত করে কলেজছাত্র রসুলের মানসচক্ষে দেখিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। গণেশের মালিক দাশগুপ্তের বিদ্যুৎ লিমিটেড নামক বৈধ ব্যবসার আড়ালে চোরাকারবারের স্বরূপ উন্মোচনসূত্রে আমলাদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য, জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতা বসন্ত রায়ের সহকারী অমৃত মজুমদার ও তার স্ত্রী অরুণা মজুমদারের জীবনের পরিণতি ক্ষমতালোভী শোষক চরিত্রের নিদারুণ পরিণামবাহী। অন্যদিকে উপন্যাসের শুরুতে ঔপন্যাসিক শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী জনতার তরঙ্গবিক্ষোভ গুলিবিদ্ধ গণেশের অবচেতনার প্রেক্ষণ থেকে উঠে আসা শিবনির্ভর মিথিক চিত্রকল্পে যেভাবে প্রকাশ করেছেন তাতে গণশক্তির ঐক্যবদ্ধ বিজয়ই প্রতিবিম্বিত হয়েছে :

...এমন অঘটন ঘটছে কেন, থেমে থাকছে কেন তার গাঁয়ের পাশের হলদি নদীতে পূর্ণিমার কোটালের জোয়ার? দেড় ক্রোশ তফাতের সমুদ্র থেকে উন্মত্ত কোলাহলে ছুটে আসছে যে মানুষ-সমান উঁচু জলের জোয়ার, তা তো থামে না, কিছু তো ঠেকাতে পারে না তাকে।...এই নদীতে প্রাণ আসবে, স্বয়ং পাগলা শিবঠাকুর যেন আসছেন নাচতে নাচতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়ে সাদা ফেনার মুকুট পরে, তেমনি ভাবে আসবে প্রাণের জোয়ার। গণেশের প্রাণেও আনন্দ এত, যা মাপা যায় না।...

সেই অভ্যস্ত, পরিচিত অতি ভয়ানক, অতি উন্মাদনায় কোটালের জোয়ার যদি বা মনে ধেয়ে এল গর্জন করে গাঁ ছেড়ে আসবার এতদিন পরে সহরের পথে সে জোয়ার থেমে গেল, বসে পড়ল ফুটপাথে পিচের পথে। এ কেমন গতিহীন গর্জন, সাদা ফেনার বদলে এ কেমন কালো চুলের ঢেউ।[৪৭]

বিরাট এক শোভাযাত্রার মাথা লালদীঘির ওদিকের মোড় ঘুরছে, সামনে তিন রকম বড় পতাকা উত্তুরে হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে।...এবার গণেশের পিতা যাদবের মনে হয়, বাঘ যেন ডাক দিচ্ছে মনের আনন্দে। তরুণ শ্রমিক গণেশের জিজ্ঞাসা, গণেশের কৌতূহল আর স্বপ্ন উপন্যাসের শেষে বাস্তব রূপ

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছে। বাবা যাদব শুনতে পায় অজয়ের আবেগমথিত উচ্চারণ : 'আমরা এগিয়েছি। ঠেকাতে পারেনি, আমরা এগিয়েছি!'[৪৮] কংগ্রেস, বিপ্লবী মার্কসবাদী ও মুসলিম লিগের তিন রঙের পতাকার ঐক্যবদ্ধ মিছিলের শক্তিই যে স্বাধীনতা সংগ্রামের যথার্থ পথ তা বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসের শেষ দুই বাক্যের সাংকেতিক ন্যারেটিভে : 'ঘাড় উঁচু হয়ে গেছে অজয়ের, দু'টি চোখ জ্বলজ্বল করছে আনন্দে, উত্তেজনায়। যাদব চেয়ে দ্যাখে, সে হাসছে। মুখে যেন তার সূর্য উঠেছে মেঘ কেটে গিয়ে।'

১৯২৬-২৮ সালের পটভূমিকে কেন্দ্র করে রচিত Rxqš উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিপথে যাওয়ার নামে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন কেন থামিয়ে দেওয়া হল—এ প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের লক্ষ্যে গান্ধীর অহিংস নীতির মৃদু সমালোচনা করে সহিংস নীতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। কালীনাথ-অমিতাভ ঔপন্যাসিকের বিপ্লবী নীতি-আদর্শের প্রতীক চরিত্র। সশস্ত্র বিপ্লবীদের আদর্শ বাস্তবায়নের বর্তমান পন্থার প্রকৃতিগত পরিবর্তন প্রয়োজন—আটুলিগাঁর পুরনো বিপ্লবী শ্যামল জানা এমন একটা ইঙ্গিতও দেন এ উপন্যাসে। সশস্ত্র বিপ্লববাদী সংগঠনের কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি Rxqš উপন্যাসে এসেছে গ্রামীণ জমিদারদের বিপক্ষে অন্যায় খাজনাবিরোধী আন্দোলন যার নেতৃত্বে ছিল ধীর সংযত ধনদাস ও বীরত্বপূর্ণ চরিত্র জ্ঞানদাস যারা পরবর্তীতে পাঁচুর রাজনৈতিক আদর্শের প্রতীকপুরুষ হয়েছে। অথচ সেই পাঁচুই কালীনাথের বিপ্লববাদী দলের পক্ষে পাকার মাধ্যমে তার বাবার রিভলবার সংগ্রহ করেছে, গ্রামের তরুণদের সংগঠিত করেছে জমিদারদের বিরুদ্ধে।

Rxqš উপন্যাসে মানিক অংশত অতীতচারী হয়েছেন। তেভাগা আন্দোলনরত কৃষকসমাজের সমান্তরালে শ্যামল জানার মতো বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বর্তমানের বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ডের ভিন্নতা কোথায় সেটাও তিনি বলার চেষ্টা করেছেন। সবশেষে নতুন প্রজন্ম যারা পাঁচুর মতো আবেগের বশে প্রতিশোধস্পৃহ হয়ে সহিংস কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে, তাদের সেই আবেগী সত্তার সঙ্গে রাজনৈতিক অভিজ্ঞানঋদ্ধ পরিণতমস্তিষ্কের সমন্বয় প্রয়োজন—এ সত্যের ইঙ্গিত দেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। পাকা চরিত্রের মধ্যদিয়ে ঔপন্যাসিক ভিন্নতর রাজনৈতিক দর্শনকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। মাতৃহীন যন্ত্রণাক্লিষ্ট এ চরিত্র দলের নিয়ম ভঙ্গ করায় কালীনাথ কর্তৃক দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েও সবসময় সতর্ক প্রহরায় নীরবে দলের জন্য কাজ করে গেছে। পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েও বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি সে। অহিংস জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিপ্রতীপে সহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক বিতর্ক ডাক্তার রায়চৌধুরী ও অমিতাভের কথোপকথনের মধ্যদিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। এক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসীদের প্রতি পুলিশের পক্ষপাতিত্ব ও বিপ্লবীদের ওপর নির্যাতন তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতার স্মারক। জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের কোন্দল ও তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য সুকৌশলে রাজনৈতিক সহিংসতা ও সাম্প্রদায়িক সংকট তৈরির ঘৃণ্য চক্রান্তের স্বরূপও ঔপন্যাসিক ভৈরব-ভুবনের সংঘাতের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। জাতীয়তাবাদী নেতাদের ধারণা জনগণ রাজনীতিজ্ঞানশূন্য কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লবী অমিতাভের কণ্ঠে উচ্চারণ করেন :

> স্বাধীনতা চাই, এটুকু তো বোঝে? বৃটিশ শাসন ধ্বংস করা চাই, এটুকু তো বোঝে? মুখ বুঁজে মার খেলে স্বাধীনতা আসে, এ রাজনীতি তারা বুঝতে পারে না, তা ঠিক। কোনদিন বুঝতে পারবেও না। যে মারে তাকে মারতে হয়, এই সোজা সত্যটা তারা বোঝে। চিরকাল তাই বুঝবে।[৪৯]

ঔপন্যাসিক বিশ্বাস করতেন জনগণের এ সচেতনতাবোধই শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে সংগ্রামের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

১৯৪৬ সালে দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতার খণ্ড খণ্ড চিত্রকে একটা পূর্ণতর রূপ দেওয়া হয়েছে ¯vaxbZvi ¯v'[৫০] উপন্যাসে। কংগ্রেস-মুসলিম লিগ ইংরেজ সরকারের শত্রু নয়, তারা পরস্পরের শত্রু, প্রতিপক্ষ। অথচ

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ পরাজয়ের গ্লানিমোচনের লক্ষ্যে ও ঔপনিবেশিক শোষণ অব্যাহত রাখার মানসে কংগ্রেস-মুসলিম লিগের মাঝে যে বৈরি সম্পর্ক সৃষ্টি করেছিল এবং যার বিষবাষ্পে সাধারণ মানুষ যে অস্তিত্ব-সংকটে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তার প্রমাণ এ উপন্যাস। সেই সঙ্গে রাজনীতির বহির্বাস্তবতায় মণিমালা আত্মকেন্দ্রিক জীবনভাবনার পরিবর্তে বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী দেবর প্রণবের সান্নিধ্যে এসে কীভাবে নতুন জীবনবোধে উত্তীর্ণ হয় সেটাও উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য দিক। সংসারের সংকীর্ণ ঘেরাটোপে নির্ঝঞ্ঝাট জীবনপ্রিয় এ নারী শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক স্বামী সুশীলের চোরাকারবারি হয়ে ওঠা ও তার ক্রমঅধঃপতনের বিরুদ্ধতা করে পুত্র-কন্যাসহ রাজপথের রাজনৈতিক সভায় অংশগ্রহণ করে। ইংরেজরা ভারতবর্ষের শোষক ও ব্যক্তিস্বার্থরক্ষাকারী গোষ্ঠী ও বিভিন্ন পাড়া-মহল্লার গুণ্ডাদের সহায়কশক্তি হিসেবে কাজে লাগিয়ে কীভাবে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের আবহমান সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ককে বিনষ্ট করেছে তার সচিত্র বর্ণনার সঙ্গে ঔপন্যাসিক প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেস-মুসলিম লিগের অসচেতনতা সম্পর্কে। দাঙ্গাদমনের জন্য পুলিশ ও সেনাবাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার বিপরীতে সাধারণ মানুষ সংঘবদ্ধ ভাবে নিজেরাই কীভাবে এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে তাও দেখিয়েছেন তিনি। এ উপন্যাসেও লেখক শ্রমজীবী শ্রেণির ঐক্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তারা উস্কানিমূলক দাঙ্গায় অংশ না নিয়ে বরং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার অঙ্গীকারে সামিল হয়েছে। পালা করে বস্তি পাহারা দেয়া থেকে শুরু করে প্রণব, গোকুল, ভূপেশদের আয়োজিত শান্তিসভায়ও অংশগ্রহণ করে শ্রমজীবী শ্রেণি। শুধু তাই নয়, দাঙ্গার নেপথ্য শক্তি ও কংগ্রেস-মুসলিম লিগের অবস্থান সম্পর্কেও তারা সচেতন। নিচের অংশটি লক্ষণীয় :

> এই দাঙ্গার পিছনে, ধর্মের নামে এই খুনোখুনির পিছনে কী কারসাজি আছে, কাদের কারসাজি আছে, এখনো না সমঝালে গরীব মানুষকে—খাটুয়ে মানুষকে হাড়ে-হাড়ে টের পেতে হবে। তাদের কত খুন কত জান দিয়ে কারা কী বাগিয়ে নিল, তাদের নসিবে কী জুটল। ইংরেজ বাদশা, কংগ্রেসি বড়ো বাবুরা আর লিগের বড় সায়েবরা উপরতলায় মরিয়া হয়ে খেলছে আপস লড়াই আদায়-নিকাশের ব্যবসাদারি খেলা—খেটেও যারা খেতে পায় না। তাদের জাত-ধর্ম হয়েছে এই জুয়াবাজির এক বড়ো চাল। মজুর, চাষী গরীব ক্ষেপে গেছে, ক্ষেপে গেছে জাহাজের দেশী ফৌজ, ইংরেজ চোখে অন্ধকার দেখছে। কংগ্রেসী বড় বাবুদের, লিগের বড় সায়েবদের বুক ধড়ফড় করছে। মজুর চাষী, গরীব মানুষ একবার চোখ মেলে মাথা তুললে, নিজেদের ক্ষমতা টের পেলে, তিন পক্ষের সর্বনাশ। ইংরেজ বাদশার অবস্থা কাহিল বটে, দেশের মানুষ তাকে সাগর-পারে তাড়াবেই তাড়াবে, কিন্তু সে জয়টা যে হবে গরীব খাটুয়ের—সর্বনাশ! তার চেয়ে ইংরেজ বাদশার সাথেই আদায়-নিকাশের ঘরোয়া আপস ভালো।[৫১]

উদ্ধৃত অংশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক বিশ্বাস স্পষ্ট হয়েছে—মজুর-চাষি, দরিদ্রশ্রেণির হিন্দু-মুসলমান তথা অসাম্প্রদায়িক ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবের মাঝ দিয়ে অর্জিত অর্থনৈতিক মুক্তিই প্রকৃত স্বাধীনতা। উল্লেখযোগ্য, ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতিতত্ত্ব, বিশ্বাস ও দর্শন নিয়ে তৎকালীন কট্টর মার্কসবাদীদের বিতর্কের অন্ত ছিল না।

ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫) ১৯৩৯ সালে পেশাগত আইনব্যবসা ছেড়ে কংগ্রেস আশ্রমে যোগ দেবার পর থেকে একনিষ্ঠ রাজনীতি সংশ্লিষ্টতার কারণে তিনবার কারাবরণ করেন। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনে পূর্ণিয়া জেলার সংগঠক হিসেবে দায়িত্বপালন করার অপরাধে কারাবাস শেষে ১৯৪৫ সালে আবার কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন তিনি। সতীনাথ ভাদুড়ী ১৯৪৭ সালে পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারি ছিলেন। কিন্তু রাজকাজ ছাড়া কংগ্রেসের অন্য কোনো কাজ নেই—এটা উপলব্ধি করে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। পরে তিনি কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেও কাজের জগৎ সেখানেও খুঁজে পাননি। তবে রাজনীতির জগৎলব্ধ এই অভিজ্ঞতা তাঁর শিল্পচেতনাকে করেছে সমৃদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের মধ্যভাগের রাজনৈতিক তত্ত্বের অন্তর্ঘাত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্তি, রাজনীতি-আক্রান্ত পারিবারিক ভাঙন, এবং তথাকথিত দেশনায়কদের চিন্তাধারার বিপথগামিতা ও স্বার্থপরতার রূপটি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং সহানুভূতি ও ভালোবাসা দিয়ে দরিদ্র কিষাণ-মজুরদের সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করেছিলেন বলেই পার্টির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের মিল হয়নি। পরিণতিতে বিদায় নেন সক্রিয় রাজনীতি থেকে। (স্মরণ করা যেতে পারে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সমরেশ বসুর জীবনেও এমনি পার্টিছিন্নতা ঘটেছিল)। সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর যে গ্রহণযোগ্যতা ছিল তাতে সতীনাথ ভাদুড়ী ক্ষমতাসীন দলের উচ্চপদস্থ ক্ষমতাধর ব্যক্তি হতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা চাননি বলেই রাজনীতির দলাদলি, স্বার্থপরতা, নীচতা সব কিছু থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসঞ্জাত সৃষ্টি তাঁর RvMix[৫২] ও †XvovB PwiZgvbm[৫৩] উপন্যাস।

বিয়াল্লিশের কংগ্রেস আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে RvMix লেখা, আর লেখা হয়েছিল যখন আগস্ট আন্দোলনের সহস্র সহস্র ছোট বড় কর্মীর সঙ্গে লেখক ছিলেন জেলে এবং এক অর্থে বিদ্রোহী ভারতবর্ষেরও তা আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরা জাগরী—প্রত্যূষের প্রতীক্ষা।[৫৪] একই রাজনীতিক পরিবারে আজন্মলালিত সমবিশ্বাসে বেড়ে-ওঠা জীবনে কীভাবে আত্মক্ষয়ী বিরোধ-সংঘর্ষ সৃষ্টি করেছিল এক রাতের আখ্যানে তা-ই উপস্থাপিত হয়েছে RvMix উপন্যাসে, স্ট্রিম অফ কনশাসনেস প্রক্রিয়ায়। 'ইংরেজ, ভারত ছাড়ো' মহাত্মা গান্ধীর এ আহ্বানের মধ্যদিয়ে ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট যে আন্দোলনের সূচনা হয় তারই পটভূমিকায় পূর্ণিয়াপ্রবাসী এক বাঙালি পরিবারের চারজনের—রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভিন্নতা ও সুগভীর জীবনচেতনার প্রকাশ ঘটেছে এ উপন্যাসে।

১৯৪৩ সালের মে মাসের একটি রাতে পূর্ণিয়া জেলে ফাঁসির আসামি আগস্ট আন্দোলনের বিদ্রোহী কর্মী স্থানীয় কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির সদস্য বিলু ফাঁসির সেলে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমাণ। আপার ডিভিসনে বাবা, 'আওরৎ কিতা'য় মা এবং জেলগেটে বিলুর ছোটো ভাই নীলুর স্মৃতিচারণমূলক আত্মকথন-রীতিতে উপন্যাসটি রচিত। সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, চেতনাপ্রবাহরীতির শিল্পিত প্রয়োগ RvMix উপন্যাসকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। সমকালীন রাজনীতির 'দুটি চূড়ান্ত সংঘাতমূলক আদর্শেরই প্রতিভূ হলো বিলু ও নীলু।'[৫৫]

আগস্ট আন্দোলনে কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টির বিপরীতমুখী ভূমিকা বিলু ও নীলুর মধ্যদিয়ে উপস্থাপনসূত্রে ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসে ভারতবর্ষের সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের ভেতরের ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করেছেন, বিন্যাস করেছেন, সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করেছেন।

জেলা স্কুলের একনিষ্ঠ গান্ধীবাদী প্রধান শিক্ষক অসহযোগ আন্দোলনে যোগ-দেয়া বাবা চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে গান্ধীর অনুসরণে গড়া আশ্রমে কংগ্রেসের অফিস করেন। জীবন, রাজনীতি ও ধর্ম —এ ত্রিবিধ চেতনায় উদ্দীপিত বাবা নিজস্ব আদর্শে অবিচল থেকেও পুত্র বিলুর মৃত্যুর কথা স্মরণ করে প্রার্থনা করেন : "ভগবান! মহাত্মাজী! বিলুর মাকে আঘাত সহ্য করিবার শক্তি দাও, নীলুর মনে বল দাও, বিলুর আত্মাকে শান্তি দাও।"[৫৬] অন্যদিকে 'আওরৎ কিতা'য় পুত্রের জন্য উৎকণ্ঠিত মা অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছেন। রাজনীতির চেয়ে মাতৃহৃদয়ের হাহাকার ও শূন্যতার অভিব্যক্তিই তার চরিত্রের বিশেষত্ব। উদ্ধৃত অসহায়-ক্ষুব্ধ অংশ লক্ষণীয় : "গান্ধীজী, তুমি আমাদের এ কী করলে? তুমি আমাদের একেবারে পথের ভিখিরি করে ছেড়েছ, সত্যিকারের ভিখিরি...নিজের ঠাকুর দেবতা ছেড়ে তোমার পুজো করেছি; তোমার জন্যে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সব ছেড়েছি; হাসতে ভুলেছি। তার প্রতিদান খুব দিলে।"[৫৭]

Dhaka University Institutional Repository

জেলগেটে অপেক্ষমাণ নীলু কমিউনিস্ট হিসেবে অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী। কংগ্রেসের রাজনীতির বিশ্লেষণ যুক্তিবাদী নীলুর দৃষ্টিতে এ রকম : 'কংগ্রেস সংগঠন সম্পূর্ণ ধনী কিষাণদের হাতে। জমিদারের শোষণ হইতে তারা মুক্ত হইতে চায়; কিন্তু নিজেরা তাহাদের সীমিত ক্ষেত্রে আধিয়াদার, বাটাইদার বা নিঃসম্বল ক্ষেতমজুরদের উপর শোষণ বন্ধ করিতে চায় না; কংগ্রেস মিনিস্ট্রির সময় নিঃস্ব রায়তদের জন্য যতগুলি আইন তৈয়ারি হইয়াছিল, সবগুলিই ইহারা কূটকৌশলে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।'[৫৮]

নিজের রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি সৎ থাকার অঙ্গীকারে দাদা বিলুর বিরুদ্ধে তার দেয়া সাক্ষ্যে ফাঁসির আদেশ হয়। দাদার মৃতদেহ সৎকারের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের দেয়া অনুমতিপত্র পকেটে রেখে সে আত্মবীক্ষণের মুখোমুখি হয়। রাজনৈতিক আদর্শ ও পারিবারিক স্নেহবন্ধনের বৈপরীত্যের দোলাচলে তার মাঝে চলে হার্দিক রক্তক্ষরণ—নিরন্তর চলে আত্মসান্ত্বনা লাভের চেষ্টা। উৎকণ্ঠা, আবেগ, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় জাগ্রত চার চরিত্রের রাজনৈতিক ভাবনা এভাবেই শিল্পরূপ পেয়েছে RvMix উপন্যাসে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের উক্তি বিশেষভাবে স্মর্তব্য : রাজনৈতিক সচেতনতা আর শিল্পচেতনার মধ্যে জোড় মেলানো বড়ো কঠিন কাজ। কঠিন, তার কারণ এ দুটি চেতনার ঝোঁক বিপরীতমুখী, পরস্পর রাজনীতির প্রক্রিয়া ও প্রকরণ প্রায়শঃ স্থূল, তার লক্ষ্য নগদ প্রাপ্তি; পক্ষান্তরে শিল্পের অভীষ্ট সৌন্দর্যসৃষ্টি ও তার চরম লক্ষ্যবিন্দুতে থাকে সত্য। এ দুয়ের বিরোধ মজ্জাগত। সেই কারণে তাঁকেই খুব উচ্চস্তরের শিল্পী বলব যিনি রাজনীতিকে উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেও তার থেকে শিল্পের সৌন্দর্য ফোটাতে পারেন। তেমন কাজই করেছেন সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর জাগরী উপন্যাসে। তিনি রাজনীতির পাঁক থেকে শিল্পের পদ্ম ফুটিয়েছেন।[৫৯]

RvMix উপন্যাসে বিভ্রান্ত রাজনীতি-ক্ষত চারটি চরিত্রের ক্ষোভ, অন্তর্যন্ত্রণা, অহেতুক বিনষ্টির উপরিতল-অন্তস্তল উন্মোচনে সতীনাথ ভাদুড়ী অসাধারণ শিল্পনিপুণ।

রামচন্দ্রের রূপকধর্মী ঢোঁড়াইকে নিয়ে অনাদৃত, নিগৃহীত, অন্ত্যজ শ্রেণির উত্থানের ইতিহাস রচিত হয়েছে সতীনাথ ভাদুড়ীর †XvovB PwiZgvbm (প্রথম চরণ-১৯৪৯, দ্বিতীয়চরণ-১৯৫১) উপন্যাসে। তুলসীদাসের 'ivgPwiZgvbm'-এর আদলে রচিত হলেও এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক প্রকৃত অর্থে তাৎমা, ধাঙড়, কোয়েরি, সাঁওতালদের জীবনসংগ্রাম ও তাদের শ্রেণিদ্বন্দ্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন।

বিহারের মফস্বল শহর জিরানিয়া থেকে চার মাইল দূরবর্তী তাৎমাটুলির বুধনীর ছেলে ঢোঁড়াই। দেড় বছর বয়সে বাবা মারা যাওয়ার পর মা দ্বিতীয় বিয়ে করায় পরিত্যক্ত ঢোঁড়াই 'গোঁসাইথানে' বৌকাবাওয়ার কাছে বেড়ে ওঠে। জীবনের কাছে বঞ্চিত ঢোঁড়াই পুরনো মূল্যবোধ-বিশ্বাসকে অতিক্রম করে নবলব্ধ জীবনপ্রত্যয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে চেয়েছিল। কিন্তু এক মুহূর্তের দাম্পত্য-ভ্রান্তির কারণে সে নিক্ষিপ্ত হয় বোহেমিয়ান জীবনচর্যায়। বিসকান্ধায় অবস্থানকালে জীবনযুদ্ধের প্রয়োজনে ভূমিকে কেন্দ্র করে জনমানসে জেগেছে রাজনৈতিক বোধ। গ্রামীণ সমাজের নানামুখী অসঙ্গতি ঢোঁড়াইয়ের মাঝে যে স্বাধিকারচেতনা জাগিয়েছে তা ছিল মূলত গোষ্ঠীচেতনানির্ভর। মাস্টারসাহেবের ছেলের কাছে তাৎমারা জেনেছে যে 'রংরেজ' (ইংরেজ) সরকারের জন্যই তাদের রোজগার নেই।"অনেকদিন আগে নাকি 'সরকার' তাৎমাদের হাতের বুড়ো আঙ্গুল কেটে নিয়েছিল।... তারপর থেকেই তো তারা কাপড় বুনবার কাজ ভুলেছে।"[৬০]

তাৎমাদের কাছে 'কলক্টর' (কালেক্টর) সাহেবই 'সরকার'। সরকারের কালেক্টর , হাকিমের ভয়ে সবাই যখন ভীত-সন্ত্রস্ত তখন ঢোঁড়াই তাদের ভীরুতা ও আত্মঅপমান থেকে জাগাতে চেয়েছে। ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত বিসকান্ধায় রিলিফের টাকা বণ্টনে গ্রামপ্রধানদের ষড়যন্ত্র ও অর্থ আত্মসাৎ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে গান্ধীর নামে ভোট আদায়, বিজয়ী হয়ে তাদের আত্মস্বার্থসিদ্ধির স্বরূপ বচ্চন সিং, বাবুসাহেব ও তার ছেলে লাডলীবাবু, রাজপুত, গিধরমণ্ডল, ইনসান আলি আড়গাড়িয়া চরিত্রের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করেছেন

Dhaka University Institutional Repository

ঔপন্যাসিক। সেই সঙ্গে দেখিয়েছেন ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করে ঢোঁড়াই দেশচেতনায় উদ্দীপ্ত হয়েছে। বিসকান্ধা গ্রামের মানুষের জন্য বীজধানের দাবীর মিছিলেই সে শুধু যোগ দেয়নি, কংগ্রেসীদের সঙ্গে মেলামেশা করে মহাত্মা গান্ধীর পথ অনুসরণ করেছে। আগস্ট আন্দোলনের সময় সে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যোগ দেয়—সহিংস কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। গুপ্ত সংগঠন ক্রান্তিদলে যোগ দিয়ে সে দেখতে পায় সদস্যদের পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস, অন্তর্কলহ ও বিচ্ছিন্নতা। মুক্তির পাথেয় হিসেবে ঢোঁড়াই বেছে নেয় রামায়ণ পাঠ। শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়ে তার রাজনৈতিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। সমকালে সাধারণ মানুষের মধ্যে কীভাবে রাজনৈতিক চেতনার বিস্তার ঘটেছিল তার প্রমাণ †XvovB PwiZgvbm (প্রথম চরণ—১৯৪৯, দ্বিতীয় চরণ—১৯৫১) উপন্যাস। সমালোচকের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে :

'ঢোঁড়াই চরিতমানসে' বিহারের নিম্নতর সমাজের তাৎমাটুলির ঢোঁড়াইকে দীর্ঘ জীবন পরিক্রমার মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক বাতাবরণে নিয়ে এসেছেন। গান্ধীভাবনাপুষ্ট রাজনৈতিক আন্দোলন সমাজের অন্ত্যজ মানুষদের কেমনভাবে স্পর্শ করেছিল তারই পরিচয় 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' উপন্যাসে পাওয়া যায়। বিহারের গ্রাম সমাজের জাতিভেদ, গোষ্ঠীকলহ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শোষণ, সরকারী আমলা, আইন আদালতে পুলিশের শ্রেণীস্বার্থরক্ষার প্রচেষ্টা, ভূমিহীন কৃষকদের দুরবস্থা ছাড়াও মানব মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির স্বচ্ছ প্রকাশ 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের দুটি খণ্ডে বিবৃত হয়েছে।[৬১]

ধর্মবোধে স্থিত ভাববাদী জীবনাশ্রয়ী ভারতীয়দের মনে গান্ধীর ভাবাদর্শ সহজেই গ্রহণীয় ছিল কারণ তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা ছিল 'ধর্মনির্ভর'। এ কারণে রামায়ণ-অন্তপ্রাণ ঢোঁড়াই মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতে 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হবে—কংগ্রেসী বলন্টিয়রদের এ কথায় 'মহাৎমাজী'-কে দেবতার আসনে আসীন করে। কিন্তু সম্ভাবনাময় এ চরিত্রের মাঝে নৈতিক আদর্শের সঙ্গে রামরাজত্ব আর রামায়ণের সত্য এমনভাবে মিশেছিল যে শেষ পর্যন্ত সাংসারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনেও সে মুক্তির দিশা খুঁজে পায়নি। রাজনীতির ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ভারতীয় চাষি-শ্রমিক-মধ্যশ্রেণি ও শূদ্রসমাজের মুক্তির পথ ধর্মনির্ভর রামরাজত্বের পথ নয়। এ প্রসঙ্গে মার্কসবাদী গোপাল হালদারের প্রশ্ন ও সংশয় অনুধাবন করা যেতে পারে :

ব্যক্তি মানুষের নিয়তি অজ্ঞেয়, হয়ত সমাজের ও কর্মের টানাপোড়েনে যা উদ্ভূত হয় তা কারোরই প্রার্থিত ছিল না। যুগজীবনের পরিণাম ও অনভীষ্ট এই রূপেই ঢোঁড়াই চরিতমানস কোনো সহজ নিশ্চিন্ত optimism-এ শেষ হয়নি, হয়েছে একটা রহস্যময় নৈরাশ্যাশ্রয়ী সংযত আত্মনিবেদনে; যা সম্ভব ছিল তা সম্ভবতঃ হলো না—বিকলাঙ্গ হয়ে গেল। Revolution unfinished না betrayed? অবশ্য তখনও উত্তর ঢোঁড়াইচরিত লেখা বাকী। লিখলে তার পরিণতি কী হতো, জানি না।[৬২]

স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও চিকিৎসক বনফুল রাজনীতিসচেতন ছিলেন। প্রথম জীবনে গান্ধীভক্ত থাকলেও ১৯৩৯ সালে, সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসবিচ্ছিন্ন হওয়ার পর, তিনি গান্ধীবাদের উপর আস্থা হারাতে থাকেন। বিজ্ঞাননিষ্ঠ মনন ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি দিয়ে তিনি ভারতীয় রাজনীতির গতি-প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নিজস্ব জীবনবোধ থেকে প্রাপ্ত রাজনৈতিক ভাবাদর্শকে তিনি শিল্পরূপ দিয়েছেন mßvl[৬৩], AvM[৬৪], AMxki[৬৫] উপন্যাসে। ভারতবাসীর মধ্যে দলীয় পরিচয়ে গণশক্তির ঐক্যের অভাব তিনি লক্ষ করেছেন। এ কারণে তিনি ব্যক্তির একক সততা, ভারতীয় সনাতন মূল্যবোধ-আশ্রয়ী আদর্শের উদ্বোধন ও কর্মময় জীবনের মধ্যদিয়েই স্বাদেশিকতাবোধের প্রকাশে আস্থাশীল হয়ে ওঠেন।

mßvl[৬৬] উপন্যাসে বিবাহিত হংস-শুভ্র, অবিবাহিত সোম-শুভ্র—দুই ভাই। হংস-শুভ্রের ছেলে শশাঙ্ক-শুভ্র ও মৃগাঙ্ক-শুভ্র। শশাঙ্ক-শুভ্রের তিন পুত্র—শঙ্খ-শুভ্র, রজত-শুভ্র ও হীরক-শুভ্র—এ উপন্যাসের সপ্তর্ষি। উনিশ

Dhaka University Institutional Repository

শতকের শেষ ভাগ থেকে বিশ শতকের ত্রিশের দশক পর্যন্ত বাংলা তথা ভারতে সাম্যবাদী আদর্শের বিস্তৃত পরিসরের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জীবনাচরণের রূপান্তর ও মতাদর্শ রপ পেয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। পিতা, পুত্র, এবং পৌত্র —এই তিন প্রবংশের রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘাতই এই উপন্যাসের অন্তর্নিহিত প্রবাহ।

ইংরেজ শাসনামলে ভারতীয়দের মনে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে কীভাবে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটছিল তার ইতিহাস দিয়ে উপন্যাসের শুরু। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের বিভাজন, ইংরেজদের দমন-পীড়ন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-হরণ, হংস-শুভ্র প্রত্যক্ষ করেছেন। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত প্রগতিশীল ভাবাদর্শ লালিত হংস-শুভ্র যখন দেখেছেন বড়ো বড়ো স্বদেশিরা ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করে উচ্চপদ অধিকার করছেন, তখন তার 'ম্যাৎসিনি'র বিপ্লববাদে উচ্ছ্বসিত মন হয়ে ওঠে অবলম্বনহীন। ইয়ংবেঙ্গলদের সাহচর্যে রাজনীতিচর্চা-শেখা মনন অবশেষে ইংরেজ ও এদেশীয় স্বার্থান্বেষী মানুষের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে হংস-শুভ্র বাড়ির বৃদ্ধ দারোয়ান তিলকের আদর্শই গ্রহণ করে—"হিন্দুধর্মই আমাদের সনাতন আশ্রয়—ওই আমাদের 'ন্যাশনালিজ্‌ম' বাদ বাকি সব ঝুটা হ্যায়।"[৬৭]

সোম-শুভ্র প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি না করলেও পৌত্র রজত-শুভ্র ফুটবল মাঠে গোরার সঙ্গে মারামারি করায় তাকে বাহ্বা জানান। 'খদ্দর-চরকার দিনে' রজতের মদ খাওয়াকে 'আউট অব ডেট' বলে তার মনোজগতে আলোড়ন তোলেন। সোম-শুভ্রকে ঔপন্যাসিক নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রকাশের প্রতিভূ পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র, নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু—প্রত্যেকের মতাদর্শের প্রতি আগ্রহী হলেও তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পছন্দ করতেন। 'দেশি কুসংস্কার এবং পাশ্চাত্য-বিহ্বলতা'—দুয়েরই বিরুদ্ধে ছিলেন সোম-শুভ্র। তিনি বিজ্ঞাননিষ্ঠ যুক্তিবাদী মন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন ভারতীয় জনমানস ও জনসমাজের সার্বিক রূপান্তর না হলে কখনোই সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য নানা তত্ত্ব-মতবাদের প্রতি কৌতূহলী হলেও 'পলিটিক্যাল' সভার প্রতি তিনি আকর্ষণ বোধ করতেন না।

তারুণ্যে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে ক্ষুব্ধ শশাঙ্ক-শুভ্র বিপ্লবী দলে যোগ দেন। বাবার সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার শিকার হয়ে বিলেত যান। দেশে ফিরে কংগ্রেসে যোগ দেন। কিন্তু অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দল, নেতৃবৃন্দের সুবিধাবাদী মনোভাব (যারা ন্যাশনালিজ্‌মের বিপ্লবী সুর তুলেছিলেন) ও পলায়নপর মানসিকতা বিশ্লেষণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন : 'এ দেশে বিপ্লব-পন্থা অনুসরণ করা মানে প্রাণ দেওয়া বা সময় নষ্ট করা।'[৬৮]

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মৃগাঙ্ক-শুভ্র অসহযোগ-আন্দোলনকালীন প্রেক্ষাপটে 'একনিষ্ঠ প্রেমিক' মৃগাঙ্ক 'একনিষ্ঠ বৈরাগী' হয়ে গান্ধী আহূত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার কারণে কারাবন্দি হন। জেল থেকে ফেরার কিছুদিন পর চৌরিচৌরার ঘটনার পরিণামে থেমে-যাওয়া অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় দিশেহারা হয়ে গান্ধীর সমালোচনা করেছেন মৃগাঙ্ক-শুভ্র। তাঁর মনে হয় 'দাদাভাই নাওরোজি আর গোখলের শিষ্য গান্ধীর কাছে ট্রুথ বড়, দেশ নয়।'[৬৯] কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের ডাকে উত্তরবঙ্গে বন্যায় বিধ্বস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের 'ভীত-ত্রস্ত-অপমানিত-ভীরু-ভীতু ও লোভী' রূপ দেখে তিনি ভারতবর্ষে গান্ধীর আধ্যাত্মিক রাজনীতির মাহাত্ম্য অনুধাবন করেন। 'জাগাতে হবে ভারতবর্ষেরই শাশ্বত মন্ত্রে। সে মন্ত্র হিংসার নয়—প্রেমের, ভিক্ষার নয়—ত্যাগের, পরমুখাপেক্ষীর নয়—স্বাবলম্বীর, ভীতির নয়—শক্তির। সে মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতবাসী অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে, কিন্তু গুলি-গোলা কামান-বন্দুক দিয়ে নয় ; আত্মার শক্তি দিয়ে।'[৭০]

Dhaka University Institutional Repository

বার বার কারাদণ্ডপ্রাপ্ত স্বদেশি সশস্ত্র বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড, সুভাষ বোসের বামপন্থা কিছুই যখন মৃগাঙ্কের ভালো লাগছিল না—এমনি এক ঔদাসীন্যের মাঝে গান্ধীর অসহযোগ ও লবণ-আইন অমান্য আন্দোলন তাকে নতুন করে উদ্দীপ্ত করে। শান্তিকামী মানুষের শান্তিময় প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন এগিয়ে চলে। পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত বন্দি মৃগাঙ্ক দীর্ঘ কারাভোগ শেষে যখন মুক্তি পান তখন বিহারে কংগ্রেস মিনিস্ট্রির বাঙালি নির্যাতন চলছে ভয়ংকররূপে। ইংরেজ ওটেন সাহেবকে ঠেঙানো সুভাষ বোস রজত-শুভ্রের আদর্শ ছিল। পিসি ইন্দু-শুভ্রার কাছ থেকে সে নেয় 'অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষা'। বাঙালিদের দুঃখ ঘোচানোর জন্যে পিসি তাকে বলেছে :"সত্যিই যদি এর প্রতিকার করতে চাও, তাহলে মরবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। আবেদন-নিবেদনে কিছু হবে না, অহিংসার ঢঙ করেও কিছু হবে না। যে তোমার গালে চড় মারবে, তার নাকে ঘুষি লাগাবার মত সাহস সংগ্রহ করতে হবে।"[৭১]

বাংলায় ১৯২৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির প্রকৃত প্রতিষ্ঠালগ্ন অর্থাৎ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ফলে ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত কমিউনিস্ট আদর্শ ও ভাবধারা কংগ্রেসী রাজনীতির প্রতি আস্থা হারানো তরুণ সমাজকে আকৃষ্ট করে। মানবেন্দ্র রায়ের মতো কংগ্রেসীরাও এই গুপ্ত আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন—যাদের দ্বারা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন হয়েছিল। অন্তিমে তাদের মতো বিপ্লবীদের বরণ করতে হয়েছিল নির্মম কারাজীবন। mßvl উপন্যাসের হীরক-শুভ্রের পরিণতিও এমন। কারাগারে বসে মেজদা রজতকে লেখা চিঠিতে সে তার রাজনৈতিক আদর্শ তুলে ধরেছে। গণতন্ত্র রাজতন্ত্রেরই নব-রূপ। যাকে গ্রাস করছে ক্যাপিটালিজ্‌ম, আর ফ্যাসিজ্‌ম সোশ্যালিজ্‌মেরই পরিবর্তিত বক্র-রূপ—ক্যাপিটালিস্টদের আত্মরক্ষার প্রয়াস। পরে অবশ্য ক্যাপিটালিস্টিক খোলস খসে সোশ্যালিজ্‌ম তার রূপ খুঁজে পাবে।

সব শ্রমিক-ধর্মঘটই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হচ্ছে কেন—এ প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে হীরক-শুভ্র আবিষ্কার করেন শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে সেসব মধ্যবিত্ত যাদের অবস্থান শ্রমিকদের থেকে দূরে। এছাড়া শ্রমিকদের অসচেতনতাও এর অন্যতম কারণ। তার আত্মকথন লক্ষণীয় :

...কারণ শ্রমিকরা এখনও এ দেশে সম্পূর্ণভাবে আত্মসচেতন হয় নি। এখনও ভদ্রলোকের বেকার ছেলেরাই আলতো আলতো ভাবে কমিউনিজ্‌ম করছে—লাইফ ইন্সিওরেন্সের এজেন্সি, বইয়ের দোকান, মাসিক-পত্রের সম্পাদকি অথবা হোমিওপ্যাথিক প্র্যাক্‌টিস করতে করতে, এবং তারাও সবাই খাঁটি লোক নয় বলে শ্রমিকদেরও খাঁটি করে তুলতে পারছে না।[৭২]

কারাবাসকালে খবরের কাগজ থেকে হীরক জেনেছে—যে কংগ্রেসের "মূলধন ন্যাশনালিজ্‌ম, কমিউনিজ্‌ম নয়"—সেই কংগ্রেসের অঙ্গীভূত হয়েছে কমিউনিজ্‌ম তখন সে হতাশ হয়েছে। কমিউনিস্ট নেতাদের বক্তৃতাসর্বস্বতা, মানবেন্দ্র রায়ের মতো ব্যক্তিত্বের কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনাল থেকে বিতাড়িত হওয়া সবকিছুই নৈরাশ্যজনক। সে লক্ষ করেছে অনেক কমিউনিস্টই কংগ্রেস-সোশ্যালিস্টের বেশে কংগ্রেসে প্রবেশ করছেন। যাদের মাঝে জওহরলালের মতো নেতা আছেন। এ কারণে 'কংগ্রেস, টেররিজ্‌ম, কমিউনিজ্‌ম'—সবকিছুর ওপরই আস্থা হারিয়েছিল হীরক-শুভ্রের ছেলে নবনীর মতো তরুণেরা। কিন্তু হীরক-শুভ্র ভারতীয় সনাতন ভাবধারা ও আদর্শ যা 'বুদ্ধ-চৈতন্য' প্রচার করেছেন তার মাঝেই সাম্যবাদের প্রেরণা খুঁজে পেয়েছে। এক্ষেত্রে আন্দোলনের আসন্ন ব্যর্থতার গ্লানিজর্জর হীরক-শুভ্র সাম্যবাদের সেই উত্তরাধিকারের ধ্বজা বহনের জন্য গুপ্তদলের বিপ্লবের মাঝে শেষ মুক্তি খুঁজতে চায় সে-ই রজত-শুভ্রকেই যোগ্য মনে করছে :

সেই সাম্যবাদই একদিন মানুষের মুক্তি আনবে—এই বিশ্বাস নিয়ে অতিশয় দুর্গম পথে আদর্শের মশাল জ্বেলে একদিন যাত্রা করেছিলাম। এসে পৌঁছেছি জেলে। কিন্তু মরেও যে শান্তি পাব না মেজদা যদি মরবার আগে শুনে না যাই যে, আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবার ভার নিয়েছে কেউ।... মেকী কমিউনিস্টে দেশ ছেয়ে গেছে। অন্তত একজন খাঁটি লোকও জেলের বাইরে কাজ করছে —এ খবরটুকু পেলেও আমার কারাবাস সার্থক হবে। এর জন্যে জন্ম-জন্মান্তর কারাবাস করতেও রাজী আছি।[৭৩]

আগস্ট আন্দোলনের বিপ্লবী কর্মী AvM উপন্যাসের অংশুমান mßvl-র হীরক-শুভ্রের অসমাপ্ত স্বপ্নের আদর্শকে ধারণ করেছে অংশুমান আর কম্যুনিস্ট পার্টির উৎসাহী সদস্য অন্তরা। কালক্রমে অন্তরা কমিউনিস্ট দলের উৎসাহী সদস্য ও সমর্থক নীহার সেনকে ভালোবেসে বিয়ে করে। কিন্তু ইংরেজ সরকারের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি গ্রহণ করায় তার স্বপ্নভঙ্গ হয়। 'পেটের দায়ে, সংসারের চাপে' 'কমিউনিস্ট' নীহার সেন 'ক্যাপিটালিস্টদের অধীনে চাকরি নেয়াকে মনে করেছে এটা তার 'রণকৌশল মাত্র'[৭৪]।

AvM উপন্যাসে অংশুমানের রাজনীতির প্রশ্নে কোনো দলীয় পরিচয় ছিল না। মিতবাক অংশুমান ইংরেজ মিলিটারির অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য বিদ্রোহী হয়েছে। তার এই অভাবনীয় পরিবর্তনে বিস্মিত অন্তরার মনে হয়েছে : "এরাই তো চিরন্তন অগ্রণী, সর্বকালে সর্বদেশে এরাই তো আদর্শের পতাকা বহন করেছে প্রাণ তুচ্ছ ক'রে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে সমস্ত সত্তা দিয়ে, আষাঢ়ের নবোদিত জলধরের মত আত্মবিসর্জন দিয়ে ধন্য করেছে পিপাসিত পৃথিবীকে। এরা বিশেষ কোন দলেরও নয়, দেশেরও নয়।...প্রাণের আবেগটাই এদের কাছে মুখ্য, দলটা নয়।"[৭৫] অংশুমানকে অন্তরা আবিষ্কার করেছে সেই 'সূর্য' হিসেবে যে 'অন্ধকার দূর করে আলোকময় সম্ভাবনা নিয়ে আসে'। 'অগ্নি' নামটি প্রতীকধর্মী। মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমাণ অংশুমানের সামনে 'ঘন গাঢ় পুঞ্জীভূত তমিস্রা' (পৃ.৮৫)-র মধ্য থেকেও অবচেতনে লালিত স্বাধীনতার স্বপ্নময়-অভীপ্সা উঠে এসেছে অগ্নি প্রতীকে।

¯‹দেশী আন্দোলনের পটভূমিকা থেকে শুরু করে স্বাধীনতা-উত্তর কাল পর্যন্ত বিস্তৃত 'AMxki' উপন্যাসের কাহিনি। 'মূর্তিমান অগ্নিশিখার মতো উজ্জ্বল ও প্রখর' সরকারি কর্মকর্তা রেলের মেডিকেল অফিসার যিনি ছবি আঁকতেন, ছদ্মনামে লিখতেন সেই অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের রুদ্র ও কোমল রূপ প্রকৃত অর্থে চিকিৎসক বনফুলের অভিজ্ঞতা ও কল্পনাসঞ্জাত আদর্শপ্রাণ ডাক্তারের প্রতীক চরিত্র। ডি-টি-এস অফিসের এদেশীয় বড়বাবু সর্বেশ্বর সান্যাল থেকে শুরু করে স্থানীয় রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার যোগেশ রক্ষিত, ফিরিঙ্গি ডি-টি-এস মিস্টার স্কট প্রত্যেককেই জব্দ করেছেন তিনি। বোমার দলে যোগ দেয়া অনামা কথক যার বর্ণনভঙ্গিতে উঠে এসেছে ডাক্তারের জীবনকথা সেখান থেকে অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক আদর্শের পাশাপাশি বিপ্লবীদের ওপর ইংরেজ মিলিটারির অত্যাচারের সচিত্র বর্ণনা মেলে। সেকালের বিপ্লবী একালের পুলিশ অফিসারের কথনে "বিপ্লবীদের চক্ষে তীর্থস্থান" মেদিনীপুরের বিশাখার কাহিনির খণ্ড খণ্ড চিত্র উপস্থাপনের মধ্যদিয়ে সে সত্যের প্রমাণ মেলে :

এক স্বদেশী আন্দোলনে সায়েবরা এসে পেট্রোল দিয়ে আমাদের ঘর-বাড়ী সব পুড়িয়ে দিলে। আমার স্বামীর মুখের উপর গুলি করলে একজন সাহেব। তার অপরাধটি কি জান? সে বলেছিল 'বন্দে মাতরম'।[৭৬]

বাঙালিদের চাকরিবিলাসী শান্তশিষ্ট আপসমুখী সুবিধাবাদী বিশ্বাসঘাতক রূপ যেমন তাকে হতাশ করেছে, তেমনি ক্ষুদিরাম, কানাইলালের মতো বিপ্লবী আদর্শবাদীরা ছিলেন অগ্নীশ্বরের প্রেরণা। এ কারণেই সশস্ত্র ডাকাতি এবং হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত জেল-পালানো আসামি কথক বিপ্লবীকে তিনি ইংরেজ ক্যাপ্টেনের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, অনেকের পাণিপ্রার্থী সুছন্দা, ব্রিটিশ হত্যার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দেহোপজীবিনী নারীতে রূপান্তরিত হওয়ায় তাকে দ্রৌপদী-কুন্তীর চেয়ে উচ্চাসন দিয়েছেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে শুধু নয়, স্বাধীনতা-উত্তরকালেও নিভৃতচারী দরদি এই চিকিৎসক

Dhaka University Institutional Repository

দেশমাতৃকার প্রতি প্রেমের প্রকাশ হিসেবে অসহায় মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেবার পাশাপাশি যোগ দিয়েছেন প্রাণাবেগে পূর্ণ স্বাধীনচেতা জিপসিদের সঙ্গে। ছদ্মনাম গ্রহণ করেছেন খগেশ্বর মুখোপাধ্যায়। দেশের শত্রু, চার ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার—লালারাম, বিশ্বেশ্বর ঘোষ, রাঘব দালাল, জাফর আলীর বাগানবাড়িতে নাচগান করা মেয়ে তিনটিই তাদেরকে খুন করেছে—এ সন্দেহে গ্রেফতার হওয়া জিপসি মেয়েদের সঙ্গে অগ্নীশ্বরের যোগাযোগ থাকায় তাকেও গ্রেফতার হতে হয়। শেষ পর্যন্ত প্রকৃত পরিচয় না দিলেও পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথোপকথনে তার রাজনৈতিক দর্শন প্রকাশিত হয়েছে :

একটা জিনিস যদি লক্ষ্য করে দেখেন, তাহলে হয়তো সত্যের কিছু আভাস পেতে পারবেন। যে চারটে লোক খুন হয়েছে তারা প্রত্যেকেই দেশের শত্রু, প্রত্যেকেই ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার। লক্ষ লক্ষ গরীব লোককে বঞ্চিত করে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছে ওরা ...আমি বাঙালী , বিদ্রোহ আমার মজ্জাগত। মনে করুন, দেশের শত্রু নিপাতের আমি অভিনব পন্থা বার করেছি। ধরুন আমার মনে হয়েছে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে বাঙালী একদিন ইংরেজের সঙ্গে লড়েছিল এইবার তার দুর্নীতির সঙ্গে লড়া উচিত। যদি দরকার হয় তার জন্য প্রাণ দিক—[৭৭]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৭-১৯৭০) রাজনীতি-অবলম্বী উপন্যাস হিসেবে উল্লেখযোগ্য হল wZwgi-Zx_[৭৮], gnvb›'v[৭৯], wkjwjwc[৮০] ও jvjgwU[৮১]। পারিবারিকসূত্রে তিনি ছিলেন রাজনীতিসংশ্লিষ্ট মানববাদী। সমরেশ বসুর সঙ্গে এদিক থেকে তার চেতনাগত সাদৃশ্য রয়েছে। মেজদা শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লববাদী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নারায়ণের মাটি ও মানুষের প্রতি প্রীতি মেজদা শেখরের উত্তরাধিকার। বিপ্লবী দলের সক্রিয় সদস্য না হয়েও কিশোর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দায়িত্ব ছিল দলের বিভিন্ন বিপজ্জনক কাজ 'যেমন অস্ত্র ইত্যাদি লুকিয়ে রাখা বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া, চিঠিপত্র, বে-আইনি বই ইত্যাদি পৌঁছে দেওয়া।'[৮২]

১৯৪৪ সাল থেকেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী বলয়কেন্দ্রে প্রবেশ করেন। এ বছর প্রকাশিত wZwgi-Zx_ উপন্যাসের বিপ্লবী চরিত্র প্রফুল্ল বাসুদেবপুর নলসিঁড়ি বা চণ্ডপাশা গ্রামে স্কুলমাস্টার হয়ে এলেও তার মূল উদ্দেশ্য গ্রামীণ সমাজবাস্তবতার মর্মমূলে প্রাণ সঞ্চার করা। কলকাতার নগর সভ্যতার অক্টোপাসপাশের শিকার, অবহেলিত গ্রামের স্কুলপড়ুয়া বখে-যাওয়া তরুণদের বিপ্লবী মন্ত্রে জাগ্রত করে প্রফুল্ল তাদের দ্বারা গ্রামে পরিবর্তনের সূচনা করে। জাতিগত বিশেষত্বের কথা বলে প্রফুল্ল ইংরেজ শাসনামলে স্কুলে জাতীয় পতাকা উত্তোলনসহ পথ নিষ্কণ্টক করতে বাঁধ নির্মাণ, 'মাহিলাড়ার কচুরিপানা পূর্ণ খালে'-র (ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে লেখালেখি করেও যা পরিষ্কার করা হয়নি) দু মাইল আন্দাজ কচুরিবন পরিষ্কার করেছে তরুণদের নিয়ে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকানি কালীপদ পোদ্দারের দোকানের সামনে শ্রেণিবৈষম্যপীড়িত নমঃশূদ্র শ্রেণির মানিক ভুঁইমালীর দলকে মদ খাওয়া থেকে বিরত রাখতে চেয়েছে আত্মজাগরণ-মন্ত্র শুনিয়ে : "মদ খেয়ো না, জমিদার তালুকদারকে খাজনা দিয়ো না...।"[৮৩] প্রণয়নিবেদনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও ঘর-সংসারের বন্ধন-উপেক্ষাকারী আদর্শচালিত প্রফুল্ল নীলিমাকে বলেছে :

...যেদিন আমার দেশকে, আমার পৃথিবীকে আমি এই অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারব, যেদিন যুগ যুগান্ত-সঞ্চিত আবর্জনার স্তূপে আগুন ধরিয়ে দিতে পারব। তার আগে পর্যন্ত আমার জন্যে ঘর নেই, বিশ্রাম নেই, প্রেম নেই। অনেক ভুলে আমাদের পৃথিবী ভরে উঠেছে ; ভয়ে আর অত্যাচারে, ক্ষুধায় আর অপচয়ে, লোভে আর দুর্ভিক্ষে। এই পৃথিবীটাকে রসাতলে পাঠিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত আর এক পৃথিবী গড়ে তুলতে না পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি থামতে পারব না —আমার থামা অসম্ভব।...[৮৪]

ঘটনাক্রমে, অবসরপ্রাপ্ত দারোগা তাঁর সম্পর্কে বলেছে "পলিটিক্যাল গুণ্ডা"। পরিকল্পনামাফিক কাজ করতে গিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করায় রবির মতো বক্তৃতাসর্বস্ব সহিংস নীতিতে আস্থাবান স্পাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে প্রফুল্ল।

Dhaka University Institutional Repository

এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক নিভৃত পল্লিজীবনে দারোগা রামকমল চাটুজ্জে, স্কুলের সেক্রেটারি রাসমোহন সেন, স্কুলের প্রেসিডেন্ট গনু মিঞা ও অবসরপ্রাপ্ত সুরেন মজুমদারকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এদেশীয় দোসর হিসেবে চিত্রিত করার পাশাপাশি নরেশ করের মতো বিপ্লবের ধ্বজাধারী ভীতিবিহ্বল বিপ্লবীর রূপ দেখিয়েছেন। মুন্সী সাহেবের চরিত্র অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিনিধি। গনু মিঞা পরিবর্তনকামী তরুণদের বিরুদ্ধে কোরানের অপব্যাখ্যা দিয়ে গবর্নমেন্টের নামে ইদ্রিসের মতো সাহেবপুরের পুরো মুসলমান সমাজকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। কিন্তু বিজ্ঞ মুন্সী সাহেব তাদের সঠিক পথ দেখিয়েছে। মুকুল চরিত্র বিপ্লবী আদর্শায়িত চরিত্র। সে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত 'অটুট', 'অনড়' শ্রেণিবৈষম্যের অবসান কামনা করে, স্বপ্ন দেখে 'অনাগত যুগের'। তার সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের সিদ্ধান্ত লক্ষযোগ্য :

> মুকুল বিপ্লবের অগ্রদূত, ঘর তাহাকে আকর্ষণ করে নাই। সে তো সাধারণের মতো আজ আর গড্ডলিকাস্রোতে অনিবার্য ধ্বংসপরিণতির পথে ভাসিয়া যাইবে না, ইহার মধ্যে সে অসাধারণ হইয়া তাহার ব্যক্তিত্বে, তাহার শক্তিতে এই স্রোতের গতি ফিরাইবে। যাহারা অনিবার্যভাবে মরিতে চলিয়াছে, তাহাদের সে মৃত্যুকে নব-জীবনের সঞ্জীবনী দিয়া বাঁচাইয়া তুলিবে ; পৃথিবী জুড়িয়া লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নরনারীকে সে নবযুগের সভাপ্রাঙ্গণে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিবে।[৮৫]

১৯৪৭-পরবর্তী গণতান্ত্রিক সরকারের জনবিরোধী চেহারা দেখে বৃহত্তর লোকসমাজের কাছে প্রাপ্ত স্বাধীনতা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এরই মধ্যে সংগঠিত কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে কম্যুনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরো। কংগ্রেস সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয় এ সময়ে। বি.টি. রণদিভের নেতৃত্বে পার্টি সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নেয়। কালক্রমে সেটা হয়ে ওঠে সন্ত্রাসবাদী পার্টি লাইন। পার্টি সদস্যদের মাঝে দেখা দেয় পেটি বুর্জোয়া মনোভাব ও ব্যক্তিগত ঈর্ষা-বিদ্বেষ। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ার মতো পটভূমি তৈরি হয়। এ প্রেক্ষাপটেই রচিত হয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের gnwb‘v উপন্যাস।

সশস্ত্র বিপ্লবী নীতিশ বারো বছর জেল খেটে মহানন্দা-তীরবর্তী নিজ গ্রাম যোধপুরে ফিরে আসে। স্থানীয় তরুণদের উদ্যোগে গ্রাম সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত জাগরণ সংঘের সভাপতি হিসেবে সমবেত তরুণদের সামনে বক্তৃতা দেয়। কিন্তু দারোগা মফিজর রহমানের সাবধানবাণীতে ভীত হয়ে বন্ধ হয়ে যায় এ সংঘের কার্যক্রম। দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় প্রকৃত বিপ্লবী নীতিশ কারাবাসকালেই কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত ভাঙনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। পুলিশের নজরবন্দি অবস্থায় পিতা যতীশ ঘোষ ও স্ত্রী মল্লিকাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিজীবননির্ভর সংকটের সূত্র ধরে সৃষ্ট বিচ্ছিন্নতাবোধ তাকে কলকাতায় আনে। গ্রামে অবস্থানকালে সুদামকাকার মেয়ে অলকার কাছ থেকে নীতিশ শুনেছে গ্রামসংস্কারের মাঝে ভারতবিপ্লবের অসম্ভাব্যতার কথা। মহত্তর কিছু করবার অন্তর্প্রেরণায় কলকাতায় হিমাংশুর সান্নিধ্যে এসে নীতিশ জড়িয়ে পড়েছে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে। হিমাংশুর দৃষ্টিতে শ্রমিকদের মতো সর্বহারা শ্রেণিই হচ্ছে বিপ্লবের পুরোধা। নীতিশের উদ্দেশে তার উচ্চারণ :

> ...তোমার গ্রামের চাষাভূষো এরা নয়। ক্ষেতে ফসল না ধরলে, হাজাশুকো হলে, বান ডাকলে দেবতাকে বরাত দিয়ে এরা নিশ্চিন্ত হতে পারে না। এদের শত্রু প্রত্যক্ষ, এদের শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়। এরা পরিষ্কার করে জানে কোথায় এদের জীয়নকাঠি, শত্রুর মারণ-মন্ত্রও অজানা নয়।[৮৬]

অন্যত্র শ্রমিক শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে আহত হয়েও থামেনি হিমাংশুর 'কমরেড' নীতিশ। ঘটনাক্রমে তার সহযাত্রী হয়েছে অলকা। শুধু রাজনৈতিক আদর্শবাদ নয়, বরং এর সঙ্গে ব্যক্তিজীবনকে সমীকৃত করার

Dhaka University Institutional Repository

অসাধারণ শিল্পসৌকর্য রূপ পেয়েছে এ উপন্যাসে। ব্যক্তিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সংকীর্ণ ঘেরাটোপ ছাড়িয়ে দেশপ্রেমের অত্যুচ্চ আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে gnvb›'v উপন্যাস।

wkjwjwc উপন্যাসে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের রাজনীতি ও ইতিহাস পরস্পরিত হয়েছে। ১৯৩০ সালের ৬ এপ্রিল শুরু হওয়া আইন অমান্য আন্দোলনের প্রবল জোয়ার ও ৪ মে গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে জনমনে সৃষ্ট হতাশার পাশাপাশি বিপ্লববাদী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পদ্ধতি-প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে রঞ্জন বিকশিত হয়েছে। কংগ্রেসের সমালোচনার পাশাপাশি বিপ্লববাদের তৎকালীন ত্রুটি-বিচ্যুতিকেও ব্যাখ্যা করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় স্কুলে পিকেটিং করতে এসে পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত 'ফার্স্ট ক্লাসের ফার্স্ট বয়' মৃগাঙ্ক আজ ইনসিয়োরেন্সের দালাল—"খদ্দরের পাঞ্জাবির মলিন আচ্ছাদনের নিচে দারিদ্র্যজীর্ণ দেহ।" বাজারের পয়সার জন্য যাকে রঞ্জনের কাছে 'আট আনা পয়সা' ধার চাইতে হয়। শিক্ষাজীবন, রাজনীতি সব কিছু থেকে ফুরিয়ে আসার কারণ জানতে চাইলে রঞ্জন মানে রঞ্জুকে সে জানায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভুল সিদ্ধান্তের কারণেই জনগণ আজ বিভ্রান্ত, কর্মীদের মাঝে দেখা দিয়েছে হতাশা ও সীমাহীন শূন্যতা—জীবনের স্বাভাবিক পথে প্রত্যাবর্তন করাও সম্ভব হয় না তাদের পক্ষে। গান্ধীর অহিংস আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘটনার সমালোচনা করলেও মৃগাঙ্ক এ সত্যও উপলব্ধি করেছে যে জনগণের পক্ষে কখনোই অহিংস থাকা সম্ভব নয় বলেই গান্ধীকে শেষ পর্যন্ত আন্দোলন থামিয়ে দিতে হয়েছে। নিচের অংশটুকু লক্ষণীয় :

> গাছে তুলে দিয়ে বার বার মই কাড়লে কী আর করা যাবে বলো? কম্প্রোমাইজ্ আর কম্প্রোমাইজ্। সকলেরই সব রইল, জলের মাছ জলে গেল —মাঝখান থেকে আমার ভবিষ্যৎটাকে আমি নিজের হাতে ভেঙে চুরমার করলাম। কেন বুঝিনি বার্দোলির শিক্ষা? চৌরিচৌরার মানে? —দেবতার পথ দিয়ে মানুষ কখনো চলতে পারে না—অন্যমনস্ক স্বরে মৃগাঙ্ক বলে।[৮৭]

অসহযোগ আন্দোলন থেমে যাওয়ায় বৃহত্তর জনসমাজের প্রতিক্রিয়া রঞ্জন প্রত্যক্ষ করেছে। একদলের কাছে গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্মানজনক। অন্যদলের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন : 'প্রতিবাদ আসে মনে—কিন্তু জোর করে বলতে পারে না কেউ। মহাত্মা গান্ধী—নামটাই যাদুমন্ত্র। মন্ত্রমুগ্ধই হয়ে থাকে মানুষ—ঝিমোতে থাকে নেশাখোর টিয়াপাখির মতো।'[৮৮]

ভোনা, কালী, পূর্ণ, খাঁদুর মতো বখাটে তরুণ সময়ের প্রয়োজনে এসে মিশেছিল আইন অমান্য আন্দোলনে। হতাশ হয়ে ফিরে গেছে স্বস্থানে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের ঝড়ের আঘাত লেগেছে রঞ্জনের বুকে। "সর্বহারাদের গান" কবিতা পড়ে তার মনে আসে চট্টগ্রামের "অমর অগ্নিযজ্ঞের রক্তাক্ত ইতিহাস।"[৮৯] বৈরাগীর গানে "অভয়রামের দ্বীপান্তর ও ক্ষুদিরামের ফাঁসি"কেন্দ্রিক স্বদেশী গান শুনে সে বিশ্বাস করতে পারে না ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছে। শৈশবে অশ্বিনীর কাছে শোনা "বোমার কারখানা"-র কথা এখনও ভুলতে পারেনি রঞ্জন। তার বিশ্বাস, ক্ষুদিরামের বোমার কারখানায় এখনও কাজ চলছে। রঞ্জুর বিশ্বাস ছিল অহিংস আত্মত্যাগের পথেই স্বাধীনতা আসবে। কিন্তু বন্ধু পরিমলের হাত ধরেই রঞ্জন সশস্ত্র বিপ্লববাদে দীক্ষা নেয়। পরিমল তাকে নরখাদক ইংরেজদের স্বরূপ তুলে ধরেছে :"...ওরা আমাদের লাথি মারে, আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে পোষা কুকুরকে রুটি খাওয়ায়। দুনিয়ার কালো জাতিদের ওপরে ওদের কোনো দরদই নেই।"[৯০]

কিশোর রঞ্জনকে লক্ষ করে বেণুদা তাকে 'যুগান্তর' পার্টির সভ্য হতে আহ্বান জানিয়েছে। সভ্য হওয়ার সুবাদে বেণুদার মাঝে সে অবিনাশবাবুর পুনর্জন্মকে আবিষ্কার করেছে। ধীরে ধীরে সে জড়িয়ে পড়ে স্বরাজপ্রাপ্তির বিপ্লবী পথে। তিন বছর অতিক্রান্ত হলে জেলবন্দি কলেজছাত্র বিপ্লবী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

সোনাচাঁদির ব্যবসায়ী হালদারের দোকানে ডাকাতি করে অস্ত্র কেনার জন্য হাজার তিনেক টাকা সংগ্রহ করে। টিকটিকির সর্দার ধনেশ্বর ও ছাই রঙের কোট পরা আই-বি কন্‌স্টেবল ইয়াদ আলীর শকুনের মতো দৃষ্টি এড়িয়ে ডাকাতি করেছে রঞ্জন। ভীতিবিহ্বলতাকে কাটিয়ে নিজেকে বলেছে :

"জেলকে ভয় করবে না, কেঁপে উঠবে না সি-আই-ডির হাজার অত্যাচারের আতঙ্ককর সম্ভাবনায়। দূর কালাপানির ওপারে বিভীষিকাময় আন্দামান। প্রাগৈতিহাসিক লস্ট ওয়ার্লডের মতো অমানুষিক বিভীষিকায় ভরা। অথচ আজ তাই নতুন একটা রামধনুকের দ্বীপের মতো তাকে মায়াময় আহ্বান পাঠাচ্ছে। যেদিন ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়ে সে হাসিমুখে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবে বিপ্লবী কানাইলালের মতো, অন্যান্য শহীদদের মতো তারও স্থান হবে কোনো জ্যোতির্ময় সপ্তর্ষিলোকে, সেদিনের চেয়ে কোন্ বড় গৌরব আছে আর?"[৯১]

এই গৌরবময়তার মাঝে যখন নেতৃত্বের বিরোধিতায় দলীয় অন্তর্বিরোধ দেখা দেয় তখন হতাশ হয়ে পড়ে রঞ্জন। 'অনুশীলন' দলের বিশু নন্দীর সঙ্গে 'যুগান্তর' দলের রোহিণীর সংঘাত তাকে ভাবিয়েছে, মনে প্রশ্ন জেগেছে সকলেই দেশের কর্মী হয়েও কেন এই বিভেদ? তার মনে হয়েছে এতে ইংরেজদের তাড়ানোর শক্তি ক্ষয় হবে মাত্র। নেতৃত্বের কোন্দল নিয়ে চললে "দেশের স্বাধীনতা শুধু স্বপ্নই থাকবে। কোনোদিনই তা আসবে না—আসতে পারেও না।"[৯২] নেতৃত্বের সমালোচনা করতে পারবে না কোনো সদস্য, পার্টির এমন সিদ্ধান্তও রঞ্জনের কাছে গ্রহণীয় হয়নি।

শেষ পর্যন্ত অস্ত্র কেনার টাকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি রায়সাহেব উপাধিপ্রাপ্ত জোতদার মথুরানাথ পোদ্দারের কাছে যাওয়ার প্রস্তুতি-গ্রহণকালে দলীয় সদস্য রোহিণীর বিশ্বাসঘাতকতায় পুলিশের গুলিতে মারা যায় বেণুদা। আশ্রয়দাতা ফৈয়জমোল্লার বাড়িতে আত্মগোপন করে রঞ্জন। শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয় সে। পাঁচ বছর জেল, দু বছর অর্ডিন্যান্স আর অন্তরীণ-বন্দির জীবন চলেছে দু বছর। এমার্জেন্সি অর্ডারে শেষ পর্যন্ত কারামুক্ত হয় রঞ্জন। দেশের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে পড়ে কালের যাত্রার সঙ্গী হিসেবে। সেই কাহিনি বিস্তারিত হয়েছে jvjgwU উপন্যাসে।

১৯৪৭ সালে ভারতবিভাগ-পূর্বকালীন পরিপ্রেক্ষিতকে আশ্রয় করে বরেন্দ্র অঞ্চলের গৈরিক পটভূমিকায় রচিত হয়েছে jvjgwU উপন্যাস। বরেন্দ্রভূমিতেই প্রথম সার্থক গণবিপ্লব—'কৈবর্ত-বিদ্রোহ' হয়েছিল। এর মধ্যদিয়ে উদ্বোধন ঘটেছিল শূদ্রশক্তির। বরিন্দ অঞ্চলেই "আদিনার সাঁওতালেরা জিতু সাঁওতালের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজেছিল।" সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার সাঁওতাল, ধাওয়া, বাদিয়া, আহীর, তুরীদের সঙ্গে রুকনপুরের হিন্দু জমিদার ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ ও পালনগরের মুসলমান জমিদার ফতে শাহ্-র শ্রেণিদ্বন্দ্ব এ উপন্যাসের উপজীব্য। মুসলিম লিগের পৃথক জাতীয়তা, পৃথক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার যৌক্তিক ব্যাখ্যাও প্রকাশিত হয়েছে এ উপন্যাসে। গণশক্তির ঐক্যচেতনা এর উজ্জ্বলতম দিক। জমিদারদের অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধকল্পে প্রজাদের সংগঠিত করেছে wkjwjwc-র বিপ্লবী কর্মী রঞ্জন, কিষাণ সমিতির উদ্যোক্তা নগেন, মুসলিম লীগের স্বপ্নময় কর্মী আলিমুদ্দিন। নির্ধারিত খাজনা ছাড়াও জমিদারকে নিজেদের জীবনধারণের জন্য তৈরি করা ঘি, দধি, মিষ্টান্ন তোলা হিসেবে দিতে হত আহীরদেরকে। এছাড়া এগুলো নিতে এসে তাদের নারীদের সঙ্গে অশোভন আচরণ করত জমিদারের পাইক-বরকন্দাজ। ফলে পাইক জটাধর সিংকে খুন করেছে যমুনা আহীর। এতে তাদের মনে ক্ষোভ জমা হয়েছিল। অন্যদিকে সাঁওতালরা ছিল ফতে শাহ্‌র অবাধ্য প্রজা। পতিত জমিতে আশ্রিত সাঁওতালদের কাছ থেকে জমিদার খাজনা চায়—আপত্তিকর ভাষায় বলা পাইক মহবুবের এ কথায় টুলকু সাঁওতালের তীর এসে বেঁধে তার গলায়। পরিণামে দশ বছর কারাদণ্ড হয় তার। এসব শ্রেণির মানুষই জমিদারদের সঙ্গে লড়াইয়ে 'ভ্যানগার্ড' হিসেবে কাজ করবে—এমন স্বপ্নই দেখে নগেন ডাক্তার, রঞ্জন। নিচের অংশে গণশক্তির জাগরণ-অভীপ্সা প্রকাশিত হয়েছে রঞ্জনের ভাবনায় :

Dhaka University Institutional Repository

জানালা দিয়ে সে বাইরে সেদিকেই তাকিয়ে রইল—নদীর ওপারে যেখানে পূর্ব দিগন্ত; যেখানে আগুনের পদ্মের মতো সূর্য উঠে তার বিছানার ওপরে সর্বপ্রথম তার আলো ছড়িয়ে দেয়।...প্রভাতী সীমান্তের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগল।...

জমিদারের ফিরিঙ্গিপুর আর হাঁসমারীর জলকর না ভরলেও তাদের (তুরীদের) ক্ষতিবৃদ্ধি নেই—এবার রুখে দাঁড়িয়েছে তারা। ওদিকে সাঁওতালেরা বুনো শুয়োর মারতে শিখছে —টুলকু সাঁওতালের ছেলে ধীরু সাঁওতাল ধানসিঁড়ির আলপথে খেলা করে বেড়ানো কেউটের শিশুর মতো বিষ সঞ্চয় করছে আস্তে আস্তে। আর তাদের সঙ্গে আজ বাহু মিলিয়েছে ডুবার ঘোষেরা—বাজের মতো লাঠির মুখে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে লোহাপেটা জোয়ান জটাধর সিংয়ের ইস্পাতী মাথাটা।[৯৩]

জমিদার ফতে শা পাঠানের দাঙ্গা-হাঙ্গামার ব্যাপারে প্রচণ্ড উৎসাহ। কুমার ভৈরব নারায়ণের সঙ্গে তার দেওয়ানি-ফৌজদারি মামলা-মোকদ্দমা চলছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় লাঠি ধরবার জন্য 'বাদিয়া মুসলমান' নামে এক শ্রেণির দুর্দান্ত লোককে নামমাত্র খাজনার বিনিময়ে পতিত জমিতে আশ্রয় দিয়েছে। তারাও দিন দিন শ্রেণিসচেতন হয়ে উঠছে। শোষকের হাতিয়ার হিসেবে কালু বাদিয়ার ছেলে হোসেনের বিক্ষুব্ধ মনের প্রকাশ :"আমরা ছোটলোক, আমরা আছি কেবল খুন দেবার বেলায়, জেলে যাবার বেলায়, আর উপোস করার বেলায়।[৯৪]

শোষিত শ্রেণির সচেতনতা ও ঐক্যকে বিনষ্ট করবার লক্ষ্যে মুসলিম লিগের উগ্রপন্থী কর্মী ইসমাইলের পরামর্শে পালনগরের টিলায় সাঁওতালদের কালীর থানে মসজিদ নির্মাণ করে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধিয়েছে ফতে শাহ্। কিন্তু আলিমুদ্দিন মাস্টার ও হোসেন তাদের আত্মঘাতী দাঙ্গা রুখতে জন ত্রিশেক ধাওয়া-বাদিয়া নিয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়েছে।

আলিমুদ্দিন মাস্টার jvjgwU অংশের একটি উজ্জ্বলতম চরিত্র। ফতে শাহ্ মুসলিম লিগের নেতৃত্ব নিতে চেয়েছে। কিন্তু আলিমুদ্দিন এ বিষয়ে সংশয়াকীর্ণ। যে আদর্শ রাষ্ট্র পাকিস্তানকে সে মনে মনে লালন করে তার নেতৃত্ব আলিমুদ্দিন নারীলোলুপ, শঠ, ধূর্ত, অত্যাচারী জমিদারদের হাতে দিতে রাজি নয়। নিচের অংশটি লক্ষণীয় :

...এদের সঙ্গেই আবার শুরু হবে নতুন করে লড়াইয়ের পালা। সে লড়াইয়ের জন্যে মন তৈরিই আছে আলিমুদ্দিন মাস্টারের। এতদিন ধরে সত্যাগ্রহের কঠিন দীক্ষা তো তাঁর ব্যর্থ হয়নি। কোনো অন্যায় সহ্য করব না, কোনো ফাঁকি বরদাস্ত করব না। ইংরেজের কাছ থেকে দেশকে যদি ফিরিয়ে আনতে পারি, তাহলে তাকে ফের তুলে দেব না ফতে শা পাঠানের হাতে! শাহী আমলের মোহ আর নেই, প্রতিষ্ঠা করব দীন-দুনিয়ার মানুষের রাজত্ব।[৯৫]

সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যেতে পারে, বঙ্কিমের উপন্যাসে যে প্রশ্নবিদ্ধ বিভাজিত জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল, বোধের রাজনীতিতে তা ছিল রবীন্দ্রনাথের বিপরীত। তারাশঙ্করের উপন্যাসে রাজনীতি হয়েছে সমাজনীতি ও অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। গ্রামীণ অর্থনীতির অনড় ব্যবস্থা ব্রিটিশদের অভিঘাতে পরিবর্তিত হয়েছিল কীভাবে এবং নব্য শ্রমিকশ্রেণির জাগরণের মধ্যদিয়ে তাদের মাঝে যে রাজনৈতিক বোধের জন্ম হচ্ছে তার বিশদ বিবরণ শিল্পরূপ পেয়েছে তাঁর উপন্যাসে। উপনিবেশিত ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক সংকট-বাস্তবতা সৃষ্টি হচ্ছে তার স্বরূপটা কী, রাজনীতির সঙ্গে মানুষ কীভাবে সম্পৃক্ত হয় এবং প্রত্যাশিত বাস্তবতায় গণশক্তির ঐক্যবদ্ধ রূপ-চিত্রায়ণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মৌল প্রবণতা। জনসম্পৃক্তি, শ্রেণি অবস্থান ও পুঁজিবাদী সমাজবাস্তবতাকে তিনি মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। ঔপনিবেশিক পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থনৈতিক মুক্তি তথা মার্কসীয় তত্ত্বকেই রাজনীতির বীক্ষণতত্ত্ব হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সতীনাথ ভাদুড়ী গণআন্দোলনের সঙ্গে অন্ত্যজ শ্রেণিকে সম্পৃক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় তাঁর রাজনীতি-অবলম্বী উপন্যাসসমূহে, উপনিবেশিত ভারতীয় রাজনীতির মধ্যে যে প্রতারণা,

Dhaka University Institutional Repository

ফাঁকি, লোভ ও অন্তর্কলহ এবং ভ্রান্তিগুচ্ছ সেসব নিরাসক্তভাবে, নিষ্ক্রিয় দর্শক হিসেবে অবলোকনের চেষ্টা করেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মার্কসীয় দীক্ষা ও জীবনবীক্ষা অর্জন করেন পারিবারিকভাবে। তৎকালীন সমসময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতার ত্রিধাবিভক্তি—অতি মার্কসবাদ, বিপ্লবী রাজনীতি, মধ্যপন্থা হিসেবে গান্ধীবাদে আস্থা-অনাস্থা তাঁর উপন্যাসে মূর্ত হয়েছে। মার্কসীয় দর্শন-পরিস্রুত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মানবসমাজের ক্রমবিকাশের কথা বলার পাশাপাশি এটাও বলেছেন যে সার্বিক গণ-আন্দোলনের মধ্যদিয়েই আমাদের দেশ মুক্ত হতে পারে কিন্তু ক্রমাগত সাংগঠনিক অন্তঃসংঘাতে, তা বারংবার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত বিভিন্ন চরিত্রের স্মৃতিচারণের মধ্যদিয়েই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ সত্য প্রকাশ করেছেন।

চল্লিশের দশক থেকে আশির দশকের ভারতীয় রাজনীতির পটভূমি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কংগ্রেসের নেতৃত্বে আগস্টের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টির ব্রিটিশ পক্ষ সমর্থন, মুসলিম লিগের অবস্থান, মন্বন্তর, ছেচল্লিশের হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, ভারত বিভক্তি-উত্তর কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনিকরণ, নকশালপন্থী সশস্ত্র বিপ্লব, শ্রেণিশত্রু খতম ইত্যাদি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সমরেশ বসু জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন বস্তিবাসী, শ্রমজীবী ও শ্রমিকসংগঠক হিসেবে; কারারুদ্ধ কমিউনিস্ট কর্মী হিসেবে অনুধাবন করেছেন পার্টির কর্তৃত্ববাদ, অন্তর্বিরোধ ও বিভক্তি; ক্রমশ বিকশিত হয়েছেন সাহিত্যিক হিসেবে। তিনি ব্যক্তিজীবনের শুরু থেকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন মধ্যবিত্ত মন-মনন-মানসিকতা ও মূল্যবোধকে। সঙ্গত কারণেই দেশ-কাল-রাজনীতির ভিন্ন মাত্রা, গভীরতা ও বিস্তার ঘটেছে সমরেশ বসু প্রণীত উপন্যাসে।

তথ্যনির্দেশ

১ পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, Dcb¨vm i vR‰bwZK, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯১, পৃ.১১

২ Picaresque novel (Sp *picaro* 'rogue') It tells the life of a knave or picaroon who is the servant of several masters. Through his experience this picaroon satirizes the society in which he lives. The picaresque novel originated in 16th c.Spain, the earliest example being the anonymous *Lazarillo de Tormes* (1553). The two most famous Spanish authors of picaresque novels were Mateo Aleman who wrote *Guzman de Alfarache* (1599-1604) and Francisco Quevedo who wrote *La vida del Buscon* (1626). Both books were widely read in Europe. Other picaresque novels included Thomas Nashe's *The Unfortunate Traveller* (1594), Lesage's *Gil Blas* (1715), Defoe's *Moll Flanders* (1722), Fielding's *Jonathan Wild* (1743), and Smollett's *Roderick Random* (1748). A more recent example is Thomas Mann's unfinished *Confessions of Felix Krull* (1954). The German term for this kind of story is *Rauberroman*. —J.A. Cuddon, *A DICTIONARY OF LITERARY TERMS,* Penguin Books Ltd : England 1982, Reprinted 1984, p.505

৩ "From the picaresque to the social novel of the nineteenth century there is a major shift in emphasis. Where the picaresque tale had reflected a gradual opening of society to individual action, the social novel markted the consolidation of that action into the political triumph of the merchant class ; and where the rogue-hero had explored the various levels of society with a whimsical curiosity (for he was not yet committed to the idea of life *within* society), the typical hero of the nineteenth century novel was profoundly involved in testing himself, and thereby his values, against both the remmants of aristocratic resistance and the gross symbols of the new commercial world that offended his sensibility." —Irving Howe : *Politics and the Novel*, A Horizon Press Book : New York, First Printing march 1957, p.18

Dhaka University Institutional Repository

৪ মার্কস-এঙ্গেলস, c_g fviZxq ¯vaxbZv h×, প্রগতি প্রকাশন : মস্কো ১৯৭১, পৃ.১৬-১৮

৫ ভীষ্মদেব চৌধুরী, Zvivk¼i e‡›'¨vcva¨v‡qi Dcb¨vm mgvR I ivRbxwZ, বাংলা একাডেমী : ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃ.৫

৬ রফিকউল্লাহ খান, evsjv‡'‡ki Dcb¨vm : welq I wkíi¡c, বাংলা একাডেমী : ঢাকা, জুন ১৯৯৭, পৃ.৪

৭ evsjv‡'‡ki Dcb¨vm : welq I wkíi¡c, প্রাগুক্ত, পৃ.৪

৮ সুপ্রকাশ রায়, fvi‡Zi KIK we‡'vn I MYZwšK msMvg, ডি এন বি এ ব্রাদার্স : কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৮৯

৯ সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' Avb›'gV উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (চৈত্র ১২৮৭—জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯)। ১৮৮২ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১০ যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পাদিত), e¼g iPbvejx (প্রথম খণ্ড : সমগ্র উপন্যাস), পঁচিশতম মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ : কলিকাতা আশ্বিন ১৪২৩, পৃ.৭২৫

১১ Dcb¨vm ivR‰bwZK, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫

১২ e¼g iPbvejx, দ্বিতীয় খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ : কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৭৬, পৃ.২৮৭

১৩ সৈয়দ আকরম হোসেন, ie›'bv‡_i Dcb¨vm †PZbv‡jvK I wkíi¡c, ধ্রুবপদ : ঢাকা ২০১৭, পৃ.১৬৫

১৪ †Mviv উপন্যাস প্রবাসী পত্রিকায় ১৩১৪ সালের ভাদ্র হতে ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিত হয়ে ১৩১৬ সালের ফাল্গুনে (ফাল্গুন সংখ্যায় দুই দফায় মুদ্রিত) এই উপন্যাস সমাপ্ত হয় এবং ১৩১৬ সালেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৫ শহীদ ইকবাল, ivR‰bwZK †PZbv : evsjv‡'‡ki Dcb¨vm (194 ü◊95), সাহিত্যিকা : ঢাকা ২০০৩, পৃ.৪২

১৬ †Mviv, রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী (সুলভ সংস্করণ) : কলকাতা পৌষ ১৪১০, পৃ.৬৬৪

১৭ †Mviv, প্রাগুক্ত, পরিশিষ্ট, পৃ.৬৬৫

১৮ N‡i-evB‡i ১৩২২ সালে (বৈশাখ—ফাল্গুন) 'সবুজপত্রে' মুদ্রিত হয় এবং ১৩২৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৯ ie›'bv‡_i Dcb¨vm †PZbv‡jvK I wkíi¡c, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৩

২০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, N‡i-evB‡i, নিখিলেশের আত্মকথা ৫, ie›'-iPbvejx, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী : কলকাতা, পৌষ ১৪১০, পৃ.৫৪৯

২১ ie›'bv‡_i Dcb¨vm †PZbv‡jvK I wkíi¡c, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৫

২২ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪১ সালে।

২৩ দ্রষ্টব্য : Dcb¨vm ivR‰bwZK, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮-৮৪

২৪ c‡_i 'vex উপন্যাসটি 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার ১৩২৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৩০ সালের বৈশাখ, আষাঢ়—ভাদ্র, অগ্রহায়ণ —ফাল্গুন, ১৩৩১ সালের জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ, মাঘ, ১৩৩২ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, কার্তিক—ফাল্গুন ও ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালের ৩১ আগস্ট (ভাদ্র ১৩৩৩)। c‡_i 'vex শরৎচন্দ্রের বহুল-আলোচিত রাজনৈতিক উপন্যাস যে কারণে এটি ব্রিটিশ রাজরোষের শিকার হয়ে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।

২৫ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, c‡_i 'vex, kir-iPbvewj, চতুর্থ খণ্ড, ঐতিহ্য : ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০৫, পৃ.১৭৮-১৭৯

২৬ c‡_i 'vex, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

২৭ c‡_i ‘vex, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৯

২৮ c‡_i ‘vex, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৮

২৯ উদ্ধৃত : Dcb¨vm ivR‰bwZK, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৬

৩০ রীণা ভৌমিক : শরৎচন্দ্র ও ভারতবর্ষের বিপ্লব আন্দোলন, শরৎ স্মারক গ্রন্থ, কলকাতা : ১৩৮৩, পৃ.৩৬

৩১ c‡_i ‘vex, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৩

৩২ সাময়িকপত্রে প্রথম প্রকাশ ১৯২৯—৩০ , গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে।

৩৩ Zvivk¼i e‡›‘¨vcva¨v‡qi Dcb¨vm mgvR I ivRbxwZ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৪

৩৪ avÎx‡‘eZv-র প্রথম কিস্তি ‘জমিদারের মেয়ে’ শিরোনামায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ‘বঙ্গশ্রী’ পত্রিকার ১৩৪১ বঙ্গাব্দের মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদকের পরিবর্তন ঘটলে তারাশঙ্কর ‘বঙ্গশ্রী’তে ধারাবাহিক এই রচনার প্রকাশ বন্ধ করে দেন। কয়েক বছর পর সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ‘শনিবারের চিঠি’তে (শ্রাবণ ১৩৪৫—ভাদ্র ১৩৪৬) ‘জমিদারের মেয়ে’ “নব পরিকল্পনা ও কলেবরে” avÎx‡‘eZv নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

৩৫ Kwj›‘x প্রথম ধারাবাহিকভাবে ‘প্রবাসী’ পত্রিকার বৈশাখ ১৩৪৬ সংখ্যা থেকে ভাদ্র ১৩৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ভাদ্র ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে কলকাতার কাত্যায়নী বুক স্টল থেকে Kwj›‘x গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে।

৩৬ MY‡‘eZv অংশের গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৪৯ ; আর cÂMvg অংশের গ্রন্থাকারে প্রথম আত্মপ্রকাশ মাঘ ১৩৫০ বঙ্গাব্দে।

৩৭ ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

৩৮ ১৯৭০ সালে গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে।

৩৯ “‘আনন্দমঠ’ থেকে ‘ধাত্রীদেবতা’ : নায়কের জন্মকথা”, শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, Zvivk¼i : e¨w³Z I mwnZ¨, প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি : নতুন দিল্লী ২০০১, পৃ.২৪৫

৪০ সজনীকান্ত দাস ‘পরিচয়’ পত্রিকায় প্রদত্ত একটি গ্রন্থপঞ্জিতে (পৌষ ১৩৬৩)-এর প্রকাশকাল ৯ জুলাই ১৯৪০ বলে উল্লেখ করেছেন। mniZjx প্রথম পর্ব গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’-র ১৩৪৬ সালের (১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দ) শারদীয় সংখ্যায় প্রথম মুদ্রিত হয়। mniZjx দ্বিতীয় পর্বের গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল, সজনীকান্ত দাসের অনুমান অনুসারে ১৯৪১। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে অধুনালুপ্ত ‘পত্রিকা’ নামক একটি মাসিকপত্রে আট কিস্তিতে (কার্তিক ১৩৪৬ থেকে আশ্বিন ১৩৪৭) ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়।

৪১ ‘cY উপন্যাস ‘প্রভাতী’ পত্রিকায় ‘জাগো জাগো’ নামে বৈশাখ ১৩৪৯ (২য় বর্ষ ১১শ সংখ্যা) থেকে আষাঢ় ১৩৫০ (৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা) পর্যন্ত মুদ্রিত হয়। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় আষাঢ় ১৩৫২ (জুন-জুলাই ১৯৪৫)।

৪২ wPý উপন্যাস ‘দৈনিক বসুমতী’ পত্রিকার ১৩৫৩ নববর্ষ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় মাঘ ১৩৫৩, জানুয়ারি ১৯৪৭-এ।

৪৩ মতিলাল রায় সম্পাদিত ‘প্রবর্তক’ পত্রিকার ২৬শ বর্ষের কয়েকটি সংখ্যায় অসম্পূর্ণভাবে পাঁচ কিস্তিতে (১৩৪৮-এর বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ) Av‘v‡qi BwZnvm উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। আনুমানিক ১৯৪৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

৪৪ Rxqš¿ উপন্যাস ‘পরিচয়’ পত্রিকায় মোট ২২ কিস্তিতে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় আষাঢ় ১৩৩৫ সালে।

৪৫ ভূঁইয়া ইকবাল (সংকলিত ও সম্পাদিত), gwbK e‡›‘¨vcva¨vq; “মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাস”, সৈয়দ আজিজুল হক, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০০১, মাওলা ব্রাদার্স : ঢাকা, পৃ.৩৮৩

৪৬ wPý, gwbK-iPbvewj, প্রাগুক্ত, ঐতিহ্য : ঢাকা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০৫, পৃ.১৭০

Dhaka University Institutional Repository

৪৭ wPý, gwbK-iPbvewj, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৯

৪৮ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : wPý, gwbK-iPbvewj পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪০

৪৯ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, Rxqš Í, gwbK-iPbvewj ষষ্ঠ খণ্ড, ঐতিহ্য : ঢাকা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০৫, পৃ.৯৬

৫০ ¯vaxbZvi mv‘ উপন্যাসটি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় জুন ১৯৫১ সালে। ঐতিহ্য প্রকাশিত gwbK-iPbvewj সপ্তম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

৫১ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ¯vaxbZvi ¯v‘, gwbK-iPbvewj সপ্তম খণ্ড, ঐতিহ্য : ঢাকা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০৫, পৃ.৩৬৫

৫২ RvMix-র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় সমবায় পাবলিশার্স, কলিকাতা থেকে ১৯৪৫ সালের অক্টোবরে।

৫৩ †XvovB PwiZgvbm-এর প্রথম চরণ বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয় ১৩৫৬ সালের বৈশাখ মাসে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে এটি ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয় সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকায়, ১৩৫৫ সালের ১৫ জ্যৈষ্ঠ থেকে ২৬ ভাদ্র পর্যন্ত ষোলোটি সংখ্যায়। পত্রিকায় প্রকাশকালে উপন্যাসটির সম্পূর্ণ নাম ছিল ‘সটীক ঢোঁড়াই চরিতমানস’। এই উপন্যাসের দ্বিতীয় চরণ প্রকাশিত হয় ১৩৫৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। প্রকাশক ছিলেন বেঙ্গল পাবলিশার্স। দ্বিতীয় এই অংশও ক্রমশ মুদ্রিত হয় ‘দেশ ’ পত্রিকায়, ১৩৫৭ সালের ১৩ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩০ ভাদ্র পর্যন্ত সতেরোটি সংখ্যায়।

৫৪ দ্রষ্টব্য : গোপাল হালদার, mZxbv_ fv‘ox : mwnZ¨ I mvabv, অয়ন : কলকাতা ১৯৭৮, পৃ.৪৫-৫৪

৫৫ নারায়ণ চৌধুরী, “জাগরী ও ঢোঁড়াই চরিতমানস”, সুবল গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদিত), mZxbv_-¯§i‡Y, ভারতী ভবন : পাটনা-১, নভেম্বর ১৯৭২, পৃ.৯২

৫৬ RvMix, mZxbv_ MšÍvejx ১, অরুণা প্রকাশনী : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৭৬ দ্বিতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ.১০১

৫৭ RvMix, mZxbv_ MšÍvejx ১, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৮—১৪০

৫৮ RvMix, mZxbv_ MšÍvejx ১ , প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৯

৫৯ নারায়ণ চৌধুরী, “জাগরী’ ও ঢোঁড়াই চরিত মানস” সুবল গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : mZxbv_-¯§i‡Y, প্রাগুক্ত, পৃ.৯২

৬০ শঙ্খ ঘোষ।। নির্মাল্য আচার্য (সম্পাদিত), †XvovB PwiZgvbm, mZxbv_ MšÍvejx ২, অরুণা প্রকাশনী : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৭৩; দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ১৯৭৩, পৃ.১২৪

৬১ অরূপকুমার ভট্টাচার্য, mZxbv_ fv‘ox Rxeb I mwnZ¨, অমর্ত প্রকাশ : কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ রথযাত্রা ১৩৯১, পৃ.১৫৪

৬২ গোপাল হালদার, mZxbv_ fv‘ox : mwnZ¨ I mvabv, অয়ন : কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ.৬৩-৬৪

৬৩ mßwl উপন্যাস ১৯৪৫ সালে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বনফুল রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

৬৪ AwM প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৩৫৩ সালে ‘শনিবারের চিঠি’ মাসিক পত্রিকায়। ১৩৫৩ সালের ফাল্গুন মাসে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

৬৫ AMxki ডি.এম. লাইব্রেরী থেকে ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে (১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে) প্রকাশিত হয়। রচনাবলীর চতুর্দশ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

৬৬ সরোজমোহন মিত্র শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী (সম্পাদিত), mßwÎ, গ্রন্থাবলীর তথ্যপঞ্জী, ebdj iPbvejx পঞ্চম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ৯ ই অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ.৬২১

৬৭ mßwÎ, ebdj iPbvejx পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮১

৬৮ mßwr, ebdj iPbvejx পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৪২৫

৬৯ mßwr, ebdj iPbvejx পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬১

৭০ mßwr, ebdj iPbvejx পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬৩

৭১ mßwr, ebdj iPbvejx পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৫০৮

৭২ mßwr, ebdj iPbvejx পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫৯

৭৩ mßwr, ebdj iPbvejx পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬১-৫৬২

৭৪ ড.সরোজমোহন মিত্র শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী (সম্পাদিত), AwM, বনফুল রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ৯ ই অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ.৬১

৭৫ AwM, বনফুল রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬

৭৬ ড.সরোজমোহন মিত্র শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী (সম্পাদিত), AMxki, ebdj iPbvejx চতুর্দশ খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ৩০ শে শ্রাবণ ১৩৮৭, পৃ.৩৪

৭৭ AMxki, ebdj রচনাবলী চতুর্দশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৭

৭৮ লেখকবন্ধু গোপাল ভৌমিক 'শারদীয় দৈনিক কৃষকে' ১৩৫১ সালে প্রকাশ করেন। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ২৫ শে অগ্রহায়ণ ১৩৫১ সালে বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে। পরে আশা দেবী অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদিত) bvivqY M‡½vcva¨vq iPbvejx প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৭৯ অনুমান : ১৯৫৫ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ডি.এম.লাইব্রেরী থেকে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় পাত্র পাবলিকেশন থেকে আষাঢ় ১৩৮৪। আশা দেবী অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদিত) bvivqY M‡½vcva¨vq iPbvejx দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

৮০ wkjwjwc উপন্যাস ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৫৯ ভাদ্র, তৃতীয় আশ্বিন ১৩৬১, চতুর্থ ১৩৬৪ জ্যৈষ্ঠ, পঞ্চম আষাঢ় ১৩৬৮ এবং প্রচ্ছদপট সমেত নতুন পরিবর্তন ১৯৭৭-এ। পরে আশা দেবী অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত bvivqY M‡½vcva¨vq iPbvejx তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৮১ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় jvjgwU উপন্যাস। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স থেকে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে আশা দেবী অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদিত) bvivqY M‡½vcva¨vq iPbvejx চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৮২ "আমার ভাই নারায়ণ", শেখর গঙ্গোপাধ্যায়, তাপস ভৌমিক, সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থপ্রতিম বর্মণ (সম্পাদিত) : 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক্ শারদ সংখ্যা, পৃ.১৬৫

৮৩ আশা দেবী অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, wZwgi-Zx_, bvivqY M‡½vcva¨vq iPbvejx প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, রথযাত্রা ১৩৮৬, পঞ্চম মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬, পৃ.৭৪

৮৪ wZwgi-Zx_, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৩

৮৫ wZwgi-Zx_, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮

৮৬ আশা দেবী অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : gnvb›'v, bvivqY M‡½vcva¨vq iPbvejx দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৮৬, চতুর্থ মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০৬, পৃ.২৭৭

৮৭ আশা দেবী অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদিত), wkjwjwc প্রথম অধ্যায়, bvivqY M‡½vcva¨vq iPbvejx তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৮৭, তৃতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪০০, পৃ.৩৭৪

৮৮ fkjwjwc প্রথম অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৩

Dhaka University Institutional Repository

৮৯ wkjwjwc প্রথম অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৫

৯০ wkjwjwc প্রথম অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৯

৯১ wkjwjwc দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৮

৯২ bvivqY M‡½vcva¨vq iPbvejx, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৪

৯৩ আশা দেবী অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : jvjgwU, bvivqY M‡½vcva¨vq iPbvejx চতুর্থ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৮৭; তৃতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৪০৩, পৃ.১৮৯

৯৪ jvjgwU, প্রাগুক্ত , পৃ.২১০

৯৫ jvjgwU, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমরেশ বসুর সমসময় ও জীবনকথা

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
সমরেশ বসুর সমসময় ও জীবনকথা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর (১৯৩৯-১৯৪৫) আন্তর্দেশীয় ও দেশীয় আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্রমজটিল পটভূমিকায় বাংলা কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)-র আত্মপ্রকাশ। বিশ শতকের প্রারম্ভেই ভারতীয় কংগ্রেসের (১৮৮৫) বারানসী অধিবেশন (১৯০৫) থেকে দলটির উদারপন্থা ও চরমপন্থায় দ্বিধাবিভক্তি; 'অনুশীলন সমিতি'র (১৯০২) অন্তর্গত বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠীর কার্যক্রম; বঙ্গভঙ্গ আইন (১৯০৫) কার্যকর হওয়া; মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা (১৯০৬); বঙ্গভঙ্গ আইন রদ (১৯১১); ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লি স্থানান্তর (১৯১২); অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১); আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০)—এসব রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে উপনিবেশিত ভারতবর্ষ তখন বিক্ষুব্ধ, প্রমত্ত। সমরেশ বসুর মতো একজন সৃষ্টিময়-সংবেদনশীল সাহিত্যিক প্রতিভার পক্ষে পারিবারিক উত্তরাধিকার, জাতীয় ঐতিহ্য, সমকাল, সমাজ ও রাজনীতি থেকে কোনোভাবেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখা সম্ভব হয়নি। অনিবার্যভাবেই সমরেশ বসুকে প্রতিক্রিয়া অথবা প্রগতির যে-কোনো একটি পন্থা নির্বাচন করতেই হয়। সমরেশ বসু কৈশোর থেকেই খুঁজে নিয়েছিলেন সমসাময়িক প্রগতির দ্বন্দ্বজটিল রাজনৈতিক চলার পথ এবং সে পথেই ছিল তাঁর যাপিতজীবন, মননচর্চা ও শিল্পসাধনা।

উপনিবেশিত ও উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ তথা বাংলার রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত, মধ্যশ্রেণির বহুমুখীনতা ও সংঘাতদীর্ণ আদর্শের ভাঙাগড়ায় প্রগতিপথে স্থির থাকা ছিল এক জটিল মানসক্রিয়া। সমরেশ বসুর রাজনীতিক মননক্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য, জীবনবোধ ও শিল্পধারণার উৎস ও বিকাশ অনুধাবনের জন্য তাঁর বেড়ে-ওঠা জীবনের স্তরসমূহ উন্মোচন ও বিশ্লেষণ একান্ত জরুরি। সৃষ্টিশীল প্রতিভা নিরবলম্ব বা স্বয়ম্ভূ নয়—ঐতিহ্য, পরিবারবৃত্ত এবং উত্তরাধিকার ও সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক পরিস্থিতির মৃত্তিকা-গভীরে শেকড় সঞ্চার করেই তার উৎসারণ। কোনো শিল্পী-ব্যক্তিত্ব, এসব কারণেই, অন্তর্জগতে কখনো হয়ে ওঠে বিপন্ন, বিচূর্ণ, অস্থির; অপরপক্ষে সুস্থির থাকে সুস্থ জীবনবোধে, কিংবা বসবাস করে ধূসর আদর্শে। এই চূর্ণ-বিকীর্ণ কিংবা বিভ্রান্ত ও ক্লিষ্ট মানব-অস্তিত্বই আধুনিক কথাসাহিত্যের বিষয়; অথচ সমগ্র মানব অনুসন্ধানেই তার শিল্পসিদ্ধি। যে-কোনো সুপ্রণীত উপন্যাসই প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে আত্মজৈবনিক।[১]

এক

সমরেশ বসুর জীবন-মৃত্যু পরিসরে সাতচল্লিশ-পূর্ব ঔপনিবেশিক এবং সাতচল্লিশ-পরবর্তী উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলা বিড়ম্বিত, বিচলিত, উত্তাল ও সংঘাতজীর্ণ হয়ে উঠেছিল নিম্নলিখিত কারণে : ১. কংগ্রেসীয় রাজনীতির ত্রিদলীয় কর্মযজ্ঞ ও অন্তর্সংঘাত; ২. মার্কস্-পন্থী তথা কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন, দ্বিধা, সংকট ও নানামুখী পতন; ৩. এরই সংশ্লেষে নকশালবাড়ি আন্দোলনের উদ্ভব। ফলে রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণাবর্তে ভেঙে-পড়ল সংস্কৃতি, ব্যক্তি-অস্তিত্ব, মানবতাবাদ, 'শ্রেণিশত্রু খতম' থেকে জন্ম নিল চীনপন্থী বিপ্লবীদের লোকবিচ্ছিন্নতা।

নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য 'ক্ষমতাকেন্দ্র দখল', কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংঘর্ষ ও সংগ্রাম। যখন এই লড়াই ব্যক্তিস্বার্থ, গোষ্ঠী-স্বার্থের জন্য অনিবার্য হয়, তখন তা হয়ে ওঠে অশুভ ও বিধ্বংসী; আর যখন তা সংখ্যাগরিষ্ঠ বঞ্চিত-লাঞ্ছিত, শোষিত, অত্যাচারিত মানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তির 'উপায়' হিসেবে সংঘটিত হয় তখন তা শুভ, কল্যাণকর। কোনো রাজনৈতিক উপন্যাস কেবল ঘটনার বিবরণ নয়, সেখানে ব্যক্তিমানুষের বৃহত্তর অস্তিত্বের প্রসঙ্গ বিশেষ ও নির্বিশেষ বিষয় ও ভাষায় নির্মিত হয়। উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলার রাজনৈতিক উপন্যাস সে কারণেই দ্বন্দ্বসংকুল, শ্রেণিমানুষের সার্থকতা, পঙ্গুতা, সীমাহীন স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা, সংঘর্ষ ও বারুদ-বিস্ফোরিত সময়-বৃত্তে আবর্তিত। ভেতর থেকে যাঁরা এই অস্তিত্ব-জট বুঝে নিতে চাইলেন তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কথাকার হলেন সমরেশ বসু। তিনি অত্যন্ত জটসংকুল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে একেবারে ভেতর থেকে দেখেছেন, তিনি ওই অন্তহীন জটের অংশী ছিলেন, তাঁর রচনার বিশেষ গুণ অবশ্যই প্রত্যক্ষতা। কারো স্বপ্ন ও স্বপ্ন ভাঙার ইতিহাস বলতে গেলে স্বপ্নের চেহারা, স্বরূপ, স্বপ্নের সঙ্গে স্বাপ্নিকের অন্তর্বন্ধনের ইতিহাস জানতে হয়।[২] সেদিক থেকে বলা যায়, বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস নতুনভাবে লেখা শুরু হয় সত্তরের দশকে।

এই পরিপ্রেক্ষিত ও বীক্ষণবলয় থেকে বলা যায়, বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের অন্যতম স্থপতি সমরেশ বসু। বাংলা সাহিত্যে সমরেশ বসু নামে যাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা, 'কালকূট'[৩] ও 'ভ্রমর'[৪] ছদ্মনামেও যিনি সুপরিচিত তাঁর প্রকৃত নাম সুরথনাথ, ডাক নাম ছিল 'তড়বড়ি'—দুটো নামই আজ বিস্মৃতপ্রায়। "আদাব" গল্প প্রকাশের পূর্বে বন্ধু ও শ্যালক দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখক-নাম দেন সমরেশ বসু।[৫] সমরেশ বসু ১৯২৪ সালের ১১ ডিসেম্বর বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের রাজানগর গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোহিনীমোহন বসু ছিলেন পেশাদার প্রতিকৃতি-অঙ্কনশিল্পী, মাতা শৈবলিনী ব্রতকথায় পারদর্শী। পাঠ্য বই অপেক্ষা ছন্নছাড়া, বহির্মুখী জীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল আশৈশব। সমরেশ বসুর শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি হয় ঢাকা শহরের লক্ষ্মীবাজারের গিরিশ মাস্টারের পাঠশালায়। স্কুল পালিয়ে শ্মশানে গিয়ে বসে থাকা, কৌতূহলবশত শিয়ালের গর্ত দিয়ে লাশঘরে ঢোকা; কী এক আকর্ষণে বুড়িগঙ্গায় বহমান নৌকা-লঞ্চের দিকে উদাস চেয়ে থাকা; দশ বছর বয়সে সদরঘাটে কিংবা মোতিমহল সিনেমা হল ছাড়িয়ে ভিড়ের মাঝে হাত বাড়িয়ে বলা, 'বাবু একটা পয়সা দ্যান।' পরিচিতজনের কাছে ধরা পড়ে পারিবারিক বিভ্রাট। কী যে আকর্ষণ জীবনকে জানার, তা কিশোর সুরথনাথই জানে। অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের সঙ্গে তাঁর সখ্য ছিল বেশি। সহপাঠী জয়নাল, মনসুর, মোটর ক্লিনার ইসমাইল ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। সময় পেলেই বুড়িগঙ্গা তীরে ঘুরে বেড়াতেন কিশোর সুরথনাথ, দৃষ্টি থাকত বুড়িগঙ্গার দূর জলে, কখনো বা দৃষ্টি ফিরত জনস্রোতের দিকে।[৬] গেন্ডারিয়ার গ্র্যাজুয়েট স্কুলে পড়ার সময়ই তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার উন্মেষ ঘটে। শৈশবকালে সুরথনাথের শিল্পীসত্তায় 'গাহে অচিন পাখি'। নদী, নির্জনতা, দিগন্তবিস্তারী মাঠ, গা-ছমছম শ্মশান, বিচিত্র নর-নারী তাকে আকর্ষণ করত। পাঠশালার প্রথা-প্রকরণ তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। গৃহশিক্ষকের প্রশ্নের জবাবে, দশ বছর বয়সী সুরথনাথের চমৎকারী উত্তর, 'আমার রবীন্দ্রনাথ পড়তে ভালো লাগে।'[৭] তিনি কৈশোরের সারল্যে রবীন্দ্রনাথের 'অনধিকার প্রবেশ' গল্প পড়ে উৎসাহিত হয়ে একই নামে গল্প লেখেন।

১৯৩৮ সালে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় পর্যন্ত সমরেশ বসু বাস করতেন ঢাকার উপকণ্ঠে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসার হলেও সাংস্কৃতিক আবহে বেড়ে ওঠেন তিনি। পিতা মোহিনীমোহন বসু ভক্তিমূলক গান, মালসী

Dhaka University Institutional Repository

গান, পূর্ববঙ্গের প্রচলিত লোকসংগীত পরিবেশন ও ছবি আঁকায় পারদর্শী ছিলেন। কাকার হাতে আঁকা ছবিও তাঁকে আকর্ষণ করত। মায়ের মুখে শোনা নিরলংকার, আটপৌরে ভাষায় ব্রতকথার পরিণামী 'সত্যবিজয়ী' বক্তব্য সমরেশের কাছে ছিল অফুরন্ত বিস্ময়ের উৎস। সমরেশ বসু পরবর্তীতে জানান : 'একে যদি প্রেরণা বলা যায়, তবে তার পদধ্বনি যেন শৈশবেই বেজেছিল, অবচেতনে, এবং সেই সব ব্রতকথা ও কথকতার মধ্যদিয়ে। সেই হিসাবে বলতে হয়, মা ছিলেন এক নিপুণ কথাশিল্পী, কী গভীর তদ্‌গত ভাব ছিল তাঁর গল্প বলার।'[৮]

স্কুলের পড়ালেখায় অমনোযোগী সমরেশ বসু ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় বুড়িগঙ্গার নিবিড় স্নেহময় আলিঙ্গন ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটিতে গঙ্গার কোলে যান লেখাপড়ার উদ্দেশে। বড়ো দাদা মন্মথনাথ বসু ছিলেন নৈহাটি রেল স্টেশনের অ্যাসিসট্যান্ট স্টেশন মাস্টার। তাঁর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে স্কুলের পড়া ফাঁকি দিয়ে শরৎচন্দ্র ও অন্য লেখকের রচনা পাঠ করতেন তিনি এ সময় থেকেই। রেলের টিকেট কালেক্টার অসমবয়সী হামিদের সঙ্গে সংগীতসূত্রে সমরেশ বসুর সখ্য গড়ে ওঠে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সে সময়ের স্মৃতি : "সেদিন দেখেছিলাম বেশভূষায় অত্যন্ত উদাসীন গ্রাম থেকে এসেছে একটা খাঁটি 'বাঙাল'। বাঁশি বাজাতে জানে। কীর্তনীয়া ঢঙে কীর্তন গাইতে পারে, ছবি আঁকতে পটু, অভিনয়ে ওস্তাদ একটা কিশোর। সাহিত্যপাঠের সদ্য-সংগৃহীত অভিজ্ঞতা থেকে তাকে এক দিক থেকে মিলিয়ে নিতে ইচ্ছে করেছে শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথের সঙ্গে।"[৯] অষ্টম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে 'মহেন্দ্র স্কুল' ছেড়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ততদিনে নৈহাটিতে রোম্যান্টিক সুরথনাথ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন হাতে লেখা পত্রিকা 'বাণী', এবং বন্ধুত্ব হয়েছে আর এক রোম্যান্টিক দেবশঙ্করের সঙ্গে।[১০]

সমরেশ বসু ঢাকায় ফিরে ঢাকেশ্বরী কটন মিলে শিক্ষানবিশ (ট্রেনি) হিসেবে যোগ দেন। এ কর্মস্থলকে বলা যেতে পারে সমরেশ বসুর 'ধাত্রীমাতা', যাকে কেন্দ্র করে তাঁর শ্রমিক-মজুরশ্রেণির সঙ্গে সমমর্মী চেতনার বিকাশ ঘটেছিল। ১৯৪০ সালে ষোলো বছর বয়সে দ্বিতীয় বার নৈহাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন সমরেশ বসু। আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়া হল না। স্কুল নেই, চাকরিতে অনুৎসাহী সমরেশ। কলকাতায় নরেশ মিত্রের 'নাট্য নিকেতনে' (পরে যার নাম বদলে হয়েছিল বিশ্বরূপা) নাটকে অভিনয় করার পাশাপাশি, শুরু করেন গান শোনা ও গান শেখা। এমনিভাবে অতিক্রান্ত হয় সমরেশ জীবনের তিনটি বছর।[১১]

১৯৪১ সালে স্বামীর অত্যাচারে, বন্ধু দেবশঙ্করের দিদি পিতৃগৃহে বসবাসরত, স্বামীবিচ্ছিন্ন বাইশ বছরের গৌরীর সঙ্গে সমরেশ বসুর পরিচয় হয়। গৌরীরা কাঁঠালপাড়ায় থাকতেন। জন্ডিস ও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত সমরেশ বসু গৌরীর আন্তরিক পরিচর্যায় সুস্থ হয়ে ওঠেন। চিত্রশিল্পী সমরেশের আঁকা ছবির অনুরাগী দর্শক, লেখক সমরেশের লেখার একনিষ্ঠ পাঠক ও সমালোচক ছিলেন গৌরী। সমরেশ বসুকে ক্রমাগত 'হয়ে উঠতে' প্রাণিত করতেন তিনি। এভাবেই গৌরীর সঙ্গে সমরেশের গড়ে ওঠে অন্তর্নিবিড় প্রণয়। সেই বাইশ বছর বয়সী গৌরীকে বিয়ে করে আঠারো বছর বয়সী, স্বজন-পরিত্যক্ত দুঃসাহসী সমরেশ নৈহাটি ছেড়ে চার মাইল দূরবর্তী আতপুরের জগদ্দল এলাকায় পাটকলের আবদুল মিস্তিরির বস্তিতে গিয়ে শুরু করেন দাম্পত্যজীবন।[১২] সমরেশ বসু মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ—সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিকে তুচ্ছ করে অস্তিত্বের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে চাইলেন, তার দায়ভার নিজেই গ্রহণ করলেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি প্রত্যক্ষ করেন পাটকলের শ্রমিক-মজুরদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম, জীবনযুদ্ধ। সংসারের অনিবার্য তাগিদে সমরেশকে হতে হল পোলট্রি ফার্মের ডিম ও আনাজের সাপ্লাইবাবু। সে কাজও টেকেনি বেশি দিন। এ সময়ে তিনি জীবনের রূঢ়বাস্তবতার মুখোমুখি হন। সমরেশ বসু এ সময়ে ঘুরেছেন অনেক, মিশেছেন বিচিত্র মানুষের সঙ্গে। তাদেরই মধ্যে জগদ্দলের সত্যভূষণ দাশগুপ্ত একজন, বয়স একুশ-বাইশ

Dhaka University Institutional Repository

বছর, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে স্নাতক। আতপুরের জমিদার বাড়ির গৃহশিক্ষকতার কারণে, তিনি পরিচিত ছিলেন সত্য মাস্টার নামে। সমরেশ বসুর চতুর্দিকে সমস্যাসংকুল গাঢ়তম অন্ধকার। সপ্তাহে তিন দিনের বেশি আহার নেই। সমরেশ বসুর বস্তিজীবনের বিচিত্রঅভিজ্ঞতা ও টিকে-থাকার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম থেকেই উৎসারিত হয়েছে উপন্যাস we wU †iv‡Wi av‡i (১৯৫২)।

আলোচ্য কালপরিসর ভারতীয় তথা বাংলার রাজনৈতিক-আদর্শিক সংঘাতে ভাঙাগড়ার উত্তেজনায় উদ্বেলিত। ১৯৩৯-এর ২৯ জানুয়ারি ত্রিপুরার অধিবেশনে পট্টভি সীতারামায়াকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে সুভাষচন্দ্র বসু দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সঙ্গে নীতিগত বিরোধের ফলে সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দল থেকে পদত্যাগ করেন। এবং ১৯৩৯ সনের ৩ মে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পার্টি গঠন করেন। ১১ আগস্ট ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯। অন্যদিকে কমিউনিস্ট নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায় ১৯৪০-এর ২২ ডিসেম্বর গঠন করেন 'র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি'। ১৯৪১-এর ১৭ জানুয়ারি, গৃহবন্দি সুভাষ বসু পুলিশের চোখ এড়িয়ে ছদ্মবেশে গৃহত্যাগ করেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হকের নির্দেশ অমান্য করে 'মুসলিম লীগ' সারা বাংলায় পালন করে 'পাকিস্তান দিবস' (২৩ মার্চ ১৯৪১)। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ মার্চ সারা বাংলায় পালিত হয় 'চীনা দিবস'। মার্চ ৮, ঢাকার মিছিলে বিরুদ্ধ রাজনৈতিক দলের আক্রমণে নিহত হন তরুণ কথাশিল্পী ও কমিউনিস্ট কর্মী সোমেন চন্দ।[১৩] মার্চ মাসের ২৮ তারিখে সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলকাতায় 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৪]

১৯৪২-এর ১ এপ্রিল প্রকাশিত হয় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ'। ১৯৪২ সালে সমরেশ বসু জগদ্দল অঞ্চলের কমিউনিস্ট পার্টির সাম্যবাদী শ্রমিকনেতা সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তের (সত্য মাস্টার) মাধ্যমে বামপন্থী রাজনীতিতে দীক্ষিত হন। সত্য মাস্টারের উদ্‌যোগ ও পরামর্শে বস্তি ছেড়ে আতপুরের তরফদার পাড়ায় ঘরভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করেন সমরেশ বসু। এখানে অধিকাংশ ছিলেন চটকলের মিস্ত্রি। এ বছরের শেষের দিকে ডিসেম্বর মাসে, সত্যপ্রসন্নের চেষ্টায় ইছাপুর ফ্যাক্টরি ইনস্পেকটরেট অব স্মল আর্মস ডিপার্টমেন্টের ড্রয়িং অফিসে ট্রেসারের চাকরি নেন। এ সময়েই মার্কসবাদী পত্রিকা 'জনযুদ্ধ'-র সঙ্গে পরিচয় কারিয়ে দেন সত্য মাস্টার।[১৫] এ পত্রিকার সূত্রে সমরেশ বসু কমিউনিস্ট পার্টির সান্নিধ্যে আসেন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বছর ইছাপুর ফ্যাক্টরিতে কর্মরত ছিলেন তিনি। এখানে অফিসঘরে বসে একুশ বছর বয়সী সমরেশ বসু রচনা করেন bqbc‡ii gwU (১৯৪৫-৪৬) উপন্যাস।

রাজনীতিঘনিষ্ঠ সমরেশের পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কংগ্রেস রাজনীতির অন্তর্ঘাত, বিরোধ ও বিচ্ছেদ এবং কমিউনিস্ট পার্টির বিতর্কিত সিদ্ধান্ত ইত্যাদি—সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে নিজেকে মানসিকভাবে বিশ্লিষ্ট রাখা সম্ভব ছিল না। ১৯৪২-এর ১৪ জুলাই সাতশো শব্দ সংবলিত ইংরেজদের উদ্দেশে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব জাতীয় কংগ্রেস কমিটি প্রথম প্রচার করে। এখান থেকেই 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সূচনা (৮ আগস্ট ১৯৪২)। আগস্ট আন্দোলনের প্রবল ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলায়।[১৬] ১৯৪২-এর ২৯ সেপ্টেম্বর মহিশদল পুলিশ-থানা আক্রমণকালে গুলিতে নিহত হন বিপ্লবী আশুতোষ কুইলা। তমলুক থানা ও আদালত দখলের জন্য শোভাযাত্রা পরিচালনার সময় নারী বিপ্লবী মাতঙ্গিনী হাজরা জাতীয় পতাকা হাতে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন। হাজার হাজার প্রতিবাদী তখন কারারুদ্ধ। সারা বাংলা গণ-আন্দোলনের জোয়ারে উত্তাল, উদ্দাম। সমসময়ে মেদিনীপুরে সর্বগ্রাসী বন্যা এবং ভয়াবহ সামুদ্রিক ঝড়ে (অক্টোবর ১৯৪২) তৎকালীন পূর্ববঙ্গে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়।

Dhaka University Institutional Repository

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক ও ধ্বংসভয় কলকাতা-চট্টগ্রামসহ বাংলার মানুষকে উদ্বাস্তুপ্রায় করে তোলে ডিসেম্বর ১৯৪২-এ। ৭-১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে জাপানি বোমারু বিমান চট্টগ্রাম বন্দরে একাধিকবার বোমা নিক্ষেপ করে।"[১৭] ১৭ ডিসেম্বর সর্বাধিনায়ক সতীশচন্দ্র সামন্তের নেতৃত্বে 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৮] ১৯৪২-এর ১৯ ডিসেম্বর কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় "ফ্যাসিবিরোধী শিল্পী-সাহিত্যিক" সম্মেলন। ২০ থেকে ২৪ ডিসেম্বরের মধ্যে কলকাতা শহরে জাপানি বোমারু বিমান মোট আটবার বোমা বর্ষণ করে।

আগস্ট আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেশের রাজনীতিতে সৃষ্টি হয় এক সংঘর্ষক্লিষ্ট ও অন্তর্ঘাতমূলক তিক্ততা। অ-কমিউনিস্টরা কমিউনিস্টদের 'ইংরেজের দালাল' আখ্যা দেয়; এবং কমিউনিস্টরা সোশ্যালিস্ট ও সুভাষ বসুর অনুসারীদের 'পঞ্চম বাহিনী' বলে চিহ্নিত করতে থাকে। ফলে উভয়ের মধ্যে গড়ে ওঠে হিংসাত্মক এক অন্তর্কলহ; এর প্রতিক্রিয়া সংক্রমিত হয় প্রজন্মপরম্পরায়।[১৯] অন্যদিকে বৃদ্ধি পায় যুদ্ধাতঙ্ক। ১৯৪৩-এর ১৫ জানুয়ারি উত্তর কলকাতার শ্রমিক বস্তিতে আবারও জাপানি বোমা বর্ষিত হয়।[২০] ১৯৪৩-এর ৫ ডিসেম্বর দুপুরে কলকাতায় পুনরায় বোমা বর্ষিত হয়। জাপানি বোমা-আতঙ্ক সারা বাংলা, দূর জেলাসমূহের জনপদকেও করে তোলে আর এক ধরনের উদ্বাস্তু ও ভীতবিহ্বল। মাদ্রাজ নৌবাহিনীর মধ্যে দেখা দেয় বিদ্রোহ (৫ আগস্ট ১৯৪৩)। বিদ্রোহ দমনের জন্য সামরিক পুলিশ বাহিনী মানকুমার বসুসহ নয়জনকে গ্রেফতার করে, এবং ১৯৪৩-এর ২৭ সেপ্টেম্বর এঁদের ফাঁসির আদেশ কার্যকর হয়। একই সময়ে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ব্যাপক শস্যহানি হওয়ায়, যুদ্ধের জন্য বিপুল রসদ-সংগ্রহের ফলে এবং জোতদার-চোরাকারবারিদের নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রে মনুষ্যসৃষ্ট এক মন্বন্তর ভয়ংকররূপে দেখা দিল। এই মন্বন্তরে বাংলায় ৩৫ থেকে ৫০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়; যার বিপুল অংশ কৃষক এবং ক্ষেতমজুর।[২১] একই সময়ে পরস্পরিতভাবে ঘটতে থাকে রাজনৈতিক ঘটনা। ১৯৪৩-এর ১৬ আগস্ট সুভাষ বসু 'আজাদ হিন্দ' ফৌজের সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর 'আজাদ হিন্দ' প্রবাসী সরকার গঠন করে তিনি তার রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন; এবং ১৯৪৩-এর ২৩ অক্টোবর ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ৩১ ডিসেম্বর 'আজাদ হিন্দ বাহিনী' আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করে। ১৯৪৪ সনের ১৮ মার্চ সুভাষ বসুর নেতৃত্বে 'আজাদ হিন্দবাহিনী' তৎকালীন বর্মা সীমান্ত অতিক্রম করে ব্রিটিশ ভারতে প্রবেশ করে; এবং পরদিন মণিপুরে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। কোহিমায় পরাজিত হয়ে পিছু হটতে শুরু করে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'।

উল্লেখিত দেশকাল পটভূমিতে ইছাপুর ফ্যাক্টরিতে চাকরি করার পাশাপাশি আতপুরের জুটমিলে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন সমরেশ বসু। সংগৃহীত হতে থাকে সমসাময়িক যুদ্ধ এবং জীবনযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকরণ। নতুন উদ্যমে হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে, ওই সব রচনায় যুক্ত হয় রাজনীতি। এ সময় সমরেশ বন্ধুবান্ধব নিয়ে গড়ে তোলেন 'উদয়ন লাইব্রেরী' নামে একটি প্রগতিশীল গ্রন্থাগার। সত্য মাস্টার সাংস্কৃতিক বিভাগের যাবতীয় দায়িত্ব দিলেন সমরেশকে বসুকে। হাতে-লেখা পত্রিকার জন্য অবিরাম লেখালেখি, ছবি-আঁকা, পোস্টার লেখা ইত্যাদি কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন সমরেশ। ইছাপুর ফ্যাক্টরির 'উদয়ন' গ্রন্থাগারে খণ্ডকালীন চাকরিতে যোগদানের ফলে, এ সময় সমরেশের কাছে উন্মুক্ত হল অধ্যয়নের নতুন নতুন বাতায়ন :

মার্ক্সবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মার্ক্সবাদী সাহিত্য পড়াশোনা করার মতো ক্ষমতা তখন ওর হয়নি, কিন্তু মার্ক্সবাদী সাহিত্য পড়াশোনা করা, বিশ্বের যাবতীয় প্রগতিশীল সাহিত্য বিশেষত ম্যাক্সিম গোর্কির লেখা বাংলা অনুবাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ইত্যাদি সমরেশের অভ্যাসে পরিণত হল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য প্রগতিশীল লেখকদের রচনার উনি তখন বিমুগ্ধ পাঠক। তারাশঙ্কর ও বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য ধ্রুপদী লেখার সঙ্গে ওঁর তখন প্রণয় জন্মেছে। তখন ওঁর

Dhaka University Institutional Repository

কাজই ছিল ডিউটি সেরে ফিরে এসে কোনোরকমে হাত-মুখ ধুয়ে একটু কিছু খেয়ে 'উদয়ন' পাঠাগারে গিয়ে হ্যারিকেনের আলোয় পড়তে বসা। এখানে বড়দার তাড়না নেই, মহেন্দ্র স্কুলের পাঠ্যসূচী নেই, এখানে আছে শুধু শিল্পীর অদম্য প্রাণ-পিপাসা। জীবনের উপকরণ খোঁজা চলে শিল্পাঞ্চলের বস্তিতে, নোংরা গলিতে, নিম্নবিত্তের অসংস্কৃত পল্লীতে, নিষিদ্ধ এলাকায়। শিল্পের প্রকরণের অনুসন্ধান দেশ-বিদেশের বরণীয় সাহিত্যিকদের স্মরণীয় রচনা-সম্ভারে। ম্যাক্সিম গোর্কি, সোলোকভ, অস্ট্রোভস্কি, ইলিয়া এরেনবুর্গ, এরিক মারিয়া রেমার্ক, লু-শ্যুন, লাও চাও যেমন একদিকে ছিলেন, অন্যদিকে ছিলেন কৃষণ চন্দর, মুনশী প্রেমচন্দ। মানিক-তারাশঙ্কর ছাড়া তিনি সুবোধ ঘোষ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পড়তেন। রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর কাছে প্রায় পরিত্যক্ত, টলস্টয় দূরে অবস্থিত বরং তাঁর মনোহরণ করেছিলেন চেখভ, জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত তাঁর বঙ্কিম দৃষ্টি নিয়ে। শুধু পাঠাগারে নয়, রাত জেগে তাঁর পড়াশোনা বাড়িতেও চলত। রাত ক্রমশ গভীর হয়ে আসে, সবাই নিদ্রিত, হ্যারিকেনের তেল ফুরিয়ে আসে। জীবন ও জগতের অনন্ত প্রশ্ন সমরেশের মস্তিষ্কে শুধু দীপ্তশিখা হয়ে বেঁচে থাকে।।[২২]

প্রকৃত অর্থে সমরেশ বসু জনসমর্থিত মার্কসবাদী বিপ্লবে আস্থা স্থাপন করেন তখন থেকেই। একই চেতনা থেকে তিনি হাতে লেখা পত্রিকার জন্য নতুন প্রেরণায় কাজ শুরু করেন। এতে তিনি বিভিন্ন লেখকের ফ্যাসি-বিরোধী, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতাবাদ, চোরাকারবারবিরোধী লেখাসমূহ প্রকাশ করেন।[২৩] ১৯৪৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রথম সন্তান বুলবুলের পিতা হন তিনি। এই সময়, ছুটির অবকাশে অথবা কাজের শেষে রাত্রে চটকলগুলোর পার্শ্ববর্তী গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়াতেন, বস্তিতে বস্তিতে যেতেন ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন ও পার্টির কাজে। এর অংশ হিসেবে তিনি নব্বই বছরের বেশি বয়সী নবকুমার দাশের কাছ থেকে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে এতদ্অঞ্চলে তৈরি-হওয়া চটকলের কাহিনি ও জীবনকথা শোনেন। প্রবৃদ্ধ নবকুমার দাশ চটকলের কাজে লেগেছিলেন পনেরো বছর বয়সে। আজীবন ছিলেন মিস্ত্রি। তাঁর শ্রুতি-অভিজ্ঞতাকে তিনি পরবর্তীকালে DËi½[২৪] উপন্যাসে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সমরেশ বসু নবকুমার দাশকেই উৎসর্গ করেন DËi½।

১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ-দেয়া সমরেশ বসু ১৯৪৪ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির 'কার্ড হোল্ডার' সদস্য, পরবর্তী কালের 'লড়াকু কমরেড'। শান্তি মুখোপাধ্যায়ের মতো ছদ্ম বিপ্লবীদের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে এবং পার্টি-নেতৃত্ব সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন ও মতান্তর প্রকাশ করে তাদের রোষানলে পড়েন তিনি। নেতৃবৃন্দের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে পার্টির অভ্যন্তর নৈরাজ্যবাদী শত্রু দ্বারা নিহত হন সত্য মাস্টার, যিনি ছিলেন সমরেশ বসুর রাজনীতির দীক্ষাগুরু, পারিবারিক জীবনের আশ্রয়স্থল ও ব্যক্তিগতভাবে সমমর্মী। তাঁর মৃত্যুতে সর্বস্বত্যাগী, দুঃখী, অসহায় ও নির্যাতিত মানুষের সঙ্গে তিনি আত্মিক বন্ধন অনুভব করেন, নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে। সমরেশের সৃষ্টিমানসে সঞ্চারিত হয় 'বেদনাময় চৈতন্য'-উৎসারিত ভিন্ন এক রাজনীতিচিন্তা ও সাহিত্যশিল্পবোধ।

১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭—উন্মাতাল ভারত তথা বাংলা। পর পর ঘটতে থাকে বিদ্যুৎবাহী সব ঘটনা; বেপথু, ঘূর্ণ্যমান পরিস্থিতির অন্তর্চাপ-বহির্চাপে যেন স্তম্ভিত চারপাশ। রাজনৈতিক নেতৃত্ব এ সময় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই কালপরিসরে সংঘটিত হয় : আজাদ হিন্দ বন্দিমুক্তি আন্দোলন (নভেম্বর ১৯৪৫); রসিদ আলি দিবস (১৯৪৬); নৌ-বিদ্রোহ (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬); সেনা ধর্মঘট (১ মার্চ ১৯৪৬), ১৯৪৬ সালের নির্বাচন; ২৯ জুলাই-এর (ডাক-তার শ্রমিক ধর্মঘটের সমর্থনে) ধর্মঘট ও হরতাল; প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস (১৬ আগস্ট); সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (আগস্ট ১৯৪৬); দেশবিভাগ (১৪/১৫ আগস্ট ১৯৪৭) এবং ক্ষমতা হস্তান্তর। কিন্তু প্রচণ্ড ভূমিকম্পের পর মাঝে মাঝে যেমন নদীর গতি পর্যন্ত পালটে যায়, তেমনি যে-খাতে সে সময় জনতার চিন্তা ও কর্ম চলছিল, যার প্রোজ্জ্বল প্রকাশ দেখা গিয়েছিল ১৯৪৫-এর নভেম্বর থেকে ১৯৪৬-এর জুলাই পর্যন্ত, সেই খাতে আর প্রবাহ যেন বইল না। হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনার আঘাতে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার ইতিহাস বিশ্রী একটা মোড় নিল। ক্রমশ ভাবনা সহজ হয়ে এল যে ধিক্কৃত দেশে একত্র শ্রমজীবী মানুষ ভাষা-ধর্ম-নির্বিশেষে স্বাধীনতা অর্জন করবে আর তার সাম্যবাদী পরিণতির দিকে অগ্রসর হবে—এমন চিন্তা দিবাস্বপ্ন। তার চেয়ে ইংরেজদের সঙ্গে আপস করে "দ্বিখণ্ডিত দেশের বিকৃত স্বাধীনতা" মেনে নেওয়া ভালো।[২৫] ১৯৪৪ থেকেই সমরেশ বসু সমসময়ের আর্থ-রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে কখনো পরোক্ষে, কখনো প্রত্যক্ষে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন।

১৯৪৬ সালে মাসিক 'পরিচয়' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা 'আদাব' ছোটগল্প প্রকাশের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দেন সমরেশ বসু।[২৬] ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দু-বাংলার বাঙালির সম্মিলিত স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের ফলে বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১) হয়, অথচ ১৯৪৬ সালে ভারতবিভাগের প্রাক্কালে গান্ধী-শরৎ বসু-মাউন্টব্যাটেনের অখণ্ড বঙ্গের প্রস্তাবের বিপরীতে, জওহরলাল-জিন্নাহ-শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জনবিচ্ছিন্ন প্রচার-প্ররোচনায় সেই বাঙালিই আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিরস্তিত্বপ্রায় হয়ে পড়ে, তারই দুঃসহ রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ 'আদাব'। মুসলমান মাঝি ও হিন্দু সুতা-মজুর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মাঝখানে পড়ে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে ডাস্টবিনের দু-পাশে আত্মগোপন করে। পারস্পরিক পরিচয়ের সংশয় ও অবিশ্বাস অতিক্রম করে তাদের দুজনের কথোপকথনে তৎকালীন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে :

"আইচ্ছা...মাঝি এমনভাবে কথা বলে যেন সে তার কোন আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে।—আইচ্ছা কইতে পারনি—এই মাই'র-দই'র কাটাকুটি কিয়ের লেইগা?

সুতা-মজুর খবরের কাগজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, খবরাখবর সে জানে কিছু। বেশ একটু উষ্ণকণ্ঠেই জবাব দিল সে, দোষ তো তোমাগো ওই লীগওয়ালাগোই। তারাই তো লাগাইছে হেই কিয়ের সংগ্রামের নাম কইরা।

মাঝি একটু কটূক্তি করে উঠল— হেই সব আমি বুঝি না। আমি জিগাই মারামারি কইরা হইব কি? তোমাগো দু'গা লোক মরব, আমাগো দু'গা মরব। তাতে দ্যাশের কি উপকারটা হইব?

আরে আমিও তো হেই কথাই কই। হইব আর কি, হইব আমার এই কলাডা—হাতের বুড়ো আঙুল দেখায় সে।—তুমি মরবা, আমি মরুম, আর আমাগো পোলামাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেরাইব। এই গেল-সনের 'রায়টে' আমার ভগ্নিপতিরে কাইটা চাইর টুকরা কইরা মারল। ফলে বইন হইল বিধবা আর তার পোলামাইয়ারা আইয়া পরল আমার ঘারের উপুর। কই কি আর সাধে, ন্যাতারা হেই সাততলার উপুর পায়ের উপুর পা দিয়া হুকুমজারী কইরা বইয়া রইল আর হালার মরতে মরলাম আমরাই।

মানুষ না, আমরা য্যান্ কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি; নাইলে এমুন কামরা-কামরিটা লাগে কেম্‌বায়? নিষ্ফল ক্রোধে মাঝি দু হাত দিয়ে হাঁটু দুটোকে জড়িয়ে ধরে।"[২৭]

উত্তরকালের সাহিত্য সমালোচক বন্ধু সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'আদাব' গল্পের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং তাঁর পরামর্শ ও উৎসাহে সমরেশ বসু তেভাগা আন্দোলনের (১৯৪৬) পটভূমিকায় লেখেন 'প্রতিরোধ' গল্প, যেটি রুশ ও চেকভাষায়ও অনূদিত হয়। এ সময় থেকেই তিনি বামপন্থী প্রগতিশীল লেখক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যকার অর্থনৈতিক পরস্পর নির্ভরশীলতার ভিত্তি ভেঙে পড়ে। উদ্বাস্তু সংকটের পাশাপাশি বেড়ে যায় দারিদ্র্য, সাধারণ মানুষের জীবনমান হয়ে পড়ে নিম্নমুখী। সবশেষে মাউন্টব্যাটেন-নেহেরু-জিন্নাহ পরিকল্পনাপ্রসূত বিভক্ত স্বাধীনতা, নেতৃত্ব-প্রতারিত জনসমাজের কাছে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। কমিউনিস্ট মতাদর্শ লালনকারী জনগণের কাছে দেশীয় শাসকবৃন্দ ব্রিটেনের আধিপত্যপ্রতিষ্ঠাকামী বুর্জোয়া বলে পরিচিতি পেয়েছে। তাদের বিশ্বাস ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক

Dhaka University Institutional Repository

বিপ্লব ধ্বংসের জন্যই কংগ্রেস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। বামপন্থীদের মনোভাব ছিল—বিপ্লবসাধনের জন্য কংগ্রেসের বিরোধিতা ও তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে 'প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র'[২৮] প্রতিষ্ঠা করা।

এ উদ্দেশ্যে তারা "ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়"—নীতিকে ধারণ করে অগ্রসর হয়। তাদের সহায়কশক্তি হিসেবে কাজ করেছে ভারতীয় সাধারণ বাঙালি যারা কংগ্রেসের ভূমিকা দেখে রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। স্বাধীনতার ঠিক পরেই অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানায় কৃষকদের সশস্ত্র জনযুদ্ধ (১৯৪৬-৫১) এক যুগান্তকারী ঘটনা। সেই ডাকেই বাংলাদেশের কৃষকরা মাঠে মাঠে সৃষ্টি করে চলেছিল তেভাগা আন্দোলনের পরিস্থিতি। এ পরিস্থিতিকে কাঙ্ক্ষিত রূপ দিতে চেয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি। ভারতের সর্বত্র দৃশ্যমান সংগ্রামগুলোকে ব্যাপক আকারে রূপ দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে তেলেঙ্গানা, তেভাগার লড়াইগুলোকে সংগঠিত করার দিকে মনোযোগী হতে ঘোষণা দেয় পলিট ব্যুরো। ইতোমধ্যে রাশিয়ায় জোসেফ স্ট্যালিনের (১৮৭৮-১৯৫৩) মৃত্যুজনিত কারণে সৃষ্ট ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টিতে অস্থিরতা বিরাজ করে। কংগ্রেস সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যর্থতাজনিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জনমানসে গণশক্তির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রেরণা জাগায়। কিন্তু অতি বামপন্থী মনোভাবের জন্য ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব কমিনটর্নের মুখপত্রে সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মাধ্যমে দেশবাসীকে সঠিক বিপ্লবের পথনির্দেশ করার চেষ্টা করলেও সেটা ব্যর্থ হয়। "ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়"—বলে প্রাপ্ত স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে কমিউনিস্ট পার্টি। বি.টি. রণদিভের নেতৃত্বে পার্টি যাত্রা করে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে, উত্তরকালে ষাটের দশকে সেটা হয়ে ওঠে জনবিচ্ছিন্ন সশস্ত্র পার্টি লাইন। পার্টি সদস্যদের মাঝে দেখা দেয় পেটি-বুর্জোয়া মনোভাব ও ব্যক্তিগত ঈর্ষা-বিদ্বেষ। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮ সালের ২৬ মার্চ কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

১৯৪৭-পরবর্তী রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় অনিবার্যভাবে সহিংস নীতিবিরোধী সমরেশের সঙ্গে পার্টির ব্যক্তিস্বার্থনির্ভর রাজনৈতিক আদর্শের ভাঙন ও সংঘাত দেখা দেয়। পার্টি সমর্থক হিসেবে স্ত্রী গৌরীও তাঁকে সমর্থন করতে পারেননি। কাজেই রাজনৈতিক সন্ত্রাসের প্রশ্নে গৌরীর সঙ্গে তাঁর আদর্শিক সংকট সৃষ্টি হয়, যা তাঁর দাম্পত্যজীবনকে প্রভাবিত করে। ১৯৪৯ সালের মধ্যে গোটা চীন ভূখণ্ড থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদার চিয়াং কাই-শেক (১৮৮৭-১৯৭৫)-চক্র কমরেড মাও জে-দঙ (১৮৯৩-১৯৭৬)-এর নেতৃত্বে বিতাড়িত হয়। ফলে তৎকালে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয় মহাচীন। এ ঘটনা ভারতীয় কমিউনিস্টদের নতুন স্বপ্ন দেখায়।

কংগ্রেসের ব্যর্থতার কারণে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আস্থা বেড়ে যায়। ১৯৪৮ সাল ও ১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ সীমাবদ্ধ গণতান্ত্রিক অধিকারকে কাজে লাগিয়ে আন্দোলন ও সমাবেশের পথ ধরে এগুতে থাকে কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ সারা ভারত রেল ধর্মঘট এবং ১৩ মার্চ পোর্ট, ডক, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারি কর্মচারী ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। এ সময় অন্ধ্র প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী কর্তৃক রচিত ভারতের বিপ্লবের বর্তমান স্তর ও আনুষঙ্গিক রণনীতি-রণকৌশল সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বলা হয়—সাম্রাজ্যবাদী দেশ রাশিয়ার সমাজবিপ্লব কখনো ভারতের মতো আধা-ঔপনিবেশিক দেশের অনুসরণীয় হতে পারে না। কাজেই ভারতের বিপ্লবের পথ ও লড়াইপদ্ধতি হওয়া উচিত চীনের বিপ্লব অনুসারী। কিন্তু পলিট ব্যুরোর পক্ষ থেকে বি.টি. রণদিভে জানান—চীন বিপ্লব নয়, রুশ বিপ্লবই ভারতবর্ষের প্রধান দিক-নির্দেশক। এ নিয়ে শুরু হওয়া বিতর্কের ফলে পার্টির অভ্যন্তরে

Dhaka University Institutional Repository

গণতন্ত্রের চর্চা বাধাগ্রস্ত হয়। পার্টি এগিয়ে যায় সন্ত্রাসের পথে, যা সমরেশ বসু কখনো সমর্থন করতে পারেননি।

কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ার পর ১৯৪৯ সালের ৮ মার্চ হাতবোমা, অ্যাসিড বাল্ব নিয়ে পাটকল শ্রমিকদের দ্বারা ধর্মঘট করানোর জন্য গৃহীত পার্টির আত্মঘাতী সিদ্ধান্তকে সন্ত্রাসবাদী কাজ মনে করে প্রতিবাদ জানানোর কারণে ঊর্ধ্বতন নেতাদের কোপানলে পড়েন সমরেশ বসু। কিন্তু ৯ মার্চ পার্টির নিয়ম রক্ষা করতে তিনি 'অ্যাকশনে' অংশ নেন। সমরেশ বসু ১৩ ডিসেম্বর পার্টির অন্যায় সিদ্ধান্তের প্রতি নির্বিচার আনুগত্য দেখাতে ব্যর্থ হলে তিনি পার্টি নেতৃত্বের বিরাগভাজন হন। গোটা ১৯৫০ সাল জুড়ে 'সঠিক রাজনীতি'র সন্ধানে পার্টিতে চলতে থাকে তীব্র বিতর্ক। পার্টির সদস্যদের মাঝে দেখা দেয় হতাশা, পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, সংশয় ও অবিশ্বাস। পার্টি নেতৃত্বের কারণেই, এ সময়ে অন্যান্য নেতা-কর্মীর সঙ্গে সমরেশ বসু গ্রেফতার হন ১৯৪৯ সালে। কারা মুক্ত হন ১৯৫১ সালের মাঝামাঝি। বুলবুল, দেবকুমার, নবকুমার আর মৌসুমী—এই চার সন্তানকে নিয়ে জননী গৌরীকে অবর্ণনীয় সংকট ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে হয়।

সমরেশের সমকালে কমিউনিস্ট রাজনীতি সারাদেশে ভিন্ন এক সংস্কৃতির জোয়ার আনে। ভাবনাচিন্তায় পৃথক এক বোধ আর চেতনার সঞ্চার করেছে। সুস্থ আর স্বাধীনভাবে ভাবতে চেষ্টা করা–নতুন প্রজন্ম হঠাৎই যেন ভিন্নতর এক আলোক বিকিরণে দীপ্ত হল। সমরেশ বসু জেনে বুঝে যে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে এসেছেন পুরোপুরি তা ঠিক নয়, নতুন ভাবনাচিন্তার জন্যই তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন কমিউনিস্ট রাজনীতির প্রতি। তবুও পাকে-চক্রে তাকে সেই প্রত্যক্ষ রাজনীতির শিকার হয়ে যেতে হয়েছে প্রেসিডেন্সি জেলে—রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে। শুধু তাই নয়, পার্টির কমরেডরা তাঁকে কারাগারের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে পাঠিয়েছিল যেটি বহিষ্কৃত ক্যাডারদের জন্য চিহ্নিত ছিল। সমরেশ বসুর জন্য এটা ছিল দহন ও ক্ষরণের উৎস। জেলে বসে তিনি আত্মবীক্ষার সুযোগ পান :

> জেলবাস আমার জীবনের এক বিরাট ভূমিকা। বন্দী জীবনই আমার দৃষ্টিকে করেছিল স্বচ্ছ আর সুদূরপ্রসারী। মানব চরিত্র যা ছিল আমার কাছে গভীর অন্ধকারে, জেলের মধ্যেই সেই মানব চরিত্রের গায়ে কোথাও কোথাও টুকরো আলোকপাত হয়েছিল। সম্ভবত দুঃখ এবং গ্লানির মধ্যেই নিজেকে এবং অপরকে কিছুটা চেনা যায়।[২৯]

জেলে থাকাকালীন গৌরী বসু তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে মাসোহারার আবেদন নিয়ে গিয়ে শুনে এসেছিলেন—"এখন মাসোহারা চাইতে এসেছো কেন, তোমার স্বামীকে গিয়ে বিপ্লব করতে বলো।"[৩০] তবুও তিনি দেড়শো টাকা মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

সমরেশ বসুর কনিষ্ঠ পুত্র নবকুমার বসু পিতা সমরেশ বসুর জীবননির্ভর wPimLv উপন্যাসে এ সময়ের বর্ণনা দিয়েছেন। সতীর্থ কমরেড শান্তি মিত্র যখন, বিধান রায়ের কাছে সাংসারিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য আবেদন করতে বলেছে, তখন বিভাসরূপী সমরেশের উচ্চারণ :

> কী করে হয় সেটা শান্তি দা! ওঁদের বিরুদ্ধেই আমাদের যাবতীয় আন্দোলন, পার্টি আজ বেআইনি ঘোষিত হয়েছে কংগ্রেসের চক্রান্তে, দলে দলে লোককে জেলে ভরেছে শুধুমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টি করার অপরাধে, অথচ আমরা নাকি গণতান্ত্রিক দেশের বাসিন্দা। এত বড় একটা অন্যায় যারা করে যাচ্ছে, তাদের কাছে আমরা আবেদন করব সাহায্যের। আমরা তো সাহায্য চাইছি না, আমরা চাইছি স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসেবে নিজেদের স্বাধীন অধিকার...।[৩১]

জেলে বসে সমরেশ বসু বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ অধ্যয়নের পাশাপাশি নিজের লেখা নিয়েও ভাবতে শুরু করেন। কারামুক্ত হয়ে এসে তিনি দেখেছেন সরকারবিরোধী কমিউনিস্ট রাজনীতি-সংশ্লিষ্টতার কারণে জেলে যাওয়াটা চাকরিক্ষেত্রে একটা কালিমালিপ্ত অপরাধ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এজন্য ফ্যাক্টরি

Dhaka University Institutional Repository

ম্যানেজমেন্ট তাকে বন্ড (মুচলেকা) দিয়ে কাজে যোগ দিতে বলার মতো অসম্মানজনক প্রস্তাবে রাজি হওয়া সমরেশের কাছে অন্যায় বলেই মনে হয়েছে। এ নিয়েও জীবিকাসন্ধানী সমরেশের সঙ্গে পার্টির মতান্তর হয়।

জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর পার্টি সমরেশকে দলীয় মুখপাত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখতে চেয়েছিল এবং এটাকেই তারা পার্টির প্রতি অঙ্গীকারের সাক্ষ্য বলে বিবেচনা করত; কিন্তু সমরেশের কাছে ব্যক্তিগত জীবনও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। পার্টির লোকজন চাইত সমরেশ বসু নিয়মিত এসে অন্যান্য কর্মীর মনোবল বাড়ানোয় সাহায্য করুন, রাইফেল-ফ্যাক্টরির চাকরিতে পুনর্বহালের জন্য পার্টি ইউনিয়নই তাঁর পক্ষ হয়ে উদ্যোগ নেবে। কিন্তু সমরেশ বসু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেছেন কারাবাসকালে দারিদ্র্যপূর্ণ সংসারের কোনো দায়িত্ব পার্টি নেতৃত্ব কিংবা কোনো অবস্থাপন্ন কমরেড বহন করেননি। আজও তারা জীবিকাসন্ধানী হওয়ার সমালোচনা করছে! অথচ প্রতিবেশী চটকল মিস্তিরি নিঃসন্তান নারায়ণদা সমরেশের ছেলেমেয়েদের জন্য দুধ দেয়া বন্ধ করেনি অর্থপ্রাপ্তির অনিশ্চয়তা দেখেও। এ সময় সমরেশ বসুর উপলব্ধি ছিল :

> আমাদের পার্টি গরিব মানুষের পার্টি ঠিকই, কিন্তু আমাদের নেতারা মানুষ হিসেবে তাদের ভাববার আগে, রাজনীতির ছকে তাদের ভাববার চেষ্টা করছে। কিন্তু মানুষকে কি কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পুরোপুরি বিচার করা যায়! আগে তো মানুষটা, তারপর তো তাদের ওপর রাজনীতির প্রভাব—যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ডেভেলাপমেন্ট। আমি জানি, হয়তো আমি খুব সরলভাবে ব্যাপারটা ভাবছি। তা হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেকের কথাবার্তায় আমার কেমন খটকা লাগে, তাঁরা যেন রাজনীতিকে মানুষের আগে ভাবেন।[৩২]

সমরেশ বসু অর্থোপার্জনে সক্ষম হলে, দাম শোধ করলেই চলবে বলে নারায়ণদা যখন তার সন্তানদের জন্য দুধ সরবরাহ করেন তখন তার কাছে নারায়ণদাকে ঈশ্বর মনে হয়েছিল। সেই সঙ্গে তাঁর মনে হয়েছিল নারায়ণদা 'কখনো কমিউনিস্ট ছিলেন না।' "...তিনি পার্টির কর্তব্য হিসেবে ওসব করেননি, একান্ত মানবিক কারণে করেছিলেন।"[৩৩]

পার্টির জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে সমরেশ বসু জানতে পারেন তার সম্পর্কে অন্যদের কী বিরূপ ধারণা জন্ম নিচ্ছে। তিনি পার্টি সম্বন্ধে নিষ্ঠাবান নন, কারণ তারা চাইতেন সমরেশ লেখার মধ্যদিয়ে পার্টি মাহাত্ম্যকে তুলে ধরবেন। কিন্তু সৃজনশীল শিল্পী হিসেবে তাঁর পক্ষে কোনো নির্দেশ মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া সংসারের দায়িত্ব তো ছিলই। তাঁর বিরুদ্ধে পার্টিনেতৃত্বের এই অভিযোগের পূর্বে কারাবাসকালেই সমরেশ বসু নিজের ভেতরে আলোড়িত হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছে পার্টিতে থাকলেও পার্টি সম্পর্কে কিছু বলবার অধিকার একজন সদস্যের নেই। বরং সবক্ষেত্রে নেতারা যা চাইবেন, তাই মানতে আর করতে হবে! সব ব্যাপারটাই তাঁর কাছে 'হিপোক্রিসি' ও 'স্বৈরাচারী' মনে হয়েছে। বিভাসরূপী সমরেশ বসুর আত্মভাষ্য লক্ষণীয় :

> ...শুধু জেল থেকে নয়, আমি মুক্তি পেতে চাইছিলাম পার্টির এই হিপোক্রিসি থেকেও। আমি স্বাধীনভাবে ভাবনাচিন্তা করার জন্য ছটফটিয়ে উঠছিলাম ভেতরে ভেতরে। দ্যাখো, মানুষের থেকে বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে কি আর কিছু হয়! আমি সেই মানুষকে দেখতে চাই আমার নিজস্ব উপলব্ধির নিরিখে। পার্টিতে থাকলেই নীতি আর মতের পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে হবে যান্ত্রিকভাবে।[৩৪]

কারাবাসকালীন অভিজ্ঞতায় সমরেশ বসু বুঝেছেন যে "পার্টির মধ্যেই স্তর বিভাগ আর শ্রেণী চেতনার ফারাক। একদল তথাকথিত প্রগতিশীল কমরেড হয়েছেন, যাদের ঝকঝকে চকচকে চেহারা, জামাকাপড়,

Dhaka University Institutional Repository

ভাবনা কোনও কিছুর সঙ্গেই পার্টির নিচু স্তরের মানুষদের কোনও যোগাযোগ নেই। অথচ আমরা তো পার্টি করতে এসেছিলাম বঞ্চিত আর নিপীড়িত মানুষদের শৃঙ্খলমুক্তির জন্য। পার্টির সঙ্গে, আমার সংঘাতটাও হচ্ছে সেইখানে।"[৩৫] পার্টির সদস্য হিসেবে স্বাধীন মত প্রকাশ করলেই দলীয় নেতৃবৃন্দ মনে করতেন সেটা দলের বিরোধিতা করা। সমরেশ বসু সম্পর্কে সেই অভিযোগ উত্থাপিত হলে তিনি সেটা মেনে নিতে পারেননি। এ-বিষয়ে বিভাসরূপী সমরেশ বসুর স্বীকারোক্তি লক্ষণীয় :

এটা তো আমার অস্বীকার করার কিছু নেই যে জীবনের বহু অভিজ্ঞতাই আমার হয়েছে পার্টি করার সুবাদে। বিভিন্ন ধরনের মানুষের সংস্পর্শে আমি যে এতদিন ধরে এসেছি, পার্টি না করলে কোনওদিন সেভাবে আসতে পারতাম না। অথচ এখন যত দিন যাচ্ছে, পার্টির ভূমিকায় আমার একটা কষ্টের অনুভূতি তীব্র হয়ে উঠছে।

অথচ পার্টির বিরোধিতা করার ভাবনা আমার স্বপ্নেও কোনও দিন আসেনি—কেন আসবে! কম্যুনিস্ট পার্টির মূল নীতিকে শ্রদ্ধা করা থেকে আমি তো একটুও সরে আসিনি।

পার্টির সুযোগ নিয়ে লাভবান হব, এরকম তো কখনও ভাবিনি। মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য আর অশিক্ষার বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট পার্টি লড়বে বলেই পার্টিকে সমর্থন করি।

...এই যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে আজ চলেছি, কম্যুনিস্ট পার্টি না করলে আর কী নিদারুণ দুঃখকষ্টে থেকেও মানুষ বাঁচার স্বপ্ন দেখে—না দেখলে, আজ চলতে পারতাম! মনের সেই জোরটা পেতাম কোথায়! মানুষের ওপর আমার বিশ্বাস আছে, আর এ-ও জানি, পার্টির চেয়ে মানুষ বড়।[৩৬]

—এটিই ছিল সমরেশ বসুর রাজনীতিচেতনার মৌল সত্য। এ সত্যে পরিস্রুত হয়েই মনুষ্যচেতনা, মানববোধ ও মানবমুক্তির দর্শনে ক্রমাগত জাগ্রত হয়েছেন তিনি। এসব রাজনৈতিক, সামাজিক ও যুদ্ধপর্বের ঘটনাপুঞ্জ এবং আত্ম-অভিজ্ঞতা সমরেশ বসুর hM hM Rx‡q উপন্যাসে কালগত উপকরণ হিসেবে মহাকাব্যোপম পরিসরে স্থান পেয়েছে।

রাইফেল-ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষ 'কজ্ অব্ ডিসচার্জে' লিখে দিয়েছিল অবাধ্যতা ও তার ওপরে কারা-কর্তৃপক্ষ 'জেলের ছাপটি'ও বসিয়ে দিয়েছিল। এ-কারণে সমরেশ বসুকে অর্থ-উপার্জনের সব জায়গায় ব্যর্থ হতে হয়। আশার কথা এই, কমরেডদের অসহযোগিতা, নির্মমতা ও সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও এই দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনে সমাজের প্রান্তবাসী মানুষের কাছ থেকে সমরেশ বসু পান সীমাহীন সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। bqbc‡ii gwU, DËi½, we wU †iv‡Wi av‡i উপন্যাস— প্রধানত এসব প্রান্তজনেরই জীবনকথা।

১৯৫১ সালে কারামুক্ত হওয়ার পর অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে জেলমুক্ত প্রগতিশীল ও কমিউনিস্ট লেখকদের সভায় আমন্ত্রিত হন সমরেশ বসু। এ বছরই দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনে আলোকময় সম্ভাবনা দেখা দেয়। শচী সেনের বুক ওয়ার্ল্ড থেকে প্রকাশিত হয় DËi½ উপন্যাস। এ উপন্যাসেই সমরেশ বসুর স্বাদেশিকতাবোধের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল। এটি প্রকাশের পর নৈহাটির বাসন্তী কেবিনে বইয়ের জন্য অপেক্ষমাণ বন্ধু সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমাশঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যজিৎ চৌধুরী, প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশ দে সহ অনেকের দ্বারা অভ্যর্থিত হন তিনি। এ উপন্যাসে তাঁর স্বাদেশিকতাবোধ প্রত্যক্ষ করে কবি বিষ্ণু দে তাঁকে অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করেন। সেই পত্রে দুটো মূল্যবান কথা লেখা ছিল :

প্রথমত, 'আপনার উপন্যাসটি পড়ে মনে হল, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে আপনার পরিচয় অত্যন্ত ক্ষীণ', দ্বিতীয়ত 'আরো লিখুন, গঙ্গার ধারের যে কথা আপনি লিখেছেন, আপনাকে দেখতে চাই তার সাগর-সঙ্গমে।[৩৭]

"পরিচয়" পত্রিকায় DËi½ উপন্যাসের সমালোচনা করতে গিয়ে অশ্লীলতার অভিযোগ আনেন চিন্মোহন সেহানবীশ। কিন্তু লেখকবন্ধু সনৎ বসু 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় এর প্রতিবাদ জানান। একই পত্রিকায় অচ্যুত গোস্বামী DËi½-র সমালোচনা করেন। প্রতি-সমালোচনা করেন গান্ধী ও বার্নার্ড শ-এর জীবনীকার ঋষি দাশ। সিগনেট প্রেসের মালিক দিলীপ গুপ্ত নিমন্ত্রণ করে সমরেশ বসুকে স্বপ্নের ফাউন্টেন পেন ও ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত msev'c‡Î †mKv‡ji K_v-র দুটো খণ্ড পুরস্কার হিসেবে দেন।[৩৮] এ সময় থেকেই শুরু হয় আর এক রূঢ় কঠোর জীবন যাপন। সমরেশ বসু এ সময়, সাপ দেখা-দেওয়া-দেওয়ালের পাশে বসে, পায়ের কাছ দিয়ে বিছে চলে-যাওয়া, শুঁয়ো পোকা গায়ে বেয়ে-ওঠা কিংবা পিঁপড়ের কামড়ানি সহ্য করে লিখে-যাওয়া একজন লেখক। এ সব সাধনা তাঁর প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত, তপস্যা-কঠোরতার সংকেত।[৩৯]

রাজনীতির বিশেষ কতগুলো যান্ত্রিক 'থিয়োরি' আর 'প্যাটার্নের' মধ্যদিয়ে চলতে পারেননি সমরেশ বসু। কাজেই DËi½ উপন্যাস প্রকাশের পর যখন তাঁর বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠে কিংবা পরবর্তীতে তিনি যখন 'দেশ' ও 'আনন্দবাজার' পত্রিকার বরণীয় লেখক হয়ে ওঠেন তখন তাঁকে 'বুর্জোয়া মানসিকতার লেখক' আখ্যা দেওয়া হয়। এ-প্রসঙ্গে সমরেশ বসুর বিশ্লেষণ ছিল এ রকম—পার্টির ঠিক-বেঠিক বিপ্লবী পন্থা নেতারা নির্বাচন করলেও কোনো দলীয় সদস্য কিংবা ব্যক্তির ভাবনা-আবেগ-উচ্ছ্বাস কখনো পার্টি নির্ধারণ করতে পারে না। wPimLv উপন্যাসে উল্লেখিত বন্ধুর কাছে তাঁর সে প্রতিক্রিয়া উচ্চারিত হয়েছে বিভাসের কণ্ঠে :

> এটা কী অদ্ভুত ব্যাপার দ্যাখ, আমার লেখা ভাষা কিংবা চরিত্রগুলো যেখানে পার্টির নেতাদের চেনাজানা আর সহজ মনে হচ্ছে সেখানে তারা বাহ্বা দিচ্ছে, আর যেখানেই ওদের পরিচিত গণ্ডীর বাইরে আমি আমার চোখের দেখা কিংবা মনের ভাবনার কথা বলছি, ওরা রিএ্যাক্ট করছে। কিন্তু লেখক হিসেবে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা তা হলে বলব না! তা হলে আর লিখে কী হবে। শুধু যদি পার্টি মাহাত্ম্য প্রচার করতে আমায় লিখতে হয়, সেটা তো লিফলেট লিখলেও চলে। সাহিত্য করার দরকার কী! মানুষ হিসেবে আমরা তো একটা বোধ থেকেই আমি কম্যুনিস্ট হয়েছি। কেউ তো ধরে বেঁধে ঢুকিয়ে দেয়নি। আমার লেখাপত্রের মধ্যে তো খুব স্বাভাবিকভাবেই নিজস্ব বোধের প্রতিফলন ঘটবে—তা না! লেখার সময় বল তো, আলাদাভাবে সবসময় আমাকে কেন মনে রাখতে হবে আমি কোন রাজনীতির সমর্থক! আমি কি সত্যি তা হলে আমার লেখাটার প্রতি সুবিচার করতে পারব? [৪০]

১৯৫২ সালে সমরেশ বসুর পিতা মোহিনীমোহন বসুর মৃত্যুর পর কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয়সূত্রে সমরেশ বসু বেঙ্গল পাবলিশার্স, ডি.এম. লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত হন। পরে তাঁর বেশ কিছু গ্রন্থ এ দুই প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশ করে। 'প্রবাহ' পত্রিকার ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় "ভোট দর্পণ" নামক রাজনৈতিক নিবন্ধ প্রকাশের প্রয়োজনে 'কালকূট' ছদ্মনাম গ্রহণ করেন সমরেশ বসু। ১৯৫৩ সালে তাঁর কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়। অতঃপর সমরেশ বসু 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় ফিচার লেখক হিসেবে যোগ দেন। সহকারী ছিলেন লেখকবন্ধু সোমনাথ ভট্টাচার্য। জীবনকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করতে শেখেন সমরেশ বসু এ সময় থেকেই। তখন সম্পাদক ছিলেন সরোজ আচার্য। তাঁর পরামর্শে 'দেশ' পত্রিকায় লেখা শুরু করেন তিনি। এ পত্রিকার সম্পাদক তখন বঙ্কিমচন্দ্র সেন হলেও, নীতিনির্ধারক ছিলেন সাগরময় ঘোষ। জীবনধারণের প্রয়োজনে সমরেশ বসু 'দেশ' পত্রিকায় 'গুণিন' (২২ সেপ্টেম্বর ১৯৫২) গল্প প্রকাশ করেন। গল্পটি প্রকাশিত হলে বন্ধুদের রূঢ় বিরোধিতার সম্মুখীন হন সমরেশ বসু। কারণ তাদের মতে 'দেশ' বামপন্থী ভাবধারানির্ভর পত্রিকা নয়। কিন্তু জনবিচ্ছিন্ন সশস্ত্র বিপ্লবপন্থী রাজনৈতিক আদর্শের চাইতে তাঁর কাছে জনজীবন বাস্তবতা বড়ো হয়ে ওঠে। মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনার ধারায় তখন দুটো মতাদর্শের উদ্ভব ঘটেছিল। প্রথমত, সাহিত্য ও গণসংগ্রামকে সমৃদ্ধ ও বেগবান করতে হলে ট্রেড

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন বা কিষাণ সভায় সরাসরি অর্থাৎ প্রত্যক্ষকর্মী হিসেবে যোগদান না-করেও শিল্পী-সাহিত্যিককে গণসংগ্রামে যুক্ত হতে হবে। কারণ এটি সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, চিন্মোহন সেহানবিশদের সহমত পোষণকারী কমরেডরা মনে করতেন গণসংগ্রাম ও সাহিত্যশিল্প সৃষ্টির সম্ভাবনার প্রয়োজনে শিল্পী-সাহিত্যিকও মজুর-কিষাণ সংগঠকদের মতো প্রত্যক্ষ কাজ করবেন। তা না হলে গণসংগ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি তৈরি হবে কৃত্রিম সাহিত্য।[৪১]

কিন্তু চিন্মোহন সেহানবিশদের এ মতবাদ মানতে পারেননি বলেই পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে সমরেশ বসুর বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, মুখ্যত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কিয়দংশে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও এ ধরনের দলীয় রাজনৈতিক যান্ত্রিক মনোভাব দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন।

পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও রাজনীতি থেকে সমরেশ বসুর বিচ্ছিন্নতা কখনোই সম্ভব ছিল না। এ কারণে প্রথমপর্বের উপন্যাসে শ্রমিক ও গ্রামীণ সমাজের যে গোষ্ঠীজীবন তিনি চিত্রায়ণ করেছেন তার মধ্যদিয়ে প্রকৃত অর্থে বিপ্লববাদী সহিংস রাজনীতিতে আস্থা হারিয়ে, সমরেশ বসু সমকালীন পরিস্থিতি অনুধ্যান করে রাজনীতি ও ইতিহাসের অবিমিশ্র শিল্পসৃজনে অগ্রসর হন। bqbc‡ii gwU, DËi½, RMÏj, we wU †iv‡Wi av‡i, kxgZx Kv‡d প্রভৃতি এ পর্বের উপন্যাস।

Avb›‘gV থেকে বাংলা উপন্যাসে যে ‘আখ্যান’ রচিত হয়েছে সেখানে বৃহত্তর জাতীয় জনজীবন ও ব্রিটিশ উপনিবেশসৃষ্ট ‘সেফটিভাল্ব’ রূপ শিক্ষিত মধ্যবিত্তসমাজের প্রতিস্রোতধর্মী ভাবনা ও জনবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক কেবল সাহিত্যকেই দ্বিধাগ্রস্ত করেনি, ভারতীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকেও বিভ্রান্ত করেছে। সমরেশ বসু কারাজীবনে উপলব্ধি করেছিলেন—জনজীবন-সম্পৃক্তি ও অভিজ্ঞতা এদেশীয় সার্বিক মুক্তির অন্যতম পন্থা। এ আন্তর্প্রেরণায় সমরেশ বসু ১৯৫৪ সালে ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখার ইচ্ছা থেকে কুম্ভমেলায় যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। অধ্যাত্মবাদ নয়, দেশকে দেশের মানুষকে তথা নিজেকে ও জীবনকে জানার অন্তহীন প্রেরণায় তাঁর এ যাত্রা। কুম্ভমেলা থেকে ফেরার পর ‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তাঁর AgZK‡¤i mÜv‡b (১৯৫৪) উপন্যাস।

১৯৫৫ সালে পার্টি সদস্যপদ নবায়নে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন সমরেশ বসু। বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশের কারণে পারিবারিক জীবনে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা দেখা দেয় তাঁর। এরপর তিনি আতপুর থেকে নৈহাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন। পার্টির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা কমে আসে। লংমার্চ ও মৌন মিছিলের মধ্যে সমরেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ‘জন্মভূমি’ পত্রিকায় প্রকাশিত M½v উপন্যাসের জন্য সমরেশ বসু ‘আনন্দ পুরস্কার’ পান ১৯৫৫ সালে। ১৯৬০ সালে শ্যালিকা ধরিত্রীর প্রতি প্রেমের টানাপোড়েন এবং স্ত্রী গৌরীর প্রতি কৃত-অপরাধবোধ ও বিবেকের দ্বন্দ্বে সমরেশ বসুর শিল্পীসত্তা দ্বিধাগ্রস্ত ও ক্ষুণ্ন হয়।

স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় শিল্পপতি, ভূ-স্বামী এবং জমিদারদের কায়েমি স্বার্থই অগ্রাধিকার পেয়েছিল। এ-কারণে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, কারিগরি কোনো পরিকল্পনারই বাস্তবায়ন হয়নি। এ আর্থ-রাজনীতিক পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হতে থাকে এবং বামপন্থী রাজনীতির প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু-সংকট মোকাবিলা করতে কৃষিজমির ওপর সৃষ্ট ক্রমবর্ধিত চাপ, কৃষিক্ষেত্রের পশ্চাৎপদতা, পাট ও চা শিল্পের ক্রমাবনতিই প্রমাণ করে ষাটের দশকে এসেও প্রতিষ্ঠিত হয়নি কাঙ্ক্ষিত ভারতীয় স্বাধীন স্বদেশীসমাজ।

Dhaka University Institutional Repository

দেশ-বিভাগোত্তর পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্বারা সমরেশ-মানস পরিস্রুত হয়। সমরেশ-মানস এ সময় হয়েছে সংক্ষুব্ধ ও ভিন্ন খাতে প্রবাহিত। সমরেশ বসুর জীবনভাবনায় ও স্বতন্ত্র রাজনীতি-চিন্তায় সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক উদ্দীপনা, বিরোধ ও বিপ্রতীপতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূলশক্তি ও প্ররোচকদের বিরুদ্ধে জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করার লক্ষ্যে 'নেহেরু গভর্নমেন্টকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থনের জন্য পি.সি. জোসীর আবেদন' (১৯৪৮) থাকলেও তাদের নীতিগত অবস্থানের ঠিক উল্টো খাতে বয়ে চলল ঘটনাপ্রবাহ। চলতে থাকে 'স্বাধীন' সরকারের জনবিরোধী চেহারার উন্মোচন : ২১ নভেম্বর ১৯৪৭ "রামেশ্বর দিবস" উপলক্ষে ছাত্রমিছিল ও তে-ভাগার দাবিতে কৃষক মিছিলের ওপর ব্রিটিশ-শাসকদের কায়দায় পুলিশি আক্রমণ। আর এক 'বিপন্ন বিস্ময়' 'পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ ক্ষমতা বিল' আনয়ন (২৩ নভেম্বর ১৯৪৭)। আবার শুরু হল আন্দোলন, মিছিল, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ।[৪২]

এছাড়া উদ্বাস্তু সমস্যা (১৯৪৭-১৯৫১); কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিতীয়বার নিষিদ্ধ ঘোষণা (২৬ মার্চ ১৯৪৮) ও হাইকোর্টের রায়ে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার (২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০); পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন (১৯৫৭); সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভের (১৮৯৪-১৯৭৬) কলকাতা আগমন (১৯৬০); চীন-ভারত যুদ্ধ (১৯৬২); ১৯৬৪-এ কমিউনিস্ট পার্টির দু-ভাগে বিভক্তি, খাদ্যসংকট ও মূল্যবৃদ্ধি, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা (১৯৬৪), পাক-ভারত যুদ্ধ (১৯৬৫), প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের শপথ গ্রহণ (২ মার্চ ১৯৬৭); কৃষক আন্দোলন থেকে নকশাল আন্দোলনের উৎপত্তি (মে ১৯৬৭); দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠন (মার্চ ১৯৬৯) এবং দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতাচ্যুতি—ইত্যাদি ঘটনার স্রোত-প্রতিস্রোতে, অন্তর্প্রবাহ-বহির্প্রবাহে পশ্চিমবঙ্গ নানা বলয়ে আন্দোলিত হয়।

১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে 'উগ্র জাতীয়তাবাদী নেশা'য় "কমিউনিস্ট পার্টি চীনকে আক্রমণকারী দেশ হিসেবে অভিযুক্ত করে। শুধু তাই নয়, কৃষক-শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষকে জওহেরলাল নেহেরুকে সক্রিয় সমর্থনের আহ্বান জানায়।"[৪৩]

চীন-ভারত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মতবিরোধ শুরু হয় এবং কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৬৪ সালে দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। জ্যোতি বসু এবং তাঁর অনুগামীরা ছিলেন মধ্যপন্থী, যাঁরা রুশ কিংবা চীন কোনোটাই পুরোপুরি সমর্থন করেন না। সি পি আই (এম)-এর জন্ম ১৯৬৪-তে। ১৯৬৪ সালে সরকারের দমননীতির কারণে বন্ধ সংঘটিত হয়। ১৯৬৫ সালের ২৬ জুলাই ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে সংঘটিত আন্দোলনে ট্রাম শ্রমিকরাও অংশ নেয়। তবে কলকাতার ছাত্রসমাজ এতে গ্রহণ করেছিল বিরাট ভূমিকা। দ্বিতীয়বার ভারত-পাক যুদ্ধের কারণে উগ্র জাতীয়তাবাদের শিকার হল যাবতীয় গণআন্দোলন। এ সময়ে সরকারের কমিউনিস্ট দমননীতি সক্রিয় হয়। ১৯৬৫ সালের পরে ভারতের দারিদ্র্য চরম সীমায় পৌঁছে যায়। জোতদার ও মজুতদারদের স্বার্থপুষ্ট খাদ্যনীতির কারণে ১৯৬৬ সালে আবারো খাদ্য আন্দোলন শুরু হয়। অজয় মুখোপাধ্যায় এ সময় 'বাংলা কংগ্রেস' নামক নতুন দল গঠন করেন। খাদ্য আন্দোলনকে ঘিরে ছাত্র ফেডারেশন এ সময় রক্ষণশীল ও র‍্যাডিক্যাল—এই দু-দলে বিভক্ত হয়ে যায়। ছাত্র ফেডারেশনের ডাকা ১০ মার্চ ১৯৬৬ ও ৬ এপ্রিল ১৯৬৬-এর 'বাংলা বন্ধ'-কে সমর্থন জানায় অজয় মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা কংগ্রেস'।[৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

দুই

১৯৬৪ সালে পার্টির সঙ্গে চূড়ান্ত মতপার্থক্য ঘটে সমরেশ বসুর। আনন্দবাজার পত্রিকার বরণীয় লেখক সমরেশ বসুকে কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থকরা মেনে নিতে চাননি। ১৯৬৫ সালে শ্যালিকা ধরিত্রীকে কেন্দ্র করে স্ত্রী গৌরীর প্রতি কৃত অপরাধে বিপর্যস্ত, অস্থির ও উদ্দাম এবং স্বেচ্ছানির্বাসিত জীবন যাপন করেন তিনি। এবং সমসময়ে রাজনৈতিক বিরোধে জড়িয়ে-পড়ে সমরেশ বসুর শিল্পীমানস ক্রমশ হয়ে পড়ে বিবরসন্ধানী। বিপর্যস্ত জীবনচেতনায় বিপন্ন হলেও সামাজিক দায়িত্ব পালনে বিরত ছিলেন না সমরেশ বসু। তিনি ১৯৬৭ সালের ১৪ মার্চ স্ত্রী গৌরীর জীবদ্দশায় শ্যালিকা ধরিত্রীকে বিয়ে করেন। পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনের আত্মক্ষয়ী মনস্তত্ত্ব এবং সময়-উদ্ভূত রাজনীতিক অস্থিরতা সমরেশ বসুকে নিক্ষেপ করে ঘূর্ণাবর্তে, দিগ্‌ভ্রান্ত হয় তাঁর দিনকাল, সৃষ্টিসাধনা।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি তথা বাংলা খণ্ডিত হওয়ার পর উদ্বাস্তু পরিবারসমূহের কিশোর-তরুণরা চিরচেনা প্রতিবেশ থেকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তাদের ভবিষ্যৎ হয়ে ওঠে অনিশ্চিত। গ্রামীণ অর্থনীতির কাঠামো ভেঙে-পড়ায় জীবিকাসন্ধানী মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরের পথ ধরে; বস্তির সংখ্যা বাড়ে দ্রুত, রাজনৈতিক দলগুলো হয়ে ওঠে নীতিভ্রষ্ট। আত্মস্বার্থপরতায় রাজনৈতিক দলগুলো পূর্ণ হয়ে ওঠে। দলের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে দলীয় নেতা-কর্মীরা ব্যবহার করে জীবিকা-সন্ধানী বেকার তরুণদের। অথচ এসব তরুণের নৈতিক অবক্ষয়ের কথা বলতে গিয়ে সেসব রাজনৈতিক নেতাই ওইসব তরুণদের সমাজবিরোধী দুষ্কৃতকারী হিসেবে চিহ্নিত করে। weei-পর্বে সমরেশ বসু এই 'অস্থির', 'নির্বিবেক' সময়েরই কথারূপ দিয়েছেন; সমরেশ বসু দেখিয়েছেন, তথাকথিত নেতৃবর্গ ওইসব ভাগ্যাহত তরুণকে কীভাবে সমাজবিরোধী হিসেবে অভিযুক্ত করেছে।

শুধু রাজনৈতিক দলের পরিচয়ে নয়, অনেক তরুণ ছিল যারা কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মী না-হয়েও পেশাদার গুণ্ডা হিসেবে বিবেচিত হতো—তারাও গণ-আন্দোলনে যোগ দিয়ে সমাজের প্রতি নিজেদের রাগ, ঘৃণা, বিদ্বেষ মিশিয়ে দিত। স্বাধীনতার প্রথম দু-দশকে এ যুবসমাজই ট্রামবাস পোড়াত, সরকারি ভবনে আগুন লাগাত, পুলিশকে লক্ষ করে ইট-পাথর-বোমা ছুঁড়ত, নিজেরা গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হয়ে যেত।[৪৫] এসব বিপন্ন, বিভ্রান্ত, উত্তেজিত, সংক্ষুব্ধ মানুষের অস্তিত্বসংকট সমরেশ বসু সন্ধান করেছেন weei (১৯৬৫), ¯xKv‡iv³ (১৯৬৭), cRvcwZ (১৯৬৭), cvZK (১৯৬৯) hM hM Rx‡q (১৯৮১) উপন্যাসে। সমরেশ বসু একই সময়ে 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত cvZK উপন্যাসের জন্য মামলার মুখোমুখি হন। ১৯৬৭ সালে তিনি বুদ্ধদেব বসু ও সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে 'আনন্দবাজার' পত্রিকার বিশেষ সুবর্ণজয়ন্তী পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৮ সালে cRvcwZ উপন্যাসে অশ্লীলতার অভিযোগে আদালতে অভিযুক্ত হন সমরেশ বসু।

বাংলা কংগ্রেসের (১৯৬৬) সমর্থনে কংগ্রেস-বিরোধী কমিউনিস্টরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফলে ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের বিপরীতে বাংলা কংগ্রেস দলের অজয় মুখোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। যুক্তফ্রন্ট সরকার সফল হতে না পারলেও কংগ্রেসের অধীনে জনসাধারণ "পুলিশি রাজের চিরাচরিত আবহাওয়া থেকে মুক্ত হয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল।"[৪৬] কিন্তু সরকারের আশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। দেশের সামগ্রিক কাঠামো পরিবর্তনের জন্য দলের মধ্যে থেকে কিছু সংখ্যক নেতা-কর্মী আন্তরিকভাবে কাজ শুরু করলেও, ফ্রন্টভুক্ত প্রায় সকল দলের আধিপত্যবাদী, ক্ষমতালোভী ও পদলোভী এবং সুযোগসন্ধানীরা দলীয় স্বার্থে, তাদের বিরোধিতা শুরু করে দেয়। এ-কারণে যুক্তফ্রন্ট সরকার সফল হতে

Dhaka University Institutional Repository

পারেনি। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ধারায় সমরেশ বসু বার বার প্রত্যক্ষ করেছেন এটা। "১০০ মণ ধান-চাল নিজেদের হাতে রাখতে দিয়ে কর্ডন ও লেভি তুলে দিয়ে খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের কথা ভুলে, আট হাজার জোতদারের উপকার"[৪৭] করার প্রতিক্রিয়ায় শুরু হয় "কৃষক আন্দোলন ও কৃষক কর্মীদের ওপর জোতদারদের সংগঠিত আক্রমণ।"[৪৮]

১৯৬৭ সালের আগস্ট থেকে কৃষক আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে মালদহ, ২৪ পরগণা জেলায়। কৃষকদের এ রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টিতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয় শ্রমিক আন্দোলন। সময়ের অনিবার্যতায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার কর্মচারীও এ আন্দোলনে যোগ দান করে। কিন্তু নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে সম্ভাবনাময় এ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সহিংসতার পথে এগিয়ে যায়। 'লাঙল যার জমি তার'—এ শ্লোগানকে কণ্ঠে ধারণ করে ভাগচাষি কৃষকেরা উচ্ছেদ বন্ধের জন্য সংগ্রাম শুরু করে। কিন্তু এর সঙ্গে হঠকারী রাজনৈতিক নেতৃত্ব যুক্ত হওয়ায় আন্দোলন নতুন মোড় নেয় :

"১৯৬৭ সালের ১৯ জুন 'নকশালবাড়ী' শিরোনামায় লিখিত 'গণশক্তি'-র সম্পাদকীয়তে সেই ধারণা ব্যক্ত হয়। বলা হয় : 'নকশালবাড়ী : এলাকার কৃষক সংগ্রামের সমস্যা জটিলতর হয়ে উঠেছে।...জটিলতর করার জন্য মূলতঃ দায়ী জোতদার কর্তৃক কৃষকের উপর আক্রমণ এবং সরকার কর্তৃক গ্রামের অভ্যন্তরে পুলিশ বাহিনী প্রেরণ।

...এই মূল সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে আন্দোলনের নেতৃত্বের একাংশের ভ্রান্ত ও অত্যুগ্র রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী।"[৪৯]

সিপিআই (এম)-এর বিদ্রোহী কর্মী হিসেবে চারু মজুমদার সিপিআই (এমএল) গঠন করেন এবং নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সমীকৃত করে নিজের রাজনৈতিক আদর্শ তুলে ধরেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল মাও জে-দঙয়ের রণকৌশল অনুসরণ করা। শহরগুলোকে আন্দোলনরত কৃষকজনতা দিয়ে প্রথমে ঘিরে ফেলা এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার জন্য গ্রামাঞ্চলে সব শক্তি কেন্দ্রীভূত করা। এজন্য অস্ত্র হিসেবে কৃষক আন্দোলনকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন তিনি। চীন-ভারত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট পার্টি দু-ভাগ হয়ে যায়। জ্যোতি বসু সিপিআই (এম)-এর সমর্থক হিসেবে চীনকে আক্রমণকারী ভাবতে পারেননি। ফলে সিপিআই (এম) ভেঙে হয় সিপিআই (এমএল)। এ দলের এস.এ. ডাঙ্গে চীনকে আক্রমণকারী হিসেবে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন। সহযোদ্ধা কমরেডরা এ-দলে ও-দলে শেষ পর্যন্ত যোগ দেন। কিন্তু "বাকিরা বরণ করেছেন সক্রিয় রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসন।"[৫০] সমরেশ বসুও সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করেন।

১৯৬৭ সালের ২১ নভেম্বর রাত ৮টায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষিত হলে ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী করে নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নেয়। ১৯৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি দুপুরে ঘোষ-কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পদত্যাগের মধ্যদিয়ে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয়। ৩৭টি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাইসহ অন্যান্য কারণে দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড শিথিল হয়ে পড়ে। ন্যায্য অধিকারের জন্য পাটকল, সুতাকল শ্রমিক থেকে শুরু করে ব্যাংক, সওদাগরি অফিস ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সরকারি কর্মচারীরাও ধর্মঘট শুরু করে। জনসাধারণের কাছে কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৬৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চূড়ান্ত ফলাফলে বিজয়ী হয়ে শপথ গ্রহণ করে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা (১৯৬৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি)।

সিপিআই (এমএল) নেতা চারু মজুমদার নির্বাচন বয়কট করেন। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন : যখন বিশ্ববিপ্লব এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছে—সেই

Dhaka University Institutional Repository

যুগে সংসদীয় পথে পা বাড়ানোর অর্থ বিশ্ববিপ্লবের এই অগ্রগতিকে রোধ করার সামিল হয়ে দাঁড়ায়। সংসদীয় পথ বিপ্লবী মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদের পক্ষে গ্রহণীয় নয়। বিশ্ববিপ্লবের এই নতুন যুগে যখন চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব জয়লাভ করেছে, তখন বিশ্বব্যাপী মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদের একটি কাজই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা হল গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী মানুষের ঐক্য গড়ে তোলা। তাই সমগ্র যুগ ধরে বিপ্লবী মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদের আওয়াজ হবে 'নির্বাচন বয়কট করো' এবং 'গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে সশস্ত্র সংগ্রামের এলাকা বানাও'। সংসদীয় পথে চলে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবীরা বহু রক্তের ঋণ জমা করেছেন। আজ দিন এসেছে সেই ঋণ শোধ করার। ("নির্বাচন বয়কট—সারা নিপীড়িত দুনিয়ার বিপ্লবী জনতার শ্লোগান")।[৫১]

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে শহরে-গ্রামে শ্রমিক ও কৃষকদের দ্বারা ব্যাপক সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছে। কারণ তারা জানত সরকার তাদের পক্ষে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নির্দেশে নকশালবাড়ি আন্দোলনের কারণে ইতঃপূর্বে বন্দি কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল, খোকন মুক্তি পায়। অধিকাংশ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-মালিক বিরোধও মিটে যায়। কিন্তু মালিকদের দালাল ও সাম্প্রদায়িক দলগুলোর স্থানীয় কর্মীরা সাধারণ জনগণের মাঝে ভ্রান্তি ছড়িয়েছিল নকশালপন্থীদের আড়ালে—আত্মপরিচয় গোপন রেখে। এর ফলে ১৯৬৯-এর মার্চ থেকে শুরু করে ১৯৭০-এর জানুয়ারি পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সংঘর্ষ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, সিপিআই (এম) ও সিপিআই (এম এল)-এর মধ্যে প্রকাশ্য হত্যা, গুপ্তহত্যা, পাল্টা-হত্যা চলতে থাকে। ফলে নকশালপন্থীরা ক্রমশ হয়ে পড়ে জনবিচ্ছিন্ন।

১৯৭০-এর জানুয়ারি মাস নাগাদ এ উভয় দলের বিরোধ এমন স্তরে পৌঁছে যার ফলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে। একদিকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন আসন্ন, অপরদিকে চারু মজুমদার 'সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে' পরিণত করার আহ্বান জানান। শরিক দলের কোন্দলের ফলে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগের মধ্যদিয়ে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার কৃষকের কল্যাণমুখী ভূমিনীতি গ্রহণ করায় কৃষকেরা বিপ্লববিমুখ হয়ে পড়ে। এ-প্রসঙ্গে চৌ এন লাই-এর বক্তব্য স্মরণীয় :

শত্রুর বিরুদ্ধে এগিয়ে যাও কিন্তু সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে। তাদের দুঃখ কষ্টের অংশীদার হও, তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। অ্যাডভেঞ্চারের পথে বা বাড়িয়ে আত্মদান করো না। লড়াই চালাও শত্রুর বিরুদ্ধে। গোপনে পুলিশ মারাটা অসঙ্গতিপূর্ণ কাজ—তার প্রভাব নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। তাতে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে।[৫২]

নকশালপন্থীদের এ জনবিচ্ছিন্নতার পরিণামে নকশাল আন্দোলনও ধীরে ধীরে ক্ষীণশক্তি হয়ে পড়ে।

১৯৭০ সালের ১৯ মার্চ পশ্চিম বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারির মধ্যদিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত তথা বাংলায় শুরু হয় কংগ্রেসের শাসন। জনসমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে কংগ্রেস অর্থ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সিপিআই (এম)-এর শত্রু হয়ে দাঁড়ায় কংগ্রেস ও সিপিআই (এমএল)।

১৯৭০ সালে পশ্চিম বাংলার শহরে ও গ্রামে নকশাল আন্দোলনের ব্যাপকতার কারণে সমরেশ বসু পার্টির সঙ্গে (ইতঃপূর্বে সৃষ্ট) মতপার্থক্যের দরুণ নিরাপত্তাহীনতা বোধ করেন। পুলিশের বড়োকর্তা তাঁকে কিছুদিনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থাকার পরামর্শ দেন। সরকারের সঙ্গে এ সময় সাগরময় ঘোষ ও অশোককুমার কথা বলেন। ব্যবস্থানুসারে সমরেশ বসু অশোককুমারের দিল্লির গেস্ট হাউসে স্ত্রী ধরিত্রীকে নিয়ে অবস্থান করেন। কয়েকমাস পরে অনুকূল পরিবেশ হলে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন সমরেশ বসু। তিনি ১৯৭১ সালে কলকাতা সার্কাস রেঞ্জের বাসায় ওঠেন। পরিস্থিতি-সংকট-বিচলিত সমরেশ বসু এ সময় অতীতমুখী হয়ে পড়েন। তিনি হয়ে ওঠেন গ্রন্থ ও সৃষ্টিকেন্দ্রিক। নীহাররঞ্জন রায়ের ev0vjxi BwZnvmসহ বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন লেখকের লেখা অধ্যয়নের পাশাপাশি সমরেশ বসু লিখে চলেন গল্প-উপন্যাস।

Dhaka University Institutional Repository

তিন

সত্তরের দশকের শুরু থেকেই সরকারি দমননীতির শিকার ও সিপিআই (এমএল)-এর আক্রমণের মুখোমুখি হয় সিপিআই (এম)। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীন কর্তৃক পাকিস্তান সমর্থনকে কেন্দ্র করে সিপিআই (এমএল)-এর চারু মজুমদার ও অসীম চ্যাটার্জির বিরোধ, পার্টির অভ্যন্তরীণ সংকটকে তীব্র করে। এবং শেষ পর্যন্ত "শ্রেণীশত্রু খতম ও চারু মজুমদারের বৈপ্লবিক কর্তৃত্বের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে"[৫৩] ১৯৭১-এর মে মাসের মধ্যে পার্টি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই চারু মজুমদারের গ্রেপ্তার ও ২৮ জুলাই লালবাজার পুলিশ লকআপে মৃত্যুর মধ্যদিয়েই নকশাল বিপ্লবী রাজনীতি স্তিমিত হয়ে পড়ে। ১৯৭২ সালের ২ ডিসেম্বর সমরেশ বসুর মাতা শৈবলিনী দেবী লোকান্তরিত হন। নকশালবাড়ি আন্দোলনের অন্তর্বিরোধ ও বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করে মাতৃহারা সমরেশ বসু সমকালীন রাজনীতির অরাজকতায় নতুনভাবে উপন্যাসের উপকরণসন্ধানে ব্রতী হন। তিনি সিপিআই (এম এল)-এর মতো 'রাইফেলকে শক্তির উৎস' ভাবেননি, বরং তাঁর কাছে 'মানুষই ছিল শক্তির উৎস'। নকশাল আন্দোলনের রক্তাক্ত ও অনিবার্য ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে সমরেশ বসু রচনা করেন gvbl kw³i Drm (১৯৭৪) এবং gnvKv‡ji i‡_i †Nvov (১৯৭৭)।

১৯৭৩ সালের ২৭ জুলাই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পটভূমিতে পশ্চিমবাংলায় সিপিআই হরতালের ডাক দিলেও সশস্ত্র বাহিনীর প্রহরায় তা ব্যর্থ হয়। হতাশা-নৈরাজ্য ও নৈরাশ্যে আবর্তিত বিপন্ন ও কংগ্রেসী শাসনে তখন ভীতবিহ্বল পুরো জাতি। ১৯৭৪ সালের শুরু থেকেই রাজনৈতিক পটভূমিকায় আসে পরিবর্তন। ইন্দিরা গান্ধীর 'গরিবি হটাও' শ্লোগানে অনাস্থা ও প্রতিবাদ জানাতে, গুজরাট ও বিহার বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে। এ আন্দোলনের মুখে ১৫ মার্চ ১৯৭৪ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়।

বিহারের ওই আন্দোলন সাধারণ মানুষের মনে সাড়া জাগায়। ১৯৭৪ সালের ১৬ মার্চ শিক্ষা কাঠামোর আমূল পরিবর্তন, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ও বেকার সমস্যার সমাধানসহ ১৩ দফা দাবির ভিত্তিতে আন্দোলনের সূচনা করে বামপন্থী 'ছাত্র সংঘর্ষ সমিতি'।[৫৪] ৮ মে ১৯৭৪ সারা ভারতে রেল ধর্মঘট পালিত হয়। এতে সমর্থন দেয় কংগ্রেস ব্যতীত সকল রাজনৈতিক দল। সরকারি দমননীতির কারণে ১২ মে ১৯৭৪ তারা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয়। ১৫ মে ১৯৭৪ অনশন ও সমাবেশের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলো 'সংহতি অভিযান' শুরু করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার, কারাবাস, বরখাস্ত, উচ্ছেদের মুখে আন্দোলন পরাভূত হয়।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বলিষ্ঠ নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করলেও রাজনৈতিক দলের কারও ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছিল না। এমন সময় তারা খুঁজে পায় ১৯৪২ সালে 'জ্বলে-ওঠা' জয়প্রকাশ নারায়ণকে। বিহার আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে যায় তাঁর হাতে। ১৯৭৪ সালের ৪ নভেম্বর হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবকের মিছিল নিয়ে সেক্রেটারিয়েট ভবনের দিকে যাত্রাকালে তিনি পুলিশের আক্রমণে আহত হন। জয়প্রকাশ নারায়ণ এ ঘটনার প্রতিবাদে ৫ নভেম্বর পাটনা ও ৬ নভেম্বর বিহার বন্‌ধ-এর ডাক দেন।

প্রধানমন্ত্রীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার বিপরীতে জয়প্রকাশকে কেন্দ্রে রেখে 'সংঘবদ্ধ বিরোধী ঐক্য'-র যাত্রা শুরু হয় ৬ মার্চ ১৯৭৫-এ। লালকেল্লা থেকে পাঁচ লক্ষাধিক লোক সংসদের দিকে এগিয়ে যায়। এতে অংশ নেয় কংগ্রেস, জনসংঘ, ভারতীয় ক্রান্তিদল ও সোশ্যালিস্ট পার্টি।

১৯৭৫ সনের ২৬ ফেব্রুয়ারি, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে অনুষ্ঠিত নাগরিক সম্মেলনে একই মঞ্চে বক্তৃতা করেন কংগ্রেস নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন, সিপিআই (এম) নেতা জ্যোতি বসু এবং জনসংঘ

Dhaka University Institutional Repository

নেতা হরিপদ ভারতী। তাঁদের পরবর্তী উদ্যোগ কলকাতায় মহামিছিল (৬ জুন ১৯৭৫)। সকল শ্রেণির মানুষের সম্মিলনে এ মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, জ্যোতি বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র সেন।

মার্কসবাদ ও সোভিয়েতবিদ্বেষী হওয়ায়, জনসংঘ, ভারতীয় ক্রান্তিদল ও সংগঠন কংগ্রেস, সিপিআই-এর দৃষ্টিতে জয়প্রকাশ নারায়ণের এ উদ্যোগ ছিল ফ্যাসিবাদের শামিল। এ-কারণে তারা রাজ্য কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বদ্ধ হয়।

সিপিআই (এম) জে.পি.ও-র দাবির সঙ্গে একমত পোষণ করলেও তাদের দিল্লি পার্লামেন্ট অভিযানে অংশ নেয়নি। বরং তারা কলকাতায় আলাদা সমাবেশ করে। ১২ জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে ইন্দিরা গান্ধীর লোকসভার আসন বাতিল হলে বিরোধী নেতারা ১১-১৫ জুন প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবিতে রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে রাষ্ট্রপতির কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করেন। কিন্তু ইন্দিরা পদত্যাগ করতে রাজি হন না। নির্বাচনী মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর লোকসভায় ভোটাধিকার ছাড়া আর সব ক্ষমতা ও অধিকার অক্ষুণ্ন থাকবে বলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রায় দেন (২৪ জুন ১৯৭৫)। ২৬ জুন ১৯৭৫ রাষ্ট্রপতি আপৎকালীন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। গ্রেপ্তার হন বিরোধী পক্ষের নেতা-কর্মীরা। সুষ্ঠুভাবে শাসন পরিচালনার জন্যই এ ব্যবস্থা নিতে হয়েছে বলে রাষ্ট্রপতি জাতির উদ্দেশে দেয়া বেতার ভাষণে জানান। জরুরি অবস্থা জারির এক সপ্তাহ পর ইন্দিরা গান্ধী ২০ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে যুব কংগ্রেসের নেতা হিসেবে ছোটো পুত্র সঞ্জয়কে রাজনীতিতে আনেন ইন্দিরা গান্ধী। তাকে কেন্দ্র করে রাজনীতির আবহ হয়ে ওঠে সন্ত্রাসনির্ভর। ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকায় বিরোধীদের কাছে সঞ্জয় হয়ে ওঠেন—"সংবিধান-বহির্ভূত কর্তৃত্ব, একস্ট্রা-কনস্টিটিউশনাল অথরিটি।"[৫৫]

চীন, উত্তর কোরিয়া ও আলবেনিয়া ব্যতীত সকল সমাজতান্ত্রিক দেশই এমনকি ভিয়েতনাম পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন জানায়। র‍্যাডিক্যাল পত্র-পত্রিকা ('ফ্রন্টিয়ার', 'দর্পণ') বাজেয়াপ্ত হয়। 'কলকাতা' পত্রিকার 'জরুরি অবস্থা' প্রতিবাদী সংখ্যা বের করায় সম্পাদক জ্যোতির্ময় দত্ত রাষ্ট্রদ্রোহী বলে সাব্যস্ত হন। ইন্দিরার "স্বৈরাচার-বিরোধিতার অভিনব পদ্ধতি হিসেবে গৌরকিশোর ঘোষ মশায় মাথা ন্যাড়া করে লোকসমাজে আবির্ভূত হলেন।"[৫৬] পরিণামে কারারুদ্ধ হন তিনি। এসব সাংঘর্ষিক ও আত্মঘাতী রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে, নিদারুণ মানসিক চাপে ১৯৭৬ সালের ৪ জুন বেলা এগারোটায় সমরেশ বসু হৃদযন্ত্র আক্রান্ত হয়ে ক্যালকাটা হাসপাতালে ভর্তি হন। সুস্থ হওয়ার পরও শারীরিক-মানসিক অবসাদ ও ক্লান্তিতে সমরেশ বসু গতিময় উদ্দাম পূর্ব জীবনে আর ফিরে যেতে পারেননি।

আত্মবিশ্বাসী ইন্দিরার পরামর্শে ১৯৭৭-এর ১৮ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দিয়ে মার্চে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। জয়প্রকাশ নারায়ণের চেষ্টায় আদি কংগ্রেস, জনসংঘ, ভারতীয় লোকদল, সোশ্যালিস্ট পার্টিসহ অ-বাম বিরোধীদল নিয়ে গড়ে ওঠে জনতা পার্টি। সভাপতি মোরারজি দেশাই, সহ-সভাপতি চরণ সিংহ, সম্পাদক হলেন সুরেন্দ্রমোহন। জগজীবন রাম সরকার ও কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ (২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭) করে নতুন দল 'কংগ্রেস ফর ডেমোক্রাসি' গঠন করেন। বিরোধী দল হিসেবে জনতা পার্টি ও কংগ্রেস ফর ডেমোক্রাসি নির্বাচনকে সামনে রেখে জনগণকে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে আহ্বান জানায়।

Dhaka University Institutional Repository

১৬ মার্চ ১৯৭৭ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে জনতা পার্টি, কংগ্রেস ফর ডেমোক্রাসি ও সিপিআই (এম) বিজয়ী হয়ে বামফ্রন্ট সরকার গঠন করে। এ সরকারের আমলে "পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও অপারেশন বর্গার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ চিত্র অনেকখানি পরিবর্তিত"[৫৭] হলেও "প্রশাসনিক ব্যর্থতা, উন্নয়ন নীতির রূপায়ণে ব্যর্থতা এবং সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতা,"[৫৮] বিভিন্ন রাজ্যে তীব্র খরা, বিধ্বংসী বন্যা ও প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে অন্তর্দলীয় কলহের সূত্র ধরে জোটের ভাঙনের ফলে সরকার নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ১৯৮০ সালের সপ্তম লোকসভা নির্বাচনে পুনরায় বিজয়ী হয়ে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে। কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয় কংগ্রেস সরকার।

১৯৮০ সালের ২৩ জুন প্লেন দুর্ঘটনায় সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যু হলে রাজনীতিতে আসেন রাজীব গান্ধী। ৩১ অক্টোবর ১৯৮৪ দেহরক্ষীর গুলিতে ইন্দিরা গান্ধীর লোকান্তরের পর ১৯৮৫-এর জানুয়ারিতে সংসদীয় নির্বাচনে ইন্দিরা-পুত্র রাজীব গান্ধী ভারতে প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি, শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশ্ব-অগ্রগতির অংশী হয়ে ওঠে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ।

১৯৭১-এর পর ভারতীয় বিশেষত পশ্চিমবঙ্গীয় রাজনীতির অন্তর্ঘাতময় দ্রোহ-বিদ্রোহ ও অস্থিরতার কালে সমরেশ বসু মিথের জগতের বাতাবরণে সমকালীন জীবনকে দেখার চেষ্টা করেছেন। মিথের কল্পকথার সঙ্গে বর্তমানের মিথস্ক্রিয়ায় সন্ধান করেছেন পরস্পরিত (প্যারালাল) বিনির্মিত নতুন চরিত্র। "বর্তমানতা থেকে মুক্তিসন্ধানী হয়ে কাঙ্ক্ষিত সংগ্রামশীল নায়কের সন্ধানে তাঁর এ যাত্রা।"[৫৯] kv¤ (১৯৭৮), h‡×i †kl †mbvcwZ (১৯৮৪), cv‡PZm (১৯৮৪), c_v (১৯৮৬), Awš Íg cYq (১৯৮৭) উপন্যাসে সমরেশ বসু সকলের কাছে তুচ্ছ, অবহেলিত কিন্তু সমষ্টি মানুষের মুক্তিতে বিশ্বাসী নায়ককে খুঁজে পেয়েছেন। আলোচ্য কালপর্বে তিনি রাজনীতির সক্রিয় কর্মী ছিলেন না, ছিলেন দ্রষ্টা। কোনো আদর্শিক ব্যক্তির সহচর হওয়া নয়, সমরেশ বসু প্রত্যক্ষ করছিলেন জনবৈচিত্র্য। এই অস্তিত্বসংগ্রামী জনজীবনবৈচিত্র্যকে এ সময় তিনি মূল্যায়ন করেছেন মানববাদী ও মনুষ্যধর্মাবলম্বী জীবনদর্শন দিয়ে। এ পর্যায়ে বাংলার অস্তিত্ব-রক্ষা ও বিভ্রান্ত জীবনযুদ্ধের কথকতাই সমরেশ বসুর সাহিত্য।

১৯৭৮ সালে প্রথমা স্ত্রী গৌরী বসু অসুস্থ হয়ে পড়েন। একই বছরের ১৩ আগস্ট নৈহাটিতে অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত ও অতনু চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বন্ধু অসিতকুমার ভট্টাচার্যের সহযোগিতায় এবং নৈহাটি ও কলকাতার সমরেশ অনুরাগীদের আগ্রহে আয়োজিত সমরেশ-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন সমরেশ বসু। ১৯৭৯ সালের ৩ জুলাই গৌরী বসু পুনরায় হৃদযন্ত্রের আক্রমণে কলকাতায় উডল্যান্ড নার্সিং হোমে ভর্তি হন। ১৯৮০ সালের ১১ জুলাই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এ বছর, ১৯৮০ সালেই, সমরেশ বসু কালকূট নামে লেখা kv¤ উপন্যাসের জন্য আকাদেমি পুরস্কার পান। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর আত্মজৈবনিক মহাকাব্যোপম উপন্যাস hM hM Rx‡q। ১৯৮২ সাল থেকে মাসিক পত্রিকা 'মহানগর' সম্পাদনা করেন তিনি। ১৯৮২ সালের শেষের দিকে তিনি শান্তিনিকেতনবাসী ভাস্কর-শিল্পী বাঁকুড়ার রামকিঙ্কর বেজ-এর জীবন-অবলম্বী উপন্যাস †'wL bvB wd‡i-র তথ্যসন্ধানে শান্তিনিকেতন ও বাঁকুড়া যান। ১৯৮৫ সালের ৬ জুন পনেরো দিনের জন্য মস্কো নিউজ ক্লাবের প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে রাশিয়া গিয়ে সমাদৃত হন এবং মস্কো বেতারে ভাষণ দেন। এ সময় cRvcwZ উপন্যাস সংক্রান্ত মামলার রায় সমরেশের পক্ষে আসে। ১৮ নভেম্বর সমরেশ বসু বেলভিউ নার্সিংহোমে ভর্তি হন হৃদযন্ত্রের সমস্যায়। ১৯৮৬ সালের ৩ এপ্রিল হরিদ্বার কুম্ভমেলায় যাওয়ার পর মেলা থেকে পাঠানো প্রতিবেদন 'অমৃতংগময়' নামে 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ বছরই সন্তোষকুমার ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার এক হাজার টাকা এবং শিরোমণি পুরস্কার দশ হাজার টাকা লাভ করেন

Dhaka University Institutional Repository

সমরেশ বসু। তিনি ২৮ সেপ্টেম্বর জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে বইমেলা ও ভারত উৎসবে যোগদান করেন। সেখানে জার্মানিপ্রবাসী বাঙালিদের দুর্গাপূজার উদ্বোধনও করেন সমরেশ বসু। ১৯৮৬ সালের ১৮ অক্টোবর তিনি যান প্যারিসে। তিনি ১৯৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে স্বাধীন বাংলাদেশ ভ্রমণে আসেন। সমরেশ বসু ১৯৮৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ভুবনেশ্বর বইমেলা উদ্বোধন শেষে ২৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৮৮ সালের ১২ মার্চ বিকেল ৩.৪৫ মিনিটে কলকাতার বেলভিউ নার্সিং হোমে তিনি লোকান্তরিত হন। সমরেশ বসুর প্রয়াণের পর প্রকাশিত হয় তাঁর অসম্পূর্ণ বিরল সৃষ্টি †'wL bvB wd‡i (১৯৯২)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সংকট, কংগ্রেস-বিভক্তি, মার্কসবাদী দলের অন্তর্কলহ ও বিভাজন, নকশাল আন্দোলন, কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন প্রভৃতি ঘটনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সমরেশ বসু মানবীয় অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষ করেছেন, নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করেছেন; এবং তা প্রসারিত করেছেন জনসমাজে। মানব-অস্তিত্বের সঙ্গে বিশ্বসভ্যতার অন্তর্বন্ধনের ও ক্রমবিকাশের সারকথা অবহিত হওয়া একবিংশ শতাব্দীর করপোরেট পুঁজি-আক্রান্ত বিশ্বে অধিকতর জরুরি। সময়ের প্রতীপে ও বিপ্রতীপে, সংঘর্ষ-সমন্বয়ের ঘূর্ণাবর্তের মাঝ দিয়ে ব্যক্তি ও জনসমাজ-অস্তিত্ব কীভাবে ইতিহাসের গভীরে শিকড় সঞ্চার করে জীবনের সদর্থ খোঁজে, বারংবার খোঁজে—তার দীক্ষা ও শিক্ষা মেলে সমরেশ বসুর উপন্যাসে। স্বীকার করতেই হবে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভালো-মন্দয় মিশিয়ে সমরেশ বসু ছিলেন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহের প্রতীক পুরুষ।[৬০]

উল্লেখ বাঞ্ছনীয়, উপন্যাস সৃষ্টিতে সমরেশ বসুর উত্তরাধিকার তথা মায়ের ব্রতকথা ও কথকতা, চিত্রকর বাবা ও পরিবারজনের সংগীতসাধনা ও চিত্রাঙ্কনচর্চা; সমকালীন জীবনে তার শিকড়ায়ন এবং ব্যক্তিগত জীবনযাপন-স্তর ও স্তরান্তর, নিঃসন্দেহে দূরনির্দেশক ভূমিকা পালন করেছে।[৬১] কেননা, এ সবের রসায়নে, পরিশীলনে, চর্চায় গড়ে উঠেছে সমরেশ বসুর শিল্পিতস্বভাব, কথাশিল্পীর জীবনসংক্রান্ত দর্শন, মানবীয় পরিস্থিতিবীক্ষণ এবং বর্ণন-উদ্ভাবন কৌশল ও দ্যোতনাবিন্যাস। তাঁর চিত্রশিল্পচর্চা ও সংগীতানুরাগ ন্যারেটিভকে রূপান্তর করেছে চিত্ররূপময়তায়, চিত্ররূপকে গোত্রান্তরিত করেছে রূপক-প্রতীকী তাৎপর্যে। উপন্যাসে পরিবেশের নানা মুড অঙ্কনে বর্ণ-গভীরতার তারতম্যের মাধ্যমে বৈচিত্র্যসাধন ও চরিত্রের প্রতিকৃতি অঙ্কনে সমরেশের আগ্রহ, বাল্যকালের দেখার চোখের গভীরে নিহিত। প্রান্তজনের বিচিত্র জীবন সংযোগসূত্রেই তাঁর উপন্যাসে কথা বলে বহু স্বর। উপন্যাস বিবেচনায় বর্তমান সূত্রগুলো প্রয়োজন-অনুসারে ব্যাখ্যাত হবে।

তথ্যনির্দেশ

১ The novelist is free to choose his material only in a limited sense, and his choice is governed by the deepest compulsions of his personality. It is that dictate both the nature of his novels and the conclusions about life he expresses through them... every novel is an extended metaphor of the author's view of life —on life itself. Allen Walter, *The English Novel,* Penguin Publications : Fourth edition., London 1962, p.15

২ অলোক রায়, evsjv Dcb¨vm cZ¨vkv I cwß, "শিকড়ের সন্ধানে সমরেশ বসু," পুস্তক বিপণি : কলকাতা, জুলাই ২০০০, পৃ.১৭৮

৩ "...আড়াল দিয়ে খুঁজে ফিরি বোধহয় নিজেকেই। তারই নাম কালকূট। কিন্তু এমন নামটি কেন? তা হলে যে প্রাণটি খুলে দেখাতে হয়। দেখলেই বোঝা যাবে, বুক ভরে আছে গরলে, আপনাকে খুঁজে ফেরা, আসলে তো হা অমৃত হা অমৃত! বিষে অঙ্গ জরজর, কোথা হা অমৃত!... কালকূট ছাড়া, আমার আর কী নাম হতে পারে?," নিতাই বসু (সম্পাদিত), "ভোটদর্পণ"; Kvj KU iPbvmgM c_g LÐ, মৌসুমী প্রকাশনী : কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ.৩১

Dhaka University Institutional Repository

৪ "আমি জাগতিক, মানবিক, সকল তমসা আমার গায়ে মেখেছি। বুকে লেপেছি। নিকষ কালো তমসার সকল ব্যথা যন্ত্রণা আমি ধারণ করে আছি। আপনারা আমার পাখায়, মহাকালের দান সেই তীব্র কম্পনে প্রতিধ্বনিত, নিরন্তর আর্তনাদের কথা জানেন না। সেইজন্য ভাবেন, আমি কেবল মুখে গুনগুন করি। সত্যি কিন্তু তা না। আমার গুনগুনানিতে অনেক আর্তনাদ। কেউ শোনে, কেউ শোনে না। তবু মহাকালের এই নির্দেশ, আমাকে বলে যেতে হবে নিরন্তর। যদি আমার বুক ফাটে, চোখের জল পড়ে, অথবা হাসিও পায়, যা-ই হোক, আমার কাজ আমাকে করে যেতেই হবে।" নিতাই বসু, Kvj KU mg‡ik, জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স : কলকাতা, ১লা বৈশাখ ১৩৯৪, পৃ.২৫৯

৫ Kvj KU mg‡ik, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১

৬ কালকূট, "কালকূটের চোখে সমরেশ বসু", 'শব্দ' (সাহিত্য পত্রিকা), কালকূট বিশেষ সংখ্যা, সাধন বড়ুয়া সম্পাদিত, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড : কলকাতা, ৩ রা জানুয়ারী ২০১১, পৃ.২৯১-৯২

৭ Kvj KU mg‡ik, প্রাগুক্ত, পৃ.৪১

৮ সমরেশ বসু, "নিজেকে জানার জন্যে", সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত 'দেশ', সমরেশ বসু স্মরণে, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড : কলকাতা, ১৪ মে ১৯৮৮, ৫৫ বর্ষ ৮৮ সংখ্যা, পৃ. ২৫-২৭

৯ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, "শিল্পের যুগলবন্দী", 'দেশ', সমরেশ বসু স্মরণে, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬

১০ মুকুল গুহ, "এই ধ্বংসোন্মুখ সমাজে সটান থাকার আদর্শের বড় প্রয়োজন", স্বপন দাসাধিকারী (সম্পাদিত) mg‡ik em : gvb‡li K_vKvi, 'এবং জলার্ক', প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৪

১১ Kvj KU mg‡ik, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮

১২ বিবাহ কালে সমরেশ বসু ও গৌরীর বয়স নিয়ে ভিন্ন তথ্য দিয়েছেন সমরেশ-গবেষক ড. নিতাই বসু। "সতেরো বছরের বেকার রুগ্ন তরুণ সমরেশ একুশ বছরের স্বাস্থ্যবতী গৌরীকে নিয়ে তো আতপুরের বস্তীতে এসে উঠলেন।" Kvj KU mg‡ik, প্রাগুক্ত, পৃ.৬০

১৩ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, Zix n‡Z Zxi, মনীষা : কলকাতা, মে ১৯৮৬, পৃ.২৪৩

১৪ Zix n‡Z Zxi, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৪

১৫ Kvj KU mg‡ik, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮

১৬ অমলেশ ত্রিপাঠী, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, দশম মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪২০, পৃ ৩০৯-১৭

১৭ অপূর্ব্ব কুণ্ডু, evsjv I ev0vjxi w'bcwÄ, প্রভা প্রকাশনী : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৮, পৃ.৩৪৪

১৮ evsjv I ev0vjxi w'bcwÄ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৪। ৮ আগস্ট ১৯৪৪ পর্যন্ত ওই 'সরকার' কার্যকর ছিল।

১৯ অমলেন্দু সেনগুপ্ত, DËvj Pwjøk Amgvß wecøe, পার্ল পাবলিশার্স : কলকাতা, নভেম্বর ১৯৮৯। দ্রষ্টব্য : প্রথম পর্ব, পৃ. ১-৩৯

২০. evsjv I ev0vjxi w'bcwÄ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৯

২১ Zix n‡Z Zxi, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬০-৬১

২২ Kvj KU mg‡ik, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬

২৩ Kvj KU mg‡ik, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫

২৪ DËi½ উপন্যাসটি সমরেশ বসু ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি জেলে বসে লেখেন। প্রথম প্রকাশিত ও দ্বিতীয় লিখিত উপন্যাস এটি। ১৩৫৮ সালের আশ্বিনে 'বুক ওয়ার্ল্ড' থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ উপন্যাস উৎসর্গ করা হয় প্রবীণ বন্ধু নবকুমার দাশ ও একালের বন্ধু সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

Dhaka University Institutional Repository

mg‡ik em iPbvejx-র প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। একই সময় সমরেশ বসু তিন অঙ্কের নাটক †jevi Awdmvi রচনা করেন। পরে নাটকটির নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'প্রেত'। নাটকটির পাণ্ডুলিপি পরবর্তীকালে হারিয়ে যায়।

২৫ Zix n‡Z Zxi, প্রাগুক্ত, পৃ.৪১০-১১

২৬ "শের সর্দার" নামে একটি ছোটগল্প দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয় বলে ড. নিতাই বসু KvjKU mg‡ik গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, এ গল্পের লেখক হিসেবে বন্ধু দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় সুরথনাথের সাহিত্যিক নাম সমরেশ বসু নির্ধারণ করেন। দ্রষ্টব্য : KvjKU mg‡ik, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮

২৭ সমরেশ বসু, "আদাব", 'দেশ' সমরেশ বসু স্মরণে, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬-১৮

২৮ L.P. Sinha, *The Left Wing in India* 1919-1947, Popular Prokashan : Mumbai, India, 1965, p.65-70

২৯ সমরেশ বসু, "নিজেকে জানার জন্যে", 'দেশ', প্রাগুক্ত, পৃ.২৬

৩০ "নিজেকে জানার জন্যে", প্রাগুক্ত, পৃ.২৬

৩১ নবকুমার বসু, wPimLv, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ২০০৫, পৃ.৮

৩২ wPimLv, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯

৩৩ সমরেশ বসু, "নিজেকে জানার জন্যে", প্রাগুক্ত, পৃ.২৭

৩৪ wPimLv, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৪

৩৫ wPimLv, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৪

৩৬ wPimLv, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৫

৩৭ ড. নিতাই বসু : KvjKU mg‡ik, প্রাগুক্ত, পৃ.৯১

৩৮ সমরেশ বসু, "নিজেকে জানার জন্যে", প্রাগুক্ত, পৃ.২৮

৩৯ সমরেশ বসু, "নিজেকে জানার জন্যে", প্রাগুক্ত, পৃ.২৭

৪০ নবকুমার বসু, wPimLv, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৮-১৩৯

৪১ চিন্মোহন সেহানবিশ, "সাহিত্য ও গণসংগ্রাম", ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদিত) : gvKmev'x mwnZ¨ weZK 2q LÐ, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, পৃ.২৪৫-৪৬

৪২ অমলেন্দু সেনগুপ্ত, DËvj Pwjøk Amgvß wecøe, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৪

৪৩ ড.ঝুমা রায়চৌধুরী, K_vmwn‡Z¨ mg‡ik em : mvgwMK gj¨vqb প্রথম খণ্ড, কৌশিক দত্ত, পূর্বাশা : কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ.৫৮

৪৪ অমলেন্দু সেনগুপ্ত, †Rvqvi fvUvq lvU-mËi, পার্ল পাবলিশার্স : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৯৭, পৃ.৯৪

৪৫ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, "প্রজাপতি-চক্র", স্বপন দাসাধিকারী (সম্পাদিত) mg‡ik em : gvb‡li K_vKvi, 'এবং জলার্ক', পরিবেশক ॥ পুস্তক বিপণি : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১১ই ডিসেম্বর ২০০০, পৃ.৭৯-৮০

৪৬ †Rvqvi fvUvq lvU-mËi, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৯

৪৭ †Rvqvi fvUvq lvU-mËi, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৯

৪৮ †Rvqvi fvUvq lvU-mËi, প্রাগুক্ত, পৃ.১০১

৪৯ †Rvqvi fvUvq lvU-mËi, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৬

Dhaka University Institutional Repository

৫০ †Rvqvi fvUvq lvU-mËi, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯

৫১ †Rvqvi fvUvq lvU-mËi, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৩

৫২ †Rvqvi fvUvq lvU-mËi, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৭

৫৩ †Rvqvi fvUvq lvU-mËi, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৩

৫৪ †Rvqvi fvUvq lvU-mËi, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৪

৫৫ †Rvqvi fvUvq lvU-mËi, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৯

৫৬ †Rvqvi fvUvq lvU-mËi, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮১

৫৭ সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, "পশ্চিমবঙ্গ : সমাজ ও অর্থনীতি", কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), ¯vaxbZv 50 †cwi‡q, দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ.২২৬

৫৮ বিপন চন্দ্র মৃদুলা মুখার্জী আদিত্য মুখার্জি, fviZel ¯vaxbZvi c‡i 1947-2000, অনুবাদ-আশীষ লাহিড়ী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ আগস্ট ২০০৬, পৃ.৩১২

৫৯ দ্রষ্টব্য : পারভীন আক্তার, mg‡ik emi wgw_K Dcb¨v‡mi welq I wkíi/c, ধ্রুবপদ : ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০১২

৬০ দ্রষ্টব্য : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, "ভূমিকা ॥ সমরেশ বসু : পথে ও পথের বাঁকে, " পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, mg‡ik em : mg‡qi wPý, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৮৯, পৃ.পাঁচ-ছয়।

৬১ সমরেশ বসু, "নিজেকে জানার জন্যে," 'দেশ', প্রাগুক্ত, পৃ.২৫

তৃতীয় অধ্যায়

সমরেশ বসুর উপন্যাসে রাজনৈতিক জীবন ও তার রূপায়ণ

প্রথম পর্যায়

নয়নপুরের মাটি উত্তরঙ্গ বি টি রোডের ধারে শ্রীমতী কাফে

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সমরেশ বসুর উপন্যাসে রাজনৈতিক জীবন ও তার রূপায়ণ

প্রথম পর্যায়

নয়নপুরের মাটি উত্তরঙ্গ বি টি রোডের ধারে শ্রীমতী কাফে

উপন্যাসে রাজনৈতিক জীবনধারণা যে কালক্রমে রূপান্তরিত হয়েছে সে সম্পর্কে সচেতন থেকেই স্মরণ করতে হয় : The political novel is peculiarly a work of internal tentions[১] রাজনৈতিক পরিসর ও পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের উদ্বেগ, সংঘাত, অসঙ্গতি, জিজ্ঞাসা ও তার বিচিত্র প্রকাশকে রূপদান করা একালের ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিবীজ। শাশ্বত মানবসত্তা এবং জীবন-অস্তিত্বের নিগূঢ় ও জটিল প্রকাশ কীভাবে সমসময়, সমাজ, বিসঙ্গতি ও ইতিহাসের ধারাবাহিক, রাজনীতিক ঘূর্ণাবর্তে অগ্রগামী হয়ে ওঠে—তারই কথকতা একালের রাজনৈতিক উপন্যাসের উপকরণ। 'কীভাবে' কথাংশের মাঝে নির্দেশিত হয়েছে মানবীয় বহমান চিরায়ত সত্তা—বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, অবরোধ, জয়-পরাজয় কিংবা অন্তর্গত বিবশ বিবরবাসী হয়ে কোন কাঠামোয় তার কথা জীবনরূপ পায়। এই জীবন রূপায়ণের বৈচিত্র্য নির্ভর করে ঔপন্যাসিকের জীবনবীক্ষণ ও জীবনাভিজ্ঞতার বিস্তার ও গভীরতার উপর।

নয়নপুরের মাটি

শোষিত শ্রেণি, মধ্যশ্রেণির স্বার্থপরতা, নিপীড়িত শ্রমজীবী (কারখানার হোক, আর কৃষিজীবী, কিংবা ধীবর শ্রেণি হোক) ও উপনিবেশজাত সংকর ধনবাদী সমাজ আর ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত তথা জমিদার শ্রেণির অসঙ্গতি—এ সামূহিক জীবনাভিজ্ঞতার শিল্পরূপ সমরেশ বসুর bqbc‡ii gwU[২]। মানবসমাজ, ব্যক্তির অন্তর্জগৎ-বহির্জগৎ, সত্তাজিজ্ঞাসা ও অস্তিত্বসংকট জন্ম দেয় অর্থনৈতিক-সামাজিক শ্রেণি-সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি, এবং সৃষ্ট হয় সার্বিক বিসঙ্গতির। আর এ সবকিছুর উপর আধিপত্য বিস্তার করে ধনবাদী রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ক্ষমতা দখল—যাকে চিহ্নিত করা হয় রাজনীতি বলে। সমরেশ বসু bqbc‡ii gwU উপন্যাসের গঠনকৌশলে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের স্বরূপ নির্মাণের মধ্যদিয়ে প্রকৃত অর্থে শ্রেণিশোষণ, শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও অর্থনৈতিক মুক্তির সাম্যবাদী দর্শন প্রয়োগ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়, রাজনৈতিক বিষয়-অবলম্বী হলেই কেবল নয়, "...বৃহত্তর ও গভীরতর জন-সমাজের চেতনা, নির্মাণ-ভাঙ্গনের প্রক্রিয়া যে সব উপন্যাসে আছে, সে সবই যথার্থ রাজনৈতিক উপন্যাস।"[৩]

bqbc‡ii gwUর কেন্দ্রীয় চরিত্র মহিমের ব্যক্তিজীবনে শিল্পী হয়ে ওঠার ভিত্তিভূমি হিসেবে লেখকের চেতনায় সক্রিয় ছিল কৃষকবিদ্রোহের রাজনৈতিক-সামাজিক পশ্চাদ্‌ভূমি। রাজনীতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিজীবনকে সমাজ-পরিসরকেন্দ্রে স্থাপন করেই সমরেশ বসু শিল্পী মহিমের রূপান্তর ঘটিয়েছেন।

মহিমের শিল্পী হয়ে-ওঠা পারিবারিক উত্তরাধিকার নয়, তার স্বোপার্জিত। এক্ষেত্রে বিকশিত জীবনের পথে তাকে আর একধাপ এগিয়ে নিয়েছে গৌরাঙ্গসুন্দর। শৈশবে গ্রামের কুমোর অর্জুন পালের মূর্তি গড়া দেখে হাতেখড়ি হয় মহিমের। মহিমের চোখে এ দীক্ষাগুরু স্বয়ং বিশ্বকর্মাকে দেখতে পেয়েছিলেন। গ্রামের শম্ভু মালা মূর্তি গড়ার মাটি সন্ধানে ব্যস্ত মহিমকে দেখে "বেঁচে থাকো, বেঁচে থাকো"—বলে আশীর্বাদ জানায়।

Dhaka University Institutional Repository

গৌরাঙ্গ মহিমের প্রথম সৃষ্টি "হাতখানেক লম্বা দশভুজার মূর্তি" দেখে তার মাঝে সম্ভাবনাময় শিল্পীর দেখা পেয়ে উচ্চারণ করে : "হবে, তোমার দ্বারা হবে (পৃ.২২)।"এরপর কলকাতায় নিয়ে শিল্পী মহিমের সামনে বৃহৎ জগৎকে মেলে ধরেছে গৌরাঙ্গ। কলকাতা গিয়ে গৌরাঙ্গর সঙ্গে "রাজধানীর মিউজিয়ম চিত্রশালা, আর্টস্কুল" ও কৃষ্ণনগর ঘুরে মহিম বিস্মিত হয়েছে। সেই সঙ্গে শিখেছে "বিলাতি মাটি আর নরম মাটির মিশেল সহ নানান বস্তু মিশ্রিত মশলায়" কীভাবে ভাস্কর্য গড়তে হয়। বিশ্বখ্যাত শিল্পী ও তাঁদের শিল্পকর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তার কাজের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না পাওয়া মৃৎশিল্পী মহিম, শেষ পর্যন্ত জীবনের শিক্ষার সঙ্গে শিল্পের সমন্বয় ঘটাতে সমর্থ হয়েছে। কলকাতার জীবনে হর-পার্বতী, বুদ্ধদেবের মূর্তি তৈরি করলেও, নয়নপুরের সঙ্গে মহিমের সম্পর্ক ছিল আত্মিক, মর্মগত। সেখানকার মাটি ও মানুষের টানেই প্রায় তিন বছর পর ভাই ভরত ও বউদি অহল্যার স্নেহ-ভালোবাসার অনুরোধে মহিম ফিরে আসে নয়নপুরের মাটিতে।

মহিমের শিল্পীসত্তা বিকাশের নেপথ্য শক্তি হিসেবে সমরেশ বসু কৃষকসমাজের ওপর জমিদার-জোতদারদের চিরকালীন শোষণ-অত্যাচার, তাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ঐক্যশক্তির জাগরণ-অভীপ্সা ও কৃষক আন্দোলনের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পটভূমিকে ব্যবহার করেছেন। তেভাগার দাবিতে ভাগচাষিদের অর্থনৈতিক অধিকার সচেতনতার প্রকাশ নিচের অংশে :

গতানুগতিক হেমন্ত নয়, নতুন হেমন্ত। আশার সঙ্গে নতুন প্রতীক্ষা। গ্রামে গ্রামে ঢোল পেটানো হয়েছে, বাড়তি খাজনা বন্ধের ও বেগার কাজের। তার সঙ্গে আর একটি কথাও ছিল যে, নজরানা বন্ধ। যে দেবে সে হিন্দু হলে গরু খায়। মুসলমান হলে শুয়োর খায়। ভাগের কথায় সাব্যস্ত হয়েছে, বীজ লাঙলে খাট্‌নি ফসল ফলানো—এ দায় রইল চাষীর। তারপরে যে যার ভাগ নেও আপন আপন খাট্‌নি ঝাড়াই মাড়াই করে। লোক চাইলে মজুরি দিতে হবে তার। মোদ্দা কথা হল, না খাটি তো দাঁতছড়কুটি আর পাই খাটি তো পাই চাই। গতর বলে কথা। (mg‡ik em iPbwejx ১, পৃ.১৯)

ইংরেজদের বাড়তি খাজনা মেটাবার অর্থের প্রয়োজনে জমিদারদের বাড়তি নজরানা কিংবা বেগার খাটায় রাজি হয়নি নয়নপুরের ভাগচাষিরা।

হরেরামের বাড়িতে সমবেত হয়েছিল নয়নপুরের চাষি, মালা, কামার, রাজপুরের কোনো কোনো চাষি, এমনকি আশেপাশের গ্রাম থেকে আসা চাষিরাও। মহিমই প্রথম ঘোষণা দিয়েছিল নয়নপুর থেকেই শুরু হবে বেগার বন্ধের লড়াই। কিষাণ সভায় উপস্থিত সমবেত চাষিদের উদ্দেশে তার বলিষ্ঠ উচ্চারণ লক্ষণীয় :

জমিদারে ফাঁকি দিচ্ছে অ্যাদ্দিন সরকারের খাজনা। সে ফাঁক ধরা পড়ে জমিদার তার দেনা শুধতে চায় মোদের মাথা কেটে। কথা নাই বাত্তা নাই, হুট্ বলতে খাজনা বেড় গেল, কিন্তুক মোরা কেন তা দিব? এ বাড়তি খাজনা না দিলে জমিদার হুজ্জোত করবে। করুক, মোরা তবু মানব না। তা ছাড়া, জমিদারে আজকাল আমাদের হাত থেকে জমি নিয়ে একুনে হাজার হাজার বিঘা অন্য লোকের হাতে তুলে দিচ্ছে। চাষ জমির খাজনার বিধেন তার আলাদা। তার ফলে আমরা উচ্ছেদ হইলাম। এই জমিদারে আর মালিকে মিলে যা শুরু করেছে তার এট্টা পিতিবিধেন না করলে মোদের কম্মো সারা। (১০, পৃ.৫৭)

সমবেত এ জনতার সামনে হরেরাম আরও ঘোষণা দেয় আগামি বছর থেকেই ভাগচাষিরা শুরু করবে ভাগের লড়াই। এটা শুনে "মহিমের চোখ সল্‌তের প্রদীপের মতো জ্বলে" (পৃ.৫৭) উঠেছিল। এসব মানুষের বাঁচার তাগিদে মহিম যদি কাজ না করে তবে শিল্পসাধনা আপসের পথ ধরবে—গৌরাঙ্গের এমন কথাও মনে হয় তার। নিজের ভেতরে সঞ্চারিত হয় এক অভূতপূর্ব আলোড়ন। শিবের মিথ-প্রতীকাশ্রয়ী বোধের আবেগ নিচের অংশে :

মনে হল, সে যেন বহুদিন পরে হঠাৎ দেশে ফিরে এসেছে, এসেছে আপন মানুষদের কাছে। আর এই হরেরাম দা। নিজের উপর শুধু ধিক্কার নয়, বুকটা ভরে উঠল মহিমের। নয়নপুরের চাষী মনিষ্যিরা আজ সকলেই নিধনের জাগ্রত শিব। সমাহত, ক্রুদ্ধ। চোখে চোখে আগুন, সে আগুন ছড়িয়ে পড়ল মহিমের বুকে। (১০, পৃ.৫৮)

এ আন্দোলনের অংশী হিসেবে মহিম বেগার বন্ধের ধর্মঘটের জন্য ঘট ও ধর্মদেবের মূর্তি বানানোর দায়িত্ব পায়।

Dhaka University Institutional Repository

ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদী শক্তির আগুন নেভানোর জন্য জমিদার-জোতদারশ্রেণি একের পর এক আঘাত করতে থাকে নয়নপুরের কৃষকসমাজকে। প্রথম আঘাত আসে অখিলের ওপর। জোতদার অক্ষয় না খাইয়ে হত্যা করেছে তার একমাত্র প্রিয় অবলম্বন মহিষ কালাচাঁদকে, যাকে সে সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থে কিনেছিল। সুযোগ মতো কালাচাঁদের ভাই হিসেবে শ্যামচাঁদকে কিনে দুটো চাকা বানিয়ে অর্থোপার্জনের স্বপ্নও দেখেছিল অখিল। কিন্তু দেনার দায়ে তার কাছ থেকে আলাদা সুদসহ ভরণপোষণের দায়বদ্ধতায় জোতদার কালাচাঁদকে নিয়ে গেলেও তাকে কোনো খাবার দেয়নি। আত্মগোপন করে অক্ষয় জোতদারের বাড়িতে গিয়ে কালাচাঁদকে রোজ আদর করে আসত অখিল। কালাচাঁদের মৃত্যুর পর সে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। গ্রামীণ সমাজকাঠামোর এ শোষণ-বর্বরতাকে শিল্পীর বিমুগ্ধ বিস্ময় ও মানবীয় সংবেদনশীলতায় অনুভব করেছে মহিম। শিল্পের আধারে এটিকে ধারণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। অক্ষয় জোতদারের অত্যাচারে মৃত মোষ কালাচাঁদের পিঠে ক্রন্দনরত অখিলের মর্মন্তুদ মূর্তি মাটি দিয়ে গড়ে মহিম নিজের দেশকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

মৃত মোষের পিঠে অখিলের হৃদয়-ক্ষত আলিঙ্গনের ভাস্কর্য গড়তে গিয়ে মহিমের অস্থিরতা—শিল্পীর প্রতিবাদের ভাষা-সন্ধান, কথাশিল্পী সমরেশ বসুর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে নিচের অংশে :

> মহিম বুঝি পাগলই হয়ে গেছে। কাজ আর কাজ। নিষ্পলক চোখ, কখনও ঘাড় বাঁকায়, আপন মনে কথা বলে, হাসে আবার গুম হয়ে বসে থাকে। প্রহর গড়ায়। কখনও মনে হয়, সে যেন নয়নপুরে নেই, অন্য কোথাও চলে গেছে! কখনও দেখে বিরাট একটা মোষ আকাশের কোল ঘেঁষে ভয়াল বেগে ছুটে চলেছে ! যার দিকে চায়, তাদের সকলেই যেন অখিল বলে মনে হয়। কাজের মাঝেই এক অদ্ভুত আবেগে সে হঠাৎ কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থাকে। সেটা পলায়ন নয়, যেন মায়ের কোলে স্তন পান করতে করতে হঠাৎ শিশু আনমনা হয়ে স্তন্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, আবার স্তন মুখে গুঁজে দেয়, তেমনি এক খেলা। কখনও কখনও আপনমনেই তীক্ষ্ণ চোখে যেন লক্ষ করে, একটা মানুষের টুকরো টুকরো হাড় পড়ে আছে তার কাছে, তার প্রতিটি গ্রন্থির সঙ্গে গ্রন্থি বাঁধতে গিয়ে সে যেন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। দেহের থেকে আলাদা করে নেওয়া সমস্ত তন্ত্রী জট পাকিয়ে গেছে, কেমন করে সে সব সারা অঙ্গে ঠিক করে পরিয়ে দিতে হবে, যেন খেই হারিয়ে ফেলছে তার। তার পর আচমকা তার চোখের সামনে একটা জ্যান্ত মানুষের ভেতরটা যেন ধরা পড়ে যায়। একটা অদ্ভুত কলকল শব্দে দিকে দিকে রক্তের ওঠা-নামা, বিচিত্র ভাঁজ মাংসের, তার ভেতরে একটা অন্ধ গুহা। সেখানে কিছু বা দেখা যায়, কিছু যায় না। এমনি সব অদ্ভুত চিন্তা। (১৬, পৃ.৭৩)

মহিমের সৃষ্ট এ মূর্তির মাঝে রূপ পায় রক্তক্ষরিত কৃষকসমাজের বঞ্চনা-লাঞ্ছনা। ওরা ভিড় করে মহিমের বাড়িতে। অখিলের পর শোষকগোষ্ঠীর আঘাত আসে হরেরামের ওপর। হরেরাম সম্পর্কে ঔপন্যাসিক জানান :

> হরেরাম ভাগচাষী আধিয়ার। নিজের জমি নাই তার, ভূমিহীন চাষী। পরম্পরায় এ অবস্থা ছিল না তার। বাপ মরার পরও কিছুদিন ছিল খালের ধারের সাত বিঘা জমি। কিন্তু এই নয়নপুরের আরও বহু চাষীর মতো একদিন দেখা গেল—বাবুদের বাড়ির সেই লাল কাপড়ের মলাটের মোটা মোটা রাক্ষুসে খাতাগুলোর পেটে হরেরামের খালের ধারের জমিটুকু লেখা হয়ে গেছে। সে যাওয়া যে কী ভীষণ, কী সাংঘাতিক, তা নয়নপুরের ঘরে ঘরে জানা আছে। আজও জানছে, জানবে ভবিষ্যতে। (৭, পৃ.৪৭)

চাষিদের এ ঐক্যচেতনা তথা সম্ভাবনাময় আন্দোলনকে শুরুতেই বিনাশ করবার লক্ষ্যে নয়নপুরের জমিদার কৃষক-আন্দোলনের সংগঠক হরেরামকে হত্যা করেছে, কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের ঐতিহাসিক চরিত্রানুসারে পুলিশ এসেছে জমিদারদেরই স্বার্থে। হেমচন্দ্র বসু অখিলের মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে প্রচার করলেও কৃষকসমাজের কাছে প্রকৃত সত্য গোপন থাকেনি যে—জমিদারদের পুরোনো প্রথা 'বাঁশডলাতেই' হরেরামকে হত্যা করা হয়েছে। মহিমের কানে কানে কৃষক ভজন বলে ওঠে "ওরা বুঝি ভাবছে,

Dhaka University Institutional Repository

হরেরামেরে মেরে ফেলে মোদের চুপ মারিয়ে দেবে। কিন্তুক, আগুন ওরা জ্বালল হাতে। হরেরামের মন্তর মোরা ভুলব না।"

জমিদার-জোতদারের ষড়যন্ত্রে নিহত হরেরামের বীভৎস মুখের ভাস্কর্যও প্লাস্টার দিয়ে গড়ে মহিম। মৃত হরেরাম তার শিল্পীসত্তাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে যায়। নিচের অংশটি লক্ষণীয় :

মৃত হরেরামকে চোখে পড়তেই মহিমের মনে হল তার হৃৎপিণ্ডটা যেন টিপে ধরেছে কেউ।---একি মরা মানুষের মুখ। এ তো মেরে ফেলা মানুষের মুখ। খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি হরেরামের মুখে। ভ্রূকুটি গোলচোখ, স্থির, নির্নিমেষ চোখের মণি। যেন হঠাৎ রাগে কটমট করে তাকিয়ে আছে। মুখ খানিক হাঁ করা। চিত করে ফেলেচে বলেই বোধ হয় জিভটা বাইরে এলিয়ে পড়েনি। তামাকের ধোঁয়ায় হল্‌দে ছোপ লাগা দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে। চোখের কোণে পিটুলিতে লাল রং গোলার মতো খানিকটা রক্ত। (১৯, পৃ.৮৯)

মহিমের এ বিশদ তীক্ষ্নবীক্ষণ শিল্পী সমরেশ বসুরই জীবনবোধ—বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে নিয়ত সংগ্রামশীল মানুষের জীবন পর্যবেক্ষণেরই সাক্ষ্য বহন করে। মহিম-চরিত্র সৃষ্টির প্রেরণা হিসেবে সমরেশ বসুর শিল্পবোধে শেষ অসমাপ্ত উপন্যাস †'wL bvB wd‡i-র রামকিঙ্করের স্মৃতি সক্রিয় ছিল কি না, এটি প্রসঙ্গতই স্মরণে আসে। শৈশব থেকেই রামকিঙ্করের মনে মানুষের জন্য যে গভীর সহানুভূতি ও সহমর্মিতাবোধ তাঁর 'জীবন ও শিল্পের যুগলবন্দি' হয়ে 'গভীরতম সত্য রূপে ফুটে ওঠে' মহিমের মাঝেও তারই প্রকাশ ঘটেছে। নিচের অংশটি লক্ষণীয় :

পুবে লক্ষ্যাতোড়ার দক্ষিণ বন থেকে, সারিবদ্ধ মহিষের গাড়ি বেরিয়ে আসছে। খালি গাড়িগুলো, নদীর স্রোত ডিঙিয়ে, চরের ওপর দিয়ে উত্তরের ওপারে যাচ্ছে। আর সতীঘাটের উঁচু চড়াইয়ের পাড়ের কাছে, কাঁড়া দুটোর গায়ে সপসপ ছপটি পড়ছে। ঘাড়ে তাদের জোয়াল। গাড়িতে বিশাল বড় শাল গাছের গুঁড়ি অনেকগুলো। দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। চাকায় শুয়োর ডাকা কঁকানি। মহিষ দুটো জল পেরিয়ে, চড়াইয়ের উঁচুতে উঠতে পারছে না। এদের পাগুলো এখনও ভেজা। মানুষ আর গরু-মহিষের চলাফেরায়, উঁচু লাল পাড়ও ভেজা। শালগুঁড়ির বোঝা নিয়ে, লাল মাটির চড়াইয়ে উঠতে পারছে না। কাঁড়া দুটোর শরীরের পেশিগুলো ফুলে উঠছে। শিংসুদ্ধ মাথা নুইয়ে, ঠেলে ওঠবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। লাল চোখগুলো যেন ফেটে পড়ছে। কিন্তু হাঁটু যেন ভেঙে না পড়ে, সেই সাবধানে ওরা শক্ত। তা হলে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে। অথচ ওদের সামনের পাগুলো হড়কে যাচ্ছে।

গাড়ির চালকের খালি গা, মহিষের মতোই কালো। কোমরের কাপড় নেংটির মতো আঁটসাঁট জড়ানো। মাথায় গামছা বাঁধা। খাটো শক্তপোক্ত শরীর। তার চোখ দুটোও মহিষের মতো লাল। রাগে ক্ষ্যাপা লাল চোখ, আর শক্ত চোয়াল। ছপটি দিয়ে কাঁড়া দুটোকে পিটছে। গালি দিচ্ছে, 'রাজার বিটা কি তুরা, আঁ? শালা, সাধে কি বুল্যেচে, বামুন বাঁদর মষ, তিন ছেড়্যে বস। তোদের উয়াতে ল্যাজ গোঁজা করব।' বলছে, আর সপসপ ছপটি চালাচ্ছে।

'অই, মের নাই গ খুড়া।' রামকিঙ্কর লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। বালকের চোখে উদ্বেগ।

মুখে কষ্টের অভিব্যক্তি। দৃষ্টি মহিষ দুটোর দিকে।"[৪]

bqbc‡ii gwU উপন্যাসেই সমরেশ বসু সর্বপ্রথম দেখাতে চেষ্টা করেছেন সামষ্টিক বাস্তবের অংশী হয়েই, ব্যক্তি বৃহত্তর সমাজ-রাজনীতিকে পর্যবেক্ষণ-পরিসরে সত্য করে তোলে, তাকে বিনির্মাণ করে।

হরেরামের মুখ গড়ার পর মহিম ঝড়ের কারণে অপঘাত মৃত্যুপ্রাপ্ত সুতীব্র জীবনপিপাসু কুঁজো কানাইয়ের মূর্তি তৈরি করে। একজন শিল্পীর প্রতিবাদী শক্তিকে শৃঙ্খলিত করার জন্য জমিদার হেমচন্দ্র বসু তাকে জমিদারি এস্টেটে 'মাইনে করা আঁকিয়ে' হিসেবে রাখতে চায়। অন্যদিকে জমিদারপুত্র হিরণের বিদুষী স্ত্রী ও গৌরাঙ্গর সহপাঠী উমা যে মহিমের গড়া বুদ্ধের ধ্যানস্থ মূর্তি গৌরাঙ্গর কাছ থেকে পেয়ে পরবর্তীতে শিল্পের জাদুকরকে দেখার 'আত্মভোলা বিমুগ্ধ' বিস্ময় নিয়ে মহিমকে দেখেছে। উমাও ভাস্কর মহিমকে নিয়ে কলকাতায় যেতে চায়—যোগ্য স্থান করে দিতে দেশে-বিদেশে। মহিমের সবিনয় অস্বীকৃতির পর

Dhaka University Institutional Repository

জমিদারপুত্র হিরণের বিদুষী স্ত্রী উমার বক্তব্য : —"না, ছোটলোক কখনো মানুষ হয় না।" গৌরাঙ্গর বলিষ্ঠ সমাজমনস্ক জীবনবেদ মহিমকে শোষিত শ্রেণির কাছাকাছি এনেছে। এ-কারণেই জমিদার হেমচন্দ্র বসুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পুজোর প্রতিমা গড়া ও চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় ক্ষুব্ধ, কটু কথার ছদ্মবেশে জমিদারবাবু মহিমকে শাসালেও শিল্পীর স্বকীয়তা-স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে চায়নি সে। অনিবার্য কারণে মহিম উমার স্বপ্নময় ব্যাকুল আহ্বানও বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে। "ধনতান্ত্রিক যুগের শিল্প উপযোগিতাবাদ"[৫]কে মূল্যায়ন করতে চায়নি মহিম, বরং বৃহত্তর মানবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে "ব্যক্তির স্বরূপ-শ্রেণিরূপ-শাশ্বতরূপের অন্বয়"[৬] সাধনের মধ্যদিয়েই সে শিল্পীজীবনের পূর্ণতার সাধনায় থেকেছে একাগ্র।

bqbc‡ii gwU উপন্যাসে গৌরাঙ্গসুন্দর মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী কমিউনিস্ট। সক্রিয়তার মধ্যদিয়ে নয়, অন্যান্য চরিত্রের উচ্চারণের মাধ্যমে বহু কণ্ঠস্বরে প্রকাশিত হয়েছে "...নয়নপুরের আপামর জনগণের সে অলক্ষ্য পরিচালক। ভাগচাষী ও ভূমিহীন চাষীদের জমিদারের শোষণ ও রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহ করার মন্ত্র সে-ই শিখিয়েছে।"[৭] সে গান্ধীবাদের 'ভাগবত মাহাত্ম্যে' (পৃ.২৮) বিশ্বাসী নয়, বরং তীক্ষ্ণ সমালোচক। শিল্পী মহিমকে 'ভাবরাজ্য' থেকে জীবনে বাঁচার লড়াইয়ের কাছাকাছি এনেছে গৌরাঙ্গ। সে নয়নপুরের ভূমিদাস কৃষকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করেছে, কৃষক সমিতি গড়ে তুলে জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে চাষিদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে প্রেরণা দিয়েছে। তার দেখানো পথ ধরেই সংগঠিত হয়েছে হরেরাম, অখিল, পীতাম্বর, ভজন, কুঁজো কানাইয়ের মতো কৃষক ও শোষিত শ্রেণি। ফলে ঔপনিবেশিক শাসকের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা মাথায় নিয়ে আত্মগোপনে থাকতে হয় তাকে।

কৃষকদের প্রতি জমিদারদের শোষণ-আধিপত্য বিস্তারে গ্রামীণ সমাজের ধর্মীয় কুসংস্কার, সহায়ক-শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এজন্য ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে না পারলে দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি কখনোই সম্ভব নয়। ঔপন্যাসিকের এ ভাবনাও প্রকাশিত হয়েছে গৌরাঙ্গ চরিত্রের মধ্যদিয়ে। গ্রামের মানুষের কাছে পাগলা বামুন হিসেবে পরিচিত বিপ্লবী গৌরাঙ্গ ঐশ্বরিক মহিমায় নয়, মানবতায় আস্থাশীল—জীবনের অধিকারই তার কাছে মুখ্য। সে বিশ্বাস করে ধর্ম ব্যবসায়ীরা ধর্মকে ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করে, সাধারণ মানুষের জীবনমান পরিবর্তনে তারা কোনো ভূমিকাই পালন করে না। এ কারণেই গোবিন্দের মতো তরুণকে নিরাকার ঈশ্বরচেতনাজাত জীবনবিমুখ প্রত্যয় থেকে জীবনবাদী করে তুলেছে সে। কুঁজো কানাইকেও সে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে তার এই শারীরিক বিকৃতি পূর্বজন্মের কোনো পাপের ফল নয়, বরং এর জন্য দায়ী আমাদের এই সমাজব্যবস্থা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা। এ সমাজকাঠামো পরিবর্তন করে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কারমুক্ত দেশ গড়ার স্বপ্নও কানাইকে দেখায় গৌরাঙ্গ।

সমরেশ বসু প্রারম্ভ পর্যায়ে রাজনৈতিক জনজীবন চিত্রায়ণের জন্য কোনো তত্ত্ব দ্বারা চালিত হননি, বরং এক্ষেত্রে বহির্বাস্তবতার জটিলতা কিংবা অন্তঃসংঘাত রূপায়ণের পাশাপাশি চরিত্রের মনোময় অন্তর্জীবনকেও অন্তরঙ্গভাবে দেখেছেন। মহিমের দীক্ষাগুরু মৃৎশিল্পী অর্জুন পাল, ভরত-মহিমের বাবা দশরথ মোড়ল, 'উদাসী ধার্মিক বাউল' থেকে কৃষকে রূপান্তরিত গোবিন্দ, বনলতা, তার বাবা নসিরাম, প্রণয়প্রার্থী নরহরি, প্রৌঢ়া সেবাদাসী হরিমতী, সর্বশেষ সেবাদাসী সরযূ, বনলতার বোন রাধা, কুঁজো কানাই, তার প্রার্থিত নারী কালু মালার সুন্দরী মেয়ে, জমিদারের পুত্রবধূ উমা প্রতিটি চরিত্র উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

মহিমের ভাই স্বাধীনচেতা ভরত জমিদারের অধীনে পরজীবী হয়ে বাঁচতে চায়নি। এ কারণে কাছারিতে গিয়ে জমিদারের সঙ্গে মামলার অন্যায় আপসও করেনি। শেষ পর্যন্ত মামলায় হেরে শয্যাশায়ী ভরত

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুবরণ করে। খাজনা আদায়ের কৌশলে তাকে 'দেনাদার' বানিয়েছিল জমিদার হেমবাবু। পরিণতিতে মামলার রায়ের তিন মাসের মেয়াদ পূর্তির আগেই মহিমকে বউদি অহল্যাসহ বাস্তুহারা হতে হয়।

উপন্যাসের কানাই মালা চরিত্রটি মানবিক সম্ভাবনায় পূর্ণ। দুঃখময়তা ও গ্লানির মধ্যদিয়েই জীবনকে জানতে হয়—জন্মকুঁজো কানাইয়ের জীবন তার প্রমাণ। মহিমের শিল্পকর্মের একনিষ্ঠ ভক্ত সে। নিজের বিকলাঙ্গ অস্তিত্ব নিয়েও জীবনকে গভীর আবেগে ভালোবেসে স্বপ্ন বুনে চলে বলেই কালু মালার সুন্দরী মেয়ের নিদারুণ দাম্পত্যজীবন সে মেনে নিতে পারে না। সমাজ তাকে মানুষ বলে মেনে নেয়নি—এজন্য কানাই মালা সৃষ্টিকর্তাকে দোষারোপ করে, 'ভগবানের বেব্‌ভোম' বলে এসব কর্মকাণ্ডকে। সেই কুঁজো কানাই চাষিদের সচেতন করতে কিষাণ সভার কাজে গেছে ন হাট মহকুমায়। মহিমকে সে এ বিষয়ে জানিয়েছে :

সেও এক মস্ত কাজ। এবার যে যার ধান কেটে নিয়া আসবে, ঝাড়াই মাড়াই করবে। তা সে জমিদারই হোক আর যাই হোক। তোমার জমিতে খাটি তোমার জমিতে বাস করি, তা বলে কি তোমার গোলাম থাকব? কাজ নাও, দাম দাও, হ্যাঁ। শুধু এই লয়, বাড়তি খাজনাও বন্ধ। অক্ষয় জোতদারের সঙ্গেও খুব একটা কিছু হবে ধানের ভাগের দখল নিয়ে। (১৬, পৃ.৭৪)

অর্থনৈতিক সংকটের পাশাপাশি ধর্মীয় কুসংস্কার তথা ধর্মের বেড়াজাল কীভাবে গ্রামীণ সমাজকাঠামোবদ্ধ মানুষের জীবনকে শৃঙ্খলিত করেছিল সমরেশ বসু গোবিন্দ চরিত্রের মধ্যদিয়ে সেটা দেখিয়েছেন। ধর্মসংস্কার-কুসংস্কার যে মানবজাগরণের পথে চরম প্রতিবন্ধক সমরেশ বসু তা জানতেন, আরও জানতেন অধিকতর দায়ী 'সমাজকাঠামো।'। কুঁজো কানাই নিজের বিকলাঙ্গতাকে 'ভগবানের বেব্‌ভোম' বলার তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ :

...তবে তোমার মুনি দেবতার এত বিবাদ কেন, জগতে এত দুঃখক্ কেন গো? কালু মালার সোন্দরী টুকটুকে মেইয়ে বুড়ো ভাতারের ঠ্যাঙানি রোজ খায় কেন।...তোমার সবার বড় ভগমানের বেব্‌ভোম যদি না হইবে, তবে মোরে কেন জন্ম দিল সম্‌সারে? (৮, পৃ.৫১)

কানাইয়ের কথা গোবিন্দর ধর্মান্ধ মনে দ্বিধার সঞ্চার করেছে। পাগলা গৌরাঙ্গর কাছে কানাইয়ের কথা বলেছে গোবিন্দ। সে তাকে বুঝিয়েছে কুঁজো কানাইয়ের সৃষ্টিকর্তা মানুষ, সে দায় মানুষকেই নিতে হবে। সন্তান প্রসবের উপযুক্ত পরিবেশের অভাব কিংবা তার মায়ের ওপর বাপের অত্যাচারের ফলেই হয়তো কানাই কুঁজো হয়ে জন্মেছে। বিজ্ঞানমনস্ক জীবনবেদের সঙ্গে যুক্ত পাগলা গৌরাঙ্গের যুক্তিনিষ্ঠ কথা গোবিন্দের মনে সাড়া জাগিয়েছে। সেই সঙ্গে শৈশবে দেখা তার বাবার ভৈরবী চক্রবর্তীদের ভাদ্র-বউ তাকে সহযোগিতা করেছে কুসংস্কার ও লোলুপতায় পূর্ণ ধর্মের বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে। গোবিন্দর ধর্মগুরু রাজপুরের আচার্য দ্বারা একদা ধর্ষিত ভাদ্র-বউয়ের সমাজে কোনো স্থান হয়নি। কিন্তু সেই ভাদ্র-বউ যখন সমাজবিমুখতায় ভৈরবী হয়ে শ্মশানকে আশ্রয় করেছে তখন সমাজ-অন্তর্গত মানুষ বুঝে না-বুঝে তার পায়ে ফুল-চন্দন নিবেদন করেছে। এ সত্য জানার পর গোবিন্দ 'উদাসী ধার্মিক বাউল' থেকে জীবনবাদী কৃষকে পরিণত হয়েছে। বনলতাকে নিয়ে নতুন জীবনসন্ধানী হওয়ার পাশাপাশি "রাজপুরের আচায্যির মুখোশ খুলে তার সর্বনাশের পথ তৈরি করছে (১৯, পৃ.৮৭)।"শেষ পর্যন্ত জোতদার-জমিদারের সঙ্গে বিবাদেও জড়িয়ে পড়েছে। তবে তার সামগ্রিক রূপান্তর প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে গৌরাঙ্গর নিচের কথাগুলো যাতে গ্রামীণ মানুষের নীচতার কারণ হিসেবে ধর্মকে দায়ী করা হয়নি, হয়েছে সমাজব্যবস্থাকে :

Dhaka University Institutional Repository

গোবিন্দ বিনাশ্রমে ফাঁকি দিয়ে খায়। সে ধর্ম নিয়ে থাকুক, ভগবানকে পাওয়ার জন্য যাক যেথায় খুশি, কিন্তু সংসারের হাড়-কালি-করা মানুষের শ্রমের খাবারে সে কেন উদরপূর্তি করবে?...বুঝলাম, হয়তো সে মানুষের চিত্তশুদ্ধির দায়িত্ব নিতে চায়, কিন্তু তা ধর্মের নামে কেন? দেশবাসী নিরক্ষর, ক্ষুধার্ত। ধর্ম দিয়ে কি তা ভরাট হবে? ঘরে বাইরে কেবলি কলহ, বিবাদ, হানাহানি মারামারি, ঘৃণা আর নীচতা। তার মূল তো ধর্ম নয়, তার অভাব, তার সমাজব্যবস্থা। যার পায়ের তলায় মাটি নেই, ধর্ম তার মাথায় কি ফুল ফোটাবে আপসে!...এমন একটা সময় গেছে যখন হিন্দু ভদ্রপরিবার সমাজের নিষ্পেষণ সইতে না পেরে ব্রাহ্ম হয়েছেন, বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মনীতির বিরুদ্ধে। কিন্তু আজকের মানবসমাজকে এক ইঞ্চি এগিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাও যে মানুষের আছে, ধর্মের দোহাই তুলে তা নিতান্তই অসম্ভব। একে বলে খোদার উপর খোদ্‌গিরি করা। মানলাম, ভগবানই যদি তোমাকে গড়ে থাকে, তবে গড়েছে তো মানুষ করে? তবে মানুষের মতো মানুষ না হব কেন? আমি করব আমার কাজ, অনাচার বাদ দিয়ে। বাঁচার পথে আছে অত্যাচার, অবিচার, আমি রুখব তাকে। তাতে যদি মরি, সে তো সবার বড় মরণ। যে আগুন লাগায়, আমি তাকে পরাস্ত করে নেভাব আগুন। সে-ই তো বলি তবে সেবা। (১৮, পৃ.৭৯-৮০)

শোষক চরিত্র হিসেবে এ উপন্যাসে এসেছে জমিদার হেমচন্দ্র বসু, অক্ষয় জোতদার, আমলা দীনেশ সান্যাল। হেমচন্দ্র গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেল খেটেছে। কারামুক্ত হয়ে বোসবাড়ির পরিবেশকে নতুন করে সাজাতে তথা সামন্ত আভিজাত্যকে খদ্দর দিয়ে ঢেকে রাখতে চাইলেও পারেনি। গৌতম বুদ্ধের ধ্যানস্থ মূর্তি গৃহে স্থান পেলেও জীবনাচরণে সহিংস সামন্তবাদী ভাবাদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে। এ-কারণেই জমিদারবাড়ি থেকে ফিরতে মহিমের বিলম্ব দেখে ভাই ভরত উৎকণ্ঠিত হয়। মহিমের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে অত্যাচারী জমিদারের কালান্তরের ইতিহাসকে অন্যাসক্ত অলংকারের আশ্রয়ে প্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক নিচের অংশে :

যাদের সঙ্গে জীবনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে শুধু অপমান, উৎপীড়ন, যাদের সঙ্গে সম্বন্ধটা বুকে হাত দিয়ে বলতে গেলে অত্যন্ত তিক্ত, তাদেরই এ আকস্মিক ডাক কেন? প্রশ্নটা বিস্মিত এবং উৎকণ্ঠিত। নয়নপুরের কত মানুষের ডাক পড়েছে এমনি অতীতে কতদিন। এখন গল্প হলেও শোনা গেছে, সে ডাকে হাজিরা দিতে গিয়ে জোয়ানমদ্দরা অনেকে ফিরেও আসত না। যদি বা আসত, কথায় বলে 'বাঁশডলার' রক্তাক্ত দেহ নিয়ে নিজের দাওয়াটিতে এসে চিরদিনের মতো চোখ বুজত। নয়নপুরের ওই প্রাসাদ, নয়নপুরের শতাব্দীর কোটি প্রশ্নের জবাবে মূক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাথরের কাছে জিজ্ঞাসা। পাথর কোনও দিন কথা বলেনি। ওই মৌন প্রাসাদ নয়নপুরের কাছে আজও বিভীষিকায়, লোভে, হাসি-কান্নায় এক বিচিত্র রহস্যের আড়ালে রয়ে গেছে। ওই প্রাসাদের মানুষের পরিবর্তন আজকাল চোখে পড়ে, প্রাসাদটার পরিবর্তন চোখে পড়েনি কোনওদিন, মানুষের নীরব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়নি আজও।...

শ্মশান পবিত্র, কিন্তু শ্মশানের আতঙ্ক কী দুর্নিবার! যেন কোন্ বিভীষণ রহস্যে ভরা, কণ্টকিত ভাবনায় মূঢ় করে দেয়, এনে দেয় আড়ষ্টতা। (৪, পৃ.৩২-৩৩)

হেমচন্দ্র বসু জমিদারির প্রতি একচ্ছত্র আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে অন্যতম উত্তরাধিকার বোনের সন্তানকে হত্যা করতেও দ্বিধা করে না। কৃষকসমাজকে বেগার শ্রমে বাধ্য করা, কৃষক বিদ্রোহ দমানোর জন্য জোতদারের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলা, ভরতের মতো অবাধ্য প্রজাদের মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে ভিটেমাটি নিলামে কিনে নেওয়ায় এটাই প্রকাশ পায় যে তার মাঝে 'স্বৈরতন্ত্রের দানব' ভিন্ন রূপে ক্রিয়াশীল। এজন্যই পাগলা গৌরাঙ্গের প্রতি কটাক্ষ দেখায় এবং মহিমকে চাকরি দিয়ে শিল্পীর প্রতিবাদের ভাষাকে দাসত্বশৃঙ্খলে বাঁধতে চায়। কিন্তু পারেনি। পরিণামে পৈতৃক ভিটা থেকে উৎখাত হয়ে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয় মহিম।

বাস্তুহারা হয়ে অহল্যার পিতৃগৃহের উদ্দেশে "মহিমের শিল্প-সাধনার অতীত দিন আর ভরতের প্রাণভরা ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষার রিক্ত সংসারের ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে তারা সকলে বেরিয়ে" আসে। তবুও সমরেশ বসু

Dhaka University Institutional Repository

নয়নপুরের মাটিতে হরেরামের সংগ্রামী সত্তাকে মৃত্যুঞ্জয় শক্তির মর্যাদা দিতে ভুলে যান না, যে অসংগঠিত-শক্তিতে নিহিত রয়েছে শোষকশ্রেণির অনিবার্য পরাজয়। নিচের বর্ণন-বয়নাংশ প্রতীকী ব্যঞ্জনায় পূর্ণ :

হরেরামের বাউরি বউয়ের কান্না বাতাসে ভর করে ছড়িয়ে পড়ছে সারা নয়নপুরে। সারবন্দি মেঘের দল ছুটে চলেছে উত্তরদিকে। হেলে পড়া সূর্যের আলো পড়ে সেই মেঘের ধারে ধারে যেন আদিম কালের পাথরের কিম্ভুতকিমাকার অস্ত্রের মতো দেখাচ্ছে। (২৫, পৃ.১০০)

উল্লেখিত দ্যোতনাময় প্রতীকী পরিচর্যা ও পরিস্থিতি-নির্মাণ-কৌশল সমরেশ বসুর প্রথম প্রণীত উপন্যাস bqbc‡ii gwUতেই উদ্‌ভাবিত হয়েছে, একাধিক স্থলে। এ উপন্যাসের সীমাবদ্ধতার চেয়ে সম্ভাবনার দিক বিবেচনা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে আমাদের মনে হয়। bqbc‡ii gwU সমরেশ বসুর প্রারম্ভ উপন্যাস। এ উপন্যাস আখ্যানবিন্যাসে অনুসৃত হয়েছে আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত ভিক্টোরীয় পদ্ধতি। সময়ের ব্যবহারে তিনি দিনপঞ্জির আবর্তন-রীতিকে প্রয়োগ করেছেন। সমরেশ উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রীয় কিংবা মধ্যবর্তী চরিত্রের প্রতিকৃতি-বৈশিষ্ট্যের শব্দরূপ পাওয়া যায়। এ উপন্যাসেও তার আভ্যন্তর সাক্ষ্য রয়ে গেছে :

...সে তখুনি চোখ নামাতে পারল না উমার দিক থেকে। খুবই সহজ ও অনাড়ম্বর বেশে সে এল। একটি কালাপেড়ে খদ্দরের শাড়ির সঙ্গে একটি সাদা জামা। দীর্ঘ সতেজ সবল দেহ, শান্ত, কিন্তু দীপ্ত মুখ। ঠোঁট দুখানিতে মমতার আভাস আছে, কিন্তু তা যেন নিয়ত কঠিন বিদ্রূপে বঙ্কিম। (৩, পৃ.২৯)

জীবন রূপায়ণে, পরিস্থিতি-উদ্‌ভাবনা সমরেশ বসুর সমগ্র উপন্যাসে দ্যোতক মোটিফ বা শিল্প-উপকরণ হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ। bqbc‡ii gwUতেও তার অঙ্কুরোদ্‌গম স্পষ্ট :

অহল্যা হাসল। নিঃশব্দ, নিষ্ঠুর সে হাসি। উমা তার জীবনেও কি এমন তীব্র শ্লেষের হাসি দেখেছে ! মহিমের সে হাসি দেখে মনে হল, এক দারুণ ঝড় পাকিয়ে ওঠার মতো আকাশের কোনও এক কোণ থেকে যেন হু হু করে কালো মেঘ অজান্তে কখন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে সারা আকাশে। (১৭, পৃ.৭৮)

সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক, bqbc‡ii gwUতে সাম্যবাদী শ্রেণিসংগ্রামের আধারে বিধৃত হয়েছে। কানাই মালার বিকৃত শরীর, গোবিন্দর প্রেমপিয়াসী বনমালার রুদ্ধ কান্না, চাষি অখিলের হাহাকার, হরেরামের বউয়ের শোকার্ত জঠর থেকে অকালপ্রসূত মৃত শিশু, চক্রবর্তী বাড়ির লুণ্ঠিতা বউয়ের যন্ত্রণাময় ঘৃণিত জীবন—ব্যক্তিজীবনের সব দুঃখবেদনার পশ্চাতে সমাজ-ব্যবস্থার অদৃশ্য হাতটিকে সুস্পষ্ট ক'রে তুলেছেন লেখক, যে সমাজ শোষক ও শোষিত এই—দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্য অনুসারে শোষক সেখানে একদিকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসক, অন্যদিকে সামন্ত-জমিদার ও তাদের অনুগত মহাজন জোতদার, ধর্মের ধ্বজাধারী আচার্য ব্রাহ্মণ। এইসব শক্তির নিরন্তর পীড়ন গ্রামজীবনকে কুসংস্কার-দারিদ্র্য অজ্ঞানতার অন্ধকারে ঠেলে রাখে। শোষিত মানুষের জাগরণ ও সংঘবদ্ধ শ্রেণিসংগ্রামের মধ্যে মাত্র আছে তাদের সুস্থভাবে বাঁচার প্রতিশ্রুতি। "নয়নপুরের মাটি"তে এই কথাই কাহিনী আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে।[৮]

কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকায় শোষকশ্রেণির বিরুদ্ধে গ্রামীণ জনমানসের ঐক্যবদ্ধ জাগরণ প্রচেষ্টা এবং তার মধ্যদিয়ে মৃৎশিল্পী মহিমের রূপান্তরই bqbc‡ii gwU উপন্যাসের শিল্পসত্য। শিল্পী ও শিল্পের দায়বদ্ধতা জীবনের কাছে—মানুষের কথা বলবে, সমরেশ বসুর অর্জিত এ জীবনবোধ অভিব্যক্ত হয়েছে মহিমের জীবনে। তার মাঝে মৃত্তিকা-মাতৃকা এবং স্বদেশ একীকৃত হয়ে একটি সৃষ্টিশীল শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কাকার আঁকা ছবির প্রতি সমরেশ বসুর কৈশোরক আকর্ষণ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে মহিমের মতো শিল্পীচরিত্র। যে শিল্পীসত্তা নিপীড়িত জীবন্ত ভাস্কর্য নির্মাণের মাধ্যমে তার প্রতিবাদ কিংবা দ্রোহকে প্রকাশ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরঙ্গ

'ইতিহাসের রাজনীতি' এবং 'রাজনীতির ইতিহাস'—এমন প্রহেলিকাময় স্ববিরোধী (Pradoxical) প্রতিপাদ্য আলোচনা সমরেশ বসুর DËi½[৯] বিবেচনায় নিষ্প্রয়োজন। অতীত সময়ের অবস্থা কেবল ঘটনা দ্বারা নির্ণীত হয় না, জনগণের কাছে তা কেমন অনুভূত হয়েছিল, সেও একটা প্রধান বিবেচ্য বিষয়। "অতএব ঐতিহাসিক ঘটনার জনশ্রুতিতে, বাস্তব ঘটনার সহিত মানব-মন মিশ্রিত হইয়া, যে পদার্থ উদ্‌ভূত হয় তাহাই ঐতিহাসিক সত্য"[১০] 'ঐতিহাসিক সত্য'কে সমরেশ বসু DËi½ উপন্যাসে ইতিহাসের জনবিবেচনার পরম্পরায় পুনর্নির্মাণ করেছেন, যার আদর্শিক ও বাস্তব অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে—জয়-পরাজয়ের দিকে নয়, পুঁজি-বিস্তারের নির্মমতার ফলে সামাজিক, ব্যক্তিক ও রাষ্ট্রকাঠামোর রূপান্তরের দিকে। সমরেশ বসু এ উপন্যাসে ব্যতিক্রমী শিল্পকৌশলে, ১৮৫৭ পরবর্তী ঘটনার সঙ্গে উপন্যাস-পরিসরের সর্বশেষ বহির্ঘটনা ও অন্তর্ঘটনার মাঝে জ্যা-বদ্ধ ধনুকের অনুরণন সৃষ্টি করতে পেরেছেন। কোনো অতীত ঘটনাই অতীত হয়ে যায়নি, চলমানতার সঙ্গে অন্তর্বয়িত হয়েছে। সমরেশ বসু তা সম্ভব করেছেন হীরালাল-লখাই চরিত্র সৃষ্টি করে, যার উৎসে আদ্যোপান্ত সক্রিয় ছিল 'মনসা লোকপুরাণ'। লাঞ্ছিত-বঞ্চিত শ্রমজীবীদের যাপিতজীবনের অভিজ্ঞতা, মানববৈচিত্র্য অনুধাবনের জন্য বহির্মুখী জীবনাকাঙ্ক্ষা, বাউলি-হাওয়ার ঘরছাড়া আহ্বান, মিথ-ব্রতকথার জীবনের প্রতি অন্তর্গত আকর্ষণ, নিসর্গের উদাসী সুরধ্বনির সমবায়ে, মিথস্ক্রিয়ায় এক বেদনাময় চৈতন্যে, ক্রমশ স্ফটিকায়িত হয়েছিল সমরেশের শিল্পী-মানস। পরে তিনি ক্রমশ পরিস্রুত হন মার্কসীয় দর্শন, রাজনীতি, সমকালীন সংকট-সংঘর্ষময় বিচলিত সংশয়, সংবেদ দ্বারা। সমরেশের কাছে সব রাজনীতি, দর্শন ও সব ধর্মের শেষ কথা ছিল—মানুষ, মনুষ্যত্ব ও মানবতাবাদ।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ছিল ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহে DËi½ উপন্যাসের নায়ক হীরালাল-লখাই বেরিলির রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ১৮৬০ সালের এক রাতে ফরাসডাঙার ফরাসি প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে গঙ্গার জোয়ারে ভেসে কাদামাখা শরীর নিয়ে এসেছিল জগদ্দল এলাকার সেনপাড়ায়। জগদ্দল-সেনপাড়ার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মনে হল 'সাপে-কাটা-মরা' মানুষটি মনসার করুণায় প্রাণ ফিরে পেয়েছে। ধর্মান্ধ বুড়ো পাটনির কাছে এমনিভাবেই সিপাহি হীরালাল হয়ে ওঠে লখীন্দর। নবজন্মপ্রাপ্ত হীরালাল-লখাই শেষ পর্যন্ত আশ্রয় পায় সর্প-দংশনে বড়ো ছেলেকে-হারানো ধর্মভীরু শ্যাম বাগদীর ঘরে। শ্যাম বাগদীর গৃহে আশ্রয় প্রাপ্তির পর, স্বামী নারান-উপেক্ষিতা কাঞ্চীবউয়ের সঙ্গে এবং পরে মুরলীদাসের আখড়ার উদ্ধত যৌবন সারদার প্রেমময় শরীরী সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে লখাই। ঔপন্যাসিক লখাই-চরিত্র অঙ্কনে শরীরী বাস্তবতা ও প্রকৃতির অনিবার্য নিয়মকে অস্বীকার করেননি। সমরেশ বসু লখাই-চরিত্রের তিনটি সত্তা—প্রথমত, সিপাহি বিদ্রোহের পরাভবে অন্তর্দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণালালনকারী যোদ্ধার মনোজগত; দ্বিতীয়ত, নারীপ্রেমের ফল্গুবেদনার রিক্ত-ব্যর্থ উপবলয়ের শূন্যতা এবং তৃতীয়ত, উপনিবেশিত ভারতের তথা কলকাতার হুগলিপাড়ের আর্থ-সামাজিক-ভাঙন-ধসে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পরাভূত, ক্রমপরাজিত মানুষের বৃহত্তর ইতিহাসের অন্তর্বয়নে গড়ে তুলেছেন হীরালাল-লখীন্দর-লখাই চরিত্র; তথা DËi½ উপন্যাস। এই নির্মাণ-পরিসরই DËi‡½র মহাকাব্যিক বিষয়।[১১] লখাই প্রত্যক্ষ করে : এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা—মিশে যায় হুগলিপাড়ের সেনপাড়া-জগদ্দলের নানা ধর্মের, নানা শ্রেণির, নানা জাতের, নানা বর্ণের মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের সঙ্গে। একটা আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে বিন্যস্ত হলেও, হীরালাল-লখাইয়ের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে প্রকৃত অর্থে সিপাহি বিদ্রোহ-পরবর্তী বৃহত্তর ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরাভবের বিপরীতে সদা-সক্রিয় প্রতিবাদী চেতনাকে প্রকাশ করেছেন সমরেশ বসু।

Dhaka University Institutional Repository

লখাই স্থানীয় জমিদার বাড়ির প্রহরী নিযুক্ত হলেও তার হীরালাল সত্তায় আজও সিপাহি বিদ্রোহে পরাজিত পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই জেগে থাকে। হীরালালের স্মৃতি-বিস্মৃতিতে, মানস-পরিক্রমায় প্রায়ই ভেসে ওঠে মহাবিদ্রোহের স্বপ্নদ্রষ্টা বীর তাঁতিয়া টোপির অসিধৃত তেজস্বী মূর্তি, নানা সাহেবের সাহসী রূপ, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের মাতঙ্গিনী রূপ ও তার পরিবার। উদ্ধৃত অংশটি লক্ষণীয় :

...আজ সে লখাই বাগদী, স্যানেদের প্রহরী।...তবু মাঝে মাঝে তাকে দেখা যায়, প্রহরী অবস্থায় বড় পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ঝাড়লণ্ঠনের দিকে চেয়ে থাকে, নয়তো শ্যামের ঘরের দাওয়ায় গালে হাত দিয়ে বসে কী যেন ভাবে। ডাকলে সাড়া নেই, খাওয়া ভুলে যায়, নাওয়া ভুলে যায়। সবাই বলে, মায়ের সঙ্গে কথা বলছে।...না, কথা সে বলে না। কয়েকটা ছবির ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো অংশ মাঝে মাঝে আচমকা তার চোখের উপর ভেসে ওঠে। সে ছবির কোথাও ভয়াবহ যুদ্ধ, কামানের ছুটন্ত গোলার অগ্নিকণা, মাত্র একবার দেখা বিদ্রোহী সেনাপতির বীরত্বব্যঞ্জক মুখ। তারপর পরাজিত বিচ্ছিন্ন এক পলাতক সিপাহি হাওয়ার আগে ধুলোর ঝড়ে জনপদের ধারে ধারে জঙ্গল মাঠ পাহাড় ভেঙে ছুটে চলেছে। আর দীর্ঘ সময় বয়ে যাওয়ার প্রহর গোনার ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো চোখের সামনে দোলে একখানি সোনার টিকলি। (mg‡ik em iPbve jx ১ : ২, পৃ.১১৮)

জগদ্দলে আগত একুশ বছর বয়সী তরুণ হীরালাল-লখাই আজ ছত্রিশ বছরের 'মস্ত জোয়ান'। এ সময়প্রবাহে পরিবর্তিত হয়েছে জগদ্দল-সেনপাড়া এলাকার আর্থ-সামাজিক কাঠামো। ব্রিটিশ যন্ত্রপ্রযুক্তির প্রসারে রেললাইনসহ বিভিন্ন কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৩ সালে কলকাতা থেকে হুগলি পর্যন্ত রেললাইন স্থাপিত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারে ভারতীয় অর্থরাজনীতির রূপান্তর ঘটে। নৌপথ ছেড়ে রেলপথে ব্রাহ্মণেরা 'কলকাতার কেল্লা' কিংবা 'কোম্পানির দরবার-দফতরে' কাজ করতে যেতেন। এ সময়েই দেশীয় সুতাসহ প্রয়োজনীয় সকল মালামাল গ্রামগঞ্জ থেকে কিনে নিত ব্রিটিশ কোম্পানি। দেশি সুতোয় তৈরি বিলেতি কাপড় অধিক মূল্যে বিক্রির জন্য আমদানি হত এদেশে। ফরাসডাঙার তাঁতিদের মধ্যে সুতোর জন্য হাহাকার পড়ে যায়। গ্রামীণ জনজীবন বিপন্ন হলেও ধন-সম্পদে স্ফীত হয় মহাজনশ্রেণি। এর মাঝে ১৮৫৫ সালে রিষড়েতে পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সঙ্গে কোম্পানি প্রবর্তিত নতুন খাজনা-আইনে জমিদারি ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে। বার বার খাজনা বৃদ্ধিতে প্রভাব পড়ে প্রজাদের ওপর। মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয় তারা। শেষ পর্যন্ত পরিবর্তিত নতুন অর্থনৈতিক অভিঘাতে বিভিন্ন পেশাজীবী সম্প্রদায় নগদ অর্থের জন্য বস্ত্রকল, পাটকলে শ্রমিক হতে বাধ্য হয়। কিন্তু যন্ত্রযুগের শ্রমদাসে পরিণত হয়েও পরাভূত, ব্যর্থ হয় তারা, অন্যদিকে নতুন জীবিকাব্যবস্থায় অভ্যস্ত হওয়া ছিল দুরূহ :

কেরেস্তান পাদরির ভগবানের হদিস্ বলার মতো সাহেবরা লোককে ধরে ধরে বোঝাল এ যন্ত্রের কথা, ভরসার কথা এবং সব চেয়ে বড়—টাকা-পয়সার কথা।...টাকার কথা শুনে অনেকেই ছুটে এল। সপ্তাহে প্রায় একটাকা পাঁচসিকে নগদ! বড় কম নয়! কিন্তু লোকের সে মেজাজ কোথায়! তারা দুদিন আসে দশদিন আসে না! কারখানা বন্ধ থাকে। এমনি তখন অবস্থা।...

এদিকে কোম্পানির নতুন প্রবর্তিত খাজনা-আইনে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল সারা দেশটার মাথায়। শ্যাম দেখল, গোঁসাই এবং স্যানকর্তারাও যুগপৎ পালটে ভিন্ন মূর্তি ধরলেন খাজনা বাড়ল তো বটেই আবার কাঁচা পয়সায় সে খাজনা দেবার নিয়ম হল। ওদিকে জোলা তাঁতি যুগী—সবাই তখন মাঠে নেমে এসেছে। সারা দেশে নাকি তুলো নেই, সুতো নেই। এমন কী, মুচি ডোম পর্যন্ত চামড়ার জন্য হা-পিত্যেশ করে রইল। দেশে নাকি চামড়াও নেই। জোলা হল জেলে, মুচি হল চাষী। হাড়ের বোতাম চিরুনি গড়ত যারা, তারাও নামল মাঠে। সারা পরগনায় পায়রার খুপরির মতো জমি ভাগ হল কুটি কুটি।" (৪, পৃ.১৩২)

সমাজকাঠামোর এ রূপান্তর প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বৃহত্তর জনমানসে তখনও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেনি। তারা ধর্মীয় চেতনার অনুষঙ্গেই এ পরিবর্তনকে গ্রহণ করেছিল। এ কারণে তাদের বিশ্বাস জন্মে যে কোম্পানির অন্যায় শাসন ও অনাচারের ফলেই ১৮৫৭ সালে সিপাহিরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসে শ্যাম বাগদীর চরিত্রে এ ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। তার স্বাদেশিকতাবোধ রাজনৈতিক চেতনাপ্রসূত না হলেও সময়সচেতন ছিল যা উচ্চারিত হয়েছে ধর্মবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে :

এত অনাচার দেশ সইবে কেন। আচমকা সারা দেশে দেশি সেপাইরা লড়াই লাগিয়ে দিল কোম্পানির বিরুদ্ধে। শ্যাম জঙ্গলপীরের থানে মানত করল, হে ভগমান্, হে বাবাঠাকুর, তোমার দু'হাতে সব অনাচার, সব পাপ শেষ করে দাও, ভূমিকম্পে ঝড়ে ওদের কলকারখানা সব চুরমার করে দাও, কোম্পানির সব্বোনাশ করো, এ ড্যাকরা সুমন্দির পো'র ঘরে ঘরে ওলাউঠায় সব শেষ করো। (৪, পৃ.১৩২)

কিন্তু 'শ্যামের বাবাঠাকুর' সেদিন ইংরেজদের ওপরই প্রসন্ন ছিল। সিপাহি বিদ্রোহের পর কাপড়ের কল, পাটকলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যশস্য পাচার হতে লাগল। আরও একদফা খাজনা বৃদ্ধি পায়। অত্যাচার ও বলপ্রয়োগ করে সম্পত্তি ছিনিয়ে নেয় গোরা কোম্পানি। নীলচাষিরা প্রাণভয়ে পালাতে লাগল। ইংরেজদের সঙ্গে দেশীয় শক্তি হিসেবে সেনবংশের দেওয়ানরা যোগ দেয়। কালক্রমে সেনপাড়ার ওপর দিয়ে রেলপথ চালু হয়, তেলেনিপাড়ায় স্থাপিত হয় পাটকল। এই সামগ্রিক রূপান্তর প্রক্রিয়ায় জগদ্দল-সেনপাড়া অঞ্চলের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সমূহ ধ্বংস-সর্বনাশকে এড়াতে পারে না। ফরাসডাঙার তাঁতি কানু ভড়, তার কাটনি বউ-মেয়ে, পবন চাঁড়াল-কাতু-নারান-মদন, শ্রীনাথ কাঠুরে ও তার দুই স্ত্রী, গণি মিঞা ও তার সুন্দরী স্ত্রী লতিফার 'ব্যক্তিজীবনের বিনষ্টির' মধ্যদিয়ে সমরেশ বসু সে ভাঙন-ধরা অস্থির সর্বনেশে সময়-সত্যকে প্রকাশ করেছেন।[১২]

কানু ভড় জাতে তাঁতি। দিল্লির নবাব-বাদশার ঘরে এমনকি হিন্দুস্থানের বাইরে পর্যন্ত তাদের তাঁতে বোনা কাপড়ের সুনাম ছড়িয়েছিল। সেই কানু ভড় রিষড়ের কলে পাটের বোরা বুনতে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু তাঁত-চরকা ধুয়ে সিঁদুর লেপে মাথা ঠেকিয়ে সারাদিন তাঁতের ওপর পড়ে থাকার কয়েকদিন পর ভোরবেলায় "কানু নতুন বানানো শেষ এবং অসমাপ্ত আগুনের মতো জ্বলজ্বলে ওড়না গলায় বেঁধে তাঁত ঘরে মাচার পাশে" আত্মহত্যা করে। মাসাধিক কাল শয্যাগত থেকে পনেরো-ষোলো বছর বয়সী মেয়ে বিনা চিকিৎসায় অভুক্ত থেকে মারা যাওয়ার পর কানুর স্ত্রী কাটনি বউ স্বামীর হাতে বোনা উজ্জ্বল আগুন রঙের তাঁতের শাড়ি নিয়ে শেষ পর্যন্ত চটকলে খাটতে চলে গেল। অন্যদিকে গ্রামের মহাজন শরাফৎ মিঞা, গরিব কৃষক গণি মিঞার স্ত্রী লতিফাকে কেড়ে নিতে চায়। এজন্য গণি মিঞা সিদ্ধান্ত নেয়, মহাজন জমি নিলামে ডেকে নিলে লতিফাকে নিয়ে সে 'ডোমনী পাড়ার কলে' কাজ করতে চলে যাবে। নিঃসন্তান শ্রীনাথ কাঠুরের দুই স্ত্রী কারখানার কুঠিয়াল সাহেবের ইন্দ্রিয় লালসার শিকার হয়ে অন্তঃসত্ত্বা হল। চটকলের সাহেব কুরুসেনের বিকৃতি-নির্যাতনে তারা আত্মহত্যা করে। কুরুসেনের কুৎসিত কাজের প্রতিশোধ নিতে ব্যর্থ ভীরু স্বামী পবন, লখাইয়ের ধিক্কারে, সজোরে থাপ্পড় মারার প্রতিক্রিয়ায়, 'সে রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে মরল আগুরিপাড়ার তেঁতুল গাছে'। পবনের আত্মহত্যা প্রায় দুরারোগ্য ব্যাধির মতো লখাইয়ের মনে চেপে বসল, কী এক অপরাধবোধের যন্ত্রণা; কাঞ্চনেরও তাই। এসব নির্যাতিত যন্ত্রদাসদের জীবনের কথকতার সঙ্গে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন গ্রামীণ জীবনবাস্তবতার সঙ্গে যান্ত্রিকজীবনের বৈসাদৃশ্য কতখানি—এ জীবন বাস্তুহারা মানুষকে কোন গহ্বরে নিক্ষেপ করেছিল। নিচের অংশটি লক্ষণীয় :

কী বিচিত্র আবহাওয়া এখানকার। এখানে সমাজ সংসার সব থেকেও যেন তার কোনও বালাই নেই। মানুষ রাত পোহালে মাঠে যায়, সেখানেও তাদের সুখদুঃখের কথা হয়, নানান চর্চা হয়। এখানকার কারখানাতেও তা হয়। কিন্তু তার রূপ যেন ভিন্ন। কথা হাসি গান সবই যেন পাট পিষ্ট করার মতো বিরাট লৌহচাকাটার মতো কঠিন, পেঁজা পাটের মতো শ্বাসরোধী নরম, স্টিম ইঞ্জিনটার বিচিত্র বহু অংশ ও গায়ের বিদ্‌ঘুটে তেলের গন্ধের মতো। ওই ইঞ্জিনটার জন্যই মানুষের বেঁচে থাকার দরকার। ওই সিলিন্ডার আর পিস্টনের নিছক ওজন, মাপা ও মসৃণ, অবিরত গড়ানো লৌহজীবন।...

Dhaka University Institutional Repository

মাঠের ও যন্ত্রের সমাজের ফারাক আছে। যন্ত্রকে তার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তুষ্ট করলেই দায়িত্ব শেষ, তারপরে তুমি যা খুশি তাই করতে পারো। কোন বাধা নেই। বারোমাসের তেরো পার্বণ বা প্রকৃতির সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ নেই। নাই বা থাকল তোমার কোনও সমাজ-সংসার, না থাক প্রীতি-ভালবাসা-স্নেহ। কিছু আসে যায় না।...যন্ত্রকে চালাতে যন্ত্র-হিসাবেই তোমার দাম। তুমিও যন্ত্র। এ-কথা মানতে মানুষ পারে না। সে ছুটতে চায় তার জীবনের দিগ্‌বিদিকে। কিন্তু কী অদ্ভুতভাবে সে নিজেকে মিশিয়ে ফেলে যন্ত্রের সঙ্গে। সে প্রতিমুহূর্তে অবরোধের প্রাচীর দিয়ে দাঁড়াচ্ছে। (২৪, পৃ.১৮৯)

এক কালের বিদ্রোহী সিপাহি হীরালাল আজকের লখাই। পুত্রের হীরালাল নামকরণের মধ্যদিয়ে সে আর এক বিদ্রোহীসত্তার সন্ধান করে। কিন্তু যন্ত্রদানবের উদ্ধত শক্তি-বিস্তারে অনাগত কালের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে সিপাহি লখাইয়ের পুত্র হীরালাল। উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে যন্ত্রযুগের কেন্দ্রীয় সত্যকেই সংকেতিত করেছে সে। হীরালাল পেয়ারা কাঠের হাতুড়ি নিয়ে কল্পনায় চটকলের শ্রমিক হয়ে ওঠে। বাবাকে সে বলে 'আমি খুব বড় মিত্তিলি অর্থাৎ মিস্তিরি হব।' লখাইয়ের জীবনে এ পরাভব ভয়ঙ্কর, নির্মম; এ ব্যর্থতা সময়-সমাজ-দেশ ও জাতির ঐতিহাসিক ঘটনা।

লখাইয়ের মনে হয়েছে চটকলে কাজ করা আর ইংরেজদের গোলামি করা একই কথা। নারান তাকে বলেছে এ গোলামি সবাই করবে বাধ্য হয়ে কারণ সারা দেশে ইংরেজদের কল বসবে। যন্ত্রযুগের অপ্রতিরোধ্য অনিবার্যতাকে অতিক্রম করতে পারেনি লখাই। শেষ পর্যন্ত পরগণার জমিদারের গোমস্তা ঢেঁড়া পিটিয়ে জানায় গঙ্গার ধারের সমস্ত জমিতে চটকল বসবে—এ ঘোষণায় প্রাচীন জনপদের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রায় সকল মানুষ হয়ে পড়ে বাস্তুহারা। লখাই দলে দলে উদ্বাস্তু মানুষের যাত্রা মনশ্চক্ষে দেখতে পায় যারা চিৎকার, কান্না ও কলরবের মধ্যদিয়ে বাস্তুসন্ধানী হয়েছে। হীরালালকে দিয়ে প্রতীকধর্মিতায় উপস্থাপিত হয়েছে এ অনিবার্য সত্য :

আর সেই হাজার বছরের গড়ে তোলা ও পরিত্যক্ত জনপদ ভেঙে উঠছে মস্ত বড় বড় ইমারত। দীর্ঘ পাড় জুড়ে তার পাথুরে দুর্গের মতো ব্যাপ্তি। তার মধ্যে যন্ত্রের গর্জন গুম্‌গুম্ করে ধরিত্রীর অঙ্গ পীড়ন করছে। বিশাল কালো চিমনি দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে সগর্বে, সন্ধানী সতর্ক প্রহরীর মতো। ফোট গ্লস্টারের চিমনির মতো গর্জন করে উঠছে গোঁ গোঁ করে। লোহা পাথর পাট ধুলো রেল... এক দানবীয় শব্দে হাহা করে ছুটে এসে গ্রাস করছে সেনপাড়া। জগদ্দল পাথরের দুলে বাগদী ডোমপাড়া পদদলিত করে এক বিচিত্র বিশাল যন্ত্র দাঁড়াচ্ছে মাথা তুলে। তারপর, আরও আরও... সমস্ত জগৎটাই যেন ছেয়ে ফেলছে কেবলি চটকল...চটকল...চটকল। আর সব ছাপিয়ে সেই ইমারতের আকাশের উপরে চটকল দেবতার চাবুকের শিষ হিস্‌হিস্ করে উঠছে ক্ষিপ্ত বিষাক্ত গোখরোর মতো।...

কেবল তার পায়ের কাছে হীরালাল তার সেই কাঠের হাতুড়িটা দিয়ে বহু কষ্টে সংগ্রহ-করা একটা পেরেক পুঁতছে মাটিতে আর লখাইয়ের পা-টা ঠেলতে ঠেলতে বলছে—'সল, সল...ছিলিন্দারতা খালা ক'লে দিই! (২৯, পৃ.২০১)

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসনের চাপে শুধু নয়, তাদের এদেশীয় সহায়কশক্তি হিসেবে যারা কোম্পানির দেওয়ানি লাভ করেছে সেসব দেওয়ানদের অত্যাচারে ভেঙে পড়েছিল ভারতবর্ষের সনাতন সমাজব্যবস্থা, রচিত হয়েছিল পরাধীনতার সুদীর্ঘ ইতিহাস। এ কারণেই মনোহর বেদের মতো দস্যু তাদের 'ডাক' কিংবা 'খাজনা' লুণ্ঠন করে কিন্তু অসহায় মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন করে না। পরিবর্তিত সময়প্রবাহে জমিদারদের অত্যাচারের রূপ ও রূপান্তরের সাক্ষী কালো দুলে। লক্ষণীয় :

জগদ্দলের সেনেরা কোম্পানির দেওয়ানির চোগা-চাপকান পরে লাখ থেকে দু'লাখ, তারপর লাখ মোহর টাকায় সিন্দুক ভরে তোলে। সোনাদানায় ভরা ভরতি ভাঁড়ারে রক্তের দাগ লেগে থাকে, ছাতা পড়ে। চরণাশ্রিত দেওয়ানের দুর্ধর্ষ লাঠিয়ালেরা মাসে মাসে হিসাব কষে, কোন অভিযানে কত টাকা এল, কী ক্ষয়-ক্ষতি হল। দেওয়ান না বাঘ, বাঘ না দেওয়ান কিংবা সেনেরা সিংহ, তারা বাঘ, শক্তি ও হিংস্রতার এ হিসাব মেলানো মাঝে মাঝে কঠিন হয়ে পড়ে তাদের পক্ষে।... গড়া নয়, দেওয়া নয়, গ্রাম জনপদ শুধু রক্তগঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া, কালো বিশাল দেহ নিয়ে শক্ত বাঁশের লাঠির ঝাপটায় ঝড়ের বেগে উড়ে যাওয়া।...

Dhaka University Institutional Repository

কখনও কয়েদখানা থেকে ভেসে আসে কয়েদির আর্তনাদ, শিকলের ঝনাৎকার, বাগদী সিপাহির হুঙ্কার। সেনেদের কয়েদখানাও আছে। কোম্পানি তাদের এ অধিকার দিয়েছে, পনেরো দিন পর্যন্ত কয়েদ করবার অধিকার আছে তার অপরাধীদের। যার উপর কোপকটাক্ষ পড়েছে তার কত পক্ষকালই কেটে যায়, যার উপর দয়া আছে সে দু' দিনেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে। এ বে-আইনের খবর কোম্পানিকে দেওয়ার সাহস কারও নেই, কোম্পানিরই বা অবসর কোথায় সে খবর নেওয়ার। (২, পৃ.১১৪-১১৫)

বিলেতের রানি ভিক্টোরিয়ার 'ভারতের মহারানী' উপাধি গ্রহণ নিয়ে সেনকর্তা ও মেজকর্তার কথোপকথনে ইংরেজ আনুগত্যই প্রকাশ পায়। কর্তা ব্যক্তিদের খুশি করবার উদ্দেশ্যে লাটসাহেব লিটনের জন্য উপঢৌকন নিয়ে দিল্লির দরবারে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে তারা। তাদের এ আলোচনার মাঝখানে লড়াকু সিপাহি যখন মহারানীর নাম শোনে তখন তার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে ঝান্সির রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের কথা। কিন্তু বড়কর্তা তাকে জানিয়েছে এ মহারানী বিলেতের—এখন "ভারতেশ্বরী! গোরাদের ফিরিঙ্গিরানী ভারতের অধিশ্বরী।" দীর্ঘ পরাধীনতার ইঙ্গিতে লখাইয়ের মানস-রূপান্তর লক্ষ করার মতো। বিদ্রোহী সিপাহি, সেনেদের প্রহরীর ব্যর্থ আক্রোশ :

বাইরে এসে বন্দুকটা ছুঁতেই হাত দুটো সাঁড়াশির মতো মুঠি পাকিয়ে উঠল লখাইয়ের। দাঁতে দাঁত চেপে বসল। সে ভুলে গেল কাঞ্চনের কথা, ভুলল শ্যাম-কালীবউয়ের কথা, ঘরের অশান্তির কথা। আচমকা এক অসময়ের ঝড় উঠল তার বুকের মধ্যে। আবার তার জীবনে যেন সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এসেছে। ফিরিঙ্গিরানী ভারতেশ্বরী! তা হলে কি সব শেষ হয়ে গিয়েছে, সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। (৫, পৃ.১৩৬)

অসমাপ্ত বিদ্রোহের শেষ পরিণতি জানবার জন্য উৎসুক লখাই মেজকর্তার কাছ থেকে ফিরিঙ্গি রানীর ভারতের মহারানী হওয়ার সংবাদে নতুন করে জেগে ওঠে :

কোম্পানির ফিরিঙ্গি রানী ভারতের মহারানী! এ কী করে সম্ভব হল! তা হলে চোখে না-দেখা যে ঝাঁসির রানীর যুদ্ধ ঘোষণার কথা শুনেছিল, শুনেছিল বীর নানাসাহেবের কথা, তাঁরাও কি এ নগণ্য সিপাহির মতো লাঞ্ছিত পলাতক জীবন যাপন করছেন? হিন্দুস্থানে কি তাঁদের আর কোনও পাত্তা নেই, বিলাত থেকে ফিরিঙ্গিরানীর শাসন-ক্ষমতার অধিকারের কথা শোনা সত্ত্বেও কি যুদ্ধের অবসান হয়ে গেছে? ...কোথায় বীর সেনাপতি তাঁতিয়া। আজও যে লখাই, ঝড়ো হাওয়ায় মেঘ গর্জনের মধ্যে তোমার সেই অমোঘবাণী শুনতে পায়, 'প্রতিটি ফিরিঙ্গির রক্তে হিন্দুস্থানকে স্নান করিয়ে শুদ্ধ করে নিতে হবে। (৫, পৃ.১৩৭-১৩৮)

ভারতের পরাধীনতায় যন্ত্রণাকাতর উৎকণ্ঠিত লখাই সেই অধ্যায়ের শেষ পরিণতি জানতে সেজবাবুর কাছে আসে। সে জানতে পারে নানা সাহেবের কারাবরণ, তাঁতিয়ার ফাঁসির হুকুমের কথা—যে হুকুম দিয়েছে কোম্পানির মহারানী। পরাধীনতা থেকে মুক্তির উপায় সন্ধানে ব্যাকুল লখাই সেজবাবুকে জানিয়েছে—"...ফিরিঙ্গি রানী এ-দেশের মহারানী হবে, ফাঁসির হুকুম দেবে—এ যেন আমার পানে সয় না।"

লখাইয়ের চেতনামথিত আবেগীয় সংলাপে সেজবাবু তাকে জানিয়েছে সমকালীন বাস্তবতা—যে বাস্তবতায় ভারতীয়রা তখন নিধিরামের জাত মাত্র। কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠায় শক্তি দিয়েছে দেশীয় শক্তি। লখাই যখন প্রতিরোধ-প্রতিশোধের প্রশ্ন উত্থাপন করেছে তখন সেজবাবুর অসহায় উচ্চারণ :

বলেছি তো লখাই, আমাদের কিছু নেই। ঈশ্বর আজ ওদের সহায়, শক্তিতে ওরা আজ সিংহবাহিনী। পৃথিবীর কেউই আজ ওদের সঙ্গে পারবে না। তার উপর আমাদের দেশের বড় বড় মাথারা আজ সব ওদেরই সহায়। (৫, পৃ.১৪০)

সেজবাবুর কাছ থেকে অসমাপ্ত বিপ্লবের পরিণতি জেনে ও ভারতবর্ষের পরাধীনতার কথা শুনে ক্রুদ্ধ লখাইয়ের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছে অসাধারণ ন্যারেটিভে, সিংহ আর অজগরের প্রতিকল্পে :

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু ঈশ্বরের অভিশাপেই যেন অভিশপ্ত ক্রুদ্ধ বন্দি সিংহের মতো অন্ধকার পথের উপর এসে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লখাই। তাঁতীয়াটোপীর উদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল তার সমস্ত স্মৃতিকে হিংস্র করে তুলেছে, দুই মুষ্টিবদ্ধ হাতে অন্ধকারকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য যেন সে ঝাপটা মারতে লাগল। না, বোধ করি সেনাপতির ফাঁসির দড়িকে সে দু'হাতে টেনে ছিঁড়তে চাইছে। তার ঘন ঘন নিশ্বাসের সঙ্গে মনে হল, মণিহারা অজগর ফুঁসছে অন্ধকারে, ধকধক করে জ্বলছে দুই রক্ত চোখ। ফাঁসি দিয়েছে তার সেই বীর সেনাপতিকে! সারা হিন্দুস্থানের কোম্পানির সমস্ত গোরাকে কি সেই ফাঁসিরও কাঠে ঝোলানো যায় না? (৫, পৃ.১৪০)

কিন্তু পরাজিত সিপাহিকে হতাশায় নিঃশেষ করেননি সমরেশ বসু, তিনি সিপাহি হীরালালকে রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ-ইতিহাসের স্বপ্নমুখর জীবনবোধে স্থাপন করেছেন। রাতের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকৃতির পটভূমিকায় লখাইয়ের অবচেতন সংবেদনে অনেকটা পরাবাস্তব ভঙ্গিতে উঠে এসেছে তার বিশ্বাসের জগৎ। কোম্পানির সমস্ত গোরাকে ফাঁসির কাঠে ঝোলানোর এক তরঙ্গিত স্বপ্নসম্ভব প্রকাশিত হয়েছে নিচের উদ্ধৃতিতে :

অন্ধকারে গাছের মাথার উপর দিয়ে পাখি একটা পাখা ঝাপটা দিয়ে উড়ে গেল বিচিত্র শব্দ করতে করতে। লখাই যেন শুনল সে পাখি বলে যাচ্ছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ...উপরের দিকে তাকাল সে। অন্ধকার। গাছের ফাঁকে ফাঁকে তারা ভরা আকাশ। সেই অসীম শূন্য থেকে ক্রমবিলীয়মান দৈববাণীর মতো সেই শব্দ ভেসে আসতে লাগল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। (৫, পৃ.১৪০-১৪১)

অনেক ঘটনা, বিপন্ন চরিত্রসমূহের শাখা-প্রশাখা ছাড়িয়ে, ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু আকাশস্পর্শী বৃক্ষের মতো লখাইকে ইংরেজদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন বার বার। মুরলীদাসের আখড়া ভেঙে চটকল উঠবে—এ সংবাদ জানানোর জন্য তেলেনিপাড়ার জমিদার বাঁড়ুজ্যেবাবুদের এক আমলার সঙ্গে জুতো পায়ে যখন দুজন ইংরেজ মন্দিরের কাছে দাঁড়ায় তখন তাদের 'স্পর্ধিত অনাচারে' ক্রুদ্ধ লখাইয়ের প্রতিক্রিয়া প্রকাশে সিংহের রূপক ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। জনৈক ইংরেজ যখন কৈফিয়ৎ চায় সে কেন আখড়ার বিষয়ে কথা বলছে, তখন ক্রুদ্ধ সিপাহি লখাইয়ের দুর্দম উচ্চারণ : "বাত আমি করব না তো তুই করবি, সাদা ঢ্যামনা। কামান থাকলে তোর মাথা উড়িয়ে দিতাম।" (পৃ.১৬৩)। তার এ সাহস দেখে, ধূর্ত গোরা ইংরেজ চটকলে মজুর-শাসন করার জন্য লখাইয়ের মতো সাহসী লোকের দরকার বলে মন্তব্য করেছে।

গাঁয়ের মানুষের চলাচলের সুবিধার জন্য দীর্ঘ সড়কের ভাঙা জায়গা যখন ভরাট করছিল লখাইরা, এক্কাগাড়ি করে লখাইয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল দুজন ইংরেজ। তাদেরকে দেখেও সরে যায়নি লখাই। উদ্ধত ইংরেজ 'ব্লাডি সোয়াইন' ও 'ব্ল্যাক বাফেলো' বলেছে তাকে। লখাইয়ের সাহস দেখে গাড়ুলিয়ার আখড়ার চতুর দুই ইংরেজ তেলেনিপাড়ার রবার্টসন্ ও ওয়ালিক (যাদের কাছে লখাই মন্দিরের ক্রুদ্ধ ধর্মান্ধ বলে পরিচিত হয়েছিল) তাকে অনেক টাকার বিনিময়ে চটকলের কাজে আহ্বান জানিয়েছে। প্রত্যুত্তরে জ্বলন্ত চোখে লখাই তাদের বলেছে—"আপ্না টাকা লেকে তুম বিলাত চলা যাও।" এ কথা শুনে বিস্মিত হয় রবার্টসন। তবুও ধূর্ত সধৈর্য ওয়ালিক অভ্যাসবশত তাকে প্রলুব্ধ করেছে, বলেছে 'হমারা কাম করনেসে বহুট ইনাম মিলেগা!' লখাই 'লেলিহান শিখার মতো খাড়া হয়ে' পরমুহূর্তেই থেমে গিয়ে বলে 'আপনা রাস্তা দেখো।' (২৮, পৃ.২০০)

সমরেশ বসু ১৮৫৭ সালের ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির নায়ক লখাই-হীরালালের মধ্যদিয়ে অতীত-বর্তমানতার সংমিশ্রণে যে প্রতিবাদের আখ্যান রচনা করেছেন তাতেই DËi½ উপন্যাস রাজনৈতিক উপন্যাসের যথার্থ পরিসরে উত্তীর্ণ হয়েছে। সমালোচকের মন্তব্য এক্ষেত্রে স্মরণীয় :

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বোধ করি সর্বাপেক্ষা প্রবলতম প্রতিবাদ ও লড়াইয়ের ব্যর্থতার পটভূমিতে সমরেশ বসু এক বলিষ্ঠ সংগ্রামী মানুষের সামনে কেমন আমাদের অর্থনীতি, সেই সঙ্গে রাজনীতিও করুণ আত্মসমর্পণ করল তার তাৎপর্যপূর্ণ ছবি এঁকেছেন। রাজনৈতিক আত্মসমর্পণ যেহেতু পরের কয়েক দশকে অন্যরকম প্রতিবাদে উত্তরণ পায়, সেহেতু প্রত্যক্ষত রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে তিনি আনেননি, আনেননি কলকাতাকেন্দ্রিক নানা আলোড়ন—সংস্কার চেষ্টাকে, কারণ এসবের তাৎপর্য স্বীকার করেও বলা যায়, দেশের বৃহত্তর সাধারণ মানুষের কাছে তখন তা অপ্রাসঙ্গিক ছিল। তাঁর উপন্যাসের কুশীলবরা যেহেতু নিম্নবর্গের মানুষ সেহেতু তাদের অর্থনৈতিক তথা সামাজিক সর্বনাশের থিমটিই বড় হয়ে উঠেছে। সিপাহী বিদ্রোহের এক যোদ্ধার এই পরিস্থিতিতে বিরাট ধ্বংসের সাক্ষী হওয়া, আত্মসমর্পণের যন্ত্রণায় দগ্ধ হওয়ার ঐতিহাসিক মানব-চিত্র 'উত্তরঙ্গে'র বিষয়।"[১৩]

সমকালে এবং 'মৃত্যু তাঁকে মহানেপথ্যে ডেকে নিয়ে গেলেও' সমরেশ বসু বাংলা সাহিত্যে সমভাবে নিন্দিত ও প্রশংসিত। এমনকী আজও 'তিনি বিতর্কের সর্বোচ্চ চূড়ায়'। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের mg‡ik em : mg‡qi wPý গ্রন্থের ভূমিকায় সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এমনি মন্তব্য করেছেন। 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত DËi‡½র সমালোচনায় চিন্মোহন সেহানবীশ সমরেশের বিরুদ্ধে 'অশ্লীলতার' অভিযোগ উত্থাপন করেন। অধ্যাপক সনৎ বসু আদ্যোপান্ত তার বিরোধিতা করেন। 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় অচ্যুত গোস্বামী সমরেশের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেন। সমরেশের পক্ষ সমর্থন করেন গান্ধী ও বার্নার্ড শ'য়ের জীবনীকার ঋষি দাস। ওইসব নৈতিক নিন্দার পেছনে সক্রিয় ছিল মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব প্রয়োগের যান্ত্রিকতা এবং মধ্যবিত্তশ্রেণির আপাত 'ভালোত্বের' নীতিকথা। উল্লেখযোগ্য, DËi½ রচনার জন্য দিলীপ গুপ্ত, নরেশ গুহ প্রমুখ সমরেশকে উপহার দিলেন দামী কলম ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত msev`c‡Î †mKv‡ji K_vর দু'টি খণ্ড। পেলেন কবি বিষ্ণু দের প্রত্যাশা ও প্রশংসাবচন।

শুধু তাত্ত্বিক বীক্ষায় নয়, সুগভীর জীবনবীক্ষায় সমীকৃত হয়েছে DËi½ উপন্যাসের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা। ঔপন্যাসিকের কেন্দ্রীয় মনোযোগ লখাইয়ের প্রতি থাকলেও এসেছে লখাই-কাঞ্চন-নারান, লখাই-কাঞ্চন-সারদা, নারান-কাতু-মদন, গণি মিঞা-লতিফা-শরাফত, তারা-পবন, শ্রীনাথ কাঠুরে-তার দুই স্ত্রী, আকালী-ক্ষেমী-নগিন, লখাই-মনোহর বেদে সহ বিচিত্র উপকাহিনি এবং ভাঙা-চোরা যন্ত্রদাসদের জীবনের কথকতা। এসেছে চটকল সাহেব হিসেবে পরিচিত কোম্পানির কর্মচারীদের মজুর শাসনের পাশবিক, ঘৃণ্য আচরণের কথা। তবে সব কিছুকে অতিক্রম করে লখাই-হীরালালের প্রতিবাদী সত্তাই অধিকতর তাৎপর্য পেয়েছে যে প্রতিবাদ পরবর্তীতে বৃহত্তর প্রতিরোধ, দ্রোহ ও বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়েছে, এবং হচ্ছে; ইতিহাস তার সাক্ষী।

বি টি রোডের ধারে

সুদীর্ঘ বি টি রোড : কলকাতা থেকে বারাকপুর, তারপর চিড়িয়ামোড় থেকে দ্রুত পুব দিতে ঘুরে, জি টি রোড নামে উত্তর দিকে কাঁচরাপাড়া পর্যন্ত প্রসারিত। সারা বাংলার বৃহত্তম শিল্পকেন্দ্র এই রাস্তা। গঙ্গার তীরে তীরে, রেল লাইনের ধারে ধারে অসংখ্য কারখানার আশেপাশে ছড়ানো-ছিটানো আবর্জনা স্তূপের মতো বস্তি। বি টি রোড থেকে নেমে কাঁচা সড়ক গেছে পুবে, নিউকর্ড ও নয়া সড়কের মিলন স্থলে একটা বেশ বড়ো লম্বা বস্তি। বস্তিটা শেওলা-ধরা খোলা সাজানো রাবিশের স্তূপ বিশেষ। এই বস্তিবাসীদের জীবন-আখ্যান নিয়ে রচিত হয়েছে we wU †iv‡Wi av‡i।[১৪] রান্না ঘরের রাঁধুনি এক কালের প্রতিবাদী ছুতোর গোবিন্দ, রুগ্‌ণ ছেলে ও তার মা, গণেশ-কালো-নগেন, লোটন-দুলারি-ফুলকি, বাজীকর ও বাড়িওয়ালা—সকলের জীবনবলয় আবর্তিত হয়, বি টি রোডের পুঞ্জীভূত কদর্যতা, নর্দমার কুৎসিত দুর্গন্ধ,

Dhaka University Institutional Repository

জমে-থাকা তরল কাশির মতো আস্তাকুঁড়, ছড়ানো-ছিটানো মানববিষ্ঠা, নিত্যদিনের রোগ-শোক আর ভেসে-আসা যন্ত্রের বয়লারের গোঙানির শব্দে। মুখ থুবড়ে-পড়া বস্তি-গুহাবাসী প্রাণীর মতো টিকে-থাকা ক্লিষ্ট জন্তুগুলোর কদর্য ও সুন্দর দ্বৈরথ ভাবনা, ভালোবাসা ও ঘৃণা, স্বপ্ন ও প্রতিবাদের মিথস্ক্রিয়ায়, সমরেশ বসু তাদের মানবীয় মর্যাদায় উত্তীর্ণ করেছেন।

we wU †iv‡Wi av‡ir আখ্যান যথাস্থিতবাদী ফোটোগ্রাফ না হয়ে মানববাদী শব্দশিল্প হওয়ার কারণ সমরেশ বসুর যাপিতজীবন-অভিজ্ঞতার অন্তর্ময় বয়ন ও বুনট। জীবনের রাজনীতিসতর্ক ঔপন্যাসিকের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হল গণমানুষের নিবিড় অভিজ্ঞতা ও তার সংশ্লেষণ—অর্থাৎ জীবন, অস্তিত্ব, বাস্তবতা ও ভূ-খণ্ড এবং নিসর্গের রসায়নের মধ্যদিয়ে হয়ে-ওঠা জীবনপুঞ্জকে সমগ্র দৃষ্টি দিয়ে উপস্থাপন করা। উন্মোচন ও বিশ্লেষণ করা তাদের অন্তর্জগৎ ও বহির্বাস্তবতা। এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ, আতপুর-জগদ্দল অঞ্চলের বস্তিবাসের অভিজ্ঞতার অন্তর্বোধে সমরেশ বসু we wU †iv‡Wi av‡i উপন্যাস রচনা করেছেন।

দাম্পত্যজীবন শুরুতে কৈশোরোত্তীর্ণ সমরেশ বসু আতপুরের আবদুল মিস্তিরির বস্তিজীবনের অংশী হয়েই অর্জন করেন নির্মম সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা। we wU †iv‡Wi av‡i উপন্যাসের উৎস, পরিসর ও পরিণতিকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সমরেশ বসুর বস্তির যাপিতজীবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। স্মরণীয় :

> বাড়ী থেকে বেরোতাম অন্ধকার থাকতে, যখন ফিরে আসতাম, তখন আমার কুটিরে জ্বলতো কেরোসিনের আলো। কাজে যাবার সময় ঘুমিয়ে থাকতো আমার সন্তানেরা, ফিরে যখন আসতাম, তখন তারা রাত্রের ঘুমে শায়িত। একজনকেই থাকতে হতো জেগে, সেই ভোর রাত্রি থেকে, রান্নাবান্না সংসারের সকল কর্ম আর সন্তান-সন্ততিদের এবং আমার সেবার জন্যও বটে, বলা বাহুল্য তিনি আমার স্ত্রী। প্রায় চৌদ্দ ঘণ্টা পর বাড়ি ফিরে, ক্লান্ত শরীরে লিখতে বসাটা প্রায় অসম্ভব মনে হলেও ভিতরের উন্মাদনা কোন ক্লান্তিকেই মেনে নিতো না। আবার লিখতে বসতাম হ্যারিকেনের আলো নিয়ে। কিন্তু অভাব ছিল কেরোসিন তেলের। সময়টা যুদ্ধের কাল, জীবনধারণের সব কিছুই ছিল প্রায় নাগালের বাইরে, নিতান্ত কোনোরকমে বেঁচে থাকা ছাড়া।...
>
> বারে বারে দোয়াতে কলম ডুবিয়ে লিখতে লিখতে বড়ো সাধ হতো ফাউন্টেন পেনে লিখি। এখন নিজের কাছেই যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়, একটা ফাউন্টেন পেন তখন আমার কাছে স্বপ্ন! অতি বাস্তব। টালির সেই ঘরে জোড়াসন করে বসে একটা জলচৌকির ওপরে কাগজ রেখে লিখতাম। গরম বা শীতকে পরোয়া করতাম না। কিন্তু জীর্ণ দেওয়ালে যখন হঠাৎ সাপ দেখা দিত, বিছে চলে যেতো কিলবিলিয়ে গায়ের পাশ দিয়ে, শুঁয়ো পোকা বেয়ে উঠতো গায়ে, পিঁপড়ে কামড়াত কুটকুট করে, লেখায় বড় ব্যাঘাত হতো। ছেলেমেয়েদের সব সময়ে সরিয়ে রাখতেন তাদের মা, যাতে কোনো গোলমাল না হয়। কিন্তু মাঝে মাঝেই, ঘরের পাশে কাঁচা নর্দমার দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসতো।[১৫]

ডিম, মুরগি ও সব্জি বিক্রেতা সমরেশ বসুর বস্তি-জীবনের অভিজ্ঞতা উপন্যাসটিকে আপন-অপরতার প্রশ্ন নির্দ্বন্দ্ব রেখেছে। তিনি আতপুর-জগদ্দলের বস্তিবাসী শ্রমিকদের জীবনের অংশী হয়েও বিস্ময়করভাবে অতিকথন-বর্জিত এবং মধ্যবিত্তের রোম্যান্টিক তারল্য থেকে নিজেকে যন্ত্রণাক্ষত নির্লিপ্ততায় স্থির রাখতে পেরেছেন অথচ শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গে মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক ও মানসিক দূরত্বকে ভেঙে দিতে চেয়েছেন we wU †iv‡Wi av‡i উপন্যাসে। গোবিন্দের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ চেষ্টা ও তার মৃত্যু নিঃসন্দেহে আণুবীক্ষণিক অভিজ্ঞতার রাজনীতি, দরিদ্র-বঞ্চিতের রাজনীতি; সে রাজনীতি কোনো তত্ত্ব-উৎসারিত বা সংবেদনবর্জিত মস্তিষ্ক পরিচালিত নয়।

বি টি রোডের নয়া সড়কে বসবাসরত মানুষের বেশির ভাগই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লাঞ্ছনা-বঞ্চনা আর চরম ব্যর্থতা নিয়ে জড়ো হয়েছে বাড়িওয়ালার বস্তিতে। বাড়িওয়ালার আন্তরিকতায় চটকলের নারী-পুরুষ শ্রমিকেরা সবাই মুখ থুবড়ে-পড়া, শেওলা-ধরা খোলার নোংরা বস্তির খুপরি ঘরের আস্তাকুঁড়ে আশ্রয় নিয়ে জীবন যাপন করে। বাড়িওয়ালা, গোবিন্দচন্দ্র শর্মা ওরফে 'ফোরটুইন্টি', প্রৌঢ়া সদী, লোটন বউ-

Dhaka University Institutional Repository

হরিশ-নন্দ, ফুলকি-নগেন-কালো, দুলারী বউ-নগেন, বাজিকর এবং রুগ্‌ণ ছেলে ও তার মা—সকলের উপাখ্যানগুলি নির্মম ইতিকথাসহ উপন্যাসের পরিণামে রসনিষ্পত্তি পেয়েছে ক্লেদকর্দমে পরিস্ফুটিত বেদনানীল পদ্মের মতো। পরাভবক্লান্ত, নিরস্তিত্বপ্রায়, ভাসমান বস্তিবাসীদের হয়ে গোবিন্দের জিজ্ঞাসা, "মানুষের আশা কখনও মরে?" বাড়িওয়ালার সন্তর্পণ উত্তর, "...হ্যাঁ, মানুষের আশা কখনও মরে না।" বস্তির বিচিত্র আদিম মানুষ, বস্তি-গুহাবাসী হামাগুড়ি-দেওয়া বিচিত্র তাদের জীবন—নারী-পুরুষের ঝগড়া, মারামারি, কলঙ্ক, লজ্জা, ঈর্ষা, ক্রোধ, রিরংসা, স্থূলতা অর্থাৎ নিষ্পেষিত-শোষিত শ্রমজীবীদের প্রাত্যহিক টিকে থাকার দর্শন, নীতিবোধ ও সংস্কৃতিকে সমরেশ বসু শহুরে ধনিকশ্রেণি ও মধ্যবিত্তের শোষক-সভ্যতাসৃষ্ট নীতিবোধ দিয়ে মূল্যায়ন করেননি। বস্তিবাসীরা নিজেদের "আমরা জানোয়ার একেবারে, জানোয়ার"-এর বেশি ভাবতে না পারলেও, সমরেশ বসু অপরিমেয় সমমর্মিতায়, 'অপর' নয় 'আপন' সংবেদনায় তাদেরকে দ্রোহী-বিদ্রোহী অস্তিত্বকামী 'মানবীয়' মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেছেন।

গঙ্গার তীরে তীরে, রেললাইনের ধারে ধারে অসংখ্য কারখানা ইমারত। তারই ছত্রছায়ায় ছড়ানো আবর্জনা স্তূপের মতো বস্তি, এমনি এক বস্তির মালিক 'বাড়িওয়ালা'। বহিরাবয়বে সে "কালো বর্ণ, শরীরটা মস্ত বড়। মাথা চাঁছা, মস্ত গোঁফ, গভীর কোঁচ নাকের পাশে। সারা গায়ে লোমের ছড়াছড়ি, ভ্রূর চুলে প্রায় চোখ ঢেকে গেছে। বাড়িওয়ালার কথা বলার ভঙ্গিটা বড় অদ্ভুত।...কখনও গোঁফ পাকিয়ে, কখনো ভ্রূ তুলে কিংবা কুঁচকে, হাতের চেটোতে ঘুষি মেরে কিংবা খাটিয়ার বাঁশে তাল ঠুকে, আবার ভীষণ রেগে কথা বলছে।" (পৃ.২০৭) সমরেশ বসু এ উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের অন্তর্স্রোত, শোণিতপ্রবাহে পাক-খাওয়া বিষ-বেদনা এবং উন্মুলিত বাসনার পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রসমূহকে উন্মোচন করেছেন, রূপ দান করেছেন।

বাড়িওয়ালার নিজের জীবন সব হারানো তিক্ত অভিজ্ঞতায় ক্ষত-বিক্ষত। ইতিহাসটি এমন : জমিদার পাটোয়ারী প্রকাশ্যে ঘর পুড়িয়ে দিয়ে তার বাবাকে খুন করে। দু-এক বছরের শিশুপুত্র নিয়ে তার মা 'সাধু'-র আড্ডায় আশ্রয় নেয়। কিন্তু সাধুদের ইন্দ্রিয়লালসার শিকার হয়ে বছর বছর মৃত সন্তান প্রসব করে দশ বছর পর মারা যায় তার মা। এগারো-বারো বছর বয়সী ছেলে—আজকের বাড়িওয়ালা, সাধুরূপী ওসব 'জানোয়ার'-এর বিকৃত লালসার শিকার হয়। বাড়িওয়ালার এই নির্মম জীবনাভিজ্ঞতা সুগভীর সমবেদনায় উঠে এসেছে সদী বুড়ির কথায়। গোবিন্দকে সে জানিয়েছে :

> কী আর হবে। ওকে কয়েদির মতো সাধুরা রেখে দিল, কারও সঙ্গে বাত-পুছ করতে দিত না।...তারপর, ও নিজেই একদিন কোথায় পালিয়ে গেল, তা আমরাও জানতুম না।...বহত দিন বাদ বাঙলায় এলুম। হাওড়া বজবজ ঘুরে এখানে এসে দেখা মিলল। দেখি, বাড়িওয়ালা বনে গেছে। আমাদের পেয়ে খুব খুশি। খুশি হলে কী হবে, আমি খুশি হইনি। কেন? না ওর পাগলামি দেখে। হেন বাড়িওয়ালা নেই যে ওর দুশমন নয়, ওর নতুন জমিদার ওকে কাবু করবার তালে আছে। সবে এসেছে, এখন দেখবে একা বিরিজামোহনই ওকে পাগল করে দিতে পারে। ও যে একেবারে বোকা...বোকা! ও যদি বাড়িওয়ালার মতো বাড়িওয়ালা হত! ...পাগল! এ ঠিকে জমি আর কদ্দিন! ওকে আবার ভাসতে হবে। (সমরেশ বসু রচনাবলী ১, পৃ.২২২)

এ বস্তির মালিক বাড়িওয়ালা স্বপ্ন দেখে বস্তিবাসীদের জন্য পাকা পায়খানা হবে, তাদের জন্য গড়ে উঠবে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা। কিন্তু তা হয়ে ওঠে না, কারণ "অফসরের ঘুষের টাকা না দিলে মিসিপালটির অনুমতি মেলে না, ঠিকা জমিতে মিসিপালটির মেথর খাটবে না।" বাড়িওয়ালা বিড়বিড় করে বলে, "আমি যদি শালা মানুষের বাচ্চা হই, এক আধেলাও ছাড়ব না। আর পায়খানা আমি করবই, জলকল আনবই, দেখি কে আমাকে রোখে।...দেখা গেল তার ভ্রূ দুটো উঠে গিয়ে বিচিত্র দুটো স্বপ্নভরা চোখ বেরিয়ে পড়েছে।" (পৃ.২২০) এই বাড়িওয়ালার উপর অন্যসব বস্তির মালিক বা বাড়িওয়ালার জাতক্রোধ আছে। কারণ :

Dhaka University Institutional Repository

"...এ বাড়িওয়ালা শুধু ভিন্নরকম নয়। একবারে উলটো মানুষ। এখানকার বাড়িওয়ালারা অবাক হয়, যখন শোনে, সে ভাড়া পর্যন্ত মকুব করে দেয় বাসিন্দাদের। তা ছাড়া কম বেশি সকলেই তার এ বিচিত্র রামরাজত্বের আদর্শের কথা শুনেছে। সেজন্য কেউ বলে, পাগল, কেউ সাধু, কিংবা কোনও ডাকাত দলের সর্দার।...তাদের যে-সব বাসিন্দাদের তারা ভাড়া না পেয়ে বেইজ্জত করে, তাড়িয়ে দেয় তারা সবাই এসে জোটে এ বস্তিতে। সবাই মিলে মতলব ভাঁজে, কী করে ওকে জব্দ করা যায়, বিপদে ফেলা যায়। ওত পেতে আছে সকলেই।" (পৃ.২৪৭)

'গোঁয়ার' ও 'রহস্যময়' এই বাড়িওয়ালাকে ঘাঁটাতে সাহস করে এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো বস্তি-লাইনের মালিক ডাকসাইটে বাড়িওয়ালা বিরিজামোহন। বিরিজামোহন থানার বড়োবাবুর বন্ধু, এখানকার বাঙালি জমিদারের স্বজন।

বাড়িওয়ালার এমনি এক অস্তিত্ববিনাশী সংকট কালে, এক বর্ষাবিধ্বস্ত অন্ধকার রাতে 'ফোরটুইন্টি' যার প্রকৃত নাম গোবিন্দচন্দ্র শর্মা, উপস্থিত হয় বি টি রোডের ধারের এই বস্তিতে। গণেশ-কালো-নগেন, লোটন-দুলারি-ফুলকি, রুগ্‌ণ ছেলে ও তার মা, বাজিকর ও বাড়িওয়ালা—সকলের জীবনে অনিবার্যভাবে জড়িত হয়ে পড়ে সে। সমরেশ বসু গোবিন্দ এবং নয়া সড়কের বস্তিবাসীদের জীবনসমষ্টিকে—এ উপন্যাসে সমান্তরালভাবে বিন্যাস করেছেন। গোবিন্দের মুখ থুবড়ে-পড়া, দীপ্র এক দ্রোহের জীবন ও তার পুনর্জাত প্রাণন শক্তিকে সমরেশ বসু we wU †iv‡Wi av‡i উপন্যাসে নিপুণ দক্ষতায়, 'কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা'য় করেছেন প্রতীকায়িত।

গোবিন্দচন্দ্র শর্মা প্রথম জীবনে কোনো এক কাঠের গোলায় ছুতোর মিস্ত্রির কাজ করত, গোলার মালিক তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল। ভারতীয় আইনের 'ফোরটুয়েন্টি' ধারায় প্রতারণার অভিযোগে মাস তিনেক জেল খেটেছিল, তখন থেকেই সে 'ফোরটুয়েন্টি' নামে পরিচিত। দশ বছর আগে জগদ্দল অঞ্চলের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা ছুতোর গোবিন্দ বি টি রোডের ধারের বস্তিতে এসে আশ্রয় নেয়। সেই থেকে ইয়ার দোস্তরা তাকে 'চারশো বিশ' মানে 'ফোর টুয়েন্টি' বলে ডাকত। বস্তিতে এসেও ওই নামে পরিচিতি পেয়েছিল সে। পূর্ব জীবনের সংগ্রামী গোবিন্দের স্বরূপ নিচের অংশে :

সেদিন সে ছিল একটা আগুনের মতো মিস্তিরি ছোকরা। সব কিছু বোঝাবুঝির ধারটা কম ধারত, অল্প কথায় চটত। কারণ, কারখানায় সামান্য খোঁচা খেলেও সে ফোঁস করে ফণা তুলে ধরত। একটু কিছু হলেই, সোজা গোরাসাহেব ম্যানেজারের ঘরে ছুটে গিয়ে টেবিলের উপর ঘুষি মেরে কথা বলত। তখন সকলের কাছ থেকে সাড়া না পেলে সে একধার থেকে সবাইকে গালাগাল দিতে আরম্ভ করত, থুতু দিত, আর বলত, তোরা ভিতু, ভেড়ার দল। ... যুক্তির প্রশ্ন তুলতে গেলে তো মারমুখীও হয়ে উঠেছে কোনও কোনও দিন। তবু এক একটা দিন গেছে, যখন তাকে সামনে রেখে খ্যাপা মানুষের দল বন্যার বেগে ছুটে গেছে ম্যানেজারের ঘরের দিকে। সবাই বলত তাকে, সেই টরন ঘরের ছোকরা মিস্তিরি। (পৃ.২৪০)

গোবিন্দর প্রতিবাদ ও ঘৃণা বোধ-বুদ্ধিজাত ছিল না, ছিল হৃদয় আর সাহস উৎসারিত। সতীর্থ হিসেবে যাদেরকে পেয়েছিল তারা সংশয় ও অবিশ্বাসকে লালন করত বেশি। এ কারণে তারা প্রতিবাদী না হয়ে নিজেদের বিনাশেই মনোযোগী ছিল—তারা যেত "শুঁড়িখানায়, জুয়ার আড্ডায়, দেবালয়ে নয়তো বেশ্যালয়ে।" (পৃ.২৪০) শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তাকে সমীহ করলেও তাদেরকে সংশয়ের চোখে দেখত গোবিন্দ। কিন্তু এ আবেগী দ্রোহ-চেতনাকে অঙ্কুরে বিনাশের লক্ষে, আচমকা ভূমিকম্পের মতো, পুলিশ জারি করে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাকে জেলা চব্বিশ পরগণা ত্যাগের হুকুম। তাকে ফিরে যেতে হয়েছে ইছামতী পারে—নিজের গাঁয়ে।

গোবিন্দর অতীত স্মৃতি সময়ক্রম অনুসারে বর্ণিত হয়নি, অঙ্কিত হয়েছে বস্তিবাসীদের নানা চরিত্রের অনুষঙ্গে। কালো-চরিত্রের দুঃখময় কথাশ্রুতিতে তার ইছামতীপারের হারিয়ে-যাওয়া জীবনের ছবি ভেসে উঠতে থাকে অন্ধকারে :

Dhaka University Institutional Repository

...মায়ের প্রশস্ত কোল জোড়া মেটে বর্ণের হোঁতকা ছেলে, অমৃতভরাট পূর্ণ স্তন ঠাসা ছেলের মুখে। মায়ের আধবোজা চোখে অপূর্ব রহস্যময় হাসি, হাসি যে নামহীন বিচিত্র স্বপ্নের! এক ফোঁটা আগুনের মতো সিঁদুরের টিপ কেঁপে কেঁপে উঠেছে।...মায়ের সেই অপূর্ব চোখের দৃষ্টি আড়ে আড়ে দেখছে অদূরের পেয়ারাতলার পুরুষের দিকে, করাতের ঘরঘর শব্দে যে গোরুর গাড়ির চাকা বানাচ্ছে। (পৃ.২১৮)

তারপর ১৩৫০-এর মন্বন্তরের ঝোড়ো ঝাপটায় সে ছবি গেছে ছিঁড়ে খুঁড়ে। দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার্ত হিংস্র ড্রাগনের আগুনে নিশ্বাসের টানে একে একে নিয়ে গেল তার স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, প্রতিবেশী সবাইকে। কেবল রয়ে গেল পেয়ারাতলার ছুতোর—গোবিন্দচন্দ্র শর্মা।

তবুও জীবন চলে, গোবিন্দও চলেছে, ছুটেছে অবিরাম। তীব্র অন্ধকারে একটি অগ্নিবিন্দুকে ধ্রুবতারা করে :

...তার জীবনের ছবিতে অনাহার একটা একটানা চৌঘরা রেখার মতো বেড় দিয়ে রেখেছে। সেই খলখল হাসির তাড়ায় আজ আবার এসেছে সে সেই চটকল শহরে, ছুটে গেছে ডায়মন্ডহারবার থেকে তিনসুকিয়া, নোয়াখালি থেকে পশ্চিমের কয়লার খনিতে। মহারুদ্র মন্বন্তরের করাল থাবার ছায়ায় ঢাকা পথে পথে ঘুরে সব হারিয়ে, পঞ্চাশ সালের গলিত জনপদের উপর উর্ধ্বশ্বাস প্রেতের মতো পদে পদে আটকে যাওয়া পা জোর করে তুলে ছুটেছে সে। তবু আজও বুকের কোন্‌খানটায় ব্যথা ও জ্বালা বোধের একটা ছোট জায়গা রয়ে গেছে, যেখানে পথচলা জীবনের সব ধারা খটখট করে বারবার বেঁধে যায়। (পৃ.২১৫)

মন্বন্তরে সব হারিয়ে উদাসী বিবাগী হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পথকে সম্বল করে বেরিয়ে পড়েছিল গোবিন্দ। আজ আবার সে জড়িয়ে পড়েছে বি টি রোডের ধারের রোগ-শোক-ক্লেদকণ্টকিত ও 'শ্মশানের বটতলার ঝুপসিতে প্রেতের মতো' বসবাসকারী প্রায় না-খাওয়া বস্তিবাসীদের জীবনের স্রোতে। সমরেশ বসু গোবিন্দর দৃষ্টিকোণ থেকেই মূলত বস্তিবাসীর জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

লোটনের মৃত্যুর পর লোটন বউ, কলের শ্রমিক দেবর হরিশ আর নন্দকে নিয়ে একই ঝুপড়িতে থাকে। প্রায় প্রতিদিনই হরিশ-নন্দের মারপিট, কুত্তার মতো ঘেউ ঘেউ আর খিস্তি-খেউড় চলে। দুজনকে ধাক্কা দিয়ে ধরাশায়ী করে 'বেগড়ানো মেয়েমানুষ' লোটন বউ ঝুপড়ি ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। নন্দ আর হরিশ সেই দরজাটিতে মুখ দিয়ে পড়ে থাকে। "আশ্চর্য! নন্দ আর হরিশ আবার পরস্পরের দিকে তাকায়, আর মুখ নামিয়ে থাকে।...বিচিত্র আদিম তাদের এই জীবন। একজনকে নিয়ে তাদের কখনও বিদ্বেষ, কখনও বন্ধুত্ব। আর তার চেয়েও বিচিত্র আদিম নারী লোটনের বউ, যে সমস্ত ঝগড়া, মারামারি, কলঙ্ক, লজ্জা, ভয়, সব ভুলে আবার ডেকে নেবে ওদের।...গোবিন্দ স্তব্ধ হয়ে গেল। লোটন বউ যাদের খায়, যাদের পরে, তাদেরই এমন ঘৃণা করে। ভালবাসার কথা না হয় বাদই গেল। সামান্য করুণা থাকলেও কেমন করে সে সেই কামিনা কুকুর দুটোর সঙ্গে ঘর করে!...পরমুহূর্তেই মনে হল, লোটন বউয়ের জীবন ধারণের ভাবনাটাই হয়ত বড়। নিরন্তর প্রেমহীন জীবন, তাই তো সবচেয়ে বড় অভিশাপ।" (পৃ.২৩৫) লোটন বউ সন্তানসম্ভবা, নন্দ-হরিশ যেন নতুন জগতে বন্ধনের সন্ধান পায়। তবু সে জগতও ঘোরতর অন্ধকারে ছেয়ে যায় : "ওরা মারামারি করে। যখন ওরা ভাবে, যে আসছে সে কার। লোটন বউ বলে, কারও নয়। আমাদের তিন জনের।" (পৃ.২৬৫) সমরেশ বসু বিস্ময়কর নিরাসক্তিতে সামাজিক ধর্মীয় আদর্শকে সরিয়ে রেখে, বস্তির জীবননীতি লোটন বউয়ের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছেন। জীবনই জীবনের প্রতিশোধ নেয়। চটকলের ছাঁটাইয়ের ক্ষত-বিপন্ন করে দেয় লোটন বউয়ের স্বপ্ন। গোবর কুড়িয়ে, ঘুঁটে বিক্রি করে টিকে আছে অনাহারী সংসারে। হরিশ-নন্দ ক্ষুধার্ত শিকারির মতো আবার শুরু করেছে তাদের জন্তুজীবন, মারামারি, ক্রোধ, হিংসা। এমন হিংস্র পরিবেশ থেকে লোটন বউ গর্ভের "অপমান আর কলঙ্কের ডালি" সন্তান নিয়ে পালিয়ে যায়—"ওদের সামনে এ সংসারে আনব না আমি তোকে" স্বগত উক্তি করে ঝাঁপ দেয় আর এক অজানা অন্ধকারে; কিংবা করে আত্মহত্যা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমযোগিনী ফুলকি আর নগেন-কালো উপাখ্যান এ বস্তির আর এক পতিত ব্যর্থ জীবনের কথকতা। কলের শ্রমিক ফুলকি, মদাসক্ত, দুর্বিনীত, শরীরসর্বস্ব ও জীবনলোভী—তার প্রতি আসক্ত বস্তির দুজন—কালো আর নগেন। নয়া সড়কের বস্তিবাসীদের মাঝে কালো-চরিত্র অন্তর্জগতে ভিন্নতর ফল্গুবেদনার এক মানুষ। গোবিন্দের বর্ণন ছবি লক্ষণীয় :

আধো অন্ধকার ঘরটিতে আগুনের নীল শিখার মতো শ্যামা ফুলকি, ঘুমের জড়তা নিয়েও এক খণ্ড ইস্পাতের মতো জ্বল জ্বল করছে। শক্ত পুষ্ট বন্য ঢেউ তোলা শরীর। বিস্রস্ত বেশবাস। জামার বোতাম খুলে গিয়ে বুকের বঙ্কিম রেখা উঁকি মেরে আছে। কপালের টিপটা খানিক গেছে বেঁকে, রুক্ষ চুল এলোমেলো হয়ে পড়েছে ছড়িয়ে। কোনও রকমে উঠে বসে কালোর দেওয়া ভাতগুলো গিলছে গপগপ করে। মুখের ভাত না গিলেই বলছে, উঃ কী খিদেটাই পেয়েছিল।

কালো যেন দেবীদর্শনের মতো হাঁটু গেড়ে তার কাছে বসেছে এবং অদ্ভুত করুণায় বেদনায় ও আনন্দে মগ্ন হয়ে চেয়ে আছে ফুলকির দিকে। (পৃ.২২৪)

ফোরটুয়েন্টি অর্থাৎ গোবিন্দর কাছে নগেন বলে ফুলকির সমস্ত জীবনকাহিনি। কালোর কাছে ফুলকি দেবী, কিন্তু প্রতারিত ক্রুদ্ধ নগেনের কাছে সে বহুগামী। ফুলকির জীবনে নগেন একা নয়, আছে আরও অনেক; 'তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই'—এমন কথা সারা বস্তির পুরুষদের সে বলে। নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে নগেনের মুখ। বলে চলে :

জানো ফোরটুয়েন্টি, আমাদের ছিপিয়ে ও অনেকদিন আমাদের লিবারবাবুর রেণ্ডিগিরি করে আসছে। হারামজাদী ভাবে, আমরা সে সব জানি না।...রাতে আমি রোজ খোঁজ নিতুম ও ঘরে ফিরেছে কি না। আর আজকাল ও সেল সাহেবের কোঠিতে রাত কাটায়। আমি নিজে যেতে দেখেছি..সচ,—সেল সায়েবের মেম বিলেত গেছে, এও জানি।...ঝুট বাত। হঠাৎ কালো বলে উঠল পাশের অন্ধকার কোণ থেকে। (পৃ.২৫৯)

ক্রোধে ভয়ংকর হয়ে ওঠা নগেন কালোকে জোড়া হাতে 'রদ্দা' মেরে পাঁকের মধ্যে ফেলে দেয়। কালোর উপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে নগেনকে শক্ত হাতে ধরে ফেলে গোবিন্দ। "তবু নগেন তড়পাতে লাগল, পুছ শালা, কে না জানে তোর ফুলকি সেল সাহেবের কোঠিতে রাত কাটাতে যায়। পুছ, কমিনা! অনেকে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, ...আমি জানি।... আমি জানি...। (পৃ.২৫৯)

ফুলকি এক লহমায় সব দেখে... বস্তির বাইরে চলে যায়। যেতে যেতে তার আঁট করে পরা শাড়ি উড়িয়ে, টিপ ঝিলিক দিয়ে, বাঁকা হেসে আগুন ছড়িয়ে যায়।...কেবল কালো পাঁক মাখা গায়ে ফুলকির অনুসরণ করে বেরিয়ে গেল বাইরে। (পৃ.২৫৯)

ছাঁটাই চলছে চটকলে, বস্তিবাসীদের অনেকেই ভেসে যাওয়ার পথে। এরই মধ্যে নগেন ক্রুদ্ধ মোষের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে গোবিন্দকে জানায়, ফুলকির প্ররোচনায় "সেল সায়েব শুয়োরের বাচ্চা আজ আমাকে পাছায় জুতোয় ঠোক্কর মেরেছে।...সকলের সামনে ফুলকি আমাকে বলে কিনা, কুকুরের আবার খাসির গোস্ত খাওয়ার নোলা। ঠিক এ সময়েই ফুলকি ঢুকল হেলে দুলে। পিছনে তার কালো।"(পৃ.২৬১) চকিতে নগেন বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ফুলকির উপর। উলঙ্গ ফুলকির নগ্ন শরীরে পাঁক, ধুলো ছুড়ে দিল বস্তির একদল বন্য উন্মাদ নারী-পুরুষ-শিশুর দল। ফুলকি তখন জলার পেত্নি, আশ্রয় নেয় ঝুপড়িতে। অশ্রাব্য কুৎসিত খিস্তি—বস্তিবাসীর ক্রোধ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। বাড়িওয়ালার নির্দেশে ফুলকি কাপড় পরে বেরিয়ে চলে যায় বস্তি থেকে। কালোও চলে গেল মাথা নিচু করে।

চৈত্র মাস। ফুলকি এখন রোগগ্রস্ত, যেন ভয়ংকরদর্শনা কুৎসিত রাক্ষুসী। ফুলকি আজ জীবনকে উন্মোচিত করে, উন্মুল জীবন তো শিকড় চারিয়ে দাঁড়াতে চায়। সমরেশ বসু যন্ত্রণা-বিকৃত মৃতপ্রায় ফুলকির স্বীকারোক্তির মাধ্যমে বিন্যাস করেছেন করুণ পরাভূত জীবনের কথা :

Dhaka University Institutional Repository

না, আমিও মন্দ।... মন্দ না হলে সেল সায়েবের কুঠিতে যেতুম?..সায়েবের কুঠিতে, ঘরের মেঝেয় মুখ দেখা যায়।...সেই ঘরে আমাকে রানী করেছিল সেল সায়েব। অমন বিছানা তোমরা চোখে দেখোনি গো কোনওদিন। শুলে পরে মনে হত কোথায় তলিয়ে গেলুম মাইরি। মেমসায়েব শোয় ওখানে। পালকের বিছানা। আর মদ! সগ্‌গের অমর্ত! কে না যেতে চায়, বলো। সোমসারে এত আরাম, এত সুখ, এত ভোগ ঐশ্বিয্যি।...

না না না, ও কথা বলো না। রোগ আমাকে সায়েব দেয়নি পেথমে। দিয়েছে এক বাবু। ছোটখাটোতে মন উঠত না আমার। নিজের দেশ থেকে পেথম বেরিয়েছিলুম যার সঙ্গে, সে আমাদের পাড়ার এক কেরেস্তান মিলিটারির চাকুরে। মাদ্রাজ শহরে তার বড় বাড়ি।

আমার কি মধুর বুলিতে মন ওঠে? মিছে রাগ নয় নগেনের? আমি সুন্দর খুঁজেছি, বাড়ি চেয়েছি, ঝকমকে তকতকে। পেয়েছিলুম অনেককেই! সবাই চেয়ে খেয়ে ছেড়ে দিল। কী করব? ওদের রাঁড় হয়ে রইলাম চিরকাল। (পৃ.২৭৪-৭৫)

এর দুদিন পরই মারা গেল সে। জীবন-উপভোগের পথ খুঁজতে গিয়ে নির্বাপিত হল উড়ে-চলা বিভ্রান্ত ফুলকি। নয়াসড়কের বস্তির কালো, সমরেশ বসুর অসাধারণ সৃষ্টি। দুরারোগ্য মরণব্যাধি আক্রান্ত ফুলকির প্রতি কালোর ভালোবাসা দেবী-সাধনার মতো, সে ফুলকির শরীর চায়নি কোনো দিন। মৃত্যুর কিছু আগে কালো ফুলকিকে বলে, "না। এ তো তুমি অনেককে দিয়েছ। যা তুমি কাউকে দাওনি, তাই আমি চাই।...তোমার মহব্বত।"

রুগ্‌ণ ছেলে-মা আর বাবার মর্মন্তুদ জান্তব ট্রাজিক জীবনেও গোবিন্দ স্বভাবত দায়িত্ববোধে জড়িয়ে যায়, যেমন অংশী হয়ে ওঠে বস্তির প্রতিটি মানুষের সংকটের সঙ্গে। ছেলেটি কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে পঙ্গু আজ, মৃত্যুপথযাত্রী; যখন সক্ষম ছিল বস্তির নির্মম জীবন থেকে মুক্তির জন্য গঙ্গার ধারে আশ্রয় নিত, বসে বসে সাহেব-মেম দেখত, আর স্বপ্ন দেখত বিলেত গিয়ে মেম বিয়ে করবে। আজ অভাবনীয় নোংরা বস্তি-ঘরের বারান্দায় শুয়ে গোবিন্দের লাগিয়ে-দেওয়া কুন্দ চারার সবুজের দিকে তাকিয়ে থাকে, পাহারা দেয়। সমরেশ বসু রুগ্‌ণ ছেলের মায়ের জীবন-ছবি এঁকেছেন যথাস্থিতবাদী দৃষ্টির সমগ্রতা দিয়ে :

ছেলেটার মা এক মধ্যবয়সী মেয়েমানুষ, আরও দুটো বাচ্চাকে নিয়ে বেসামাল হয়ে পড়েছে। এখানে এ খোলার চালায় অন্ধযুগের আদিম মায়ের মতো মেয়েমানুষটি। তার লজ্জার কোনো বালাই নেই। একটিমাত্র নেংটি পরনে, বাদবাকি সমস্তই খোলা। তার নড়াচড়ার তালে তালে নত বুক দুলছে কিন্তু কোনও অস্বস্তি নেই। লজ্জার কথা ভাবাই দুষ্কর। রোগা নয়, কিন্তু শরীরটা যে ফোঁপরা, তা তার ভাবভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে। মানুষের গলায় মাদুলি থাকে। তার জট বাঁধা চুলে সেই মান্ধাতা আমলের বাঁধা বেণীতে একটা তামার মাদুলি ঝুলছে। (পৃ.২২৫)

অথচ মাতাল বাবা ক্রুদ্ধ মোষের মতো সর্বংসহা বউকে জন্তুর মতো প্রহার করে। তখন রুগ্‌ণ ছেলে প্রতিক্রিয়ায় মাকে বলে, "ও শালাকে আমি মেরে ফেলব।" ঘৃণায়, ক্রোধে ছেলেটার স্বপ্নময় মুখ রক্তহীন নীল শিরায় কিলবিলিয়ে ওঠে। কী এক সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক লূতাতন্তুজাল উন্মোচন করেছেন ঔপন্যাসিক : "মায়ের এই খোলা বুক, নগ্ন কোলটুকু সে চেয়েছিল নিরঙ্কুশভাবে। কিন্তু পায়নি। আরও ভাই বোন এসেছে বছরের পর বছরে।...মায়ের কোলের জন্য হিংসে এসেছে। বিদ্বেষ ও আক্রোশ তার সকলের উপরে।" (পৃ.২২৬) এখন রোগ তার স্বপ্নকেও কেড়ে নিয়েছে। চটকলের ছাঁটাই, মোষের মতো ক্রুদ্ধ বেকার বাপ উধাও। মা ব্যস্ত থাকে সারাদিন কয়লা-গোবর সংগ্রহে, কাজের সন্ধানে। নিঃসঙ্গ রুগ্‌ণ ছেলেটার আজকাল একমাত্র সঙ্গী ফোরটুয়েন্টি চাচা—গোবিন্দ। সেই সেবাযত্ন করে। গোবিন্দের লাগিয়ে-দেয়া কুন্দ গাছের কষ্টে-ফোটা গুচ্ছ দুই ফুল ঝরে গেছে, পাতাহীন গাছটি ঝাড়ুর কাটির মতো দাঁড়িয়ে। সম্প্রতি ছেলেটির কণ্ঠস্বর স্তব্ধ।

ফাল্গুনের চাঁদ আকাশে। গোবিন্দ ছেলেটার পাশেই। উঠোনে রুগ্‌ণ ছেলেটা বস্তির মাটির দাওয়ায় চিত হয়ে শুয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। ছেলেটার মা এসে দেখে, মরা ছেলেটি :

Dhaka University Institutional Repository

...সে তার ছেলের মুখ থেকে হঠাৎ জ্যান্ত কয়েকটা কৃমি টেনে বের করে ফেলল।...জ্যোৎস্নায় কীটগুলো কিলবিল করছে। মা তার একটানা গলায় কাঁদতে লাগল...এমন যমের কাছেই তোকে রেখে গেছলাম।

নির্বাক হতভম্ব গোবিন্দের দিকে সবাই এমনভাবে তাকাল যেন সত্যি যম দেখছে।...চাঁদ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বস্তিটার দিকে। (পৃ.২৭১)

বস্তিবাসীদের ফাইফরমাস খাটা, শিশুদের সেবাযত্নকারী, রাঁধুনি, পরোপকারী গোবিন্দকে সকলে 'যম' বলে পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত জানায়। গোবিন্দ মনুষ্যবোধের নিষ্ঠুর পরাভবের নীরব অন্তর্স্রোতে, অন্ধকারে আশ্রয় নিল, বক্ষে তার অদৃশ্য রক্তক্ষরণ। রুগ্‌ণ মৃত ছেলেটা আর গোবিন্দ দুরকম স্বপ্নভঙ্গের ব্যর্থতায় পরস্পরিত হয়ে যায়।

সমরেশ বসুর কাছে এই উপন্যাসটির এক আলাদা গুরুত্ব ছিল। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'রচনাবলীর গ্রন্থপরিচিতি'তে লেখেন, "বি টি রোডের ধারে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি হারিয়ে একরাত্রেই পাগলপ্রায় হয়েছিলাম, মনে করতাম তার প্রধান পুরুষ চরিত্রটি প্রত্যক্ষত আমিই, কারণ একটা মহত্ত্বের প্রবণতা, তখন সম্ভবত আমার অবচেতনে ক্রিয়াশীল হয়েছিল" (গ্রন্থপরিচিতি, পৃ.৭০০)। উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র গোবিন্দর জীবন-স্রোতের সঙ্গে জড়িত হয়ে, অনুপ্রবিষ্ট হয়ে ও পরস্পরিত হয়ে সীমাহীন বেদনাতরঙ্গে সৃষ্ট হয়েছে এ উপন্যাসের সকল এপিসোড।

দুলারী-গণেশের আখ্যান 'মানুষের জটিল মনঃসমীক্ষণে' এবং বিপন্ন আবেগ, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও প্রণয়ের নিঃশব্দ উত্তেজনা-নৈরাশ্যে মানবিকও বটে। জীবন নিজেকে ভাঙতে ভাঙতে জীবনকে সন্ধান করে। গোবিন্দ কালোর কাছ থেকে জানতে পারে দুলারী-গণেশের জীবনকথা। বস্তির প্রাণবন্ত দুলারী বউ আজ বিছানায় লেপ্টে-থাকা কঙ্কালসার। গণেশ চটকলের কাজ ছেড়ে সারাক্ষণ মৃত্যুপথযাত্রী রুগ্‌ণ বউয়ের সেবা করে; মৃত্যুকে প্রতিরোধ করে ঘিরে থাকে অতন্দ্র প্রহরীর মতো। এখন গণেশ অথর্ব, অন্ধকার মূর্তির মতো। বস্তির এমন কেউ নেই যে তার কামাই-করা টাকায় এক সময় উপকৃত হয়নি। 'আধপেটা রেশনের খিদায় হরতালে'র সময় বস্তিবাসীদের স্বার্থে দ্রোহী গণেশ 'ফটিচার ম্যানেজারের গলা ধরে কারখানা থেকে বের করে দিয়েছিল।' হাজতও খেটেছিল তেরো দিন। অথচ এখন অর্থ নেই, চিকিৎসা নেই, কারখানায় যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে—সে এখন নিরাশ, আত্মঘাতকের মতো উদাস। সহশ্রমিক ফাগুকে সাহেব অন্যায়ভাবে থাপ্পড় মারলে এই গণেশ সাহেবকে প্রতিবাদে গলা টিপে ধরেছিল। অথচ আজ সকল বস্তিবাসীর চোখে গণেশ 'বেয়াকুব'; তারা বলে 'গরিব কুলি কাবাড়ির আবার মহব্বত। ওসব লাখপতির ঘরে সাজে।' গণেশের প্রত্যুত্তর হৃদয়-উৎসারিত কথকতা :

ঝুটা বাত। লাখপতির জান রূপেয়া, রাজার মহব্বত সিংহাসনে, রানী তো পুতলা। এক যাবে হাজারটা কিনবে। আমি রাজা নই, একটা ফালতু আদমি। আমার জানের পরোয়া নেই, পরোয়া মহব্বতের। একটা আমার লাখ লাখ, গেলে যে ফকির বনে যাব! (পৃ.২৪২)

গোবিন্দর অবচেতন অন্তর্দাহে বর্তমান এবং অতীত বিজড়িতভাবে জেগে ওঠে : "এ কী সর্বনেশে, কর্মনাশা সব-ভণ্ডুল-করা ভালবাসা। বুঝি তার প্রাণটা মস্ত বড় বলেই! গণেশ আর দুলারীর দিকে তাকাতে গিয়ে তার চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠল সেই ছুতোর বউয়ের ছবি, সেই কঙ্কালসার মায়ের উঠোনভরা দাপাদাপি।" (পৃ.২২৮) গণেশের কৃতজ্ঞতামিশ্রিত ভালোবাসা, দুলারী বউয়ের ভালোবাসার তপস্যার কথা শোনে গোবিন্দ :

এই দুলারী...ও ভিন্‌জাতের ছোটঘরের মেয়ে। গাঁয়ে যখন ওকে আমার ঘরে এনে তুললাম, তখন আমাদের ঘরের মানুষেরা আর ওদের জাতের লোকেরা আমাকে এমন পিটলে যে, জান খতম মনে করে ফেলে দিয়েছিল নদীর কিনারে। তখন এই

Dhaka University Institutional Repository

দুলারী আমাকে নিয়ে বনে জঙ্গলে লুকিয়ে ফিরেছে, সারা গায়ের খুন গাইবাছুরের মতো চেটে চেটে তুলেছে. হাড়-গোড় ভাঙা টুণ্ডাকে কোলে করে রেখেছে। আর ও আজ মরতে বসেছে, এখানে আমি কার উপর শোধ তুলব। কার উপর? তাই ভেবেছিলাম আমিও মরব...মরব ওর সঙ্গে। (পৃ.২৪৩)

গোবিন্দ দায়িত্ব নেয় দুলারীর আরোগ্যের; সম্মত হয় গণেশ। দুর্গন্ধযুক্ত স্যাঁৎসেঁতে কাঁথাকাপড় পরিচ্ছন্ন করে, দুলারী বউকে খাটিয়ায় রাখল আকাশের তলায়, রোদে হাওয়ায়। ক্রমশ বাঁচার ইচ্ছা আর আস্থা জাগল দুলারীর শরীর-মনে। গণেশ ব্যস্ত হয়ে ওঠে কারখানার কাজে। সময় মতো অবিরাম সেবা করে চলে গোবিন্দ।

দুলারী ফিরে পেয়েছে নতুন জীবন। গণেশ ফিরে পেয়েছে নতুন দুলারীর রূপ-সৌন্দর্য-'মহব্বত'। দুলারীর বর্ণনা :

সদী বুড়ি আজ নিজের হাতে তাকে নাইয়ে দিয়েছে গঙ্গার মাটি ঘষে, চুবচুবে মাথা আঁচড়ে দিয়েছে পাট করে। কপালে দিয়েছে মেটে সিঁদুরের তেল গোলা টিপ, কাজলের রেখা টেনে দিয়েছে চোখে। কানে বিলিতি রূপোর মাকড়ি, কঙ্কন, পায়ের বাঁকমল ছাই দিয়ে মেজে দিয়েছে ঝকঝকে করে। অনেক দিন বাদে নিজের হাতে হলুদ রঙের শাড়ি পরেছে নাভির তলা দিয়ে আঁট করে বেঁধে, বিনা কোঁচে, দোভাঁজে নিভাঁজ করে, যেমন করে সে কারখানায় যেত। (পৃ.২৫২)

পুনর্জাত দুলারীর অস্তিত্বের অবচেতনে গণেশের মাঝে অজ্ঞাতসারে স্থান পেয়েছে সব-হারানো গোবিন্দ। দুলারী-গণেশের হাসি-ঠাট্টা-কৌতুক তরঙ্গে গোবিন্দ অন্যমনস্ক, একাকি, ছুতোর বউয়ের ঘোমটা-উঠানো ইশারা দেখে। চিত্তজাগতিক কী এক দুষ্প্রাপ্য অতীত এবং বর্তমান গোবিন্দের জীবনে দুলারীকেন্দ্রিক এক দুঃখ, নতুন চেহারায় বাধার ব্যূহ রচনা করে। দুলারী-গোবিন্দের দ্বৈতসত্তার উন্মোচন, তার আন্তরক্রিয়া-বিক্রিয়া সমরেশ বসু স্বল্পকথায়, অব্যর্থ সংলাপে, বিস্ময়কর মানবীয় পরিস্থিতিতে দৃশ্য ও দৃষ্টিগ্রাহ্য করেছেন :

বাঁকটা কাঁধে নিয়ে বেরুতে যাবে গোবিন্দ, এমন সময় আবার এসে দাঁড়াল একেবারে গোবিন্দের কাছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে। গোবিন্দ অপ্রতিভের মতো হেসে বলল, কী হল?

পরিষ্কার গলায় বলল দুলারী, বহুত কুছ। তোমার দিল ঠাসা আছে কীসে, কভি তা বলতে চাও না। ভাবো আমি সমঝি না। বলো, কেন তুমি চলে এলে?..

তোমার সঙ্গে রঙ্গ করেছি।

এ কী রঙ্গ। তোমার মুখ হর বখত্ দুখ-আন্ধার।

দুলারীর নিশ্বাস লাগে গোবিন্দের গায়ে। গোবিন্দের চোখ বুজে আসে। আজ আর তাকানো যায় না দুলারীর দিকে। তার ভরা শরীর, নতুন পোশাক, উষ্ণ নিশ্বাস।

কান্নারুদ্ধ গলায় বলে দুলারী, বলতে, আমার ব্যামো সেরে গেলেই তুমি খুশি। সেরেছি। আজ কী দুখ্ তোমার বলো আমাকে।...

রোগা মুখে তেমনি হাসির ঝলক ফুটিয়ে সে জবাব দিল, দোস্তানি দুঃখের কি শেষ আছে? শেষ নেই। পথ ছাড়ো, কলে ভাঁজ লাগাতে হবে। অনেক কাজ রয়েছে।

আর একবারও দুলারীর দিকে না তাকিয়ে হনহন করে চলে গেল। কিন্তু বেরোবার গলির অন্ধকারে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দেওয়াল সেঁটে, যেন লুকিয়ে পড়েছে সে প্রাণঘাতী আততায়ীর ভয়ে। অসহ্য ক্রোধে হিসিয়ে উঠল, এ শালা কীসে ফেঁসেছি আমি—কীসে?

কেবল দুলারীর কাজল টানা চোখে ভিড় করে আসে মেঘ। (পৃ.২৫৪-৫৫)

অস্তিত্ব-নিরস্তিত্ব, আহার-অনাহার, চাপা ক্রোধ আর প্রকাশ্য প্রতিবাদের মধ্যদিয়ে টিকে আছে বি টি রোডের ধারের নয়া সড়কের বস্তিবাসীদের জীবন। শ্রমলুটকারী শিল্পমালিকশ্রেণির ছাঁটাইয়ের নির্মম

Dhaka University Institutional Repository

হিংস্রতার বিরুদ্ধে সংঘটিত হল স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ-প্রতিরোধ। কারখানার ভিতর ঘেরাওয়ের অভ্রভেদী ব্যূহ, বাইরে মালিকপক্ষের স্বার্থ রক্ষাকারী পুলিশের বেষ্টনী। শ্রমিক আন্দোলনের সক্রিয়কর্মী গণেশ। কমবেশি প্রায় সবাই জড়িত। বাড়িওয়ালার বস্তির ছাঁটাই হয়েছে এগারোজন। ধর্মঘটের তীব্রতায়, সংশয়হীন লৌহঘেরাও-এর ফলে মালিক পক্ষের সেল সায়েব আত্মসমর্পণ করে। কূটকৌশলী সমঝোতার মাঝে মালিকপ্রেরিত তৃতীয় পক্ষ গুণ্ডাবাহিনী পুলিশের উপর আক্রমণ করে ব্যর্থ করে দেয় সব। নগেনের কাছ থেকে এ সত্য গোবিন্দ জানতে পারে :

আমরা ঠিক ছিলুম...ম্যানেজার শালা পেরায় কাত মেরেছিল, সেল সায়েবটা আমাদের পায়ে ধরতে অবধি এসেছিল, মাইরি। এর মধ্যে কে যে শালা পুলিশের গায়ে ঢিল মারলে, ব্যস অমনি পুলিশ লাঠি চালিয়ে দিলে।... তাজ্জব, কেউ পয়লা পালাচ্ছিল না, কতকগুলো ডরপোঁক এমন চেঁচামেচি করে ছুটতে লাগল—(পৃ.২৬৪)

প্রত্যক্ষ সংগঠন-অভিজ্ঞ ঔপন্যাসিক শ্রমিকশ্রেণির ঐক্যচেতনার উন্মেষের মধ্যদিয়ে শ্রমিকশ্রেণি কীভাবে সংগঠিত ও সুশৃঙ্খলিত হয়—তা স্পষ্ট করেছেন। পাশাপাশি এও দেখিয়েছেন, মুনাফালোভী ধনিক শ্রেণির প্রতিভূ মালিকপক্ষ শ্রমিকশ্রেণির এ ঐক্যকে ধ্বংস করার জন্য কীভাবে তৃতীয় শক্তি তথা গুণ্ডাবাহিনীকে ব্যবহার করে।

ধর্মঘটের ব্যর্থতার পরিণামে নগেনসহ এগারোজন শ্রমিক ছাঁটাই হয়। গণেশ হয় কারারুদ্ধ। আশাবাদী নিঃসঙ্গ নগেন বস্তি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে কাজের খোঁজে। বাড়িওয়ালা আর বিরিজামোহনের সংঘাত তীব্র হয়ে উঠছে। রাঁধুনি গোবিন্দ, বস্তির সকলের পরিষেবা করেও ক্রমশ ব্যস্ত হয়ে ওঠে বাড়িওয়ালার বস্তির জমি উদ্ধারের ন্যস্ত দায়িত্বে। শহর আর কলকাতার উকিল-ব্যারিস্টারের কাছে মামলার জন্য ছুটাছুটি করছে গোবিন্দ। এমনি ব্যস্ততম মুহূর্তে দুলারীর সন্দেহ, ঘৃণা আর মর্মভেদী অকৃতজ্ঞতা, অপ্রকৃতস্থ করে দেয় গোবিন্দকে। দুলারীর বিশ্বাস গোবিন্দ গণেশকে উসকে দিয়ে জেলে পাঠিয়েছে। দুলারীর অবচেতন মনের বিসর্পিল বিষদাঁত আঘাত করে তাকে :

দুলালী মুখ ফিরিয়ে বলল তীব্র গলায়, তুমিই তো বেচারিকে উসকানি দিয়ে জেলে পাঠিয়েছ জানি না, না?

গোবিন্দ নির্বাক, নিথর।

দুলারী একেবারে তিক্ত গলায় হিসিয়ে উঠল, ওকে জেলে পাঠিয়ে তুমি আমাকে—আমার সঙ্গে মহব্বত ফাঁদতে চাও, জানি না ভেবেছ? গোবিন্দের মনে হল সে অন্ধ হয়ে গেছে, বোবা হয়ে গেছে, কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছে...সে যন্ত্রণায় ফিসফিস করে উঠল, দোস্তানি...দোস্তানি। বলতে বলতে সে ছুটে বেরিয়ে গেল। (পৃ.২৬৮)

সমরেশ বসু তাঁর সৃষ্টির 'শ্রেষ্ঠ মুখ'[১৬] অবচেতনে মহত্ত্বের প্রবণতা সক্রিয় ছিল যার, সেই গোবিন্দের তলিয়ে যাওয়ার নিরস্তিত্বপ্রায় শূন্য অনুভূতিকে চেতনাপ্রবাহরীতির ছেঁড়া-ছেঁড়া বাক্যে, কোলাজরীতিতে নিরবয়বকে দৃশ্যমান করেছেন। জীবন-সন্ধানের বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে ঔপন্যাসিক উদ্ধৃতির শেষ বাক্যসংকেতে গোবিন্দকে ফিরিয়ে আনলেন বাড়িওয়ালার নয়া সড়কের বস্তিতে :

সম্বিত নেই গোবিন্দের। চলছে, যেন নিজের পায়ে নয়। একবার ভাবল মহল্লার দিকে যাবে। কিন্তু মোড় ফিরে নিউ কর্ড রোড পেরিয়ে, পুবের ঝোপে ঝাড়ে ছাওয়া অন্ধকার পথে রেল লাইনের দিকে এগিয়ে চলল। চলল যেন নিশি-পাওয়া অচেতন মানুষের মতো। অবশ, বিহ্বল। হুস হুস করে দানবীয় শব্দে ছুটে আসছে একটা রেলগাড়ি দক্ষিণ দিক থেকে।

গোবিন্দের চোখের উপর ভেসে উঠল পুবের এই নাক বরাবর রাস্তাটা। ...নীলগঞ্জ ... বারাসত ... বসিরহাট ... ইটিন্ডেঘাট ... ইচ্ছামতী! নোনা কালোবরণী ইচ্ছামতী মানুষের মনের ইচ্ছা পূরণ করেছে। ... ও-পারে মুখ থুবড়ে পড়া ছুতোরের ঘর, ছুতোর বউ, মাটিমাখা হোঁতকা ছেলে, ছোট বিনুনির চুড়ো বাঁধা মেয়ে, আর ... গাড়িটা এসে পড়েছে, ঝম ঝম ঝম ঝম ...।

Dhaka University Institutional Repository

কে? চোখের সামনে ভেসে উঠল অনেকগুলো মুখ। বাড়িওয়ালা, কালো, ফুলকি, নগেন, রুগ্ন ছেলেটা, গণেশ, ছাঁটাই, মামলা ... দুলারী! মামলা! ... মামলা! ...

ঘং করে একটা শব্দের সঙ্গে লাইনের গেটটা একবার ককিয়ে বন্ধ হয়ে গেল।...রেল ইঞ্জিনের উত্তপ্ত হাওয়া ঝাপটা মেরে গেল চোখে মুখে। (পৃ.২৬৯)

গোবিন্দ বস্তিতে এসেই বাড়িওয়ালার কাছ থেকে জেনেছে গুড় বেচে বড়লোক হওয়া 'ছিঁচকে বেনে' জমিদার নতুন আইনে আগে মৌরস হয়ে যাওয়া জমিটা ঠিকে বানিয়ে দশ বছরের মেয়াদি করে দিয়েছে। এক বছর মেয়াদ বাকি আছে—এ সময়ের মধ্যে বাড়িওয়ালার জমিটা রাখার জন্য চেষ্টা করতে হবে—ভালো উকিলের কাছে দলিলপত্র নিয়ে যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত গোবিন্দ নিজেই এ দায়িত্ব নেয়। কিন্তু সবচেয়ে 'বড় বস্তি-লাইনের' মালিক 'ডাকসাইটে বাড়িওয়ালা' বিরিজামোহনের কূট ষড়যন্ত্রের কারণে সে পেরে ওঠে না অনেক দিন থেকেই। নয়াসড়কের বস্তি-জমির মালিক বাঙালি জমিদারের সঙ্গে বিরিজামোহনের ছিল সখ্য। এ জমি যে ভাল শুধু তাই নয়, বিরিজামোহনের এর প্রতি আকর্ষণের অন্যতম কারণ ছিল—এ বস্তির বাড়িওয়ালা ও তার বাসিন্দারা তাকে সমীহ করে না, 'সেলাম করে না'।

গোবিন্দের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে ঔপন্যাসিক বিরিজামোহনের যে রূপ চিত্রিত করেছেন তাতে তার স্বভাব চিত্রিত হয়েছে। বিশ্লেষণ নয় সমরেশ বসু বর্ণনের তির্যক ভাষায় বিরিজামোহনের স্বরূপ শনাক্ত করেছেন :

আচমকা বিস্ময়ের ঝোঁকটা কাটিয়ে ওঠবার আগেই গোবিন্দ দেখল বিরিজামোহন আসছে এদিকেই। রোগা, বেঁটে ফরসা লোকটা কাছে আসতে দেখা গেল জরি-পাড় কাঁচির ধুতি পরেছে ফুলকোঁচা দিয়ে, হাঁটু অবধি ঝুলে পড়েছে ফিনফিনে আদ্দির কলিদার পাঞ্জাবি, মাথায় দেশি টুপি, পায়ে বুটিদার নাগরা। লোকটার মুখের চামড়া যেন অকালেই ঝুলে পড়েছে। কুত্‌কুতে দুটো চোখের তীক্ষ্ণ শিকারির দৃষ্টিতে যেন সে আগে পাছে কেবলই শিকার খুঁজছে। ঠোঁটের কোণে ও ওই চোখে তার একটা ছলনার নোংরা হাসি জ্বল্‌জ্বল্ করছে। লোকটাকে গোবিন্দ আরও একদিন দেখেছে। সেদিন লোকটার একটা কথারও জবাব দেয়নি বাড়িওয়ালা। খানিকক্ষণ বকে বকে আপনিই চলে গিয়েছিল। ওর উপস্থিতির কারণই হল, বাড়িওয়ালাকে খানিকটা অপদস্থ করা। (পৃ.২৪৭-৪৮)

অর্থপিপাসু কূটকৌশলী বিরিজামোহন বাইরে অমায়িক ও শান্ত হলেও, বাস্তবত ক্রূর ও কুটিল সে। নয়াসড়কের বাড়িওয়ালাকে 'খুঁচিয়ে' অকারণে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে নিষ্ঠুর আনন্দ পায় বিরিজামোহন। ঔপনিবেশিক ইংরেজদের নাচঘর পর্যন্ত তার গতিবিধি। দশ বছর আগে দেখা গোবিন্দকে চিনতেও ভুল হয়নি বিরিজামোহনের। বস্তির চারপাশে সারা শহরের ময়লা আবর্জনা ছড়িয়ে সে হেলথ অফিসারের কাছে এটাই প্রমাণ করে যে এ বস্তিটা বসবাসের অযোগ্য, জন-অস্বাস্থ্যকর বলে পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। গোবিন্দের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়েছে, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, হেলথ অফিসার সবাই বিরিজামোহনের সাহায্যকারী জমিদারবাবুর অর্থ পেয়েই ভুল রিপোর্ট লিখেছে।

গোবিন্দ হয়ে পড়েছে দুর্বল, কৃশকায়—ছুটে গেছে গরিবের বন্ধু সদাশিব মানুষ, অন্ধ ব্যারিস্টারের বাড়ি কলকাতায়। গোবিন্দের কাছে সব শুনে অন্ধ ব্যারিস্টারবাবু জানিয়ে দেন : "গোবিন্দ, শয়তানের সঙ্গে শয়তানীতে পাল্লা দেওয়া যায় না।...তবু মানুষ শয়তানের কাছে হার মানে মাঝে মাঝে। তোমাদের হয়তো হার মানতে হবে।" একটা অদৃশ্য শানিত নখ বিদ্ধ হয় গোবিন্দের বুকে। কোর্টের রায় জানা যায়, জজ বলেছে : আইনত যদিও জমিটা প্রজারই ঠিকা স্বত্ব, তবু মিউনিসিপালিটির রিপোর্ট অনুযায়ী এরকম একটা নোংরা আস্তানাবিশেষকে রাখা স্বাস্থ্য ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। নোটিশ অনুসারে মাত্র এক মাসের মধ্যে যেন বস্তিটি অপসারণ করা হয়। অন্যথায় উক্ত সময়ের পর সাত দিনের মধ্যে দখলকারী প্রজাকে উচ্ছেদ করা যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তির উঠোনে বসে-থাকা সকলের চোখ বিস্ময়ে, দুশ্চিন্তায় ঘোলাটে হয়ে গেছে। খাটিয়ার উপর বাড়িওয়ালার দৃষ্টিতে অন্ধকার। গলির মুখে এসে দাঁড়ায় হাড্ডিসার ক্ষীণজীবী চেহারা আর উসকো-খুসকো চুলের ছেঁড়া জামা-পরিহিত সর্বাঙ্গ ধূলিমলিন গোবিন্দ। বস্তির সবাই নিশ্চুপ। বাড়িওয়ালা মুখ ফিরিয়ে রইল তার দিক থেকে। ফোরটুয়েন্টি গোবিন্দ যেন সত্যিই প্রতারণা করেছে।

কোর্টের দেওয়া সময় অগ্রাহ্য করে ওইদিনই জমিদার, তার লোকজন ও বিরিজামোহন বস্তি গুড়িয়ে দিয়ে বাড়িওয়ালা ও বস্তিবাসীদের উৎখাত করতে শুরু করে। মাটি আর ছিটে বেড়া, বাঁশ আর কঞ্চি, পুরোনো খোলা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, ধুলো উড়ছে চারদিকে। প্রতিবাদে গোবিন্দ ঝাঁপিয়ে পড়ে শাবল কুড়ুলওয়ালাদের উপর। একক প্রবল বাধার মুখে শাবল কিংবা ছুরিকাঘাতে খুন হয় গোবিন্দ। গোবিন্দের মৃত্যুর অন্তর্বয়ন, বস্তিবাসীদের অনুতাপ-অন্তর্দাহ, পরিপার্শ্ব ও প্রকৃতির প্রতীকী পরম্পরার শিল্পমিথস্ক্রিয়া অনুধাবনীয় :

> হা হা রবে মেঘ ছুটে আসছে, কালবৈশাখীর অট্টহাসি ভেসে আসছে আকাশ থেকে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।... বাড়িওয়ালা গোবিন্দকে তুলে নিয়ে এল বস্তির উঠোনে।...গোবিন্দ তখনও মরেনি। বোধ করি শেষবারের জন্য সে ওদিকে তাকাল। ওই উত্তর দক্ষিণে বিলম্বিত নিউ কর্ড রোড, পূর্বে ঝোপে ঝাড়ে ছাওয়া বাঁকা রাস্তা চলে গেছে রেল লাইন পেরিয়ে, বহু দূরে—বারাসাত...বসিরহাট...ইটিন্ডেঘাট...ইচ্ছামতী ! ছুতোর বউ, ছেলে...
>
> সমস্ত এলাকা খালি করে লোক আসছে, ভরে উঠছে উঠোনটা।...বাড়িওয়ালা ছুটে ঘরে চলে গেল। অসহ্য একটা অপরাধ বোধের যন্ত্রণা তাকে কামড়ে ধরেছে, জীবনের শেষ সম্বল তিনশো টাকার থলিটা ছুড়ে ফেলে দিল মাটিতে।—কার জন্য এ-সব ! আমি বেইমান!..
>
> দুলারী সকলের অলক্ষ্যে নিজের ঘরে গিয়ে মাটিতে মুখ দিয়ে হু-হু করে কেঁদে উঠল, আমার কলিজার দুটো পাশ; একটা জেলবন্দি আর একটা আমি আপন হাতে টিপে দিয়েছি, শেষ করেছি।...
>
> সেই রুগ্ন ছেলেটির মধ্যবয়সী মা গোবিন্দের পাশে বসে তার কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিল, মুখের রক্ত মুছে দিতে দিতে বলল, আমি তোকে যম বলেছি, আমার সোনার বাছা। তোর যম যেন কোনওদিন রেহাই না পায়।
>
> তারপর সব নিস্তব্ধ। আস্তে আস্তে একটা অদ্ভুত গুলতানি উঠতে লাগল ভিড়ের মধ্যে।...আকাশের কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা গুলতানি হু-হু করে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে দিগন্তে। (পৃ.২৮০-৮১)

বস্তিবাসীদের জন্য লড়াইয়ে গোবিন্দ প্রাণ বিসর্জন দিয়ে জানিয়ে গেল জীবনের মানে কী; মুক্তিপথ-যাত্রার রক্তমূল্য কতটুকু, কীভাবে তা শ্রমিকশ্রেণিকে ঐকবলয়ে জাগ্রত করে। অনাগত কালবৈশাখীর 'ঝোড়ো হাওয়ায়' রেখে যায় জেলবন্দি গণেশ তার শ্রমিকদ্রোহ-প্রতিবাদ।

এ-উপন্যাস সম্পর্কে সমরেশের আবাল্যবন্ধু সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গ উক্তিটি স্মরণীয় : "যে ন্যাচারালিস্টিক বাস্তব সমীক্ষণ হয়ে যেতে পারত এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের চোরাবালি, সমরেশ আশ্চর্যভাবে তা থেকে নিজেকে রক্ষা করেছেন। জোলা নয়, গোর্কিই এ-ক্ষেত্রে সমরেশের উপর কিছুটা প্রভাব ফেলেছেন। বস্তি বাস্তবতার অনুপুঙ্খ সমাবেশে লেখকের কোনও শৈথিল্য ছিল না। কিন্তু তার থেকে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে মানবীয় অস্তিত্বের অপরাজেয়তা। দুঃসহ বি.টি. রোডের ধারের মানুষদের যন্ত্রণা, কিন্তু দুর্মর মানুষের প্রেম—এই নৈতিক অবধানতায় সমরেশের দীক্ষা কতটা জোরালো, এই উপন্যাস তার সাক্ষ্য বহন করছে।"[১৭]

শুধু গোবিন্দ নয়, গণেশ-দুলারী, কালো-ফুলকি, রুগ্‌ণ ছেলে আর মা এবং বাড়িওয়ালার নিষ্ঠুর ইতিহাস-তাড়িত জীবনের মাঝেও ঔপন্যাসিক এসব মানুষের অপরাজেয়তাকেই সন্ধান করেছেন। আতপুরের আবদুল মিস্তিরির বস্তিবাসের অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করে সমরেশ বসু আতপুর-জগদ্দলের শ্রমিক অঞ্চলের প্রাত্যহিক বাস্তবতাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন we wU †iv‡Wi av‡i[১৮] উপন্যাসে। উপন্যাসের কাহিনি বিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

স্থানিক পরিসরে বিবৃত হলেও ঔপন্যাসিকের জীবনভাষ্যে ও শিল্পনৈপুণ্যে তা নির্বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছে। গোবিন্দের নির্ভীক প্রাণ, বিদ্রোহী সত্তা ও দ্রোহচেতনা, প্রতিপক্ষের আঘাতে মৃত্যুর মাঝে পরাভূত হলেও, তা সর্বকালের বঞ্চিত মানুষের উত্তরাধিকার হিসেবে we wU †iv‡Wi av‡i উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে।

শ্রীমতী কাফে

উত্তর চব্বিশ পরগনার পাশ দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর প্রবাহিত গঙ্গার পুব পাশে নৈহাটি স্টেশনের সামনে গড়ে-ওঠা 'বাসন্তী কেবিন'—নৈহাটির এক সময়ের "চির বামপন্থী এই রেস্তোরাঁকে পর্যায়ে পর্যায়ে স্পর্শ করে গেছে অগ্নিযুগ, গান্ধীযুগ, সমাজবাদী গণ আন্দোলনের যুগ। এই ত্রিকাল স্পৃষ্ট রেস্তোরাঁটিকে নিয়ে লেখা 'শ্রীমতী কাফে'।[১৯] চরমপন্থা, তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ থেকে আইন অমান্যের গণ-আন্দোলন এবং তারপরে ভারতীয় রাজনৈতিক শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন পদক্ষেপ—দীর্ঘ এই পথ পরিক্রমণের সাক্ষী যেন 'শ্রীমতী কাফে'—লেখকের ইতিহাস সচেতনতার ও কালান্তর অবধানতার প্রতীক। ব্রিটিশ-ভারতীয় উপনিবেশের আড়াই দশক এই উপন্যাসের কালগত উপাদান। লেখকের রাজনৈতিক মতাদর্শ যখন সূচ্যগ্র চূড়ায় পৌঁছেছে 'শ্রীমতী কাফে সেই সময়ের চিহ্নবহ। শ্রীমতী কাফেই বলা যায় এই উপন্যাসের নায়ক। তথাপি বলা যায় ভজন এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার পারিবারিক মাত্রা, তার রাজনৈতিক মাত্রা, এবং তার ব্যক্তিগত আকুতি, তার প্রায়শ প্রমত্ততা—সব মিলিয়েই ভজনই শ্রীমতী কাফের আত্মা।[২০] kxgZx Kv‡d উপন্যাসের প্রারম্ভে, সমরেশ বসু লেখেন :

> প্রথম কথা, শ্রীমতী কাফে কোন একটা বিশেষ রেস্তোরাঁ নয়। তবু একাধিক মিলে শ্রীমতী কাফের একটা বিশেষত্ব আছে। অর্থাৎ শ্রীমতী একটা ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। সে ঐতিহ্য আমাদের জাতীয় জীবনেরই আলো-আঁধারির খেলা।...
>
> শ্রীমতী কাফে যেন রঙ্গমঞ্চ, যে হিসাবে আমরা সমগ্র বিশ্বকেই রঙ্গমঞ্চ বলে থাকি। সুতরাং ক্ষেত্র বড় বিস্তৃত নয়। অথচ অনেক ঘটনা।
>
> তাই কাহিনীর গতি চলতি নিয়ম থেকে একটু অন্য পথ ধরেছে। পথটা সমাদৃত হলেই সার্থক।

সমরেশ বসু স্বভাবতই জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেন সামূহিকভাবে, আবার ব্যষ্টিকভাবে। নিচুতলার মানুষ, মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, বিপ্লববাদীদের অন্তর্কলহ, শ্রমিক শ্রেণির উত্তেজিত দিক্‌চিহ্নহীন প্রতিবাদ—নৈহাটির মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার শব্দরূপের মাধ্যমে, সমরেশ বসু ১৯২০-৪৮ সময়-পরিসরের সর্বভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব, অন্তর্কলহ এবং সাধারণ বিচিত্র পেশার মানুষের প্রবল জিজ্ঞাসা ও হতাশা-বঞ্চনার শিল্পরূপ দিয়েছেন। অর্থাৎ ভারতের কেন্দ্র নয়, নৈহাটির প্রান্তিক মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় kxgZx Kv‡d হয়ে উঠেছে ঘূর্ণাবর্ত সময়ের রূপক। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র দুটি—শ্রীমতী কাফে এবং মালিক শ্রীভজনানন্দ হালদার। সমরেশ বসু শ্রীমতী কাফে ও ভজনানন্দ, ভজন, ভজুলাট-কে উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন পরস্পরিত ও সুস্পষ্ট পশ্চাদ্‌পট বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে। নায়ক হল নির্ধারিত বহমান সময়, ধাবমান কাল; কখনো কুণ্ডলায়িত, কখনো বিসর্পিল।

রাজনীতিক-পারিবারিক অধীনতা ও পরাধীন চাকুরি-জীবন অপেক্ষা, ভজনের কাছে দু-পয়সার চা বিক্রেতার স্বাধীন জীবন অপরিমেয়, অনন্য স্বাদের। এভাবেই ভজনের চা-বিক্রয় ব্যবসার শুরু। ভজনের আদি দোকানের বর্ণনা নিম্নরূপ :

> বড় রাস্তার পশ্চিম ধারে কেরোসিন টিন পাতের মরচে পড়া চালা আর পোকা ধরা ছিটেবেড়ার হেলে পড়া ঘর। তাকে আবার দুভাগে ভাগ করা। সামনের দিকে কেরোসিন কাঠের টেবিল, আর উনুন। টেবিলে কাপ আর গেলাস। বাইরে খান দু'য়েক বেঞ্চি পাতা। সেখানে বসে চা খাচ্ছে কয়েকজন মিস্তিরি শ্রেণীর লোক।...

Dhaka University Institutional Repository

ঘরের বাইরে দরজার পাশে একটা ব্ল্যাকবোর্ডে মস্ত বড় করে খড়ি দিয়ে লেখা রয়েছে চা। ছোট অক্ষরে, এক কাপ দু পয়সা। দু' পয়সা আবার দুটো গোল বৃত্ত এঁকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। (mg‡ik em iPbvejx ১, পৃ.২৯২)

এখানকার নিয়মিত খদ্দের রেলওয়ে ইয়ার্ডে-র বাঙালি, ও অন্যান্য শ্রমিক। এই চা দোকানেই আসে জেলখাটা কৃপাল দত্ত, হীরেন নিয়োগী আর রথীন—তাদের আলোচনার বিষয় জাতীয় রাজনীতি, তার কর্মকাণ্ড, মতান্তর ও মতাদর্শের সংকট। এখানেই আমরা প্রথম পরিচিত হই ভজনের দাদা বিপ্লবীবাহিনীর আঞ্চলিক অধিনায়ক নারায়ণ হালদারের সঙ্গে। এবং এই চা দোকানের পার্টিশনের আড়ালে, রাতের ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশে, মাদক-ব্যবসায়ী বিদেশি এক আগন্তুকের প্যাকেট থেকে উন্মোচিত হয় 'বিষধর কাল কেউটের মতো চকচকে দুটো রিভলবার'; কার্টুজ এবং বিপ্লবসংক্রান্ত চিঠি। উদ্দেশ্য বিপ্লব সাধন। আমরা লক্ষ করি, বিপ্লবী নারায়ণের সন্ধানে এই ছিটেবেড়ার চায়ের দোকানে সশস্ত্র পুলিশ তল্লাশি ও হামলা চালায় একাধিকবার। চায়ের দোকানের দ্বিতীয় পর্যায়ের শ্রীমতী কাফের বিশদ আলোচনা যথাস্থানে করা হয়েছে।[২১]

kxgZx Kv‡d উপন্যাসে সমরেশ বসুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য তিনি প্রতিটি চরিত্রকে অন্তর্জগৎ-বহির্জগৎ মিলিয়ে সমগ্র দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিবেচনা করেছেন। উনিশশো বিশ-আটচল্লিশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, কঠিন-কঠোর ব্রিটিশবিরোধী স্বরাজ-আন্দোলন, বিপ্লববাদ, সমাজতন্ত্র-সাধনা, শ্রমিক আন্দোলন, সাম্যবাদী সংগঠন প্রভৃতি অস্থির সর্বত্যাগী দহনকালের চরিত্রপুঞ্জ কেউই, রাজনীতিতত্ত্ব-শুষ্ক হৃদয়হীন নয়, স্বপ্নভ্রষ্ট নয়, নয় যন্ত্রসদৃশ। তাদের প্রায় সকলেই অন্তর্দ্বন্দ্ব-বহিঃসংঘর্ষের দ্বৈরথে, কুণ্ডলায়িত পরিণাম-বলয়ে আবর্তিত হয়ে, পরিণামে ট্রাজিক অবসাদে এক ধরনের স্থির জীবনে স্থিত হয়েছে।

মহাদেব হালদারের পরিবারকে কেন্দ্র করে এ উপন্যাসের অন্যতম কাহিনি-স্রোত আবর্তিত হয়ে আটচল্লিশ স্পর্শ করেছে। একগুঁয়ে মহাদেব হালদারকে পরিচিত-জনেরা মামলাবাজ, 'উনিশটি মামলার পরাজয়ের গ্লানি' বহন-করা 'নেকো হালদার' বলে জানে। কারখানা করবার জন্য অন্য অনেকের সঙ্গে তার জমিও অর্থমূল্যে ইংরেজ কোম্পানি নিতে চেয়েছিল। কিন্তু কোনোক্রমেই তিনি জমি ছাড়তে রাজি ছিলেন না। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যাওয়া তার পক্ষে শুভ হয়নি। বিশেষ করে কান্ত চক্রবর্তী ও কানাই মুখুজ্যের মতো জমিদার যখন ইংরেজদের সহায়। কাজেই বসতবাড়ি ছাড়া একমাত্র সম্বল জমিটুকু হারিয়ে মহাদেব হালদার আজ বাঁচার অবলম্বনও খুঁজে পান না। মামলার চক্রে বাঁধা পড়ে নেশাগ্রস্ত মদ্যপ সংসার-উদাসীন মহাদেব হালদার স্ত্রীকে হারিয়েছেন, সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব পালনে হয়েছেন ব্যর্থ। 'এক মুঠো ভাত আর এক ঘটি জলের জন্য' তাকে পরনির্ভরশীল হতে হবে ভেবে তীব্র বিষাদগ্রস্ত হয়ে ওঠেন হালদার। অর্থাভাবে শেষ জীবনে পুত্রের মদ চুরি করে নেশা করেন, এক কালের দম্ভী একরোখা মহাদেব হালদার। মহাদেব হালদার-চরিত্র নির্মাণে ঔপন্যাসিকের মন্তব্য ও পুত্রের সাক্ষ্য লক্ষণীয় :

লোকটা জীবনে কোনওদিন কাউকে বিশ্বাস করেননি। শুধু তাই নয়, চুপিসারে কেউ-ই বলতে ছাড়ে না যে, তার বাবা জমিদারের নায়েবগিরি করে এ বিশ্বসংসারে অনেককে অনাথ করেছেন। কিন্তু সে বঞ্চনার মুঠিভরা পয়সা কোনওদিন রাখতে পারেননি। ভজনের বিশ্বাস, দশজনের অভিশাপই তার কারণ। (পৃ.২৯৩)

আটচল্লিশ সালের মাঝামাঝি বৃদ্ধ নেশাগ্রস্ত মহাদেব হালদার রাজনীতির টানাপোড়েনের সাক্ষী হয়ে বেঁচে আছেন। পৌত্র গৌরকে দিয়ে মামলা করাতে ব্যর্থ মহাদেব। চিত্তরঞ্জনের আশীর্বাদপুষ্ট প্রধান রায় মন্ত্রী হয়েছেন শুনে মুমূর্ষু শয্যাতেই তিনি আশায় বুক বাঁধলেন। একদিন তিনিই কাউন্সিলের ইলেকশনে প্রধান রায়কে এ সব অঞ্চলের ভোট পাইয়ে দিয়েছিলেন। সুরথ বাঁড়ুজ্যেকে পরাজিত করেছিলেন। পৌত্রের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

মহাদেব হালদারের সাহায্যপ্রার্থী-পত্রের জবাব আসে মন্ত্রীর কাছ থেকে : 'আর নারায়ণের ভাইপোর কোনও কাজ সরকারি ব্যবস্থায় নেই।' তাঁর জীবনের আশপাশ নেই, পেছন নেই। সামনের অন্ধকার কণ্টকিত পথটাকে কেবল নেশার ঘোরে, বার্ধক্য আর ব্যর্থতায় অতিক্রম করা।

ভজনানন্দ হালদার, মহাদেব হালদারের কনিষ্ঠ পুত্র, ১৯২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণায় রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে চায়ের দোকান দিয়ে স্বাধীন স্বনির্ভর জীবনযাপনের চিন্তা করে। ভজনের শারীরিক অবয়ব তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্যবাহী। নিচের অংশে ভজনের বর্ণনা লক্ষণীয় :

হালদার মশায়ের ছোট ছেলে। ছেলে নয়, যেন একটা জীবন্ত শাণিত ইস্পাতের তলোয়ার। গায়ের রংটা উৎকট ফরসা, ধবধবে। ঠোঁট দুটো রক্তাক্ত। খাড়া নাকটা তার উন্নাসিক চরিত্রের সাক্ষীর মতন, চোখ দুটো টানা টানা কিন্তু কটা মণি দুটোতে একটা অদ্ভুত ধকধকানি। একহারা লম্বা, সটান একটু বেশি। সামনে পেছনে কোথাও সামান্য ঝোঁকতা নেই। আর মাজা ঘষা ফিটফাটভাব তার সর্বাঙ্গে বিরাজ করেছে। দু'এক বছর হল বি.এ. পাশ করে বেরিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগের ছেলে। এ যুগে এতখানি লেখাপড়া শিখে সরকারি দপ্তরে একটা সদ্‌গতি হতে পারত তার। কিন্তু সেদিক থেকে তার নিজের প্রচণ্ড আপত্তি। তা ছাড়া, তাদের পরিবারে একটা সরকার-বিরোধী ছাপ একা নারায়ণ হালদারের জন্যই যেন গভীর ভাবে এঁকে রেখে গিয়েছে! সেসবে ভজন বিচলিত নয়। এখানকার কোনও চটকল বা অন্য কোনও বেসরকারি কারবারে তার চাকরি হতে পারত। কিন্তু জবাব তার একটাই ছিল, ও-সব ছ্যাচড়া কাজের জন্য ভজন জন্মায়নি, কিন্তু টাকাও নেই যে, কোনও একটা কারবার ফেঁদে বসবে। অতএব এই চায়ের দোকান। (পৃ.২৯২)

ভজন-চরিত্রের বর্তমানতাকে অনিবার্য করার জন্য সমরেশ বসু মহাদেব হালদার ও তৎকালীন সামাজিক সামূহিক নির্জ্ঞান, পারিবারিক ইতিহাস ও জন্মগত উত্তরাধিকারকে ব্যবহার করেছেন। সমরেশ বসুর বর্ণন অনুসরণীয় :

তবে এ-কথাও সত্যি, চব্বিশ পরগনার উত্তর সীমান্তে তাদের এ ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত অঞ্চলে পাড়ায় ঘরে নীচতা ও হীনতা যেন সীমাহীন। অর্থ ও যৌবনের লালসার নোংরা দাগ অনেক ঘরে গুপ্ত ছাপ রেখে গিয়েছে। হাজার বছর পূর্বে এরা স্বৈরতন্ত্রের রাজা ও পুরোহিত, সে কথা বাহ্যত ভুলে গেলেও নীল রক্তধারা তার কাজ এখনও স্তিমিত ধারায় তলে তলে চালিয়ে যাচ্ছে।...এ সত্যের মতো আর একটা সত্য, সুযোগের সদ্ব্যবহারও এরাই করেছে। আধুনিক শিক্ষাকে গ্রহণ করেছে এরাই সকলের আগে। এ যুগে এদের বংশধরেরাই আবার প্রতিবাদ করেছে অন্ধকারে গোপন পাপের। অবশ্য এ সমাজের পরিত্যক্ত স্তরগুলোতেও এ সময়ে পম্পিয়াই নগরীর পশ্চাদ্‌পট সর্বনেশে বিসুবিয়াসের মতো তলে তলে গোমরাচ্ছে।

ভজনের জন্ম এ সমাজে। এখানে ঘরে বাইরে তার শ্রদ্ধা নেই কোথাও, বলা চলে একটা চির-অবিশ্বাসী। ওমর খৈয়ামের সেই উক্তিটা ভজনের খুব প্রিয়, 'সে কোন্ এক মরুর বুকে, অবিশ্বাসী থাকত সুখে।' (পৃ.২৯৩)

এই চায়ের দোকানকে কেন্দ্রে রেখে উপন্যাসের মূল কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। এই চায়ের দোকান, দ্বিতীয় পর্যায়ের আধুনিক রেস্টুরেন্ট এবং ভজনানন্দ হালদার ভজন, সমীকৃত ও একীভূত হয়ে আছে। এটি ভজনের মানসপ্রতিমা। সেই অনুভব থেকে মনের মতো সাজিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে এর নামকরণ করেছে শ্রীমতী কাফে। কালের সাক্ষী শ্রীমতী কাফে ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শগত ব্যক্তির মিলনস্থল—বিচিত্র চরিত্রের এক চলমান চিত্রশালা। সমকালীন রাজনীতির ভাঙা-গড়ায় বিভিন্ন দল ও দলীয় চরিত্রের মতোই আন্দোলিত হয়েছে শ্রীমতী কাফে।

১৯২০ সালে বাড়ির পাশেই চায়ের দোকান দেয় ভজু। এরপর জড়িয়ে পড়ে অসহযোগ আন্দোলনে। আন্দোলন প্রত্যাহারের পর গান্ধীর মতাদর্শকে কাপুরুষতা মনে হয়েছে দাদা নারায়ণের কাছে। এজন্য সে ব্যায়াম সমিতির দিকে ঝুঁকে পড়ে, বিপ্লববাদের বিপজ্জনক পথে চলে। হীরেন গান্ধীবাদে অবিচল। প্রিয়নাথ সমাজতন্ত্রে দীক্ষা নেয়। কিন্তু ভজন নতুন কোনো পথের সন্ধান করেনি, বরং স্বেচ্ছায় নিজেকে

Dhaka University Institutional Repository

নিক্ষিপ্ত করেছে এক নিদারুণ অবিশ্বাস, হতাশা ও শূন্যতার বৃত্তে। সর্বত্র অবিশ্বাসী হলেও দাদা নারায়ণ ছিল তার 'জীবনাকাশে' সূর্যের মতো। নারায়ণের সঙ্গীরা ছিল নক্ষত্রের মতো। কারণ তারা কেউই সমাজের কদর্যতায় কলঙ্কিত হয়নি, নিমজ্জমানও কেউ নয়। তবু তাদের গৃহীত পথও অনুসরণযোগ্য হয়নি ভজনের কাছে। যে উদ্দেশ্যে তাদের এ পথচলা তার কোনো ভবিষ্যৎ-গন্তব্য দেখতে পায় না ভজু। সেকালের গ্রাজুয়েট ভজন কবিতা লিখত, পড়ত দেশ বিদেশের গ্রন্থ, বাংলা সাহিত্যদর্শন, সাহিত্য। ভজনের লূতাতন্তু-মনস্তত্ত্ব, তার এ মনোভঙ্গি উদ্ধৃত নিচের অংশে প্রকাশিত হয়েছে :

তাই তার সমস্ত কিছুতেই এখানে অবজ্ঞা আর অশ্রদ্ধা। তাই ব্যক্তি হিসাবে একমাত্র নারায়ণের প্রতি তার অসীম শ্রদ্ধা, বুঝি নিজের প্রাণটাও তুচ্ছ কিন্তু নারায়ণের পথকে সে গ্রহণ করেনি। ওটা একটা বৃথা কাজ, পাথরের দেওয়ালে অকারণ মাথা ঠোকা। যে কারণে সে সাধু হবে না সে কারণেই সে হবে না বিপ্লবী। তাঁদের জন্য তোলা রইল নমস্কার।

এ সমাজের বুকে তাই সে ব্যতিক্রম নয়, একটা বিভ্রাট। যত অশ্রদ্ধা, তত তার দম্ভ, বিনয় হল ধাষ্টামো। ঘরে বাইরের দুর্বুদ্ধিতা তাকে যেন নিয়ত পোড়াচ্ছে। চরিত্রে যে তার প্রচণ্ড বেগ, তাতে সেই পোড়ানো যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কোথাও ঠাঁই নেই তার, নেই জীবনের নিরাপত্তা। তবে কাকে মানবে সে। তাই বুঝি আর সবকিছু ছেড়ে এ চায়ের দোকান। তাই সে ভজু নয়, লোকে বলে ভজুলাট। (পৃ.২৯৩-২৯৪)

রেলওয়ে ইয়ার্ডের শ্রমিক বাঙালি, ঘোড়ার গাড়ির চালক ভুনুর মতো সমাজের প্রান্তবাসী মানুষের সঙ্গে ভজুর বন্ধুত্ব হয়, যেমন মোটর ক্লিনার ইসমাইল ছিলেন সমরেশ বসুর বন্ধু। কারও মতাদর্শকে গ্রহণ না করলেও তার চায়ের দোকানে, পরবর্তীকালে শ্রীমতী কাফেতে, সকলেই সমানভাবে অভ্যর্থিত ও আপ্যায়িত হয়। সকলের আলোচনায় উদাসীন থেকেও কখনো কখনো নিজস্ব জীবনবোধের তাগিদে তাদের প্রয়োজনের সময় পাশে দাঁড়ায় ভজন। এ কারণে আফিমের স্মাগলার বিদেশি আগন্তুক যখন দুটি প্যাকেট, নারায়ণের কাছে পৌঁছে দেয়, এবং প্যাকেট খুলতেই বেরিয়ে পড়ে 'বিষধর কাল কেউটের মতো চকচকে দুটো রিভলবার। ছ'ঘরা রিভলবার।' সঙ্গে কার্তুজ এবং গুপ্ত চিঠি। ভজন দ্রুত তাদেরকে চায়ের দোকান ত্যাগের কথা বললেও, বিপ্লববাদীদের প্রতি তার গোপন, ফল্গু মানসিকতা তাৎপর্যপূর্ণ :

এটা মাত্র ভজুর তাড়া দেওয়া। সে এ দলের কেউই নয়, আপত্তি করলে নারায়ণকে হয়তো অন্য কোথাও আস্তানা গাড়তে হবে। কিন্তু ভজুর একটা অদ্ভুত কৌতূহলও ছিল সব কথা জানা ও শোনার। তা ছাড়া, এই বিপজ্জনক কাজে দাদাকে সে আর কোথায় যেতে বলবে? (পৃ.২৯৯)

বিপ্লববাদী দীক্ষায় নারায়ণ নির্ভীকতার পরীক্ষার জন্য রথীনকে নির্বাচন করে। নারায়ণ বলে, 'তোমাকে আজ রাত্রি বারোটার পর একলা শ্মশানে যেতে হবে। যে চিতায় হরি-বুড়োকে পোড়ানো হয়েছিল, তার পাশে নামের প্রথম অক্ষর লিখে আসবে।' ভজন দাদার রাজনৈতিক কর্মী নয়, তবুও রথীনকে বুকে জড়িয়ে তার কল্যাণ-প্রার্থনা, তার প্রতি একান্ত আস্থা—দাদার প্রতি তীক্ষ্ম গোপন এক অভিমান ভজনকে বিদ্ধ করে। ভজন-চরিত্রের অন্তর্ভুবনে এই সংবেদের গুরুত্ব নিবিড় : "ভজু মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার বুকটার মধ্যে কেন যেন বারবার মোচড় দিয়ে উঠছে। অকারণ বেদনায় বুকটা ভরে উঠছে তার। কেবলি কেন মনটা তার বারবার বলে উঠল, 'আমি একাকী, নিঃস্ব। স্নেহ, ভালবাসা আমার জন্য নেই এ সংসারে'।" (পৃ.৩০০) ভজন গ্রাজুয়েট, দেশি-বিদেশি কাব্য পাঠে তার মনোজগতের অবচেতন-চেতনে রোম্যান্টিকতার ফল্গুস্রোত প্রবাহিত; এবং ওই সংবেদনাগুচ্ছ তাকে সূক্ষ্ম রহস্যময় বলয়ে অস্থির করেছে। ওই রাতেই দাদা নারায়ণের সঙ্গে খাবার সময় 'বেতাল' 'দিশেহারা' 'ব্যস্ত' সুরহীন লয়হীন ভজনের মনোকথন :

জীবনের পথে কেবলি কোলাহল। অস্থির। কী যেন চাই কী যেন নেই। এ জীবনে কেবলই ছুটে চলেছি, যেন হাজার বছর ধরে। পাঠশালা, স্কুল, কলেজ, কাব্য দর্শন, রাজনীতি তারপর চায়ের দোকান। কিন্তু বৃন্তহীন। কী যেন ফেলে এসেছি। কী

Dhaka University Institutional Repository

চায় এ মন। মনের সঙ্গে মনান্তর। কোথাও মাথা নত করতে পারিনে, বুক ভরে পারিনে কাউকে আলিঙ্গন করতে। তবুও শুনি নহবতের সুর, বেতালের তালে দেখি গজলের তাল ফেরতার মোহিনী কটাক্ষ। (পৃ.৩০১)

একই রাতে রথীনের নিরাপত্তা ও তার সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য এবং দাদা নারায়ণের কাছে সংগোপনে ব্যক্তিগত দুঃসাহসের পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনে শ্মশানে গিয়ে হরি-বুড়োর চিতার পাশে সংকেত চিহ্ন 'শ্রী' লিখে ফেরার সময় গঙ্গার ধারে Kc৷jK͠jৗর নবকুমার-মৃন্ময়ীর স্মৃতি স্মরণে আসে; ভজু শুনতে পায়, কে ডাকছে মৃন্ময়ী...মৃন্ময়ী। এ ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু প্রকৃতিবিজড়িত নৈসর্গিক উপাদানে ভজন-চরিত্রের মনঃবিশ্লেষণ করেছেন এবং সংকেতিত করেছেন তার পরিণাম :

গঙ্গার দূর বুকে বোবার মত তাকিয়ে রইল সে। মৃন্ময়ীর ভাবনা তার হৃদয়ে গোপন স্থলে বেজেছে নিজের বিয়ের কথা ভেবে। তার এ দিশেহারা প্রাণে কাউকে দরকার। কাউকে চাই। দাদা, রথীন, বাবা, বকুলমা, যাক যে যার পথে। কীসের মান অভিমান।...কোন প্রতিযোগিতায় সে মাতবে না রথীনদের সঙ্গে। সে তার সমস্ত বেদনা যন্ত্রণা রাগ হাসি নিয়ে সে একজনের কাজে নিজেকে সঁপে দেবে।...

কত কথা ছিল মনে। কত ছিল ভাববার, কত হিসাব-নিকাশ, জীবনের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে আড়ম্বরের যুক্তিতর্ক। সব ভাসিয়ে অন্ধকারে এই মুহূর্তে শুধু একটি মুখ ছড়িয়ে গেল সারা আকাশে। অবলীলাক্রমে সে পরীক্ষায় পাশ করে এসেছে স্কুলে কলেজে, কিন্তু কোনও বিশ্বাস দানা বেঁধে ওঠেনি সেদিন। কী হওয়া উচিত ছিল, জানত না সে কথা। আজ হঠাৎ জীবন গঙ্গার মোহনায় এসে সে পথ হারিয়েছে। হারানো পথে কেবল একটি মুখ। 'বুঝি গঙ্গার কাছে অঙ্গীকার করে গেল ভজু অস্ফুট গলায়, 'আমি বে' করব।'...

তারপর সে ফিরে চলল। জীবনের অথৈ সমুদ্রে সে চলল বুঝি তার মৃন্ময়ীর সন্ধানে। মধ্যরাত পেরিয়ে, শ্মশান মাড়িয়ে চলল যেন এ শতাব্দীর এক অভিশপ্ত ছায়া। (পৃ.৩০৪-০৫)

বৈশাখের মাঝামাঝি। দুদিন আগে বিয়ে হয়েছে ভজনের। অনেক রাত। আকাশের গোঙানি, বিদ্যুতের সর্বনাশা চমক। ঝড়ের তাণ্ডব। ভজনদের একতলা বাড়িটা ঢেকে গেছে মেঘ, ঝড়, অন্ধকার ও গাছের মধ্যে। থরথর করে কেঁপে উঠছে ভজুর চায়ের দোকানটা, দুলছে চালার টিন, চড়চড় করছে বেড়ার বাঁশ। ঠকঠক করে নড়ছে খড়ি দিয়ে লেখা কাঠের বোর্ডটা। সমরেশ বসু বিপর্যস্ত নিসর্গের প্রতীকী পরিচর্যায় উপস্থাপন করেছেন, ভজনের ফুলশয্যার রাত। প্রকৃতির ভয়ংকর, ধ্বংসাত্মক মেজাজের মধ্যদিয়ে সংকেতিত হয়েছে 'এ শতাব্দীর এক অভিশপ্ত' মানুষ—ভজনের ট্রাজিক পরিণাম।

নতুন খাট। পুষ্পঘ্রাণে ঘুমিয়ে আছে ঘোমটা-খোলা দীর্ঘদেহী স্বাস্থ্যবতী শ্যামাঙ্গিনী ভজনের বউ যুঁই। বিস্রস্ত যুঁই। নিরলঙ্কার, কারণ ভজুর ভালো লাগে না। খুলে রেখেছে যুঁই, অঙ্গের সব অলঙ্কার। ভজনের বিবাহোত্তর অতল-স্পর্শিত মনোজগতের ভাবনা, অস্থিরতা, দ্বৈরথ, মন-মনান্তর ও যুগযন্ত্রণা রূপায়ণে সমরেশের অন্তর্বয়ন লক্ষণীয় :

...হ্যাঁ, এই তো সেই মেয়ে, যাকে সে কিছুদিন আগেই চেয়েছিল। একে নিয়েই তো সে আজকের আধখানা রাত কাবার করেছে সোহাগের বন্যায়।... হ্যাঁ, সত্য সে একেই চেয়েছিল, তাতে ভুল হয়নি। কিন্তু মনের মধ্যে কে চিৎকার করছে, না আমি একে চাইনে, এর কাছে নিজেকে আমি কেমন করে সঁপে দেব।

তবে সে কাকে চেয়েছিল। মন ফিরে বলে, একেই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আর চাইনে। কাউকেই না। তার যে মনের সঙ্গে মনান্তর। মন যেন এক সর্বনেশে যন্ত্রবিশেষ।

...শুধু তুষ্ট নয় ভজু। তার তুষ্টি নেই। এ যুগটাই তার কাছে বিশ্বাসঘাতকতার যুগ। এ যুগের শিক্ষিতের অভিশপ্ত জীবন নিয়ে সে দাঁড়িয়েছে। জীবনে সে কিছু চেয়ে উঠতে পারেনি, তবুও চেয়েছিল। আগুন লেগেছে তার বোবা অস্থির অনুভূতিময় প্রাণে। সে জানে না আগামীকাল তার জীবন কোন্ খাতে বয়ে চলবে অথচ একটা সন্দেহ উঁকি মারছে, এক দারুণ ব্যর্থতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সে।

Dhaka University Institutional Repository

বাইরে কড়কড় করে মেঘ ডাকছে, বাজ পড়ছে। বাতাসের শাসানি আর মুষলধারে বৃষ্টির ঝাপটা আছড়ে পড়ছে।...ঝড়ের শেষ ঝাপটা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল জানালা দিয়ে। ফুলশয্যার ঘরে ছত্রাকার হয় গেল ফুল আর মালা। নতুন বউ শিউরে জেগে উঠে বসল। (পৃ.৩১১)

বাবা মহাদেব হালদারের মদের বোতল থেকে এ রাতেই ভজন দ্বিধাভরে অথচ নির্ভয়ে গলায় ঢেলে দিল মদ। এখান থেকেই শুরু তার সর্বনেশে নেশার; সঙ্গে সিগারেটেরও। তার শোণিতপ্রবাহে কী এক আত্মধ্বংসী অগ্নিস্রোত প্রবাহিত হতে থাকে। ঝড়ের উন্মাতাল আক্রোশ, আর্তনাদ এবং বাবা হালদারের হাতের মদের বোতল মেঝেয় পড়ে বেজে উঠল ঝন ঝন করে। সমরেশ বসুর এ সব পরিস্থিতি নির্মাণ তাৎপর্যবহ।

১৯১৮ সালের প্রথম থেকেই দাদা নারায়ণ অনুপস্থিত। ভজনের বিয়ের পর সে এসেছিল কয়েক মাসের জন্য। বিপ্লব সংগঠনের কাজে বাড়িতে থাকত স্বল্প সময়। এক রাতে পুলিশ অতর্কিত তল্লাশি হামলা চালায় ভজনদের বাড়িতে; পালিয়েছিল নারায়ণ, আর আসেনি। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার তিনদিন পর পুনরায় হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পুলিশ বাড়িতে, ভোর রাত্রে। যুঁই তখন বাপের বাড়ি। কয়েক দিন পর হামলা হয়েছিল ভজনের দোকানে। দিন পনেরো পর খবর পাওয়া গেল নারায়ণ আলিপুরের কারাগারে বন্দি।

এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অবিশ্বাসী, অতিরিক্ত মদ-খাওয়া ভজনের মনে হয়েছিল 'তার জীবনে যেন একটা মোড় নিতে বসেছে'; অনুভব করেছে জাতীয় মুক্তির দায়িত্ব তারও আছে :

মনে হয়েছিল, একটা বিশ্বাস এসেছে তার মনে। নারায়ণের ফেলে যাওয়া কাজ তাকেই শেষ করতে হবে, এ-কথাটা যেন দপ করে জ্বলে উঠেছিল তার বুকের মধ্যে। রীতিমতো সভাসমিতিতে যাতায়াত আরম্ভ করেছিল সে। তার উপর অনেকের বিশ্বাস ছিল, শ্রদ্ধা ছিল তার সাহসিকতার উপর। কিছুদিনের জন্য চায়ের দোকানের ব্যবসা প্রায় উঠে যেতে বসেছিল। রথীন সুনির্মল এরা তার সহকর্মীর মতো, ছায়ার মতো ঘুরত তার সঙ্গে।

কিন্তু বেশিদিন গেল না। কয়েকটা ঘটনার জন্য থামতে হল ভজুকে। এ সময়টাতে কয়েক মাস অনুপস্থিতির পর যুঁই এল বাপের বাড়ি থেকে। (পৃ.৩১৫)

বাপের বাড়ি থেকে সপুত্রক যুঁই এসে দেখল, সংসার বিশৃঙ্খল। শ্বশুর আরও নিস্পৃহ, ভাসুর জেলবন্দি; বকুলমা বিরক্ত বিষণ্ন। চায়ের দোকান বন্ধ। স্বামী কী এক দুর্বোধ্য অস্থিরতায় ছটফট করছে। অতিরিক্ত মদ খাওয়া শুরু হয়েছে তার। যুঁইয়ের সিদ্ধান্ত ভজনকে ফিরিয়ে আনল ব্যবসায় : "সেইদিনই বিকেলে সে ঘুগ্‌নি তৈরি করে দিল দোকানের জন্য। ভজন এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে তাড়াতাড়ি গিয়ে দোকান খুলে বসল।" (পৃ.৩১৫)

"বৎসরান্ত হল। ঘুরে গেল আরও একটা বছর ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতেই। তারও পরের বছর কাটল তোড়জোড় করতেই। ভজনের নতুন দোকান খোলার তোড়জোড় (পৃ.৩১৩)।" এই তিন বছর সময়ে ভজনের বিবাহ, স্ত্রী যুঁইয়ের একটি ছেলে হয়েছে। যুঁই তার গচ্ছিত সব অলংকার ভজনকে হস্তান্তর করেছে; ভোটের সময় স্বরাজী দলের কাছ থেকেও কিছু পেয়েছিল ভজন। এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীমতী কাফে রেস্টুরেন্ট। এই শ্রীমতী কাফে তার সেই কল্পলোকের শ্রীমতী। এই তার প্রিয়া ও প্রেয়সী, তার জীবন।

স্টেশনের এক নম্বর প্লাটফর্ম সংলগ্ন প্রশস্ত রক, রকের নিচেই ইঁট ভাঙা খোয়া বাঁধানো রাজপথ। স্টেশনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে তিনটা ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ি, ধুলোমলিন জঞ্জালের মতো পড়ে থাকে

Dhaka University Institutional Repository

কিম্ভূতকিমাকার একটা ট্যাক্সি। বাসরুটহীন এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকে লালরঙের একটা চৌকা বাস, পুষ্পময়ী। ড্রাইভারের যত চিৎকার সন্ধ্যায়, প্যাসেঞ্জারের চেয়ে হর্নের শব্দই বেশি।

রাস্তার অপর দিকে, পশ্চিমে কতকগুলো সারি সারি দোকান—প্রায় সবই পানবিড়ি আর ময়রার। দোকানগুলিতেও ভিড়। চিৎকার ও সন্ধ্যাবেলার ভিড়ে সমস্ত অঞ্চলটাই একটা বাজার হয়ে ওঠে। এ সবের মাঝে সহজেই দৃশ্যমান হয় এখানকার হাল ফ্যাশনের রেস্টুরেন্ট। ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে শ্রীমতী কাফের বিবরণাংশ :

স্টেশনের ঠিক উলটোদিকেই রাস্তার সবচেয়ে বড় সাইনবোর্ডটায় লেখা রয়েছে, শ্রীমতী কাফে। সেই সাইনবোর্ডটা যেন অল্পবয়সী গেঁয়ো বরের মাথায় একটা মস্ত টোপরের মতো হয়েছে। হরফগুলো প্রায় একফুট লম্বা।...শ্রীমতী কাফের নীচে ছোট করে লেখা রয়েছে, স্থাপিত ইং ১৯২০ সাল।...

বারান্দার পরেই সুদৃশ্য দরজাটা দেখবার মতো। ঘরটার সামনের দিকে দেওয়াল নেই, দুটো বড় বড় পাল্লার দরজা। নকশা কাটা আলমারির মতো দরজার উপরের অর্ধেক কাচ লাগানো।...সেই কাচের দুদিকে বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা রয়েছে, শ্রীমতী কাফে। ভিতরে আসুন। প্রোঃ শ্রীভজনানন্দ হালদার। চৌকাঠের ডান কোণের দেওয়াল ঘেঁষে কাউন্টার।...

দরজা বরাবর দেওয়ালে একটা পুরনো আমলের দেওয়াল ঘড়ি।...পেন্ডুলামে দুলছে একটা নরকঙ্কালের মুণ্ডের ছবি। ঘড়িটার ঠিক উপরেই গদা চক্র ও শঙ্খ পদ্মধারী একটা নারায়ণের ছবি রয়েছে।...

ঘড়িটার ডান দিকে রয়েছে দেশবন্ধু সি. আর. দাশের একখানা ছবি। ছবিটার নীচে লেখা রয়েছে রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত মর্মোক্তি :

> ‘এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
> মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।’

আর একটা বড় ফ্রেমের মধ্যে ছোট ছোট চারখানা ছবি রয়েছে। র‍্যাফেলের মা ও ছেলে, মেরী মাতা, রবীন্দ্রনাথ ও সিরাজদৌল্লা। এ চতুষ্টয়ের একত্র সমাবেশ কেন, তা এ কাফের মালিক ভজনানন্দ ছাড়া অন্যের পক্ষে বলা শক্ত। (পৃ.৩১৭-১৮)

ভজনের অতীত-বর্তমানে কোনো ভালোবাসার পাত্র নেই, অন্তর্জগতের অবচেতন ঘূর্ণিবলয়ে যুঁইকে আবছা দেখে মূর্তিহীন—হাসি নেই, চোখ নেই, শব্দহীন। মনোকথনে সে বলে, ‘কে তুমি শ্রীমতী। জীবনটা তো ছেড়ে দিয়েছি তোমার হাতে। আর তোমার কী চাই।’ ‘যুঁই কেবিন’ নাম দিতে গিয়েও, স্ত্রীর নিরাগ্রহে এই kxgZx Kv‡d তার সেই কল্পলোকের শ্রীমতী। “এই তার প্রিয়া ও প্রেয়সী, তার জীবন। মানুষের কিছু না থাক তবু কিছু চাই। সেই কিছু তার শ্রীমতী কাফে।” (পৃ.৩১৯)

kxgZx Kv‡d উপন্যাসের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত হল মূলত বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের ভারতীয় জীবন ও মতান্তরের রাজনীতি, তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, অন্তর্কলহ, আদর্শান্তর। “গান্ধীবাদী-সন্ত্রাসবাদী-সাম্যবাদী : মূলত এ তিনটি ধারার তর্ক-বিতর্ক, প্রয়াস-ব্যর্থতা, উজ্জীবন-ক্লান্তি চিত্রিত হয়েছে উপন্যাসটিতে।”[২২]

সমরেশ বসু আবেগদীপ্ত মেটাফরিক ভাষায় শুরু করেছেন kxgZx Kv‡d উপন্যাস :

সময়টা উনিশশো বাইশ সালের বসন্তকালের শেষ দিক। সারা দেশটা যেন একটা বিরাট ছাইয়ের ভস্মস্তূপ হয়ে আছে। ছাইয়ের স্তূপটা বিলিতি কাপড়ের।...জাতীয় আন্দোলনের নিভানো চিতার ছাই প্রদেশ জেলায় ছড়িয়ে যেন একটা ধূসর আবছায়া ঢাকা পড়ে গিয়েছে। বোঝা যায় না সেই ভস্মস্তূপের তলায় আগুন চাপা পড়ে আছে কি না। আর জায়গায় জায়গায় লেগে আছে রক্তের দাগ। নতুন যুগের সূচনায় যে সমস্ত বিচিত্র ও অসম্ভব ঘটনা গত কয়েক বছর দেশে ঘটে গিয়েছে, বুঝি সেটা একটা স্বপ্ন মাত্র।...

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু বর্দৌলির রাগিণী যেন বিয়ে-বাসরের কলরবে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের বিষাদ নিয়ে চেপে বসল। (পৃ.২৮৭)

এই আবেগদীপ্র আলংকারিক বর্ণনার ইতিহাস-সূত্রের উল্লেখ উপন্যাসপাঠের জন্য প্রয়োজন। কেননা, রাজনীতির বহুমুখী আদর্শ ও পার্টিতন্ত্রের লূতাতন্তুজাল জড়িয়ে ধরেছে এই সময়-পরিসরকে, ভারতের জনজীবন ও স্বরাজ সাধনার অভীপ্সাকে।[২৩]

kxgZx Kv‡d উপন্যাসে ঘটনাবহুলতা আছে কিন্তু ভিক্টোরীয় প্রথাবদ্ধ রীতির আদি-মধ্য-অন্ত্য বিশিষ্ট কোনো নিটোল কাহিনি নেই। নেই কোনো অভিজ্ঞতার একরৈখিক বর্ণনা। এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক আপন যুগ্মসত্তার সঙ্গে বহিরাঙ্গিক রাজনীতির মত-মতান্তরের মাঝে অবিরাম সংলাপ তৈরি করেছেন। তারই উচ্চারণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বিপ্রতীপতা ও অগ্রগামিতার অন্তর্বিন্যাসের কোলাজ হয়ে উঠেছে kxgZx Kv‡d।

এতৎসংক্রান্ত কতিপয় দৃষ্টান্ত অনুধাবনীয় :

১ হীরেন তাড়াতাড়ি বলল, 'মদের দোকানে পিকেটিং করার একটা ডেট ফিকসড করে ফেললে হত নারায়ণদা।'

নারায়ণ একটু দ্বিধাভরে বললেন, 'করতে হলে কারখানা ছুটির দিন করতে হবে। কিন্তু মজুরদের সঙ্গে একটা ক্ল্যাশ হয়ে যেতে পারে।'...হীরেন কিছুদিন ধরেই লক্ষ করে দেখছে, জাতির চরিত্র গঠনের এ ধরনের কাজেকর্মে নারায়ণদার কেমন একটা উদাসীনতা। তিনি স্বরাজ লাভের অন্য পথ ধরেছেন। বিশেষ ফেব্রুয়ারি মাসে বর্দৌলিতে ওয়ার্কিং কমিটির ডিসিশনের পর থেকে তিনি অন্যদিকে আরও এগিয়ে গিয়েছেন। এমন কী, বর্দৌলির ডিসিশনকে বলেছেন কাপুরুষতা। ব্যায়াম সমিতিগুলোর দিকে তার ঝোঁক বেশি।...পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, গান্ধীজির পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন। তাদের পথপ্রদর্শক নেতা নারানদা আজ সন্ত্রাসবাদের ভয়াবহ পথে চলেছেন।...

নারায়ণ বললেন, 'বিকেলে সমিতিতে আসতে কেউ ভুলো না।' (পৃ.৩০৭)

২ হীরেন...গম্ভীর গলায় বলতে আরম্ভ করল, 'সম্প্রতি তুমি দেশের কথাটা ভেবে দেখেছ কৃপাল! অবশ্য আমি বিশ্বাস করি গান্ধীজি নিশ্চয়ই এ অচল অবস্থা দূর করবেন। কিন্তু আমরা তাঁর আদর্শ থেকেও অনেক দূরে সরে যাচ্ছি। টেররিস্টদের কথা বাদ দাও, তারা শিগগিরই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু, নবীন গাঙ্গুলী নাকি রুশ বিপ্লবের কথা বলতে আরম্ভ করেছে, টেররিজমে সে সুবিধে করতে পারল না।

কৃপাল বলল, 'তা যদি বলো, তবে জহরলালও তো বিলেত থেকে ফিরে এসে রুশ বিপ্লবের কথা বলছেন।' হীরেন এক মুহূর্ত দ্বিধা করে জবাব দিল, ' কিন্তু তিনি কমিউনিস্ট পার্টি বলে একটা আলাদা সংগঠন করার কথা বলেননি।...গান্ধীজির আদর্শকে এরা কেউ বোঝেনি। আমরা নিজেরাই তার জন্য দায়ী। ...আমরা তাঁর নির্দেশ মতো গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারছি না। সাইমন কমিশনের ইতরোমি দেখে গান্ধীজি সাম্রাজ্যবাদীকে আর একবছর মাত্র সময় দিয়েছেন, তার পরেই পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি। অহিংসার পথে আমাদের সমস্ত দমন-নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কৃপাল, তুমি জানো, আমি ধাওড়ায় মেথরদের কাছেও যাই। তাদের অশিক্ষা ও অস্পৃশ্যতার অভিশাপ মোচনের জন্য।' (পৃ.৩২৪)

3 তাছাড়া, গুপ্তচর ওৎ পেতে আছে কয়েকদিন, শ্রীমতী কাফের পেছনে আত্মগোপনকারী ওই ছেলেটার জন্য। কী নাম তার? সুরুজ সিং। আশ্চর্য ছেলেটার কী অদ্ভুত ধারণা। কখনও বলছে, হ্যাঁ, গীতায় আমার বিশ্বাস আছে, নরনারায়ণই আমার পথদ্রষ্টা। আবার বলছে, রুশ রেভ্যুলিউশনের মতো আমরাও শ্রমিক আন্দোলন করব। বলে, মীরাট কন্‌সপিরেসি সাকসেস হলে স্বাধীনতা পাওয়া যেত। বলে, মুজঃফর আমেদ, ডাঙ্গে...। না ! সে পথে নয়।

আমাকে যেতে হবে আরও তলায়, সেই যুগ যুগান্তরে হারিয়ে যাওয়া ভারতের আত্মার সন্ধানে। যেখানে অস্পৃশ্যতা নেই, অশিক্ষা নেই, যেখানে করুণাময় আমাদের সকলের হৃদয়ে সমানভাবে অধিষ্ঠিত। সেই হবে আমাদের নবভারতের জয়যাত্রা (পৃ.৩২৫)

4 আজকাল সন্ধ্যাবেলা প্রায়ই প্রিয়নাথের সঙ্গে কৃপালদের তর্ক হতে দেখা যায়। ঠিক তর্ক নয়, প্রিয়নাথকে সকলে বিদ্রূপ-বাণে জর্জরিত করে তোলে।...হীরেন অবশ্য বিদ্রূপ করে না, কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা করে তর্ক করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সে প্রিয়নাথকে গালাগাল দিতে আরম্ভ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আবহাওয়া এমনভাবে পেকে উঠেছে যে, নিজেদের বাগযুদ্ধের বহর কিছুটা কমে এসেছে। সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের আপসের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। গান্ধীজি ইয়ং ইন্ডিয়াতে ঘোষণা করেছেন, তাঁর এগারো দফা দাবি সরকার মেনে নিলে সমূহ আন্দোলনের কোনও প্রয়োজনই হবে না। কিন্তু সরকার এগারো দফার একটাও বিবেচনা করতে রাজি নয়। সকলের মধ্যেই একটা উত্তেজনা ও প্রতীক্ষা থমথম করছে। দেশ জোড়া অসহিষ্ণুতা। সংবাদপত্রগুলো হিংসাকামী কর্মীদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে গান্ধীজির আদর্শ। সাবধান করে দিচ্ছে সন্ত্রাসবাদীদের। (পৃ.৩৪৮)

5 সন্ধ্যাবেলা। চপ কাটলেট ভাজতে ভাজতে হঠাৎ চমকে উঠল চরণ। দেখল, পেছনের দরজা দিয়ে কাকে কাঁধে নিয়ে ঢুকছে রথীন। ঢুকে কাঁধের থেকে নামিয়ে শুইয়ে দিল মাঝের ঘরের বেঞ্চিতে। শোয়াল সুনির্মলকে। রিভলবার ছোঁড়া প্র্যাকটিশ করতে গিয়ে তার হাতে গুলি লেগেছে। গুলি করেছে রথীন। টার্গেট দেখাতে গিয়ে আর হাত সরিয়ে নেওয়ার অবসর হয়নি সুনির্মলের।...

প্রথম রাত্রে রোজকার মতো জমে উঠল দোকান। কৃপালের সঙ্গে আজ সারদা চৌধুরীও কংগ্রেসের সভ্য হয়েছেন। কৃপালেরই কারসাজি। চৌধুরী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাঁড়াবেন।... ইতিমধ্যে সুনির্মলের ড্রেস হয়ে গিয়েছে।...

প্রিয়নাথ বলল, 'রথীন, রেল মজুরদের সম্পর্কে সেই কার্বন কপির ইস্তাহার লেখা হয়েছে?'

রথীন জানালো, হয়নি। হয়নি, তা জানত প্রিয়নাথ। বলল, 'তোমার এই গুলি ছোড়াছুড়ির চেয়ে সেটা অনেক দরকারি কাজ ছিল রথীন।'

রথীনের মুখ রাগে থম্‌থমিয়ে উঠল। ইনি নারায়ণদার সহকর্মী। নারানদার অনুপস্থিতিতে ইনিই নেতা। কিন্তু সম্প্রতি ওঁর মুখে নতুন একটা কথা শোনা যাচ্ছে, সমাজতন্ত্রবাদ। কথায় কথায় মজুর কৃষক আন্দোলন। সমিতির জীবনের প্রতি ওঁর কোনো দায়িত্ববোধ নেই। (পৃ.৩৫৩-৫৪)

6 কয়েক দিনের মধ্যে নারায়ণও শ্রীমতী কাফের প্রাত্যহিক শরিক হয়ে উঠলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে শ্রীমতী কাফের আসরের খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। প্রিয়নাথের সঙ্গে কৃপালদের যে বিষয়ে বিতর্ক হচ্ছিল কিছু দিন থেকে, সেটা একটা চরম আকার ধারণ করল। প্রায় প্রত্যহই একই তর্কের অবতারণা হয়। ...অঞ্চলে স্বদেশী আন্দোলনের গোড়াপত্তন নারায়ণের দ্বারাই হয়েছে বলা চলে। অথচ, নারায়ণ আজকে যে আদর্শকে গ্রহণ করেছে, তা প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজির পথের ও মতের সম্পূর্ণ বিরোধী।... দেশবন্ধু যেভাবে শ্রমিকদের কথা বলতে চেয়েছিলেন, তার মূলে ছিল একটা স্বাভাবিক উদারবাদ। কিন্তু প্রিয়নাথের বক্তব্য অনুযায়ী শ্রমিক বিপ্লবটা শুধু অহিংস নয়, অনেকের কাছে ব্যাপারটা কিছু দুর্বোধ্য ও ভয়ঙ্কর।...

প্রিয়নাথের সঙ্গেও নারায়ণের বিরোধ দেখা দিয়েছে। সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পথে সন্ত্রাসবাদ কীসে অন্তরায় সেইটার বোঝাপড়া নিয়ে তাদের মধ্যে গণ্ডগোল। অথচ প্রিয়নাথ সশস্ত্র বিদ্রোহকে অস্বীকার করতে চায় না।...

চোখের জলের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিয়ে সে (প্রিয়নাথ) বলল নারায়ণকে, 'নারায়ণ আজ আমাদের রাগের দিন নয় আলোচনার দিন ছিল। তাই বলছি, সমিতির এ আদর্শ নিয়ে আমাদের পা বেশিদূর যেতে পারে না। দেশের বৃহত্তম শ্রমজীবী জনসাধারণই আমাদের সমিতি। আমার বিশ্বাস তাদের পরে-ই। শ্রমিক বিপ্লব যদি তুমি চাও, তোমাকে একদিন আমার কথা বিশ্বাস করতে হবে।' (পৃ.৩৬৭-৩৬৯)

kxgZx Kv‡d-র 'রঙ্গমঞ্চে' চল্লিশটির বেশি রাজনৈতিক ঘটনা ও ভাবনা, মত ও মতান্তর দৃশ্যবদ্ধ কথোপকথন-পরিচর্যায় বিন্যস্ত হয়েছে, যার বিকাশ ঘটেছে পারম্পর্যহীনভাবে, টুকরো টুকরো, ছেঁড়াছেঁড়া ভাবে। এরই মধ্যদিয়ে রূপলাভ করেছে সমকালীন রাজনৈতিক তত্ত্ব ও পার্টিতন্ত্রের সঙ্গে সমান্তরালে চলার সংগতি, অসংগতি-বিসংগতি ও ব্যক্তিগত ব্যর্থতাবোধ। সমরেশ বসু kxgZx Kv‡dর 'রঙ্গমঞ্চে' ভারতীয় জনগণের মুক্তি-অভিমুখী বিচিত্র রাজনীতির অগ্নিবলয়, উচ্ছ্বসিত জোয়ার ও অবসাদগ্রস্ত ভাটার ঘূর্ণাবর্ত এবং তার স্রোত-প্রতিস্রোতের দ্বন্দ্বকীর্ণ ইতিহাসের যেন 'নাট্য রূপ' দিয়েছেন সমরেশ বসু। নিরন্তর সংঘর্ষ-উত্তেজিত ও অবসাদক্লান্ত কুশীলবদের চোরাস্রোত উদ্‌ভাবনায় পূর্বাপর অভিনিবেশী ছিলেন ঔপন্যাসিক। সক্রিয় প্রধান চরিত্রাবলি হল : নারায়ণ-হীরেন-প্রিয়নাথ-কৃপাল-রথীন-সুনির্মল, শঙ্কর ঘোষ; আর মধ্যবর্তী চরিত্রগুচ্ছ হল—বাঙালি-ভুনু-মনিয়া-রামা-সরসী-প্রমীলা-কুটে পাগলা-বিশ্বনাথ-চরণ আর

Dhaka University Institutional Repository

তরুণ পুলিশ অফিসার। ভজনানন্দ হালদার, ভজন—স্রষ্টা ও দ্রষ্টা, তার সঙ্গে বিজড়িত হয়ে গেছে পিতা মহাদেব হালদার ও অগ্রজ বিপ্লবী নারায়ণ হালদার এবং বকুলমা।

জীবনের কোথাও শৃঙ্খলকে মেনে নিতে চায়নি ভজন। তার বদ্ধপ্রাণ কেবলই মুক্তি খুঁজেছে। সাত বছরের বিবাহিত জীবনে তিন সন্তানের জননী যুঁইয়ের জীবনের লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার স্বরূপ সে প্রত্যক্ষ করেছে। কখনো কখনো ভজনের মনে হয়েছে তার স্ত্রীর 'বুদ্ধি', 'হৃদয়' 'যৌবন' 'সমস্তটাই ব্যর্থ হয়েছে আর একটা ব্যর্থ মানুষের হাতে পড়ে' (পৃ.৩২৫)। গ্র্যাজুয়েট ভজনের আজকের পরিচয়—সে একটা মাতাল। 'অপমান', 'ঘৃণা' ও 'অভিশাপে' ভজনের অন্তর্দাহ সর্বত্র। কিন্তু তবু যুঁইকে ভজন মুক্তি দিতে পারবে না। আপন মনে তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয় :

এ ফুল ফোটার হল না অবকাশ
কুঁড়ি ঝরে ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাসে। (পৃ.৩২৬)

দাদা নারায়ণের কারাবাস তাকে আরও উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। মাঝে মাঝে বিভ্রমে পড়ে সে—মনে হয় দাদা যেন তাকে ডাকছে। সশস্ত্র বিপ্লবে অংশ না নিলেও এর বিকল্প নির্ভরযোগ্য কোনো পথও খুঁজে পায়নি ভজন। এ কারণে সে দাদার আরাধ্য দেবতা চক্রধারী নরনারায়ণের ছবি শ্রীমতী কাফেতে টাঙিয়েছে। রথীন, কৃপাল, সুনির্মলদের ভজন দাদারই শিষ্য ভাবে। এদের জন্য প্রতিনিয়তই তাকে পুলিশের হয়রানি সহ্য করতে হয়। ইউ পি-র তরুণ বিপ্লবী সুরজ সিংকে পুলিশ খুঁজতে আসায় উৎকণ্ঠিত রথীন ও সুনির্মলকে আশ্বস্ত করেছে ভজন। কারণ সুরজ সিংয়ের কাছে রিভলভারসহ এমন কিছু কাগজপত্র ছিল যাতে নবীন গাঙ্গুলীর অস্ত্রাগার সম্পর্কে তথ্য ছিল। তাদের মতো স্বাধীনতার স্বপ্ননায়কদের পুলিশের গ্রেফতার থেকে ভজন কৌশলে বাঁচায়। 'সাহেব মারা দলের' সদস্য হিসেবে সুরজ সিংয়ের 'মিল চার্জ' নিজের 'ব্যয়ের অঙ্কে' লিখে রাখার কথা বলে দম্ভভরে উচ্চারণ করে : "সাহেব মারা দলের কাছ থেকে শ্রীমতী কাফে পয়সা নেয় না।"(পৃ.৩২৬) অন্যদিকে তল্লাশি করতে এসে এদেশীয় পুলিশ অফিসার যখন শ্রীমতী কাফের প্রোপ্রাইটর ভজনের চেয়ারে বসতে চাইছিল তখন স্বাধীনচেতা, দুঃসাহসী, দুর্বিনীত ভজন তাকে বাধা দিয়ে বলেছিল : "উঁ হুঁ হুঁ, ওটি করবেন না। ওটা প্রোপ্রাইটারের চেয়ার।" শুধু তাই নয়, তাকে সতর্ক করে বলেছে তল্লাশির সময় যেন কাপ, ডিস না ভাঙে। নিদারুণ অন্তর্দাহ নিয়ে আপাত দৃষ্টিতে রক্তচক্ষু মাতাল হলেও হেঁয়ালিপূর্ণ কথার মধ্যদিয়ে সুগভীর জীবনবেদকে প্রকাশ করা ছিল ভজনের চরিত্রবৈশিষ্ট্য। সুরজ সিংকে নিরাপদে শ্রীমতী কাফে থেকে বের হতে সহযোগিতা করার পর উদীয়মান সূর্যালোকিত প্রকৃতি এবং কৌতূহলী দর্শকদের প্রশ্নোত্তরে ভজনের উক্তি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ :

প্ল্যাটফর্মের মাথার কালো শেডের আড়াল থেকে সূর্য উঠছে। রক্তবর্ণ সূর্য, স্পষ্ট মনে হচ্ছে সেটা ঘুরতে ঘুরতে উপরে উঠছে। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে তার আলো। ছড়িয়ে পড়েছে শ্রীমতী কাফের দরজায় দেওয়ালের পাথরে।... বোমা নয়, পিস্তলও নয়, সূর্য ধরতে এসেছিল। সে তো আকাশে, ওই যে। বলে, আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিল। (পৃ.৩২৯)

হীরেন, প্রিয়নাথ, সুনির্মল, কৃপাল, বাঙালি, সকলেই আসে শ্রীমতী কাফেতে। অনেক সময় তাদের যন্ত্রণা ভাগ করে নেয় ভজন। ধাঙড়বস্তিতে গিয়ে রামাসহ উন্মত্ত ধাঙড়দের আচরণে অপমান-লাঞ্ছিত, স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণাবিদ্ধ, উন্মাতালপ্রায় গান্ধীপন্থী হীরেন, ভজনের কাছে এসেই আশ্রয় চায়, 'ছেলেমানুষের মতো হু হু করে কেঁদে ওঠে'। ঈষৎ দ্বিধাগ্রস্ত ভজনের কাছ থেকে মদ চেয়ে নিয়ে হীরেন যন্ত্রণা-মুক্তির পথ খোঁজে। অপ্রকৃতস্থ হীরেন নিয়োগীকে ভুনুর ঘোড়ার গাড়িতে বাসায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নেয় ভজন।

Dhaka University Institutional Repository

'বিকেলের আসরে শ্রীমতী কাফে যেন একটা বিচিত্র নাট্যের মঞ্চ হয়ে ওঠে'। ভজন আড্ডায় অংশগ্রহণকারীদের রাজনৈতিক মতান্তরের হৈচৈ, আচরণ ও কোলাহলে, ক্ষুব্ধ ভজন তাদেরকে রূঢ় কথা বললেও, শেষ পর্যন্ত তাদের তাড়িয়ে দিতে পারে না। শ্রমিক আন্দোলনে অংশ নিয়ে দু বছর কারাবাস শেষে মনোহর ও ভাগন শ্রীমতী কাফেতে এসে মাটিতে বসতে চাইলেও ভজন উষ্ণ অভ্যর্থনায় তাদেরকে 'কুরশি'তে বসতে বলেছে। অথচ ভজনের এ আচরণে কংগ্রেসের সদস্য কৃপাল বিদ্রূপের অট্টহাসি হেসেছে, কিন্তু মাতাল ভজন 'খ্যাঁক' করে উঠে বলেছে :

থাক, আর দাঁত বার করে হাসতে হবে না। আমার কাছে স্বদেশীওয়ালার কোনও জাত নেই। ভুনু গাড়োয়ান আমার সারথী, বাঙালি আমার ইয়ার, আর এ জেলখাটা স্বদেশীওয়ালাদের আমি মাটিতে বসাবো। (পৃ.৩৭১)

এভাবেই সমরেশ বসু রাজনৈতিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে ব্যক্তির মানবীয় অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষ করেছেন ভজন চরিত্রের মধ্যদিয়ে। বিশে, চরণ, ভবনাথ বাঁড়ুয্যে, প্রমীলার বর, ছেলে নবীন প্রতিটি চরিত্র সমরেশ বসুর রাজনৈতিক ভাবনার স্মারক। ভবনাথ বাঁড়ুজ্যে নিরাপদ, নিশ্চিন্ত, ছকবাঁধা জীবনের মাঝে কোনো তাৎপর্য খুঁজে পায় না। ক্ষুদিরাম এবং নারায়ণের কথা কেবলি তার মনে হয়—যাঁরা মহাজীবনের, মহামরণের পথিক। সে ভাবে তার ছেলেরাও যদি এ পথে যেত তবে সে সুখী হত। এসব অনুভূতি ভবনাথ প্রকাশ করে ভজনের কাছে।

মনোহর কিংবা ভাগনই শুধু নয়, তার দোকানের কর্মচারী বিশে, চরণ প্রত্যেককেই সে প্রাণের খুব কাছের মানুষ করে তুলেছিল। চুরি করে খায় বলে বিশেকে দোকান থেকে তাড়িয়ে দেয় না ভজন, শুধু বলে 'দোকানটাকে বাঁচিয়ে' খেতে। ভজন লাভ চায় না—নিজে বাঁচার পাশাপাশি বিশের মতো নিরস্তিত্বপ্রায় মানুষদের বাঁচাতেও চায়। কিন্তু এ ক্ষুধাই শেষ পর্যন্ত বিশের মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। স্বভাববশত চুরি করে বিষাক্ত খাবার খেয়ে বিশের মৃত্যু-পরবর্তী ঘটনা সমরেশ বসুর সুগভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সাক্ষ্যবাহী। ভজন কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়েও বিশের মৃত্যুতে শোক পালন উপলক্ষে শ্রীমতী কাফে একদিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। অথচ, মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনী বৈঠকের উদ্দেশ্যে আসা কৃপালসহ আরও কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তি এতে 'বিমর্ষ অপ্রস্তুত, অবাক' হয়েছে। কেউ কেউ হেসেছেও। কিন্তু সমরেশ বসুর রাজনৈতিক ভাবনার প্রতীক চরিত্র হিসেবে ভজন মানুষকে, মানবতাকে অস্বীকার করে রাজনীতিকে সবার উপরে স্থান দিতে পারেনি। একই বোধ থেকে সে কলকাতা আলিপুর জেলে দাদার সঙ্গে দেখা করে ফেরার সময় শিয়ালদহ স্টেশনে উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ষোলো-সতেরো বছর বয়সী ছেলে অনাথ, ক্ষুধার্ত চরণকে শ্রীমতী কাফেতে নিয়ে আসে।

পরিবর্তিত রাজনৈতিক পটভূমিতে শ্রীমতী কাফের ওপর পুলিশের নজর পড়েছে। নারায়ণের আত্মগোপনের পর শ্রীমতী কাফে সহ ভজনের বাড়িতে খানাতল্লাশির পরোয়ানা নিয়ে আসে মহকুমা বিলিতি সাহেব এস.ডি.ও.। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের অত্যুৎসাহী ছোকরা পুলিশ অফিসার তাকে জানায় : 'স্যার, কাফে নাম দিয়ে আসলে এটা একটা সাংঘাতিক ঘাঁটি। কাফে নাম দিয়ে আসলে এটা একটা রাজনৈতিক দলগুলির কেন্দ্র। যদি কিছু মনে না করেন স্যার, এই রেস্টুরেন্টটা আপনি উঠিয়ে দিন'। (পৃ.৩৮৩) ঝানু সাহেব পুলিশ কর্মকর্তার ভিন্ন মত, গোয়েন্দা পুলিশের নজরদারির সুবিধার জন্য কাফেটা থাকা উচিত। এভাবেই থেকে গেল শ্রীমতী কাফে।

১৯২৯ সালে 'কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত' অনুযায়ী গান্ধীজি পুনরায় আইন অমান্য ও বয়কট আন্দোলনের আহ্বান জানালে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আবারও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শ্রীমতী কাফে পরিণত হয় পুলিশের লক্ষ্যবস্তুতে। তিন মাসের মধ্যে বেশ কয়েকবার তল্লাশি হওয়ায় নিষিদ্ধ এলাকা হয়ে ওঠে শ্রীমতী

Dhaka University Institutional Repository

কাফে। অনেকে ঠাট্টা করে 'স্বদেশী রেস্টুরেন্ট' বলতে শুরু করে। খদ্দের, কেনাবেচা কোনোটাই না হওয়ায় ভজনের আর্থিক দৈন্য চরমে পৌঁছে। ভজন ১৯২০ সনের মতো এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত না হলেও বাঙালি, ভুনুর সঙ্গে মদ্যপান করে অন্তর্দহন, অকথিত অতল বেদনা ভুলে থাকতে চায়। কিন্তু কী করে তা সম্ভব। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সংবাদ পড়তে গিয়ে সে দেখতে পায় দাদা নারায়ণ যেন সেখানে লড়াই করছে। বোম্বাই শহরের শোলাপুরের শ্রমিকদের লড়াইয়ের কাহিনি রূপকথা মনে হয়। নিদারুণ অবসাদে আক্রান্ত ভজন বাইরে থেকে রাজনৈতিক ঘটনাধারাকে পর্যবেক্ষণ করেছে, আশাহত ও যন্ত্রণাদগ্ধ হয়েছে। বয়কট আন্দোলনরত শিক্ষার্থী, দেহোপজীবিনীসহ সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে বিলেতি কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব দেখে মাতাল ভজন ক্রুদ্ধ, প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তাঁর মনে হয়েছে দরিদ্র দোকানদারের বিলেতি কাপড় পুড়িয়ে আর যাই হোক না কেন, স্বরাজ আসতে পারে না। ছেলেরা বিলিতি মাল বলে যেগুলো আগুনে ফেলে দিচ্ছে সেসব দোকানদারের কান্না শুনে ভজু প্রতিবাদ করেছে, রক্তচক্ষু মাতাল ভজন দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে যায় ভিড়ের মাঝে :

খ্যাপা ছেলের দল থমকে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখল ভজুলাটকে। লাল টকটকে মুখ, আগুনের মতো ধ্বকধ্বকে বাঘের মতো ক'টা চোখ। নারানদার ভাই। রগচটা আর মাতাল ভজুলাট। মানুষ নয়, একটা খেপা সিংহ যেন।...বড় বড় কয়েকটি ছেলে বলল, 'বিলিতি মাল যে।'

'বিলিতি মাল যে?' তীক্ষ্ণ গলায় ভজু বলে উঠল, ' কিনিসনে বিলিতি মাল। কে তোকে মাথার দিব্যি দিয়েছে। গরিবের মাল তোরা নষ্ট করবি কেন? নষ্ট করতে হয় পয়সা দিয়ে কর।' বলে সে ছেলেটাকে ছেড়ে দিল। (পৃ.৩৮৮-৮৯)

সমস্ত দেশে রাজনৈতিক তীব্র বিক্ষোভ, টালমাটাল নৈহাটি, "ক'দিন ধরে এখানে ভয়ানক ঝড় জল শুরু হয়েছে। সারাদিনে শুধু জল, রাত্রের দিকে সামুদ্রিক ঝড়ের দক্ষিণ হাওয়া যেন গোটা দেশকে উত্তরদিকে মুখ আছড়ে ফেলতে চাইছে।" সমরেশ বসু বর্ণিত রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত এবং প্রকৃতির ক্রুদ্ধ রূপকে পরিস্থিতি নির্মাণে সমীকৃত করেছেন।

তরুণ পুলিশ অফিসার তল্লাশির নামে, ভজনের দুঃসাহস ও ঔদ্ধত্যের কথা স্মরণ করে উগ্র প্রতিহিংসায় শ্রীমতী কাফের প্রোপ্রাইটারের চেয়ার, টাঙানো ছবিসহ ডিস, কাপ, জলের জালা ভেঙে ফেলে। যেন শ্রীমতী কাফে মূর্তিমান প্রতিরোধ, আইন অমান্যকারী স্বদেশী প্রতিষ্ঠান। গ্রেপ্তার আতঙ্কে কেউ আসে না শ্রীমতী কাফেতে। পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলে ভজন আবার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে :

এখনও কাটেনি শ্রীমতী কাফের সেই ভগ্নদশা। সামনের দরজার কাচের ভাঙা টুকরোগুলিকে আঠা দিয়ে কাগজে জোড়া লাগানো হয়েছে। সেই জোড়া তালি দেওয়া কাচ লাগানো হয়েছে দরজায়। মনে হয়, লেখাগুলি মাঝখান দিয়ে ফেটে ফেটে গিয়েছে। ভাঙা চেয়ার ক'টা জড়ো করা রয়েছে এক কোণে। ছবিগুলি বাঁধানো হয়েছে আবার। ঠিক তেমনি ভাবে টাঙানো হয়েছে দেয়ালে। ঘড়িটা রয়েছে তেমন। এমন কী এক চিল্‌তে কাচের টুকরোটুকুও। (পৃ.৩৯৩)

ঝড়-জলের তাণ্ডবের মধ্যে শ্রীমতী কাফের পেছন দরজা দিয়ে নারায়ণের আকস্মিক আবির্ভাব। সামনে এসে, নারায়ণ ভজনের মাথায় হাত দিয়ে জানায়, গঙ্গার ওপারে পুলিশ। গ্রেপ্তার আশঙ্কায় নারান ভজুকে হাড়মুণ্ডি পুলের কাছে পৌঁছে দিতে বলে। অতিরিক্ত মদ্যপানে বিবশচৈতন্য ভজন এটা বিশ্বাস করতে পারেনি। তার মনে হয় ভদ্রবেশী ঠ্যাঙাড়ে তাকে প্রাণে মারার জন্য নিতে এসেছে। কিন্তু 'তোর প্রাণের ভার আমার'—নারায়ণের এ উক্তিতে চেতনা ফিরেছে ভজনের। সে হেসে বলেছে : "দাদা তুমি? ভজু কাউকে তার প্রাণের ভার দেয় না, নেয়। তুমি একটু বসো, এলুম বলে।" (পৃ.৩৯৩)

ঝড়-জলের রাতে ভুনু গাড়োয়ানের 'নেশাচ্ছন্ন' ঘুম ভাঙিয়ে ভজন তাকে হাড়মুণ্ডি পুলে নিয়ে যেতে চাওয়ায় ভুনুর মনে হয়েছে এটা ভজনের মাতলামি। কিন্তু ভজন 'গম্ভীর ও পরিষ্কার গলায়' 'নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় বেদনাকে' প্রকাশ করে মূলত নিজেকেই উন্মোচন করে :

Dhaka University Institutional Repository

'দ্যাখ ভুনু, পয়সা আমার না-ই থাক, পেছনের ঘরে নিজের মাল বানিয়ে যতই কেন না কাউন্টারে কোচা লুটিয়ে বসি, আর মাল বিক্রি না হোক্ কেবল মাতাল হয়েই পড়ে থাকি, তবু মাঝে মাঝে এ প্রাণের জ্বালা দাউ দাউ করে ওঠে বুঝলি? আজ আমি প্রাণ দিতে পারি। আর প্রাণ দেওয়ারই অভিসারে যাব আজ। দাদাকে পৌঁছে দিতে হবে হাড়মুণ্ডি পুল, পেছনে তার পুলিশের তাড়া। আমার কাছে এসেছে বিপদে। আমি কি চুপ করে থাকতে পারি। আজ যে দেবতা আমাকে বর দিতে এসেছে রে ভুনু। সময় নেই, ঘোড়া জুড়ে দে। (পৃ.৩৯৪-৩৯৫)

গাড়িতে মাতাল ভজুকে দেখে 'সন্ত্রাসবাদী নেতা' নারায়ণের মনে হয়েছে : "এ সংসার মানুষকে সবই তৈরি করতে পারে, প্রাণের জ্বালায় মানুষ কী না হতে পারে।" (পৃ.৩৯৬) ছুটে চলা ঘোড়াগাড়ির উপর যেন বাজ পড়ল। মাতাল ও ভাঙা জীবনের পথে ধাবমান ভজুর ব্যর্থতা ও বিশ্বাসহীনতার মাঝে সমস্ত পৃথিবীর রূপ প্রত্যক্ষ করে নারায়ণ আবেগভরা অস্পষ্ট কণ্ঠে বলেছে :

'তুমি তাকে পথ দেখাও, ছিঁড়ে ফেলো এ অন্ধকার, ভাঙো এ পথের বাধা।'... ভজু ঘুমোয়নি। অন্ধকারে তার দুই বন্ধ চোখের পাতা ভিজিয়ে জল গড়িয়ে এল। কাকে বলছেন এ কথা তার দাদা? তাকে না ঈশ্বরকে ! কেন বলছেন? (পৃ.৩৯৬)

আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালে কৃপাল, শঙ্কর, সারদাচৌধুরী, হীরেন, রথীন, সুনির্মল সকলেই কারারুদ্ধ। কিন্তু শ্রীমতী কাফেতে বেড়েছে খদ্দেরের সংখ্যা এবং ভজন এখন সার্বক্ষণিক মাতাল, তবে রাজনীতিতে সচেতন। নরসিং নামধারী এক খদ্দের পড়ে শোনায় তৎকালীন রাজনীতির চিত্র নিয়ে লিখিত কয়েকমাস আগের 'মাসিক বসুমতী' যাতে বাঙালি রাজনৈতিক কর্মীদের বিদ্রূপ করে লেখায় ভজন যন্ত্রণাক্রুদ্ধ হয়েছে :

... বাঙ্গালার রাজনীতি ক্ষেত্রে অধুনা যে ভূতের নৃত্য দেখা যাইতেছে ... যে স্বেচ্ছাচার ও পরমত অসহিষ্ণুতার জন্য আমরা বুরোক্রেসিকে দায়ী করিয়া গালি পাড়ি ... স্বরাজ্যদলের দলপতিদের মধ্যে এ দোষ দেখা দিয়েছে। তারই ফলে বাংলা কংগ্রেসে দলাদলি ... পরন্তু 'তরুণ রাজনীতিক' বিজ্ঞের মতো বুঝাইয়াছেন যে, গতানুগতিক শান্তি ও আরামের জীবন, জীবন নহে, উহা মৃত্যুরই লক্ষণ, বিবাদ বিতণ্ডাই জীবন! ... যেদিন বাঙ্গালা সংবাদপত্রসেবীদের সভায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বাবুর উপরে 'স্বাধীনতাকামী' তরুণ লেখকের আক্রমণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম ... অদৃষ্টের পরিহাসের মতো ...ডাক্তার বিধানচন্দ্রকে অপমান ও প্রহার ... বাঙ্গালী তুমি ভাবিয়া দেখ, আজ তুমি কোথায়। (পৃ.৩৯৯)

এটুকু শুনে শুধু ভজন নয়, কুটে পাগলাও 'হা হা করে হেসে' ওঠে। ভজন বলে 'গঙ্গায় মেয়েদের ঘাটে বসে থাকা' আন্দু ভট্চাযের ছেলেও বাঙালি। মাসিক বসুমতীর মতে সকল বাঙালিই আজ কুটে পাগলা হয়েছে। এখানেই সে থেমে যায়নি। অহং-উদ্দীপ্ত ভজন পত্রিকা পাঠক নরসিংকে বলেছে :

নরসিং, আমিও বাঙালি। কিন্তু, নারায়ণ হালদার কি বাঙালি নয়? নেকড়ের মুখের শিকারের মতো লুকিয়ে ফিরছে প্রিয়নাথ, সেও যে বাঙালি, সেটা তোদের সম্পাদক সতীশবাবুকে লিখে পাঠিয়ে দে। (পৃ.৩৯৯)

একটা সময় ভারতবাসীর কাছে 'মুক্তির প্রতীক' ছিল স্বরাজ। কিন্তু উনিশশো চৌত্রিশ সালে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের পর সেই মুক্তির আশা দুরাশায় পরিণত হয় এবং উনিশশো বাইশ সালের মতো বিশ্রী একটা হতাশা ছেয়ে আছে সারা দেশে। 'বাংলা এ্যাসেম্বলিতে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কংগ্রেসকে বাংলায় 'পরবাসী' করে তোলে। বামপন্থী সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির কাছে সমস্যারূপে প্রতীয়মান হন। সমস্ত ঘটনায় বাংলার বুকে নেমে আসে অসহ্য অবসাদ। এ অবসাদ, ক্লান্তি, হতাশা শ্রীমতী কাফেতেও।

এরপর ভারতবর্ষের রাজনীতিতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতদ্বৈধতাজনিত তিক্ততার প্রতিক্রিয়ায় কংগ্রেস-বিভক্তি ও ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের উদ্ভবসহ বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহকে খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন সমরেশ বসু। নিচের অংশটি লক্ষণীয় :

Dhaka University Institutional Repository

...লিগ মিনিস্ট্রির দরুনই ললিত মুখুজ্যেরা আন্দোলনরত। কংগ্রেস, গান্ধী, আইনসভা, ইকনমিস্টের সম্পাদকীয়, শ্রমিক তদন্ত রিপোর্ট, ফজলুল হকের বিবৃতি, নবীন শ্যামাপ্রসাদের সিংহনাদ, সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস বিরোধিতা, কমিউনিস্ট পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন, বাটলিওয়ালা, ডাঙ্গে আর মুজঃফর আহমদ, অর্থাৎ এদেশীয় রাজনীতির আদি ও শেষ। তার পর হিটলার, হিমলার-হেস-গোয়েরিং তোজো-মুসোলিনী-চেম্বারলেন-ট্রটস্কি তার উপরে রাশিয়া ও স্ট্যালিন। (পৃ.৪১৪)

এ সব রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন নিয়ে পার্টিতন্ত্রের দলাদলি ও বিবাদ সংঘাত, আধিপত্য বিস্তার ও ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা দৃশ্যমান থাকে শ্রীমতী কাফেতে।

বাঙালি বউ ছেলে হারিয়ে, ঘর বিকিয়ে নিঃস্ব হলেও আশাহীন নয়। একদিন সে সব ফিরে পাবার আশা করে। কিন্তু ভজন সব দিক থেকেই আশাহীন। অ্যালকোহলের মাত্রা বাড়িয়ে তীব্র ঝাঁজে পোড়া পেটের যন্ত্রণা নিয়ে প্রিয়নাথের কাছে শ্রমিক বিপ্লব, সাম্যবাদ, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, অক্টোবর বিপ্লব—এসব শুনে ভজন বুঝতে পারে নতুন যাত্রা, নতুন লক্ষ্যের প্রস্তুতি চলছে। হয়তো তার পরিণতি সে দেখে যেতে পারবে না এমন শঙ্কাও কাজ করে তার মাঝে। এ কারণেই তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয় :

এ মহানিদ্রা ঘুচিবে জানি
আকাশে ধ্বনিবে অভয় বাণী
মন্ত্রের মতো ছড়াবে মর্তে
মহাদেশ দেশ ঘরে পল্লীতে।
(সেদিন) বাউলের সুরে বেহালার তারে
জ্বলিবে আগুন গ্রামে প্রান্তরে।
দেখবি তোর সোনার কানন নাই,
ধরিত্রী মুখ রহিবে ফিরায়ে
না দিবে তোরে ঠাঁই। (পৃ.৪১৬-১৭)

বন্দি বিপ্লববাদীদের মুক্তি সম্পর্কে নীরব রাজনীতিবিদদের আপসকামী মনোভাবে বিপন্ন ভজন কংগ্রেসী রাজনীতিতে আস্থাশীল হীরেনের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে :

... কি পাপ করেছে আন্দামানের বন্দিরা? তাদের জন্য একটি কথা তোমরা বলেছ? বলি ফাইল বগলদাবা ক'রে ইংরেজের অফিসে গিয়ে কোন্ স্বরাজের জন্য তোরা লড়ছিস্? বন্দিদের এই তিলে তিলে মরণ, তোমাদের এ শত্রুর সঙ্গে হাত মেলানো আর পরস্পরের সাহায্যের রাজনীতির জন্যে? তোমাদের এ খাতা-বদলির দাবি আর সমাজ সংস্কারের ধাপ্পা দিয়ে ভেবেছ এ রেল আর চটকল মজুরদের তোমরা ঠাণ্ডা করে রাখবে? ভজুলাটকে বাজে কথা বুঝিয়ো না নিয়োগী। আগামী দু'চার বছরে তোমরা আরও ক্ষমতা পেতে পারো, এমনকী তুমি, কৃপাল, তোমরা সবাই কর্তা হতে পারো, কিন্তু জেনো সেটাই শেষ নয়। তোমরা ভেক্ নিতে পারো, সাধু হতে পারো না।" (পৃ.৪১৭)

রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়েও রাজনীতিসচেতন ভজনের এ সত্যভাষণ প্রকৃত অর্থে তৎকালীন রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে সমরেশ বসুরই উপলব্ধি।

শ্রীমতী কাফের অন্তর্গত সকল পার্টিতন্ত্রীকে ধারণ করেছে ভজুলাট। দুর্বিপাকে কাউকেও সে ঘৃণা করে না, অথচ ভেতরের স্বপ্ন ক্ষয়ে যায়। মদ্যপানে বলা চলে মাতাল ভজুলাট—শ্রীমতী কাফের শুধু নয়, বাংলা উপন্যাসের অন্যতম নীলকণ্ঠ চরিত্র। ব্যর্থ স্বপ্নের ভজুলাট যেন সমরেশ বসুর দ্বিতীয় সত্তা।

অবিশ্বাস, সংশয়, সন্দেহ, ভজনের জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। নিরাপদ, নিশ্চিন্ত, ছকবাঁধা জীবনে অসুখী ভবনাথ বাঁড়ুজ্যের কাছে কখনো কখনো সে স্ত্রী যুঁই, সন্তানদের অনিশ্চিত জীবনের দুর্ভাবনার কথা প্রকাশ করেছে :

Dhaka University Institutional Repository

আমি ভজু, ভজুলাট মাতাল। আমাকে সকলে হিসেবের বাইরে রেখে দিয়েছে! দিক, দোষ দেব না... দেখো, ছোটকালে বাবাকে দেখেছি মাতাল, প্রতিবেশীকে দেখেছি স্বার্থপর। পয়সার জন্য ব্লেড দিয়ে মাসির গলা কাটতে দেখেছি পাড়ায়। মা বাবা কাউকে আমার বিশ্বাস ছিল না। মায়া ছিল না নিজের প্রতি। মদ যেদিন প্রথম খেয়েছি, নির্ভয়ে খেয়েছি, বাবার সামনে দিয়ে হেঁটে গেছি! এ ছাড়া আর কী উপায় ছিল জানতুম না। কার তোয়াক্কা, কীসের তোয়াক্কা, আর কীসের আশায়? জীবনটাকে কোনওরকমে ক্ষয় করে ফেলা, এই তো জীবন! ... শালা ঘরে একটা ফোঁটা মদ রাখতে পারি না, বাবা খেয়ে ফেলে। সংসারের আগে পেছনে সমস্তটা শূন্য। এ শ্রীমতী কাফে চোরাবালুর উপর দাঁড়িয়ে আছে, আমি দেনায় তল হয়ে আছি। তোমরা বলবে এ শুধু আমার দোষ, কিন্তু পারি না। সকলের মুখে আমাকে অন্ন তুলে দিতে হয়, শ্রীমতীর রোজগার আমাকে সবটুকু পোষাতে পারে না আর বাবা...

...এ জীবনের বেড়াজালকে ভাঙতে পারলুম না। যিনি পেরেছেন, তিনি চলে গেছেন। আমি? আমি কী করব আমার এ অবিশ্বাস, সংশয়, সন্দেহ দিয়ে, কোথায় কুটব মাথা? (পৃ.৪২১)

ভুনু গাড়োয়ানের হাত জড়িয়ে ধরে তার অন্তিম ইচ্ছা প্রকাশ করে : "জীবনের ভাঙা পথে আমি যেন তোর মতো গাড়োয়ান হতে পারি। আমি যেন মুটে হতে পারি। আমাকে যেন কোনওদিন থামতে না হয়, কোনওদিন না।" (পৃ.৪২১)

এরপর পাল্টে গেল রাজনৈতিক পট। কংগ্রেসের মনোভাবে এসেছে নমনীয়তা। জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসের ডাকের পরিবর্তে কংগ্রেসের শুধু 'স্মৃতি পালনে'র নির্দেশ কার্যকর করতে আহ্বান জানিয়েছে বি পি সি সি। এ নিয়ে সুভাষ বসুর সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় বাংলা কংগ্রেসে বামপন্থার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। অবস্থা এমন হয় যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক সুভাষ বসুর সদস্যপদ বাতিলের আশঙ্কা দেখা দেয়। তাঁর নেতৃত্বে নতুন দল ফরওয়ার্ড ব্লক গঠিত হয়। বি পি সি সি-র কর্মপরিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য গান্ধীবাদী কংগ্রেসীদের নিয়ে অ্যাডহক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এমন পরিস্থিতিতে কৃপাল প্রিয়নাথদের সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদকে ছেড়ে কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে সুবিধাবাদী অবস্থানে যাওয়ার পরিকল্পনা করলেও রথীন জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসের কথা স্মরণ রেখে ছাত্রদের দ্বারা ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। শান্তিপূর্ণ সভা, শোভাযাত্রা, শহিদ স্মরণ—এসবই ছিল কংগ্রেসের পূর্বঘোষিত কর্মসূচি। কিন্তু রথীন কংগ্রেসের সদস্য হয়েও ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়েছে। হরিজন সেবা, পপুলার ফ্রন্ট, বম্বের কাপড়ের কলে ধর্মঘটের স্মৃতি নিয়ে নিষ্ক্রিয় দর্শক হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকা যক্ষ্মাক্রান্ত সুনির্মল শেষ পর্যন্ত মিশে যায় জনারণ্যে। পুলিশ বাধা দিতে এলে ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেও অসুস্থ ভজন শেষ চেষ্টা হিসেবে ভুনুর ঘোড়ার গাড়ি মাঝপথে রেখে পুলিশের জন্য বাধা সৃষ্টি করে। কৃপাল হীরেনের হাত থেকে গীতা কেড়ে নিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিলে পুলিশ তার ওপর দিয়ে থেঁতলে দলে মার্চ করে যায়।

সমস্ত হতাশা-নৈরাশ্যের মাঝে ভজনের কাছে একমাত্র ঝড়-কম্পিত দীপশিখা ছিল নারায়ণ। এজন্য দাদা নারায়ণের ঝোলা-থেকে-পাওয়া ঋষি কার্ল মার্কসের ছবি সংবলিত বই সে তুলে দিয়েছে শ্রীধরের ছেলে, স্কুলের গেটে পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত ছাত্র কানু-র হাতে। এভাবেই নারায়ণের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার রেখে যেতে চায় ভজন।

দিন দিন 'দারুণ অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা' ভজনকে 'ময়ালের মতো গ্রাস করছে। সেদিন সন্ধ্যায় ভজুলাট ক্যাশ কাউন্টারের টেবিলে, এলিয়ে পড়ে আছে অসহ্য পেটের যন্ত্রণায়; প্রায় সংজ্ঞা নেই তার। ভুনু গাড়িতে করে অচেতনপ্রায় ভজনকে নিয়ে গেল বাসায়। দাদার চিঠির জন্যই যেন শেষ প্রতীক্ষা ছিল তার। মৃত্যুর প্রাক্-মুহূর্তে সেই কাঙ্ক্ষিত চিঠি হাতে এসে পৌঁছলেও পড়ে দেখার সুযোগ হয়নি ভজনের। দাদার চিঠি যেন 'অসীম সমুদ্রের দূর দ্বীপ থেকে আসা এক ঝলক রোদ' তার কাছে। কিন্তু সেই চিঠি খুলে পড়ার আগেই

Dhaka University Institutional Repository

ভজু মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। পেটের নাড়িতে নাড়িতে সহস্র বিস্ফোটকের যন্ত্রণা। সমস্ত লিভারটা যেন বিষাক্ত পুঁজ রক্তে ফুলে উঠেছে। চিঠিটা দুমড়ে যেতে লাগল হাতের মুঠোয়। মেঝেতে ছেঁচড়ে যেতে লাগল মুখ। পথের নিশানা এসেছে, মুক্তির সন্ধান এসেছে, খুলে পড়তে চায় ভজু। (পৃ.৪৩১)

অন্তিম মুহূর্তে ফিসফিস করে মুক্তিপিয়াসী ভজন বলে :

কথা বল হে মৌন রাত,
চোখ চাও....
মুক্তি দাও।....(পৃ.৪৩২)

ভজনের মৃত্যুর প্রতীকী ব্যঞ্জনায় পরাধীন ভারতবাসীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এভাবেই অভিব্যক্ত হয়। শ্রীমতী কাফে কয়েকদিন বন্ধ থাকল। বারান্দায় শুয়ে রইল কয়েকদিন, একটা কুকুর আর কুটে পাগলা।

মহাদেব হালদারের জ্যেষ্ঠপুত্র নারায়ণ হালদার। এ উপন্যাসের একজন রাজনীতি-ভাবনার আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তির আবর্তিত বলয়। ১৯২২ এর ১২ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গণ-সত্যাগ্রহ স্থগিত ঘোষণা করে। ব্রিটিশ সরকার মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেফতার করে ছয় বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে অবসান ঘটে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের। উপন্যাসের শুরুতে গান্ধীবাদী স্বদেশীকর্মী কারামুক্ত নারায়ণ হালদার গৃহ প্রত্যাবর্তন করেছে। একুশ-বাইশ সালের ব্যর্থতা থেকেই নারায়ণের রাজনীতি মোড় নিল, স্বরাজসাধনের পথ গেল পাল্টে :

এ সময়টাতে এমনিতেই সারা দেশময় সরকারের দমননীতির তাণ্ডব চলছে। 'স্বরাজ' 'স্বাধীনতা' ইত্যাদি শব্দগুলো যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে উচ্চারণ করতে হয়। ওই কথাগুলোই যেন একটা মূর্তিমান বিদ্রোহের মতো ব্রিটিশ সিংহকে ভীত ও সংক্ষিপ্ত করে তুলেছে। (পৃ.২৯৭)

অন্যদিকে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের ফলে দেশে সশস্ত্র বিপ্লবী কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়। কালক্রমে নারায়ণ এখন বিপ্লববাদী। বিপ্লববাহিনীর আঞ্চলিক অধিনায়ক সে। 'দলের কেন্দ্রীয় কমিটি'-প্রেরিত রিভলবার দিয়ে সশস্ত্র নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের বিপ্লবী-দক্ষতায় দীক্ষিত করা তার দায়িত্ব। নারায়ণের সঙ্গে গত বছর কৃপাল-হীরেন-রথীন জেল খেটেছে। তবে তার সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে রথীন ও কৃপাল। যদিও কৃপাল পরবর্তীতে স্বরাজ্যদলে যোগ দেয়। জেল থেকে ফিরে আসার পর হীরেন ও কৃপাল আন্দোলনের নতুন পথ সন্ধান করেছিল। কিন্তু নারায়ণ যে সহিংস পথ-নির্দেশনা দেবে তা তারা ভাবতেই পারেনি। নারায়ণের সশস্ত্র বিপ্লববাদী আদর্শ হীরেন গ্রহণ করেনি, করেছে সুনির্মল ও রথীন। 'অনুশীলন' 'যুগান্তর' সমিতির মতো পুনঃজাগ্রত ব্যায়াম সমিতির ছদ্মাবরণে বিপ্লবী দল গঠনে আত্মনিয়োগ করেছে নারায়ণ। এর মাঝে সাংগঠনিক কাজে নৈহাটি ত্যাগ করে ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়েছে তার।

ভজনের বিয়ের পর দাদা নারায়ণ এসেছিল কয়েক মাসের জন্য। হঠাৎ একদিন গভীর রাতে বাড়িতে পুলিশি তল্লাশির মাঝে নারায়ণ নিরাপদে আত্মগোপন করে। গত বছর মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার পর আবারও একবার হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পুলিশ ভোর রাত্রে। কয়েকদিন পর পুনরায় পুলিশি হামলা হয়েছিল শ্রীমতী কাফে রেস্তোরাঁয়। দিন পনেরো পর সংবাদ এসেছিল নারায়ণ কারাবন্দি হয়ে আছে আলিপুরের প্রেসিডেন্সি জেলে।

খ্রিষ্টীয় নতুন বছরের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি আচমকা মুক্ত হয়ে এল নারায়ণ। বিকালবেলা, বিনা সংবাদে এসে দাঁড়ায় স্টেশনের রকে। পিছনে দুজন কুলি বিছানা বাক্স মাথায়। তার ফাঁসি হওয়ার কথা

Dhaka University Institutional Repository

থাকলেও ইংরেজ সরকার তা পারেনি। এ কারণে তার আগমন সকলের কাছে চোদ্দো বছর বনবাস শেষে রামের ফিরে আসার সমমর্যাদা পেয়েছে। সায়েব মেরে জেলে যাওয়া নারায়ণ তার কাছের মানুষদের কাছে নারান ঠাকুর, বটঠাকুর। 'প্রাণভোলানো রূপে'র নারায়ণ কুটে পাগলার কাছে 'গোরাচাঁদ'। স্থানীয় সকল লোক, পথচারী, দোকানি, গাড়োয়ান সবাই ভিড় করেছে নারায়ণকে ঘিরে। সভাস্থল মনে করেছে তরুণ পুলিশ অফিসার। (দ্র. পৃ.৩৫৮)

শ্রীমতী কাফেতে অনুজ ভজনের বিভ্রান্ত, বিপন্ন, সংসারবৈরাগী মাতাল জীবন প্রত্যক্ষ করে 'সন্ত্রাসবাদীর ভয়ঙ্কর চোখ ছলছল করে উঠল।' সমরেশ বসু এ উপন্যাসে স্বদেশী, সমাজতন্ত্রী, সন্ত্রাসবাদী কিংবা বিপ্লবী—প্রতিটি চরিত্রের সংবেদনশীল মনোজগতকে আবেগে-অনুভবে-মমতা ও প্রীতিতে, সম্পূর্ণভাবে এক মানবীয় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, বিচিত্র অভিমুখী তরঙ্গিত বৃত্ত-বলয়ে উপস্থাপন করেছেন; শনাক্ত করেছেন প্রতিটি চরিত্রের সমগ্র হয়ে-ওঠার মানবীয় বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে।

বিপ্লবী নারায়ণের অন্তর্স্রোতের সমগ্রতা উন্মোচনের জন্যই ঔপন্যাসিক নারায়ণ-প্রমীলার উল্লম্ফনধর্মী একটি ছোট এপিসোড যুক্ত করেছেন :

নবীনের মা বসল। বসে বলল মাথা নিচু করে, 'আমার নাম প্রমীলা। বাবার নাম, শ্রীনকুলেশ্বর পাঠক।'

বুঝেছেন, বুঝেছেন নারায়ণ। আর বলতে হবে না। সেই পাঠকবাড়ির মেয়ে, মেয়ে নয় সেই বালিকা। বুকের মধ্যে ধ্বক্ করে উঠল বিপ্লবী নারায়ণের।...একটা মুহূর্তে সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেল নারায়ণের। নানান কথা মনে পড়ছে। সব বাজে কথা।...নারায়ণের প্রায় কৈশোরোত্তর বয়সের সেই গোপন উন্মাদনা। নাম না জানা বিচিত্র অনুভূতি। অনুভূতি নয় পাগলামি। পাগল না হলে গঙ্গাধারের পাড়ায় কেন বারবার ছুটে যেতে হত। আর সেই পাগলামি আজও বুকের মধ্যে কী এক কাঁটার মতো যেন খচখচিয়ে উঠছে। বুকের মধ্যে ঢাকাঢুকি দেওয়া একটা মুখ, একটা অন্ধকার আচ্ছন্ন মুখের ঢাকনা কে যেন হুস করে উড়িয়ে দিল।...বুঝি জানাজানি নেই সেই গোপন অন্ধকার মুখটির সঙ্গে মানুষটির। (পৃ.৩৬৩-৬৪)

নারায়ণ-প্রমীলার দুজনের কথার মধ্যে স্মৃতি, দীর্ঘশ্বাস, গোপন বেদনা বিকীর্ণ হল, বিস্তৃত হল। সমরেশ বসু অসাধারণ শিল্পিত দক্ষতায় পরস্পরিত মোচড়-খাওয়া দুটো জীবনের অন্ধকারের মাঝে সংযত আলো, আদর্শ আর আত্মত্যাগের বিকিরণ ঘটিয়েছেন। গৃহ ত্যাগের আগে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে বলল প্রমীলা, "একটা কথা বলে যাই। নারানদা, আমার টাকা পয়সা সোনার অভাব নেই...একবার যদি আপনি আমার ঘরে পায়ের ধুলো না দেন, তা হলে মরেও আমার কোনও অভাব ঘুচবে না। যাবেন তো?" (পৃ.৩৬৫)

বিপ্লবী নারায়ণের অনিশ্চিত মৃত্যুলগ্ন জীবনে প্রমীলাকে কথা দেওয়া কঠিন, 'না' বলাটা আরও নিষ্ঠুরতা। নারায়ণ বলল, 'যাব, সময় এলে একদিন নিশ্চয় যাব।' এ জীবনে সময় আর হয়নি নারায়ণের।

রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্ক, স্বরাজ লাভের সঠিক পথ নির্ধারণে মতান্তর, উত্তেজনা; শ্রীমতী কাফেতে যেন পার্টি 'ষড়যন্ত্রের আসর' বসে আজকাল। আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে এ অঞ্চলে পুলিশি তল্লাশির হিড়িক পড়ে গেল। প্রিয়নাথ বাড়িতে অন্তরীণ। কৃপাল আর শঙ্কর ঘোষ সভা করতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। শ্রীমতী কাফে চিহ্নিত হল 'স্বদেশী রেস্টুরেন্ট' হিসেবে। এ জেলার শ্রেষ্ঠ নেতা নবীন গাঙ্গুলিও গ্রেফতার হলেন। কারারুদ্ধ হয় সুনির্মলও। গৃহবন্দি থেকে পালিয়ে গেছেন প্রিয়নাথ। এখানকার স্বদেশী আন্দোলন এতদিনের অবসাদ কাটিয়ে একটা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত ঢেউয়ের মতো ভেঙে পড়ল।

এমনি সময়ে, প্রকৃতির ভয়ানক ঝড়জলের মাঝে, কাঁধে ঘর-ছাড়া বাউন্ডেলে ব্যাগ নিয়ে শ্রীমতী কাফেতে এল নারায়ণ। ভজনের সহায়তায় 'হাড়মুণ্ডি পুল হয়ে' পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে সে আত্মগোপনে চলে গেল। কালক্রমে বন্দি হয়ে নারায়ণ নির্বাসিত হয় আন্দামানে। ভজনের মৃত্যুর প্রাক্‌মুহূর্তে আন্দামান থেকে নারায়ণের লেখা চিঠি আসে :

Dhaka University Institutional Repository

কল্যাণীয় ভজু,

তোর চিঠি পেয়েছি। জানিস তো চিঠি আসতে কত দেরি হয়। তুই মনটা অত উতলা করিস কেন।...দ্যাখ, মানুষ চিরদিন একরকম থাকে না। আমিও নেই। তোর সেই ছোটকালের কথা মনে আছে, আমি সাধু হয়ে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিলুম? সেটা কতবড় পাগলামি! বৃথাই ভগবান বলে চেঁচিয়েছি। বারবার যে হাত তুলে নমস্কার করেছি আকাশের দিকে তাকিয়ে, সে যে তাদেরই, তোরাই সে যে। প্রমীলাকে বলিস, বাইরে গেলেই দেখা করব...'

তারপর কালি লেপে দিয়েছে চিঠিটাতে। যেন দ্বীপের পরে অথৈ সমুদ্র। (পৃ.৪৩২)

সমরেশ বসুর বর্ণন-কৌশলে প্রমীলাকে বলা শেষ বাক্য অশ্রুত থেকে গেল, কেবলই আবর্তিত হচ্ছে লবণাশ্রুর অসীমতা। 'যেন' উৎপ্রেক্ষার সংকেত-ব্যঞ্জনা পাঠককে স্তব্ধ বেদনায় গুঞ্জরিত করে।

তেতাল্লিশ সালে কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হল। জাপান-বিরোধী আন্দোলন তখন কমিউনিস্টদের মুখ্য কাজ। কিন্তু ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি তারা বোঝাতে পারেনি দেশকে। ক্রমশ শ্রীমতী কাফের বর্তমানে দায়িত্বরত সকলেই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের লোক। ফলে, সেখানে রাজনৈতিক কোলাহল, এমনকী হাতাহাতি, মারামারিও হচ্ছে। এমনি পরিপ্রেক্ষিতে আন্দামান থেকে মুক্ত হয়ে এসেছেন নারায়ণ। সংসারের ব্যর্থ দায়িত্ব নিতে দেয়নি ভজনের স্ত্রী যুঁই। যুঁই বলল :

...আপনাকে দেশের মানুষ নির্বাসন থেকে মুক্ত করে নিয়ে এসেছে। আমি তো তার থেকে বাদ নই। আপনি চলে যান তাড়াতাড়ি, আপনার কাজে হাত দিনগে। আমাকে আর অপরাধী করবেন না।...কিন্তু আরও কিছু বলার ছিল যুঁইয়ের। বলল, 'প্রমীলা ঠাকুরঝি মারা গেছেন।' কয়েকমুহূর্ত তিনি অবুঝ পাগলের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরে বললেন, 'ও ! মারা গেছে? কবে?'

'বছরখানেক। আপনাকে একবার দেখবার...'

'বউমা।' নারায়ণ থামিয়ে দিলেন যুঁইকে। তিনি আর শুনতে চান না। পারছেন না শুনতে।... যুঁই বলল, 'যদি কখনও রানাঘাট যান, তবে একবার প্রমীলা ঠাকুরঝির বরের সঙ্গে দেখা করবেন। ঠাকুরঝি বলে গেছেন।' (পৃ.৪৩৫-৩৬)

নারায়ণ গিয়েছিলেন প্রমীলার বরের সঙ্গে দেখা করতে। কথা বলতে বলতে ভদ্রলোকের চোখে জল দেখা দিয়েছিল। তিনি জানালেন, "এই যে নবীন, একেও সে আপনাকেই দিয়ে গেছেন। আর আমি। আমাকে যদি নেন, মাইরি বলছি, আমি আর কিছুতেই একলা থাকতে পারছি না (পৃ.৪৩৬)।" নারায়ণ জোর করে প্রমীলার স্বামীর হাতটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে খালি বলেছিলেন, 'আপনি একটু চুপ করুন।' তারপর নীরবে তারা দুজনেই অসীম শূন্যে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে হীরেন নিয়োগীর আদর্শ গান্ধীবাদ। স্বদেশী আন্দোলনে গান্ধীপন্থী নারায়ণ-কৃপালের সঙ্গে জেল খেটেছে সে। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের দুটো দিক ছিল তার প্রেরণার উৎস—সত্যাগ্রহ এবং অহিংসা। সত্য এবং অহিংসার মাধ্যমে জন্ম নেয়া আত্মার শক্তি, ভালোবাসার শক্তিই হল সত্যাগ্রহ। গান্ধীর ধর্মীয় বিশ্বাস এবং রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সমন্বয় সাধন ভারতের নিরক্ষর, ধর্মভীরু মানুষের কাছে তাঁর আবেদনকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। তিনি হিন্দু-মুসলিম অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। শ্রেণি-বিরোধ নয়, শ্রেণি-শান্তি এবং শ্রেণি-সমন্বয়ই ছিল তাঁর সামাজিক দর্শন। এ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথা নির্মূল করে সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে হরিজন সম্প্রদায়সহ সমাজের সকল অংশের সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট হন। রাজনীতিক সহযাত্রী নারায়ণ, কৃপাল, রথীন, প্রিয়নাথ যখন নতুন নতুন উদ্‌ভূত পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক আদর্শ বারবার

Dhaka University Institutional Repository

পাল্টেছে, হীরেন শেষ পর্যন্ত স্থির থেকেছে। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার পরবর্তী পরিস্থিতিতেও হীরেন মদের দোকানে পিকেটিং, হরিজন সেবা, পরিচ্ছন্নতা-শুদ্ধতার পক্ষে সংগঠনে ব্যস্ত থেকেছে। গীতা ও চরকাবিচ্ছিন্ন হতে পারেনি হীরেন।

দুবছর মদের দোকানের পিকেটিং-এর ফল অত্যন্ত গুরুতর হয়েছিল। "শুধু পুলিশ নয়, শ্রমিকরাও পর্যন্ত তাদের লাঠি নিয়ে তাড়া করেছে। হীরেনের কপালে লাঠি পড়েছিল একটা বুড়ো ধাঙড়ের। সে প্রায় পনেরো দিন চুঁচুড়ার হাসপাতালে ছিল।... হীরেন সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছে হরিজন সেবায়। (পৃ.৩২২)

এমনি সময় জেলপ্রত্যাগত হীরেনের কাছে ভিক্ষাপ্রার্থী হল জীর্ণ দশা, ময়লা পোশাকের, সারা গায়ে খড়ি-ওঠা, ঠোঁটে কান্নাভরা এক নারী। গান্ধীবাদী হীরেনের অনুভব :

হীরেনের আজন্ম সংস্কারাচ্ছন্ন চোখ নত হয়ে এসেছিল তার খোলা বুকের সারল্য দেখে। জেল থেকে ফিরে তার মনটা ভার হয়েছিল। সেদিন আচমকা বেদনায় ভরে উঠেছিল তার বুকটা। মনে হয়েছিল গান্ধীজির সেই নিরন্ন, অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবাসী এসে আজ দাঁড়িয়েছে তার সামনে। জিজ্ঞেস করে জেনেছিল মেয়েটি বিহারের নট জাতীয়া। এখানে একটা ইটখোলায় কাজ করতে এসেছিল স্বামীর সঙ্গে। স্বামী মারা গিয়েছে, সে বেকার, ভিক্ষাবৃত্তি ধরেছে।

হীরেন তার জন্য কাজ জোগাড় করে দিয়েছে মিউনিসিপালিটিতে। তাকে শুনিয়েছে গান্ধীজির বাণী, শিখিয়েছে পরিচ্ছন্নতা, বুঝিয়েছে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ, নির্দেশ দিয়েছে তকলিতে সুতো কাটার। (পৃ.৩৩০)

শুধু রামাকে নয়, পুরো ঝাড়ুদার বস্তিতে গিয়েই হীরেন তার আদর্শ প্রচার করে। রামার পরিবর্তনে বিস্মিত হয়ে তার প্রতি অনুভব করে এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ এবং যন্ত্রণা। কী এক রক্তক্ষয়ী দ্বৈরথের শুরু। দ্বিধাদীর্ণ হীরেন বারবার আবৃত্তি করেছে গীতার সূত্র। পরমুহূর্তেই সে মনে মনে চিৎকার করে উঠেছে :

না না কোনও ইন্দ্রিয় আসক্তি আমার হৃদয়কে বাতাসের নৌকার মতো উন্মার্গগামী করেনি। এ যে আমার আদর্শ, আমার কর্তব্য। তাকে কেমন করে আমি পদদলিত হতে দেখব।...

রামার ওই অতল কালো চোখে সে যে দেখতে পেয়েছে যুগপৎ করুণা ও আগুনের শিখা। সে যে নবভারতের নায়িকা। মৃৎশিল্পী যে মূর্তি নিজের হাতে তৈরি করে খড় মাটি দিয়ে, সেই মূর্তির পায়ে একদিন তারই পুষ্পাঞ্জলি পড়ে। হীরেন তার কল্পনা-চোখে দেখতে পেল, গান্ধীজির পাশে দাঁড়িয়েছে রামা। রামা যুগেশ্বরী।...

রামার গা থেকে একটা কীসের সুগন্ধ ভেসে আসছে। দেখল, তার এলো খোঁপায় বাসি ফুল, কানে পরেছে নতুন রুপোর দুল। সে ভেবে পেল না, রামার দেহের প্রতিটি রেখা হঠাৎ এত তীব্র, জীবন্ত হয়ে উঠল কেমন করে।...

হীরেন দেখল, তার সামনে রামা নেই, এক অপরিচিতা উচ্ছৃঙ্খল বেদে নট-নারী। সে হাসছে। যে হাসিতে আকাশ চমকায়, বাতাস থমকায়, পাথরকে কথা বলায়। (পৃ.৩৩১)

শ্রীমতী কাফেতে বসে হীরেন আত্মবিশ্লেষণ করে। অন্তর্জগৎ রক্তাক্ত করে আত্ম সমীক্ষায়—গান্ধীনির্দেশিত আদর্শ থেকে সে বিচ্যুত কী না; ইন্দ্রিয়-উত্তেজনার কাছে সে পরাজিত হচ্ছে কী না। হীরেন সুতো কাটে না আজকাল। বাড়ি যেতে তার অনীহা; কোনো দারিদ্র্য নয় অভাব নয়, বরং সবাই জানে নিয়োগী বাড়ির অফুরন্ত ঐশ্বর্যের কথা। তবু তার পরিবার-উদাসীনতার কারণ :

সেই বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের কারণে অকারণে ঝগড়া বিবাদ, এক পাল ভ্রাতৃবধূর গহনা ও মাৎসর্যের নোংরামি তার সহ্য হয় না। তাদের বিরাট অন্দর মহলে, অনেক জোড়া সুন্দর চোখ, সম্পর্কের ঠাট্টার আড়ে প্রশ্রয়ের হাসি ও রাখঠাকহীন কথা কোনওদিন তার মনটাকে একটুও টানেনি, টলায়নি। উপরন্তু সেই পরিবেশে তার মনে একটা ঘৃণার উদ্রেক করেছে। (পৃ, ৩৩৪)

Dhaka University Institutional Repository

হীরেন বিশ্বাস করে রামার সৌন্দর্য রূপে নয়, গুণে; চেহারায় নয়, চরিত্রে। রামা তার আবিষ্কৃত ভারতের নিপীড়িত আত্মা। এখানে দেখার প্রশ্ন নেই, অনুভবের সাধনা। রামা হীরেনের আদর্শের সৃষ্টি। অতঃপর প্রস্তরীভূত আদর্শের হীরেন, রামাকে রাজনীতিক-মানবিক ও নৈতিক গান্ধী-আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চায় বারংবার, জানিয়ে দেয় সে ভারত-আত্মার প্রতিনিধি। আরও বলে, "তোমরা যে অস্পৃশ্য নও, এটুকু প্রমাণ করার জন্যই আমি তোমাদের হাতে খাব, তোমাদের সকলের সঙ্গে। সে হবে আমাদের সার্বজনীন চড়ুই-ভাতি। এতে তোমাদের লজ্জার কিছু নেই।" (পৃ, ৩৩২)

ভারতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিচিত্র দিক্‌পরিবর্তন, মতপার্থক্য, তর্ক-বিতর্ক-কুতর্কে শ্রীমতী কাফে উত্তেজিত হয়ে ওঠে যথারীতি। গান্ধী প্রবর্তিত 'হরিজন সেবা'-ই হীরেনের পথ, কোনো বিতর্কের পন্থা নয়। শ্রীমতী কাফের পেছনের ঘরে তাত্ত্বিক বৈঠকে উপস্থিত থাকে নারায়ণ, প্রিয়নাথ, কৃপাল, রথীন ও সুনির্মল। মতান্তরের জন্য হীরেনের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ :

হীরেন বসে আছে বাইরে। একদিন নারায়ণকে কেন্দ্র করেই সে দেশোদ্ধারের নেশায় পাগল হয়েছিল। সেদিন নারায়ণের কথায় প্রাণ দেওয়া কিছু অসম্ভব ছিল না। কিন্তু আজ, মতাদর্শের বিরোধে সে সম্পর্ক শুধু স্তিমিত হয়নি, তাদের আলোচনায় যোগদানের অধিকারও তার নেই। সে জন্য তার প্রাণে একটা বেদনা ছিল। তার মতো কৃপালও একদিন এইভাবেই রাজনীতির মধ্যে ঢুকেছিল। কিন্তু কৃপাল আজ নারায়ণকে শুধু বিদ্রূপ করে না, আক্রমণ পর্যন্ত করে। কিন্তু হীরেনের এমন মতিভ্রম হয়নি। তার বিশ্বাস নেই, কিন্তু সে শ্রদ্ধা করে তাঁর সাহসকে। সমীহ করে নারায়ণকে। প্রশংসা করে সহিষ্ণুতাকে। (পৃ.৩৬৭)

উচ্চবর্ণ হিন্দু কর্তৃক অস্পৃশ্য বলে ভারতের অবহেলিত হিন্দু সম্প্রদায় অর্থাৎ ভারত-আত্মাকে মর্যাদা বোধে, শুচি-শুদ্ধতায় জাগ্রত করার তপস্যায় অবিচলিত হীরেন। তাদেরকে পদদলিত করে স্বরাজ-স্বাধীনতা প্রকৃত মুক্তি এনে দিতে পারে না। উগ্র ও বিভ্রান্ত রাজনীতি তাকে আদর্শচ্যুত করতে পারেনি। রুচি-নৈতিকতার স্থূলতার কারণে পারিবারিক পরিসর থেকে বিচ্ছিন্ন হীরেন অন্তর্জগতে তীব্র নৈঃসঙ্গ্য লালনকারী। হীরেনের একমাত্র স্বপ্ন সাধনা হল—অন্ত্যজ অবহেলিত অপমানিত ভারত-আত্মাকে জাগ্রত করা। সেদিন বিকেলে হীরেন রওনা হল ঝাড়ুদার বস্তির উদ্দেশে।

ধাঙড়বস্তিতে আয়োজিত 'সার্বজনীন চড়ুইভাতির নিমন্ত্রণ' রক্ষা করতে গিয়ে 'তাড়িপানে মত্ত ধাঙড়দের' উন্মত্ত আচরণে হীরেন হতাশাবিদ্ধ হয়ে ব্যর্থতার গহ্বরে মুখ থুবড়ে পড়ে। এক বীভৎস অভিজ্ঞতা :

হীরেনের পাশ থেকে রামা হেসে উঠল খিলখিল করে, সর্বাঙ্গ দুলিয়ে। হীরেন তাকিয়ে দেখল, চোখ জ্বলছে রামার। খসে পড়েছে আঁচল, এলিয়ে পড়ছে চুল। আর হাসছে তীব্র মধুর গলায়।...

তাকিয়ে দেখল, আলুথালু বেশে, জ্বলন্ত চোখ বাঘিনীর মতো ওত পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে রামা।...সর্বনাশা নট মেয়ের এ আর এক রূপ। কিন্তু হিংস্রতা সে দেখতে চায়নি। এ যে বীভৎস, ভয়াবহ।... লোকগুলি অচেতন উন্মাদ। 'রাজা হো, পরধান হো, হামারা সাথ্ পিতা' বলে, বলে একজন ভাঁড়টা তুলে ধরল হীরেনের মুখের কাছে। হড়হড় করে ঢেলে দিল হীরেনের সর্বাঙ্গে। (পৃ.৩৮০-৮১)

অপমানে বেদনায়, বস্তি থেকে বেরিয়ে ছুটে চলল হীরেন। সামনে অন্ধকার, চোখ দৃষ্টিহীন। মনশ্চক্ষে তার দেবতার মূর্তির কাছে সে চায় আত্মঘাতী হতে, প্রার্থনা করে তার মৃত্যুর। রামা ছুটতে ছুটতে এসে ক্রন্দনরত হীরেনের পায়ের উপর আছড়ে পড়ে। এ পরিস্থিতি নির্মাণে সমরেশ বসু ধনুকের ছিলার মতো টানটান তীক্ষ্ম এক নাটকীয় দ্বৈরথ সৃষ্টি করেছেন। বিশুদ্ধ সত্তার সঙ্গে অন্তস্থ আবেগের সংঘাত। রাজনৈতিক আদর্শ এবং ভালোবাসার দ্বিমুখী বর্শাফলা হীরেনকে বিদ্ধ করছে :

অন্ধকার মাঠ। ওই দূরে গঙ্গা। আকাশে ঝিকমিক করছে তারা।

Dhaka University Institutional Repository

'বাবুজি।' নির্ভয়ে অসঙ্কোচে হীরেনকে লতার মতো জড়িয়ে ধরে লতার মতো উঠে দাঁড়াল রামা। কেঁদে উঠল হা হা করে। 'বাবুজি হমারা গোস্তাকি হমারা। হমকো পিটিয়ে, গালি বকিয়ে। বাবুজি হমকো লে চলিয়ে আপকো সাথ। হম এঁহা নহি রহেগা..নহি..।'

হীরেনের বুকের মধ্যে থরথর করে কাঁপছে। রামার তপ্ত আলিঙ্গন, নিশ্বাসের আগুন পুড়িয়ে দিল তার সর্বাঙ্গ। অন্ধকারেও দেখতে পেল, তার মুখের সামনে রামার ঠোঁট, জলে ভেজা চোখ, রামার সর্বাঙ্গ।...

শিউরে উঠল। এই তো মৃত্যু। মৃত্যু তার বক্ষলগ্ন। কিন্তু সে এত ভীষণ, এত ভয়ঙ্কর। দু হাতে সে নিজেকে মুক্ত করে নিল।...নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল।...

তারপর সেইখানে বসে পড়ে মাটিতে মুখ দিয়ে কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। (পৃ.৩৮১)

অপমানিত বিভ্রান্ত আতঙ্কিত হীরেন অন্তর্ঘাতী যন্ত্রণা প্রশমনের জন্য, শ্রীমতী কাফেতে ভজনের কাছে এসেই ছেলেমানুষের মতো হু হু করে কেঁদে ওঠে। ভজনের কাছে মদ চায়। হীরেন জীবনে প্রথমবারের মতো মদ খেয়ে মুক্তি খোঁজে। সে অন্ত্যজ শ্রেণির জীবনমান পরিবর্তনের গান্ধীবাদী আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মসমালোচনাও করেছে। তার মনে হয়েছে—এ হয়তো তারই ভুল, সে হয়তো ধাঙড়-বস্তিবাসীদের বোঝাতে পারেনি। বাড়িতে ফেরার পথে ভুনু গাড়োয়ানের গাড়ির গায়ে মাথা এলিয়ে ভাবতে ভাবতে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে :

না, সে বিশ্বাস হারাবে না। মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। গান্ধীজির কথা মনে পড়ছে তার। অসহিষ্ণু হলে তার চলবে না। আজ যারা তাকে লাঞ্ছিত করেছে, তারা ভুল করেছে। এমনি করেই তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে অনাচারের পথ থেকে, দিতে হবে শিক্ষা। (পৃ.৩৮৩)

১৯৩০-৩২ এর দেশব্যাপী বিরাট গণজাগরণ, প্রতিবাদী বিক্ষোভের জোয়ার। আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে স্বরাজ এল না। স্বরাজের জন্মস্বপ্ন ব্যর্থ হল। সেই বাইশ সালের মতো বাংলার বুকে অবসাদ। অবসাদ শ্রীমতী কাফেতে। হতাশায় আজকাল মদ-সিগারেট খাওয়া ধরেছে কৃপাল, এবং তার রাজনৈতিক গুরু শঙ্কর ঘোষ। তাদের চিন্তার মাঝে ভয়াবহ ফাটল ধরেছে। অবসাদে ভেঙে পড়েছে হীরেন রাজনীতিতে, হার্দ্য জগতে :

একদিন ছোকরা ঝাড়ুদারের প্রেমে পড়ে যেমন রামা বিচিত্র হাসিতে ঘুমন্ত শিশুর দেয়ালা করত, তেমনি হাসে বউদি। সে হাসিতে যেন একটা ভয়াবহ সর্বনাশের ইঙ্গিত রয়েছে। বউদিকেও তার বড় ভয়। বউদির ইচ্ছা, ওই রামার মতো। একখানি ছোটোমোটো বাসা, সেখানে হীরেন আর বউদি। বউদি নয় বউ। ছি ছি ছি, ততখানি নীচে কেমন করে সে নামবে। (পৃ.৪১৭)

জালিয়ানবাগ দিবসের স্মৃতি পালনের নির্দেশ দিয়েছে কংগ্রেস সারা ভারতময়, আহ্বান জানিয়েছে বি পি সি সি। বাংলা কংগ্রেস বামপন্থার দিকে ঝুঁকেছে। সুভাষ বসুর কংগ্রেসের সদস্য পদ বাতিল হতে পারে। শোনা যাচ্ছে বি পি সি সি-র উপর অ্যাডহক কমিটি চাপানো হবে গান্ধীবাদী কংগ্রেসীদের নিয়ে। আর সুভাষ বসুও একটা নতুন দল গঠন করতে পারে, শোনা যাচ্ছে। গত কয়েক বছরে প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসের অ্যাসেম্বলির কার্যাবলি হীরেনের পছন্দ নয়। হীরেনের স্তিমিত নানা ভাবনার স্বরূপ লক্ষণীয় :

সে দেখেছে নিজেদের মধ্যেই দলাদলি, ক্ষমতার অপব্যবহার। সে যা চেয়েছিল, গান্ধীজি যা চেয়েছিলেন, সে বস্তু সুদূর পরাহত। নিশীথ রাত্রির ঘুমন্ত ভারত, ঊষার মঙ্গল গান ও স্তোত্রে, ঘণ্টা ও কাঁসি-ধ্বনিতে মুখরিত মন্দিরের ভারতকে পাশ্চাত্ত্যের ডামাডোলের বাজারের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইছে সবাই। তাই সে আজ রাজনীতি থেকে দূরেই থাকে।.. দূরে না থাকলে উপায় কি। যে মন্দিরের সে স্বপ্ন রচনা করেছিল সেই মন্দিরের রক্ষাকর্ত্রী রামা ঝাড়ুদারনী। ফল পাকুড় ও স্বপাকের মিষ্টি দিয়ে দেবতার পুজো দেবে। সেই প্রসাদে তারা ধন্য হবে। কিন্তু কুৎসিত জগৎ তার বিষাক্ত কীটে পরিণত

Dhaka University Institutional Repository

করেছে রামাকে। আর বউদি ! তার চোখে শুধু আগুন আর একটা ভয়াবহ হাসি। ওই হাসি দেখে নাকি পুরুষে মাতালও হয়। না, হীরেন পালিয়ে যাবে কোথাও। (পৃ.৪২৫)

বুদ্ধি আর তত্ত্ব দিয়ে যা সম্ভব, সহস্র বছরের জাত-পাতের সংস্কারের সামূহিক নির্জ্ঞানের অক্টোপাস-টানে বাস্তবে তা সম্ভব নয়। একদিন রামার আলিঙ্গনকে মহামৃত্যুর আলিঙ্গন মনে হয়েছিল হীরেনের, অথচ শেষ পর্যন্ত বউদির 'চোখের আগুন ভয়াবহ হাসির কাছে', 'আলিঙ্গনে'র কাছে আত্মসমর্পণ করছে হীরেন। আত্মহত্যার মাঝে মুক্তির সন্ধান করেছে কতবার। করা হয় না কারণ "ভবিষ্যতের একটা বিচিত্র কৌতূহল তাকে বার বার বাধা দিয়েছে।...আর বিচিত্র তার মতি, রামাকে দেখলে আজও তার হৃদয় অপ্রকৃতস্থ হয়ে ওঠে।"

রামার আত্মসমর্পণ প্রত্যাখ্যানের কারণ কেবল রাজনৈতিক আদর্শিক নয়, অন্ত্যজশ্রেণিভুক্ত রামার প্রণয় প্রাচীন সংস্কারের দৃষ্টিতে হীরেনের অচেতন-অবচেতনে অসামাজিক বলেই তা পরিত্যাজ্য।

উনিশো আটচল্লিশ-এর হীরেন এখন কলকাতাতেই থাকে, সঙ্গে বউদি। বউদিও এখন একজন কংগ্রেসের নেত্রী। অভ্যাসবশত হীরেন সুতো কাটে। অবসিত স্মৃতিতাড়িত হীরেন আশ্রয় নেয় ধর্মগ্রন্থে, ভারতের তীর্থ ক্ষেত্রসমূহে। সংগ্রহ করছে প্রাচীন ভারতের তথ্য। হীরেন বেদ-বেদান্ত ও ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে রচনা করছে প্রবন্ধ।

প্রিয়নাথ, নারায়ণের বন্ধু, রথীন আর সুনির্মলের 'প্রিয়দা' কয়েকদিন হল জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে। সমরেশ বসু এভাবেই তাকে kxgZx Kv‡d-তে উপস্থাপন করেছেন। নারায়ণ-হীরেনের সঙ্গে প্রিয়নাথের রাজনৈতিক মত ও দলাদর্শের পার্থক্য আছে, তবে তার অন্তর্লোকে কোনো অবরুদ্ধ হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বসিত হয়নি। গান্ধীবাদের সঙ্গে আছে তার তীব্র বিরোধ, নারায়ণের মতের সঙ্গে সূক্ষ্ম বিরোধ। অন্যদিকে নারায়ণের সঙ্গে প্রিয়নাথের মতপার্থক্য হল—প্রিয়নাথ সশস্ত্র বিদ্রোহকে অস্বীকার করে না অথচ সহিংস নীতিবিরোধী বিপ্লবের কথা বলে। প্রিয়নাথের মতাদর্শ নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পথে বিপ্লববাদ কীভাবে বাধা সৃষ্টিকারী মতবাদ, এই ধোঁয়াটে বিষয়টি নারায়ণ জানতে চায় প্রিয়নাথের কাছে। নারায়ণের সশস্ত্র বিপ্লবকে অস্বীকার না করলেও শেষ পর্যন্ত সহিংস নীতিবিরোধী প্রিয়নাথ শ্রমিক বিপ্লবের পথেই হেঁটেছে। নারায়ণও শ্রমিক বিপ্লবের দ্বারা সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে সমর্থন করে, তবে বিপ্লববাদীদের কর্মকাণ্ড বাদ দিয়ে নয়। এ কারণে প্রিয়নাথ যখন নিজের মতাদর্শ যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে না সেজন্য 'মতের টানাপোড়েনে' দলের গুরুত্বপূর্ণ কাজে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা করে নারায়ণ তাকে নিজেদের সমিতির বাইরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। অন্যদিকে 'চক্রধারী নারায়ণ' ও 'ঋষি কার্ল মার্কস'-এর ছবি সংবলিত বই পড়ে নিজের ধারণা স্পষ্ট করতে চায় প্রিয়নাথ, মীমাংসিত হতে চায় সে; সময়ের তীক্ষ্ণ এক বিস্ময়কর রসায়ন।

জনবিচ্ছিন্ন হয়ে নয়, জনগণকে সঙ্গে নিয়েই কাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসবে—প্রিয়নাথের এ কথা বিপ্লবী নারায়ণ অস্বীকার করেনি, বরং তার মতাদর্শের সত্যতা বিশ্লেষণে মনোযোগী হয়েছে। কয়েকজন দীক্ষিত বিপ্লবী নয়—মূলত 'জনসাধারণই সমিতি'—প্রিয়নাথের বলা এ কথার মধ্যে 'চরম সত্যের' আভাস পেয়েছে নারায়ণ। রথীনের কাছেও সশস্ত্র বিপ্লববাদী আদর্শ থেকে সরে-আসা প্রিয়নাথের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করেছে সে :

Dhaka University Institutional Repository

রথী, তুমি পরশু বলেছিলে, প্রিয়নাথ বুঝি ভয় পেয়েছে। তা নয়। ওর মতো সাহসী আমাদের সারা জেলার মধ্যে কেউ ছিল না, আজও আছে কিনা জানি না। ওকে শত্রু ভেবো না। আজকে শুধু কথায় বলছি শ্রমিক বিপ্লব, আমার বিশ্বাস একদিন হয়তো প্রিয়নাথকেই আমাদের অনুসরণ করতে হবে। (পৃ.৩৬৯)

নৈহাটি এলাকায় প্রিয়নাথের গতিবিধি সীমাবদ্ধ, রাত ন'টার পর বাইরে চলাচল বেআইনি। স্টেশন ত্যাগ করতে পারে না পুলিশের অনুমতি ছাড়া। কোনো শ্রমিক মহলে প্রিয়নাথের প্রবেশ নিষিদ্ধ। শ্রীমতী কাফেতে প্রিয়নাথের উপস্থিতি কংগ্রেসপন্থীদের কাম্য নয়, বাঞ্ছনীয় নয় কৃপালদের কাছে :

আজকাল সন্ধ্যাবেলা প্রায়ই প্রিয়নাথের সঙ্গে তর্ক হতে দেখা যায়। ঠিক তর্ক নয়, প্রিয়নাথকে সকলে বিদ্রূপ-বাণে জর্জরিত করে তোলে। প্রিয়নাথকে শ্লেষ করে হাসাহাসির হররা পড়ে যায়। প্রিয়নাথ নিতান্তই একলা পড়ে গিয়েছে। হীরেন অবশ্য বিদ্রূপ করে না, কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা করে তর্ক করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সে প্রিয়নাথকে গালাগাল দিতে আরম্ভ করেছে। (পৃ.৩৪৮)

কৃপালের ক্রোধ ও উত্তেজনার কারণ নারায়ণের সহকর্মী, অনুপস্থিতিতে নেতা হওয়া সত্ত্বেও প্রিয়নাথের মুখে শোনা যাচ্ছে সমাজতন্ত্রের কথা। কৃপালের বিশ্বাস নারানদা-র সামনে প্রিয়নাথ এভাবে সমাজতন্ত্রের কথা বলতে পারত না। কিন্তু তা নির্ভুল নয় :

প্রিয়নাথ জবাব দিল, 'বলতুম, একশোবার বলতুম, রথীন। এই আমার বিশ্বাস।'

রথীন তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে প্রিয়নাথের দিকে। পকেটে তার লোডেড রিভলবার। তার ক্রুদ্ধ অবুঝ মনটার মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদ একটা অন্য রকমের আপসের মতোই মনে হতে লাগল। শ্রমিক বিপ্লব একটা ধোঁয়াটে সংস্কার। এই ধোঁয়াটে ভাবের মধ্যে তার কেবলি সুনির্মলের রক্তাক্ত হাতটার কথাই মনে পড়ছে। তার সন্ত্রাসবাদী জীবনে এ লজ্জা ও বেদনা রাখবার ঠাঁই ছিল না। তার উপরে এক দুর্বোধ্য আদর্শের দ্বারা তার প্রায় আজন্ম লালিত বিশ্বাসের প্রতি আঘাত সে সইতে পারছে না।...রথীনের চোখে মুখে কী অসহ্য ঘৃণা, অবিশ্বাস ও সন্দেহ।...

বাইরের ঘরে ভিড় ঝিমিয়ে এসেছে। কৃপাল চলে গেছে তার সাঙ্গপাঙ্গসহ। হীরেন বসে আছে একলা। (পৃ.৩৫৫)

ভারত তথা বাংলার আপাত শান্ততার অব্যবহিত ভেতর-স্তরে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল শ্রমিক, দলিত অন্ত্যজ শ্রেণির স্তম্ভিত হতাশা এবং ক্রোধ। যাদের লাঞ্ছনা-বঞ্চনার লাভা উদ্‌গিরণ আটচল্লিশ-উত্তর খণ্ডিত ভারতকে উত্তাল, রক্তাক্ত আর বিমূঢ় করে রেখেছিল। kxgZx Kv‡d উপন্যাসে এমন সব মানুষের জীবন, ক্ষোভ ও দুঃসহ পীড়নের কথা সমরেশ বসু অঙ্কন করেছেন, রাজনীতিকদের মতান্তর ও শ্রমজীবী শ্রেণির অন্তর্প্রবাহী করুণ, ব্যর্থ ক্ষোভের সঙ্গে সমীকৃত করে।

kxgZx Kv‡d উপন্যাসে রেলওয়ে ইয়ার্ডের শ্রমিক বাঙালি, চটকলের শ্রমিক মনোহর, ভাগন, লোটন, বিশে, চরণদের জীবনবাস্তবতার মধ্যদিয়ে ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু প্রকাশ করেছেন উপনিবেশিত ভারতবর্ষের নিরন্ন মানুষের জীবনরূপ—তাদের শোষণের ইতিকথা। হীরেন যখন গান্ধীবাদকে মনে প্রাণে ধারণ করে ভারতবর্ষের সনাতন মূল্যবোধ-আদর্শকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে, অস্পৃশ্য ভারত-আত্মাকে জাগাতে চেয়েছে তখন ডক ইয়ার্ডের শ্রমিক বাঙালি মদ্যপান করার জন্য লজ্জিত হয়েও হীরেনকে জানিয়েছে—দেশের লোককে শিক্ষিত করার সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদ প্রথা তারা উঠিয়ে দিতে চাইছে এতো ভালো কাজ। কিন্তু তারা শুধু নিজেদের বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা চায়, অধিকার চায়। শ্রমিক বাঙালি 'স্বরাজ' বোঝে না, বোঝে রুটিরুজির উপায়। কারণ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তার স্ত্রী সংসার ত্যাগ করতে চায়। বাঙালির নিচের কথন লক্ষণীয় :

Dhaka University Institutional Repository

...বাবু তোমাদের মন্দিরে আমরা যেতে চাইনে, ছোঁয়াছুঁয়ির কী দরকার। আমাদের পেট ভরে দুটি খাওয়ার পথ বাতলে দেও। বারো মাস আর ছেলে বউয়ের শুকনো মুখ দেখতে পারিনে। মাসে চোদ্দো টাকা মাইনে, এ সব কি আর নড়চড় হয় না? (পৃ.৩৪৯)

এর পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীপন্থী হীরেন বাঙালিকে জানিয়েছে তারা 'স্বরাজ' চাইছে এজন্যেই। খাওয়াটা অনেক বড়ো, কিন্তু স্বরাজে আরো অনেক কিছু আছে। এ কথার জবাবে বাঙালি, শ্রমিক নিপীড়নের যে বর্ণনা দিয়েছে তাতে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসবাহী শোষকের বহতা রূপের প্রকাশ স্পষ্ট; এবং ঔপনিবেশিক শাসনশৃঙ্খল মুক্ত হলেও এদেশীয় শাসকদের ভবিষ্যৎ-শোষণের ধারা যে অব্যাহত থাকবে তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট :

বাঙালি অন্যদিকে তাকিয়ে নীরবে মাথাটা নাড়ছিল। একটু একটু করে তার চোয়ালটা শক্ত হয়ে উঠল। ছোট হয়ে এল চোখ দুটো। শক্ত হয়ে উঠল হাতের মুঠি। বলল, 'আছে, সেটাও তোমাকে বলি লেউগিবাবু। এর এট্টা ব্যবস্থা তোমরা করো। আমাদের সঙ্গে কাজ করে লোটন, খোট্টা। থাকে কুলিবস্তিতে। আমাদের কাজ পথে পথে। আমাদের দশজনকে বললে, ভোর পাঁচটার মধ্যে এখান থেকে এগারো মাইল দূরে যেতে। সায়েব বাবুরা বলে খালাস, এট্টা টালির বন্দোবস্ত নেই। তা লোকে কেমন করে যাবে? কালা সায়েব বললে, পায়ে হেঁটে। এমনিতেই সেদিন পথে বাঘ বেরিয়েছিল। রাত করে যাবার ভয়ে লোটন বলেছে, অত সবিরে সে যেতে পারবে না। তা বললে বিশ্বাস যাবে না বাবু, শুনে সাদা সায়েব লোটনের পাছায় ঘপ করে কষালে এক লাথি, আর কালা সায়েব চুলের মুঠি ধরে এনতার কিল চড় ঘুষি।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল বাঙালি। তাকে দেখে মনে হল হিংস্র আক্রমণে এখুনি বুঝি শত্রুকে ধরে সে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলবে। দপদপ করে জ্বলে উঠল চোখ দুটো। বলল, চিবিয়ে চিবিয়ে, 'তা' বাবু প্রাণটা চাইল, ওই সাদা কালা দুটো কুত্তার বাচ্চাকে ওই খানেই হাম্বর দে ঠেঙে ফেলে দে আসি লাইনে। কিন্তুক পারিনি।

পারিনি বলতে গিয়ে যেন গলার স্বরটা একেবারে সপ্তম থেকে ভেঙে তলার পরদায় নেমে এল তার। মনে হল অসহায় আক্রোশের বাষ্প জমে উঠেছে তার গলায় আর চোখে। বলল, 'উলটে আমাদের দশজনের এক টাকা করে মাইনে কেটে দিলে। বাবু, ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা আমাদের, অ আ ক খ মাথায় থাক, এ পেটে পিঠে মার আর কদ্দিন সইব বলো। বলো। (পৃ.৩৪৯-৩৫০)

বলে কাঁদতে কাঁদতে শ্রীমতী কাফে থেকে বেরিয়ে যায় সে। শ্রমিক বাঙালির এ ব্যথিত ব্যাকুল আর্তনাদে প্রিয়নাথের চোখে দেখা দেয় আগুন, হীরেনের দৃষ্টি চলে যায় 'তারা ভরা এক টুকরো আকাশের দিকে'। এ প্রেক্ষাপটই প্রিয়নাথকে ট্রেড ইউনিয়নের কাজে প্রবর্তনা দেয়। অন্যদিকে এই মাতাল বাঙালিকে দেখে কংগ্রেস সদস্য শঙ্কর বিদ্রূপ করে। নারায়ণ বোঝে শ্রমিক বাঙালির অন্তর্যন্ত্রণা-দুঃখময়তার উৎস। শ্রীমতী কাফের দেওয়ালে ঘড়ির উপরে স্থাপিত নারায়ণের মূর্তির দিকে তাকিয়ে বিপ্লবী নারায়ণ মনে মনে বলে :

পাব তাকে পাব। আজ যিনি মেঘের আড়ালে, কাল তাঁর হাসির আলো ছড়িয়ে পড়বে সারা আকাশে। অন্তর্যামী তো জানেন, এই উপোসী মাতাল মানুষগুলি, ওই বাঙালি, ওদের বুকে কী অসহ্য বেদনা। অপমানে মাথা নোয়ানো ভগবান কী দারুণ ক্রোধে ওদের বুকের মধ্যে গর্জাচ্ছে। পিশাচের পায়ে চাপা মাথার শিরা উপশিরা ছিঁড়ে পড়তে চাইছে তাদের মাথা তোলার জন্য। --- বল বীর, বল চির উন্নত মম শির। (পৃ.৩৭৪)

বাঙালির বাড়িতে হাঁড়ি চড়েছিল কিনা জানতে চেয়েছিল নারায়ণ। কোম্পানির রেলে চাকরি করে হাঁড়ি চড়েনি শুনে লোকে হাসবে এজন্য বাঙালি জানায় 'আসলে আমাদের হাঁড়িই ফুটো। তলা দে সব গলে যায়।'—এ কথা বলে বাঙালির যে অট্টহাসি তা নারায়ণের কানে হয়ে ওঠে "দরাজ গলায় কান্নার একটা হা হা রবের রূপান্তর মাত্র।" (পৃ.৩৭৪)

স্বামী লবার মৃত্যুর পর তার বউকে কাজ দেবার প্রলোভন দেখিয়ে তিলকঠাকুর ভুলিয়ে নিয়ে এসে ফুর্তি করে। বাঙালি জানে শেষ পর্যন্ত মেয়েপাড়ায় স্থান হয় তার। নিজের স্ত্রীর জীবনে উক্ত পরিণতির শঙ্কায় শঙ্কিত হয় সে।

Dhaka University Institutional Repository

শুধু বাঙালি নয়, চটকলের শ্রমিক মনোহর, ভাগনের সাথেও কথা হয় নারায়ণের। তারা দু বছর কারাবাস করে ফিরেছে। তাদের কথায়ও নারায়ণ জেনেছে শ্রমিক নির্যাতনের কথা, জেনেছে মেয়ে, শিশুদের বিলাতি কোম্পানির লোকেরা জানোয়ারের সমতুল্য মনে করে। এসব লোকদের পাল্টা জবাব দিতে চায় সে।

জবাব দিতে হবে। কিন্তু কী ভাবে? আগুন জ্বালতে হবে। এ-দেশের প্রত্যেকটি সাদা চামড়ার মানুষকে ধরে ধরে আগুনে পুড়িয়ে মারতে হবে। সারা দেশটার কোণে কোণে ইংরেজের কবরখানা তৈরি করতে হবে। (পৃ.৩৭৩)

এই বাস্তব অভিজ্ঞতার অন্তর্তাড়নায় শ্রমিকদেরও সংগঠিত করতে চায় নারায়ণ। মনোহর, ভাগনকে জানায় নিজে সে তাদের সঙ্গে থাকবে। সশস্ত্র বিপ্লবী নারায়ণ তাদেরকে প্রাণিত করে। বলে, যে শ্রমিকরা আর পড়ে পড়ে মার খাবে না, তারা প্রতিবাদী হবে। নারায়ণের বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতি পাগলামি মনে হয় শঙ্কর ঘোষের কাছে। নারায়ণের শ্রমিকসংগঠনের সিদ্ধান্ত কৃপালের কাছে অন্তর্ঘাতী ও বিষবৎ মনে হয়েছে। শঙ্করকে বলেছে : "শুধু পাগলামি নয়। কংগ্রেসের মধ্যে এ-সব এলিমেন্ট বিষের মতো কাজ করছে শঙ্করদা।" যে কৃপাল নারায়ণের হাত ধরে রাজনীতিতে এসেছিল সেই নারায়ণ সম্পর্কে তার এ ধরনের মনোভাব মূলত অসহিষ্ণু, বিমূঢ় রাজনৈতিক মতাদর্শের ইঙ্গিত। হীরেন নিয়োগী এর ব্যতিক্রম। কংগ্রেসের সভ্য হিসেবে সে সকল মতবিরোধ আলাপ-আলোচনার দ্বারা সমাধান করতে চায়। তবে তার মাঝে শঙ্কাও কাজ করেছে :

...গান্ধীজির সমস্ত বাসনা হয়তো এবারও অতৃপ্ত থেকে যাবে। কেন না, দেশের জন্য যারা প্রাণ দেবে, তারা যদি সুস্থ মনে এক মত না হয়, তবে তো ব্যর্থতাই আসবে। ব্যর্থতা আসবে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে। তাই তো এসেছিল একদিন। একুশ সালের হিংসাত্মক ব্যর্থতা থেকেই তো নারায়ণ মোড় নিলেন। কিন্তু হীরেন মোড় নেয়নি। সে বিশ্বাস করে গান্ধীজির দর্শনকে, তাঁর আদর্শকে।" (পৃ.৩৭৪)

নারায়ণের সশস্ত্র পথকে শ্রমিকস্বার্থসিদ্ধির পথ বলে মনে হয়নি হীরেনের। বরং শিক্ষা ও অহিংসার মর্মবাণী হৃদয়ে ধারণ করেই শ্রমিকদের সত্যাগ্রহের 'প্রকৃত সৈনিক' করে তুলতে হবে। একথা সে ভজনকেও বলেছে। কিন্তু ভজন মাতাল অবস্থায়ও সশস্ত্র ইংরেজদের ভূমিকা সম্পর্কে প্রকৃত সত্য উচ্চারণ করে হীরেনের কাছে প্রশ্ন তুলেছে : "সত্যাগ্রহ বনাম কামান?" (পৃ.৩৭৫)

এভাবেই ধীরে ধীরে ১৯৩০ সালের আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরি হচ্ছিল। কারণ সমগ্র দেশের মানুষ অস্থির হয়ে উঠেছিল এটা গান্ধীজিও উপলব্ধি করছিলেন। এ কারণে তিনি ঢাকায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার পরিকল্পনা করেন। এরই মাঝে মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে কৃপাল সদলবলে ক্যানেস্তারা বাজিয়ে সারদা চৌধুরীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালায়। কিছুদিন পরেই 'সুভাষ বসুর পালটা সরকার গঠনের প্রস্তাবের' পরিবর্তে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গান্ধীজি সংগ্রামের ঘোষণা দেন। শ্রীমতী কাফে নিষিদ্ধ এলাকা বলে গণ্য হল জাতীয় আন্দোলনের স্রোতধারা বিসর্পিল, চড়াই-উতরাই হয়ে, বারংবার নতুন তত্ত্ব, নতুন তর্ক-বিতর্কের পথে বলয়িত হয়ে ছুটে চলল সময়ের দ্রুত টানে। গান্ধীজির পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলনের আহ্বান আসবে ঊনত্রিশে তা স্পষ্ট হতে শুরু হল। গর্জে উঠল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ দেশ। উত্তেজিত নৈহাটি :

প্রত্যহ স্টেশনের দেওয়ালে আর গাছে সর্বত্র পোস্টার পড়তে লাগল।
'সত্যাগ্রহী প্রস্তুত হও।' 'স্বায়ত্তশাসনে আমাদের জন্মগত অধিকার।' 'বিলিতি কাপড় আর মদ ছেড়ে দাও।' 'লবণ আইন ভাঙো।' 'স্কুল কলেজ ছাড়ো, ছাড়ো সরকারি চাকরি।'
কাগজে কাগজে গান্ধীজির ছবি। মনের মতো দলবল নিয়ে দণ্ডি সত্যাগ্রহ করে তিনি চলেছেন সমুদ্রোপকূলে। (পৃ.৩৮৪)

Dhaka University Institutional Repository

মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন অনিবার্য ঘটনার ফলে চাপা পড়ায় মহকুমা কংগ্রেস কমিটি প্রতিদিন সমবেত হয় শ্রীমতী কাফেতে। প্রিয়নাথ অন্তরীণ হওয়ার পর রথীন, কৃপাল শঙ্কর ঘোষের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দেয়। মে মাসে আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করায় গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করা হয়। সমস্ত দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, বোম্বাইয়ে শোলাপুরের শ্রমিকদের বীরত্বগাঁথা পত্রিকায় প্রকাশ, জেলার শ্রেষ্ঠ নেতা নবীন গাঙ্গুলীর গ্রেফতার হওয়ার সংবাদে আন্দোলনের তীব্রতা, শ্বশুরবাড়ির অনুশাসন ভেঙে বেরিয়ে আসা অল্পবয়সী সুন্দরী বিধবা ভ্রাতৃবধূসহ আরও অনেককে নিয়ে হীরেনের চুয়াল্লিশ ধারা ভেঙে মিছিল নিয়ে পায়ে হেঁটে লবণ তৈরি করতে ডায়মন্ডহারবার হয়ে ডান্ডি অভিমুখে যাত্রা, সভা করতে গিয়ে শঙ্কর ঘোষ ও কৃপালের গ্রেপ্তার, রথীনের নেতৃত্বে ছাত্র ধর্মঘট, বারাঙ্গনাসহ সর্বস্তরের মানুষের বিলেতি কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব, ভুনু কর্তৃক হরতাল কর্মসূচি সফল করবার জন্য অন্যান্য ক্ষুধার্ত গাড়োয়ানদের বোঝানোর চেষ্টা, মিছিলে পুলিশের বাধাদান-লাঠিচার্জ, হীরেন-বউদি-সুনির্মল-রথীন-সন্তোষ মাসিমাসহ আরও অনেকের আহত ও গ্রেপ্তার হওয়া, অদৃশ্য স্থান থেকে পুলিশের ওপর ঢিল ছোঁড়া, শ্রীমতী কাফেতে পুলিশের প্রতিহিংসামূলক তাণ্ডব, খণ্ড খণ্ড এ আন্দোলন চিত্রের মধ্যদিয়ে তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতাকে প্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক। উল্লেখিত রক্তক্ষয়ী প্রতিবাদের মধ্যেও ভারতবাসীর স্বাধীনতার স্বপ্ন জেগে থাকার অভীপ্সা অসামান্য শিল্পসাফল্যে মূর্ত হয়েছে নিচের অংশে :

> একদল পুলিশ গোরা সার্জনের হুকুমে একটা দীর্ঘ নারকেল গাছে উঠবার চেষ্টা করছে। কোন এক অজানা দুঃসাহসী ওই সুউচ্চ নারকেল গাছের মাথায় পতাকা বেঁধে দিয়েছে। গ্রীষ্মের পোড়া আকাশের গায়ে উড়ছে পতাকা। অধৈর্য হয়ে উড়ছে কোন এক অসীমে ছুটে যাওয়ার জন্য। সেই পতাকা নামাতে হবে। কিন্তু কোনও সেপাই গাছে উঠতে পারছে না। খেপে উঠছে গোরা সার্জন। রাস্তার লোক ধরে গাছে ওঠাতে চাইছে, কেউ উঠছে না। (পৃ.৩৯০)

শেষ পর্যন্ত নামাতে পারেনি এ পতাকা। "পতাকা উড়ছে। অনমনীয়, অজেয় ভাবে এক দুরন্ত দুষ্ট শিশুর মতো হা হা করে, উড়ছে আকাশের গায়ে। পারেনি নামাতে পুলিশ।" (পৃ.৩৯২)

কিন্তু সারা দেশে উদ্দীপনার জোয়ার কাটতে না কাটতেই রাজনৈতিক গ্রেপ্তারে শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়। এরপর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এক নিদারুণ শূন্যতা-হতাশা ও অবিশ্বাসের সমান্তরালে ভজনের জীবনের পরিণতির মধ্যদিয়ে সাংগঠনিক রাজনীতির সক্রিয় সদস্য থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসনে যাওয়া রাজনীতিসচেতন ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু তাঁর রাজনৈতিক বীক্ষাকে বাণীরূপ দিয়েছেন।

আইন অমান্য আন্দোলনের কাল শেষ হল। তারপর বিয়াল্লিশ সালও অতিক্রান্ত। কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেছে। প্রিয়নাথের উপর জারিকৃত গ্রেপ্তারি পরওয়ানা প্রত্যাহৃত হয়। আবার বেরিয়ে এসেছে প্রিয়নাথরা। প্রিয়নাথ এখন কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক। পরবর্তীতে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক হিসেবে পুলিশের কাছে শিল্পাঞ্চলে গোলযোগ সৃষ্টিকারী হিসেবে চিহ্নিত হয় সে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হবার মাস ছয়েক পরে ১৯৪২ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধের ফ্যাসিবিরোধী স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন হয়ে, যুদ্ধে মিত্রপক্ষের সমর্থনে নতুন নীতি গ্রহণ করে। রথীনের বিপ্লবী রুদ্র মূর্তি দেখে প্রিয়নাথ মনে মনে ক্রুদ্ধ হলেও শেষ পর্যন্ত আত্মবিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসে যে, রথীনের মতো কর্মীর আদর্শ বিভ্রান্তির পেছনে তাদের কর্মপরিকল্পনাই দায়ী। উদ্ধৃতি লক্ষণীয় :

> 1 আজকে কমিউনিস্ট নামটা তখনকার কংগ্রেসের মতো। হয় তো বা আরও কিছু নতুন নাম, নতুনতর তার কাজ। যেন সভ্য আর্য ঋষির আশ্রঁ কুঞ্জে, অসভ্য অনার্য উলঙ্গ শিবের আবির্ভাব। সেই শিবের মোহন মূর্তি দেখে ঋষিবধূর অঙ্গবাস খুলে যায়। কে জানে, একদিন গণমনের সমস্ত বাঁধ ভেঙে দেবে কি না কমিউনিস্ট পার্টি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রিয়নাথ যে পথ নিয়ে একদিন নারায়ণের বিশ্বাস হারিয়েছিল, সেই পথেই সে তার সিদ্ধির অন্বেষণে ছুটে চলেছে। উপকণ্ঠের মজুরবস্তি তার কর্মক্ষেত্র। যে রথীন একদিন তার বিরুদ্ধে ছিল, সেই রথীন আজ তার সর্বক্ষণের সঙ্গী।...এখন মিউনিসিপালিটির ধাঙড় মেথরদের একটা ইউনিয়ন হয়েছে প্রিয়নাথের চেষ্টায়। রামা সেখানেই যায়। (পৃ.৪১৩)

২ তারপর শ্রীমতী কাফে। প্রিয়নাথদের অহোরাত্র আড্ডাস্থল ওটাই। লোকে বলে রেস্টুরেন্ট নয়, কমিউনিস্ট পার্টির অফিস। সত্যি, তাদের দলের প্রাদেশিক নেতারাও এ অঞ্চলে এলে একবার শ্রীমতী কাফেতে আসেন। (পৃ.৪৩৬)

উনিশশো আটচল্লিশ সালের শেষ। অতিক্রান্ত হয়েছে সর্বগ্রাসী যুদ্ধ আর মন্বন্তর। মানুষ মরেছে লক্ষ লক্ষ। বিয়াল্লিশ সালের সংগ্রামে, ছেচল্লিশের আজাদ হিন্দ্ দিবসে শহিদ হয়েছে শত শত। প্রিয়নাথ সর্বস্ব-হারানো যুঁইয়ের সঙ্গে দেখা করেছিল, হয়তো কিছু করতে পারত, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই কমিউনিস্ট পার্টিকে স্বাধীন ভারত সরকার বেআইনি ঘোষণা করে। আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হল প্রিয়নাথ।

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের উত্থান-পতন, পক্ষাঘাতগ্রস্ত বিশৃঙ্খল আকস্মিক সিদ্ধান্ত ও তা থেকে বহির্গমন—সারা ভারত বিস্ময়, ভীতি ও হতাশা নিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। পার্টিতন্ত্রের আত্মপ্রেমজনিত বৈকল্য ধস নামিয়েছে স্বরাজস্বপ্নে। বিলেতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত ধনিক শ্রেণি ও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত-প্রতিনিধি, প্রাচীন 'ভারত-আত্মা'র সাধকরা সাতচল্লিশের রাতে নিয়ন্ত্রণ নিলেন ভারত শাসনের। প্রশাসনে রয়ে গেল ব্রিটিশ উপনিবেশ-কাঠামো বা মডেল। উনিশশো বাইশের আত্মত্যাগী স্বরাজমুক্তির মৃত্যুলগ্ন রাজনীতিকরা হারিয়ে গেল বিসুভিয়সের উদ্গিরণের ভস্মতলে। প্রিয়নাথ আত্মগোপনে, নারায়ণ গ্রেফতার হয়ে কারাগারে; কানু, বাঙালি, মনোহর, ভাগন শ্রমিকরা জেলে। কৃপাল-শঙ্কর ঘোষ-হীরেন কলকাতাতেই থাকে; নবীন গাঙ্গুলি কংগ্রেসের এমএলএ। তিনি একদিন মোটর থেকে নেমে শ্রীমতী কাফেতে এক কাপ চা খেয়ে ম্যানেজার যতীশবাবুকে বলেছিলেন, "চায়ের স্বাদটাও দেখি লাল হয়ে গিয়েছে। আপনি বুঝি প্রিয়নাথের দলের লোক (পৃ.৪৩৬)।" পার্টিতন্ত্র, অন্তর্কলহ, অসহ্য মতান্তর—এমনি ভীতিকর ফাটল ধরিয়েছিল উপনিবেশ-উত্তর ভারতের রাজনীতিতে।

উপন্যাসের মূল আখ্যান এটুকু হলেও সমরেশ বসুর রাজনৈতিক দৃষ্টিসীমা ছিল বহুদূরস্পর্শী। এ কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলন, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৬ সালের আজাদ-হিন্দ দিবস, ১৯৪৭ সালের আপসকামী ক্ষমতাভোগের দ্বিখণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তী কাল পার হয়ে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের শেষ সময়ের ন্যারেটিভের মধ্যদিয়ে সমরেশ বসু বিপন্ন-নিরন্ন অন্ত্যজ, শ্রমজীবী, কৃষিজীবী শ্রেণির জীবনবাস্তবতা সংকেতিত করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ভজনের পরিবার ও শ্রীমতী কাফে-কে অবশিষ্ট আখ্যানের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। ভজনের সন্তান গৌর বাবার মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে শ্রীমতী কাফেকে 'বদমাইশ'দের আশ্রয়স্থল করে তোলে। এরপর লিজের মাধ্যমে কেবলি হাতবদল হয়ে চলে শ্রীমতী কাফে। শ্রীমতী কাফের লিজপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ায় মারামারি-হাতাহাতি পর্যন্ত হয় সেখানে। ১৯৪৮ সালের শেষ দিকের শ্রীমতী কাফের অবস্থা :

সাইন বোর্ড আছে তেমনি। তবে একদিকে কাত হয়ে পড়েছে। বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। অস্পষ্ট হয়েছে লেখাগুলি। দরজাগুলি পুরনো হয়ে গিয়েছে। চেয়ারগুলি হাল আমলের রূপ ধরেছে। ভেতরে ছবিগুলির অধিকাংশ নেই। নেই ভজনের সেই প্রিয় ছবি রবীন্দ্রনাথ, মেরি, সিরাজদ্দৌলা, আর র‍্যাফেলের মা। নেই নারায়ণের ছবি। ঘড়িটার লেখাগুলি ক্ষয়ে গেছে। ঘড়িটার নীচে একটা কাগজে লেখা হয়েছে, 'লিকার স্ট্রিকটলি প্রোহিবিটেড'। (পৃ.৪৩৩)

আন্দামান থেকে কারামুক্ত হয়ে এসে নারায়ণ সংসারের হাল ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু ভজনের স্ত্রী দেশ-দশের কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ নারায়ণকে সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ হতে দেয়নি। এ কারণে নারায়ণ

Dhaka University Institutional Repository

কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন যতীশকে শ্রীমতী কাফের দায়িত্ব দিয়ে যায়। প্রিয়নাথদের আড্ডাস্থল হিসেবে রেস্টুরেন্টের পরিবর্তে শ্রীমতী কাফে যেন 'কমিউনিস্ট পার্টি'র অফিস হয়ে ওঠে।

১৯৪৮ সালের শেষ দিক কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হওয়ার পর প্রিয়নাথ আবার আত্মগোপন করে। বিভিন্ন জেলায় ঘুরে অবশেষে নারায়ণ গ্রেফতার হয়। কানু, বাঙালি, মনোহর, ভাগন তারা সকলেই জেলে। স্বাধীনতা-পরবর্তী ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের দমননীতির কারণে এভাবেই গণমানুষের মুক্তি-সাধনার অবসান নয়, রূপান্তর ঘটে। অপরপক্ষে ঘনবসতিপূর্ণ এ অঞ্চলে দেশ বিভাগোত্তর উদ্বাস্তু ও খণ্ডিত-পরিবারের জনসম্প্রদায় 'দাবা খেলার ছড়ানো ঘুঁটির মতো ছড়িয়ে' আছে চারদিকে। স্বাধীন ভারতেও, শ্রীমতী কাফে পুলিশের গোয়েন্দা নজরবন্দির শিকার হয়। শ্রীমতী কাফের উপর কড়া নজর :

> অন্ধকার রাত্রে অদৃশ্য প্রেতের জোড়া জোড়া চোখ পাহারা দিচ্ছে শ্রীমতী কাফে। এর প্রতিটি ইটে ইটে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা।
>
> দেওয়ালে দেওয়ালে লাল রং-এর পোস্টার পড়ে রাত্রে, এই সরকারকে বিতাড়নের আহ্বান তাতে। খাওয়া পরার দাবি, বাঁচার দাবিতে ক্ষুব্ধ লেখা থাকে কাগজগুলিতে। দেওয়ালে, গাছে পাড়ায় টিকটিকির মতো অনুসন্ধানী চোখ ঘুরছে। কে, কারা দিচ্ছে ওই পোস্টারগুলি। নজরটা সোজা গিয়ে পড়ে শ্রীমতী কাফের দিকে। (পৃ.৪৩৮)

পরাধীন ভারতের সেই 'ছোকরা পুলিশ অফিসার' যে ভজনের জীবদ্দশায় ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতা-কর্মীদের গ্রেফতারের জন্য মাথা উঁচু করে কোনোদিন শ্রীমতী কাফেতে প্রবেশ করার সাহস পায়নি। স্বাধীন ভারতে আজ, শ্রীমতী কাফেতে এককালে আশ্রয়প্রাপ্ত সেসব নেতা-কর্মী এবং সরকার দলীয় প্রশাসনের নির্দেশে সেদিনের তরুণ পুলিশ, আজকের 'পদস্থ পুলিশ অফিসার' সরকারি হুকুমনামা সহ সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে প্রবেশ করে শ্রীমতী কাফেতে। ওই দিনই বন্ধ করে দেওয়া হল সর্বদলের কর্মকাণ্ড বক্ষে-ধারণ-করা শ্রীমতী কাফে, 'কমিউনিস্ট পার্টির গুপ্ত অফিস' থাকার অভিযোগে। নির্মম এই পরিহাসকে সমরেশ বসু ইতিহাসবোধের শান্ততায়, প্রকৃতির ন্যারেটিভে, প্রতীকায়িত করেছেন, ঔপন্যাসিকের রাজনীতিক বোধও তাতে প্রতিফলিত হয়েছে :

> শীতের রুক্ষতা। চারদিকে ন্যাড়া গাছ। ধুলো আর ধোঁয়া। সব যেন কুঁকড়ে আছে। ওই আকাশ, ধুলো, মাটি সবই। তবু একটা দক্ষিণের সামুদ্রিক হাওয়ার বেগ থেকে থেকে হুসহুস করে আসছে। শীতের আড়ামোড়া ভেঙে আসছে বসন্তের হাওয়া। (পৃ.৪৩৯)

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্যায়ের জাতীয়তাবাদী, গান্ধীবাদী, কংগ্রেসপন্থী, সশস্ত্র বিপ্লববাদী, শ্রমিকসংগঠক আত্মত্যাগী 'মুক্তিপন্থী'দের বিভক্ত স্বাধীন ভারতের বর্তমান অবস্থা ও অবস্থানের বর্ণনা করেছেন সমরেশ বসু তির্যক বর্ণনে। কানপুরের বিপ্লবী তরুণ সুরজ সিং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক হয়ে এ অঞ্চলেরই বাসিন্দা হয়েছে। রামা ও রেল ইয়ার্ডের বাঙালির রাজনীতির পরিণাম এখন শূন্য। 'ভারত-আত্মা' রামার জট-পাকানো মাথার চুলে উকুনের স্বাধীন বংশ বিস্তার, পরনে ধুলো মলিন ছেঁড়া কাপড়। ফুক্ ফুক্ করে বিড়ি ফোঁকে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে খ্যাল খ্যাল করে হাসে। কাছে পিঠে থাকে এক গাদা বাচ্চা। তার ঝাড়ু দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে বাচ্চাগুলি! হীরেন কলকাতাবাসী, বউদি নয়, বউ নিয়ে; তিনিও একজন কংগ্রেস নেত্রী। হীরেন প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, ধর্ম ও তীর্থক্ষেত্র পরিভ্রমণ করে, তথ্য সংগ্রহ করছে ইতিহাসের। বিপ্লবী সুনির্মল, বিধবা রূপসী সরসী রায়কে বিয়ে করেছে। সুনির্মলের মতে বিধবা বিবাহও তো বিদ্রোহ। সে তার পিতৃপিতামহের সঞ্চিত অর্থ উইল করে দেবে সরসীকে, তার সন্তানকে। বিপ্লবী নবীন গাঙ্গুলী, কৃপাল এখন কংগ্রেসী এমএলএ। শঙ্কর ঘোষ কলকাতা কংগ্রেস কমিটির লোক। শুধু অপরিবর্তিত আছে কুটে

Dhaka University Institutional Repository

পাগলা। শ্রীমতী কাফের রাঁধুনি চরণ নাড়ু পুরোতের গলিতে পণাঙ্গনা মেয়েটির মাঝে মুক্তি খোঁজে। এ বাস্তবতা কেবল নৈহাটির নয়, সারা ভারতের।

ভজন পরিবারের তথা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নৈহাটির প্রসূতিপ্রতিষ্ঠান শ্রীমতী কাফের মালিক ভজনের প্রাপ্তি হল—তার পা-কাটা ক্রাচধারী ছেলে নিতাই এখন শ্রীমতী কাফের রাঁধুনি। বর্তমান মন্ত্রী প্রধান রায়ের এক কালের নির্বাচনের সহকর্মী মহাদেব হালদারের অনুরোধের প্রত্যুত্তরে বর্তমান মন্ত্রীর জবাব এল, "আর বিপ্লবী নারায়ণের ভাইপোর কোনও কাজ সরকারি ব্যবস্থায় নেই।"(পৃ.৪৩৭) ক্রাচধারী নিতাইয়ের দিনরাত্রির ক্ষরিত যন্ত্রণার বিবরণ দিয়েছেন সমরেশ বসু অন্তর্চাপ-স্পন্দিত রূপকল্পে, দুমড়ানো-মুচড়ানো স্বদেশের সংকেতে :

তখন হয়তো অন্ধকার শ্রীমতী কাফের ঘরে ঘুম ভেঙে যায় নিতাইয়ের। আজকাল সে এখানেই শোয়। আর তার ঘুম আসে না। ক্রাচ ছাড়া এক ঠ্যাং নিয়ে দাঁড়ায়। ঘুম আসে না, বিচিত্র খেয়ালে লাফিয়ে লাফিয়ে পেছনের ঘরে যায়। যেন একটা ঠ্যাংওয়ালা প্রেতের মতো। ঝাঁপটা আটকানো আছে কিনা দেখে। তারপর হঠাৎ লাইটটা জ্বেলে দেয়। অমনি তার কিম্ভূতকিমাকার ছায়াটা ভেসে ওঠে বেড়ার গায়ে। (পৃ.৪৩৮)

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশের সেবক তরুণ পুলিশ, স্বাধীন ভারতে সেই একই পুলিশ অফিসার, ভজনের ক্রাচধারী ছেলে রাঁধুনি নিতাইকে দেখে বিস্মিত হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে ভজনের দুঃসাহসী আচরণ-উচ্চারণে অপমানিত তরুণ পুলিশ অফিসার, আজ ঔদার্য দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে উপযাজক হয়ে নিতাইকে 'একটু সমঝে চললে' সরকারকে বলে তার নামে দোকান খুলে দেবার ব্যবস্থা করবে বলে জানালে, প্রতীক্ষারত দর্শক-ভিড় উপেক্ষা করে,

কোনও কথা না বলে, খুব জোরে পিচের রাস্তায় ক্রাচের শব্দ তুলে চলে গেল সে। খট্ খট্ খট্...অফিসারটি চাপা অস্ফুট গলায় খালি বললেন, 'সাপের বাচ্চা, শলুই! ননসেন্স !' বোধ হয় মাথাটা আজ আবার নতুন করে নিচু হয়ে গেল তাই রাগ হচ্ছে।

তারপর দোকানটা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল। (পৃ.৪৩৯)

উপন্যাসের শেষে, প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের ভারতীয় রাজনীতির বহু দলতন্ত্রী মত-মতান্তর ও অন্তর্বিরোধের পরিণামকে সমরেশ বসু যেন ঐতিহাসিক কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। ৪৭-পরবর্তী স্বাধীন ভারতীয় পরিশ্রমজীবী জনগণের প্রাপ্তির 'নোনতা স্বাদ'কে অসামান্য ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। পা-কাটা ভজনের ছেলে ক্রাচধারী নিতাই যেন খণ্ডিত ভারতের প্রতিরূপক :

নিতাই যুঁইকে বলল অফিসারটির কথা। যুঁই তাতেও বিস্মিত হল না। বরং নিতাইয়ের কঠিন মুখটার দিকে বড় বড় চোখে তাকাল। তারপর নিতাইয়ের একটি হাত নিজের ঘাড়ে নিয়ে ক্রাচ দুটি সরিয়ে বলল, 'ও দুটো থাক, আমার উপর ভর দিয়ে একটু দাঁড়া বাবা। ওই দুটো আমি দেখতে পারিনে রে।'

নিতাই বলল, 'তোমার উপর আর কতদিন ভর করব?'

যুঁই বলল, 'ভর করবি কেন? তা বলে আমার বুকে একটু আসতে নেই?'

হাওয়া আসছে। উত্তরের চাপ ঠেলে আসছে দক্ষিণ হাওয়া। (পৃ.৪৩৯-৪০)

নিতাইয়ের ওই প্রশ্নে সচেতন পাঠকের মস্তিষ্কের অনেক জানালা খুলে যায়, উত্তপ্ত জিজ্ঞাসা প্রবেশ করে মনোজগতে, চিন্তনক্রিয়ায় থমকে যায় ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের গতিপথ। স্তম্ভিত, আর্দ্র, ধৈর্যস্নিগ্ধ যুঁই হয়ে ওঠে 'মহামাতৃকা', বিভ্রান্ত সময়ের কল্যাণময়ী নির্ভুল আশ্রয়, অবিরাম সান্ত্বনা। ঘনীভূত ইতিহাস ও প্রগাঢ় বর্তমান এবং সম্ভাব্য আগামী দ্রবীভূত হয়ে kxgZx Kv‡dর যুঁই কেবল দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়, মনোগ্রাহ্য চরিত্রও বটে। উদ্ধৃতির শেষ দুটি হ্রস্ব বাক্যে স্পন্দিত হয়ে ওঠে সমরেশ বসুর শিল্পবোধের সংযম, প্রলোভন নিরপেক্ষতা।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১ Irving Howe, *Politics and the Novel*, A Horizon Press Book, New York : First Printing march 1957 P.20

২ bqbc‡ii gvwU সমরেশ বসুর প্রথম লেখা (১৯৪৫-১৯৪৬) ও দ্বিতীয় প্রকাশিত (গ্রন্থাকারে ১৯৫২) উপন্যাস। একুশ বছর বয়সী সমরেশ এ উপন্যাসটি লিখেছিলেন অস্ত্রকারখানার নকশা ঘরে বসে। ১৯৪৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের পর মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের মূলসূত্র সম্পর্কে তার যে উপলব্ধি সেটাকে কেন্দ্র করেই তিনি bqbc‡ii gvwU উপন্যাস লেখেন। এটি মাসিক 'পরিচয়' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) mg‡ik em iPbvejxর ১ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩ পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, Dcb¨vm ivR‰bwZK, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯১, পৃ.১১

৪ সমরেশ বসু রচিত ও বিকাশ ভট্টাচার্য চিত্রিত, †'wL bvB wd‡i, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৩, পৃ.২১ ॥ প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯২

৫ কৃষ্ণা পাল, "সমরেশ বসুর উপন্যাসে গোষ্ঠীজীবন : শ্রমিক ও গ্রামীণ সমাজ" স্বপন দাসাধিকারী (সম্পাদিত) : gvb‡li K_vKvi, 'এবং জলার্ক' : পরিবেশক পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০০, পৃ.১৬৮

৬ 'ভূমিকা', "সমরেশ বসু ও একজন পাঠক", সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় : mg‡ik em : mg‡qi wPý, প্রাগুক্ত, পৃ.সাত

৭ ড. নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়, cvK-Ôweei Õ c‡e mg‡ik em, সাহিত্য প্রকাশ : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা পুস্তক মেলা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, পৃ.৯

৮ কৃষ্ণা পাল, "সমরেশ বসুর উপন্যাসে গোষ্ঠীজীবন : শ্রমিক ও গ্রামীণ সমাজ", স্বপন দাসাধিকারী (সম্পাদিত) : gvb‡li K_vKvi, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৯

৯ সমরেশ বসুর প্রথম প্রকাশিত ও দ্বিতীয় লিখিত উপন্যাস। কারাবাসকালে প্রেসিডেন্সি জেলে বসে তিনি লেখেন এটি। প্রকাশক ছিলেন লেখকবন্ধু সচ্চিদানন্দ মজুমদার। ১৩৫৮ সালের আশ্বিনে 'বুক ওয়ার্ল্ড' থেকে প্রকাশিত হয়।

১০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, BwZnvm, বিশ্বভারতী : কলকাতা ১৪২০, পৃ.১২২

১১ "উত্তরঙ্গ বিষ্ণু দে-র খুব ভালো লেগেছিলো। আমাকে বলেছিলেন, লেখাটা 'প্রায় এপিক', ঠিক এই শব্দদুটিই ব্যবহার করেছিলেন। কারণ ব্যক্তি নয়, সমাজচিত্রটিই ফুটে উঠেছে, বালজাক ইত্যাদির রচনায় যেরকম দেখা যায়।" সনৎ বসু, "মেঘরৌদ্র মেশামেশি", mg‡ik em : gvb‡li K_vKvi, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

"DËi½ প্রকাশের পর সমরেশ বসু অভিনন্দন-পত্র পেলেন বিষ্ণু দের কাছ থেকে। বিষ্ণু দে সেই চিঠিতে দু'টি মূল্যবান কথা লিখেছিলেন, প্রথমত, 'আপনার উপন্যাসটি পড়ে মনে হল, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে আপনার পরিচয় অত্যন্ত ক্ষীণ', দ্বিতীয়ত, 'আরো লিখুন, গঙ্গার ধারের যে কথা যে কথা আপনি লিখেছেন, আপনাকে দেখতে চাই তার সাগর-সঙ্গমে।' আগে পেয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠিতে উপদেশ, পরে পেলেন বিষ্ণু দের চিঠির প্রেরণা।" নিতাই বসু, KvjKU mg‡ik, জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স : কলকাতা, ১লা বৈশাখ ১৩৯৪, পৃ.৯১

১২ চিন্মোহন সেহানবীশ 'পরিচয়' পত্রিকায় 'উত্তরঙ্গে' অশ্লীলতার অভিযোগ আনলে 'নতুন সাহিত্যে' উত্তর দেন সনৎ বসু; পর পর আরো দুটি সংখ্যায় লেখেন অচ্যুত গোস্বামী ও গান্ধী ও বার্নার্ড শ'য়ের জীবনীকার ঋষি দাশ। দ্রষ্টব্য : 'এবং জলার্ক', প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৯

১৩ 'ভূমিকা', "সমরেশ বসু ও একজন পাঠক", সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, mg‡ik em : mg‡qi wPý, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭

১৪ সমরেশ বসু রচিত তৃতীয় উপন্যাস। ১৯৫২ সালে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সত্যমাস্টার—সমরেশ বসুর রাজনৈতিক দীক্ষাগুরুকে বইটি উৎসর্গ করা হয়। পরে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) mg‡ik em iPbvejxর ১ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৫ সমরেশ বসু, 'নিজেকে জানার জন্যে', সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত), 'দেশ' সমরেশ বসু স্মরণে, আনন্দ বাজার : কলকাতা, ১৪ মে ১৯৮৮, ৫৫ বর্ষ ৮৮ সংখ্যা, পৃ.২৫-২৭

১৬ "শ্রেষ্ঠ মুখটির সন্ধানে যেতে যেতে মনে পড়ে, 'বি টি রোডের ধারে' যার পাণ্ডুলিপি হারিয়ে এক রাত্রেই পাগলপ্রায় হয়েছিলাম, মনে করতাম, তার প্রধান পুরুষ চরিত্রটি প্রত্যক্ষত আমিই, কারণ একটি মহত্ত্বের প্রবণতা, তখন সম্ভবত আমার অবচেতনে ক্রিয়াশীল ছিল।" সমরেশ বসু , 'নিজেকে জানার জন্যে', সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত), 'দেশ' সমরেশ বসু স্মরণে, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯

১৭ "সমরেশ বসু : ব্যক্তি ও লেখক," সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত mg‡ik em iPbvejx, ১ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ.চার

১৮ 'বি টি রোডের ধারে' কোথাও কোথাও 'বি.টি.রোডের ধারে' মুদ্রিত দেখা যায়। আমরা সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত mg‡ik em iPbvejx ১ খণ্ডের বানানরীতি অনুসরণ করেছি।

১৯ প্রকাশ ১৯৫৩ এই সময়েই 'চতুষ্কোণ'পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং প্রথম সংখ্যায় একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখবার জন্য বলেন প্রদ্যুৎ গুহ। লিখলাম 'শ্রীমতী কাফে'—এই প্রথম একটি উপন্যাস, যদিও পুস্তকাকারে অনেক বড় হয়েছে এবং কোনো পত্রিকার কাছ থেকে এককালীন একটি রচনার জন্য, একশো টাকাও এই প্রথম পেলাম। দ্রষ্টব্য : 'দেশ', প্রাগুক্ত, পৃ.২৮

২০ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, "সমরেশ বসু : ব্যক্তি ও লেখক", সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত mg‡ik em iPbvejx 1, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৮, পৃ.চার

২১ "নৈহাটি রেলওয়ে স্টেশনের সামনেই বাসন্তী কেবিন। এ কালের নৈহাটির একমাত্র উজ্জ্বল রেস্তোরাঁ। একে ঘিরেই সমরেশ বসুর 'শ্রীমতী কাফে'—উপন্যাসকল্পনা মঞ্জরিত হয়েছে। কিন্তু এই রেস্তোঁরাটি নৈহাটি স্টেশন-পর্বের আগে একটি আদিপর্ব ছিল। ঘোষপাড়া রোডে নৈহাটি স্টেশনকে বাদিকে রেখে এগিয়ে যেতে একটু পরেই ডানদিকে ছিল বাসন্তী কেবিনের পুরানো ঠিকানা। আমার কালের বাসন্তী কেবিনের সেই পুরানো ঠিকানায় যাতায়াতকারী আর যদি কেউ জীবিত থাকেনও তবে তার সংখ্যা অতিব অল্প, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।" সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শ্রীমতী কাফে ইতিহাসের রাজপথে : ট্র্যাজিক উল্লাসে', Aciv‡ni Aefvm, দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৫, পৃ.৯৩

২২ mg‡ik em : mg‡qi wPý, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬

২৩ ১৯২০ সাল। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কলকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যুগান্তকারী 'অসহযোগ আন্দোলনের' প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পশ্চাদ্‌পটে সক্রিয় ছিল ১৯১৯ সনের কতিপয় রাজনৈতিক ঘটনা : ১. জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাযজ্ঞের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের ঔদাসীন্য ও নির্লিপ্ততা এবং মহাত্মা গান্ধীর উপর রাওলাট আইনের গভীর প্রতিক্রিয়া; ২. গান্ধীর মতো অভিজ্ঞ নেতার নেতৃত্বে কংগ্রেস বিপ্লবী সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহিত হয়; ৩. নরমপন্থীরা কংগ্রেস ত্যাগ করায় কংগ্রেসের নেতৃত্ব চরমপন্থীদের হস্তগত হয়। ফলে কংগ্রেসের পক্ষে বিপ্লবী কর্মসূচি গ্রহণ করা সহজ হয়; ৩. ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের খিলাফত-আন্দোলন মহাত্মা গান্ধী তথা কংগ্রেসকে অসহযোগ-আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল স্বদেশীর বিস্তার—বিশেষ করে চরকা ও খদ্দরের ব্যাপক প্রচলন, অস্পৃশ্যতা পরিহার, মাদকতা ও বিলাতি পণ্যসামগ্রী বর্জন এবং তিলকের স্মৃতি-তহবিলে এক কোটি টাকার চাঁদা সংগ্রহের পরিকল্পনা। নঞ্অর্থক কর্মসূচির মধ্যে ছিল : সরকারি খেতাব বর্জন, সরকারি অনুষ্ঠান বয়কট, সরকারি স্কুল-কলেজ পরিহার, আইন-সভা ও আদালত বর্জন প্রভৃতি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আইন সভা বর্জনের বিরুদ্ধে থাকলেও ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনে এম. কে. গান্ধীকে সমর্থন করেন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, আবেগ, তরুণদের উত্তেজনা নিভৃততম পল্লিকেও উজ্জীবিত করে। জাতির ইতিহাসে নিঃসন্দেহে ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ এক গৌরবদীপ্ত রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা হল।

১৯২১ সালে ব্রিটিশরাজ ভারতের ভিন্ন এক জাগ্রত মূর্তি প্রত্যক্ষ করে। সুপ্ত ভারত-সিংহ যেন নিদ্রাভঙ্গের পর কেশর ঝাপটা দিয়ে গর্জন করে উঠেছিল। হিন্দু-মুসলমান যে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি দেখা গেল, তা অভূতপূর্ব। সুভাষচন্দ্র বসু

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করেন, জওহরলাল নেহেরু এলাহাবাদ হাইকোর্ট বর্জন করে আন্দোলনে যুক্ত হন। স্কুল-কলেজ ও আইন-আদালতে পিকেটিং করা ছাড়াও মদের দোকানেও পিকেটিং করে দোকানগুলি অচল করে দেওয়া হয়। বিদেশি পণ্যের দোকানের সামনে পিকেটিং চলতে থাকে। ভারতের জাগ্রত জনগণ ইতিহাস নির্মাণ করছে; 'স্বরাজ আসছে বছরের মধ্যেই'—গান্ধীর আশ্বাস পেয়ে আকাশচুম্বী উদ্দীপনায় উন্মাতাল জনতা। ১৯২১ সালের পহেলা জুলাইয়ের মধ্যে মধ্যে তিলক স্মৃতি-ভাণ্ডারে এক কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছিল; বিদেশি কাপড় ভস্ম করে জনতা স্বাধীনতা সংগ্রামে অবিচল থাকার শপথ নিল। কৃষক-শ্রমিক সমাজও উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, সমবেতভাবে নিয়োজিত হয় আন্দোলনে সংগঠনে। গভর্নর-জেনারেল রিডিং অসহযোগ-আন্দোলন দমন করতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে, নিরস্ত্র ভারতবাসীর উপর নির্মমভাবে গুলি ও লাঠি চালনা করে। ১৯২১ সনের শেষে বিশ হাজার স্বরাজ-আন্দোলকারীদের কারারুদ্ধ করা হয়। বন্দি করা হয় মহাত্মা গান্ধী ছাড়া অধিকাংশ প্রধান নেতাদের। সন্ত্রস্ত ব্রিটিশ সরকার আপসের প্রস্তাব দিলে, গান্ধী তাতে অসম্মত হন।

একুশ সাল অতিক্রান্ত হলেও 'স্বরাজ' এল না। তৎসত্ত্বেও অনড়, অটল দেশের মনোবল। আহমদাবাদ কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীকে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্বের সর্বময় ক্ষমতা অর্পণ করা হল। মহাত্মা গান্ধী গভর্নর-জেনারেলকে জানিয়ে দিলেন : সাত দিনের মধ্যে যদি বন্দি সত্যাগ্রহীদের মুক্ত না করা হয়, তাহলে দেশবাসীকে রাজস্ব না দেওয়ার আহ্বান জানাবেন। উল্লেখযোগ্য, গান্ধী ইতঃপূর্বে দু দুবার বারদোলির আইন অমান্য আন্দোলন পিছিয়ে দিয়েছিলেন। যখন আবার তিনি বারদোলিতে আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখনি (৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২২) শোনা গেল গোরক্ষপুরের চৌরিচৌরায় জনতা থানায় আগুন লাগিয়ে বাইশজন পুলিশকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। যদিও চৌরিচৌরায় নেতা ভগবান আহিরকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করে ও থানার সম্মুখে সমবেত জনতার উপর গুলি চালিয়ে পুলিশ যথেষ্ট প্ররোচনা দিয়েছিল, তবু কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবীদের হিংসাত্মক কাজ বরদাস্ত করতে গান্ধী রাজি ছিলেন না। তখনই তিনি বারদোলি আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন। ১৯২২ এর ১২ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্কিং কমিটি গণ-সত্যাগ্রহ স্থগিত ঘোষণা করে। ব্রিটিশ সরকার মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেফতার করে ছয় বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের অবসান ঘটে।

মতিলাল নেহেরু, চিত্তরঞ্জন দাশ, লালা লাজপৎ রায়, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ আন্দোলন প্রত্যাহার করায় মহাত্মা গান্ধীকে তীব্রভাবে নিন্দা করেন। সুভাষচন্দ্র বসু আন্দোলন স্থগিতকে 'জাতীয় বিপর্যয়' হিসেবে চিহ্নিত করেন। রজনীপাম দত্তের ভাষায় 'যুদ্ধ শেষ। সমগ্র অভিযানও শেষ হয়ে গেল। পর্বত বাস্তবত মুষিক প্রসব করল'। এম. কে. গান্ধীর কারাদণ্ডের কেউ কোনো প্রতিবাদ করল না।

১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে অসহযোগ-আন্দোলন স্থগিত হলে, বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেকার সশস্ত্র বিপ্লবী কার্যকলাপ নতুন কৌশলে ভিন্ন রূপে পুনরায় শুরু হয়। বিপ্লবী মানবেন্দ্র রায়ের আদর্শে 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' গোষ্ঠী অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। ১৯২৪ সালের পরে ভারতীয় বিপ্লবীরা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে কারামুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহেরু প্রমুখ 'স্বরাজ্য দল'(১৯২৩) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী কারামুক্ত হন। অসহযোগ-আন্দোলনের সময় (১৯২০-২২ খ্রি.) স্বতন্ত্রভাবে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়। কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯২৫ সালে বাংলায় মুজফ্‌ফর আহমেদ ও কাজী নজরুল ইসলাম, হেমন্তকুমার সরকার কংগ্রেসের ভিতর 'শ্রমিক-স্বরাজ পার্টি' নামক একটি সংস্থা গঠন করেন। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হলে শ্রমিকদের মধ্যে নতুন চেতনার সৃষ্টি হয়। এ সময়ই অর্থাৎ ১৯২৭ সনে বাংলাসহ অন্যান্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কৃষক-মজদুর পার্টি'। উল্লেখযোগ্য যে, বিশ ও ত্রিশ-এর দশকে ভারতে সমাজতন্ত্রী আদর্শের সঞ্চার ঘটে, এবং তা দ্রুত তরুণ সমাজের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই আদর্শবাদের প্রতিভূ ছিলেন জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসু। কালক্রমে দুটি শক্তিশালী দলের উদ্ভব ঘটে—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সি পি আই) ও কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি (সি পি এস)। এরপর আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায় (১৯৩০-৩১), লবণ আইন ভঙ্গ করে ডাণ্ডি অভিযান (১৯৩০) দিয়ে শুরু এবং দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৩২-৩৪)। কংগ্রেস বেআইনি ঘোষিত হল ১৯৩১-এ। উৎস : ১. অমলেশ ত্রিপাঠী, ¯vaxbZv msMv‡g fvi‡Zi RvZxq Ks‡Mm (1885-1947), আনন্দ পাবলিশার্স : কলকাতা, দশম মুদ্রণ ১৪২০, পৃ.৯৬-১১১॥ ২. এ.আর.দেশাই, fviZxq RvZxqZvev‡`i mvgwRK cUfwg, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী : কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ ১৯৭৬॥ B.N. Pandey, The Break-up of British India, Macmillan & co. Ltd. : London 1969

চতুর্থ অধ্যায়

সমরেশ বসুর উপন্যাসে রাজনৈতিক জীবন ও তার রূপায়ণ

মধ্য পর্যায়

মানুষ শক্তির উৎস মহাকালের রথের ঘোড়া

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সমরেশ বসুর উপন্যাসে রাজনৈতিক জীবন ও তার রূপায়ণ

মধ্য পর্যায়

মানুষ শক্তির উৎস মহাকালের রথের ঘোড়া

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরবর্তী দু দশকে ভারতীয় শাসকরা প্রকৃত অর্থে শিল্পপতি, ভূস্বামী ও জমিদারদের স্বার্থকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়ায় জনসাধারণের জীবনমান হয়ে উঠেছিল নিম্নমুখী। অর্থনীতিতে ক্রম ঘনায়মান সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে বামপন্থী রাজনীতির প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পায়। এরই প্রতিক্রিয়ায় ১৯৫৯ সালে সংঘটিত খাদ্য আন্দোলনের পর উগ্র জাতীয়তাবাদী নেশায় ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ছাত্র ফেডারেশন দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়। অবশ্য চীন একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করার এক বছর পর ১৯৬৩ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর 'বন্দী মুক্তি ও গণদাবী প্রস্তুতি কমিটি'-র নামে এক জনসভা আহ্বান করা হয়। এতে সংবলিত হয় রাজবন্দীদের মুক্তি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দাবি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ১৯৬৪ সালে বামপন্থীদের নেতৃত্বে নতুন করে ছাত্র ফেডারেশন গড়ে তোলে। জ্যোতি বসু ও তাঁর অনুসারীরা রুশপন্থা অথবা চীনপন্থা কোনোটাই পুরোপুরি সমর্থন করেন না। সেই সময় এদের বলা হতো মধ্যপন্থী। পরিণামে ১৯৬৪ সালে সি পি আই ও সি পি আই এম—এ দু ভাগে পার্টি বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৬৪ সালে দ্বিতীয়বারের মতো কমিউনিস্টদের ব্যাপকভাবে বন্দির প্রতিবাদে তাদের ডাকে বন্‌ধ সংঘটিত হয়। ট্রাম শ্রমিকরাও ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৯৬৫ সালের ২৬ জুলাই যে আন্দোলন শুরু করে তাতে ছাত্রসমাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ১৯৬৬ সালে সরকারি সামন্তবাদী ভূমিনীতি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের জোতদার ও মজুতদারদের তোষণনির্ভর ভুল খাদ্য নীতির কারণে ছাত্র ফেডারেশন রক্ষণশীল ও র‍্যাডিক্যাল দু শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে।[১]

ভারতের জনগণের প্রধান শত্রু হল ১. মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ; ২. সোভিয়েত শোধনবাদ; ৩. জমিদার শ্রেণি এবং ৪. মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণি—এই চারটি শত্রুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উচ্ছেদের উপর জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য নির্ভরশীল। সংগ্রামের এই কাঠামো চীন বিপ্লবের পদ্ধতি অনুসারে রচিত হয় ও সশস্ত্র সংগ্রামকে বিপ্লবের সঠিক পথ বলে ঘোষণা করা হয় এবং সেহেতু জানানো হয় সংসদীয় নির্বাচন বয়কটের আহ্বান। কালক্রমে ১ মে ১৯৬৯ ঘোষিত হল তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টির যাত্রা। ২ মে মনুমেন্ট ময়দানে নকশালপন্থীদের আহূত সমাবেশে দুই দলের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। একদিকে যুক্তফ্রন্ট সমর্থক, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী এবং অন্যদিকে নকশালপন্থী কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে, ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা বিস্ফোরিত ও ইট নিক্ষিপ্ত হয়। সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে কলকাতার নানা এলাকায়। এমনি এক সংঘর্ষময় পরিবেশে 'লাল বই' হাতে কানু সান্যাল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন ভারতের কমিউনিস্ট

Dhaka University Institutional Repository

পার্টির (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) জন্মক্ষণ। ঘোষিত হয় : 'নকশালবাড়ির আগুন আজ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, এই সংগ্রামকে আজ নতুন স্তরে নিয়ে যেতে হবে।'[২]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, নকশাল বাড়ির আন্দোলন চীন, কানাডা, কোয়েবেক, ব্রিটেন, নেপাল প্রভৃতি দেশের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমর্থন আদায় করে নিয়েছিল। বিপ্লবী যুব সমাজকে সশস্ত্র সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করার জন্যই 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' এবং 'চীনের পথ আমাদের পথ', 'রাইফেল শক্তির উৎস' এসব শ্লোগানের তাৎপর্যকে রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল। চারু মজুমদার 'সত্তর দশক'কে মুক্তির দশক বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ব্যতিক্রমী। এই আহ্বান তীব্র বেগে সঞ্চারিত হল—ক্ষেতমজুর, গরিব ভূমিহীন কৃষক, মধ্যবিত্ত তারুণ্যদীপ্ত তরুণ-তরুণী, গণ আন্দোলনে উৎসাহী প্রৌঢ় এবং মোহমুক্ত তথাকথিত কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রবাহিনী, বুদ্ধিজীবী, লেখক, শিল্পী এবং অন্যান্য সকলের মধ্যে। সশস্ত্র আন্দোলনের ব্যাপকতা এতই তীব্র ছিল যে যুব সম্প্রদায় প্রকৃত অর্থেই নিজেরা সশস্ত্র হয়ে শত্রুপক্ষের মোকাবিলার জন্য নিজেদের চেতনাকেও সশস্ত্র করে তুলল। ওই সংগ্রামগুলিকে তারা আখ্যায়িত করলেন 'জঙ্গি কৃষক সংগ্রাম', 'সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম', 'শ্রেণিশত্রু খতমের সংগ্রাম', 'জনযুদ্ধ', 'রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াই' ইত্যাদি।[৩]

১৯৭২ সালের মধ্যেই পার্টির অভ্যন্তরে গুরুতর মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক মতপার্থক্য স্পষ্ট হতে শুরু করে। পার্টির প্রথম কংগ্রেসের পর আন্তঃপার্টি দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ দ্রুত সামনে চলে এল। বিভিন্ন নেতা আন্দোলনের পথ ও পদ্ধতি নিয়ে সরাসরি ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন, পেশ করলেন নিজ নিজ দলিল। সুশীতল রায়চৌধুরী, অসিত সেন, প্রমোদ সেনগুপ্ত, পরিমল দাশগুপ্ত, কানু সান্যাল, অসীম চট্টোপাধ্যায় এদের মধ্যে অন্যতম। গুরুতর মতাদর্শগত বিচ্যুতিতে পার্টির মধ্যে আন্তঃপার্টি সংঘাত অন্তর্ঘাতী হয়ে ওঠে। এ সকল ঘটনার সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ায় পার্টি বিভক্তির কাজ দ্রুততর হল। সরকারি সিআরপির সশস্ত্র আন্দোলন-দমন নিষ্ঠুর পীড়নমূলক রূপ নিল। এরই মাঝে ১৯৭২ সালের ২৮ জুলাই পার্টির অভ্যন্তরের ইনফরমারের তথ্যানুসারে চারু মজুমদার গ্রেফতার হন। এই ঘটনার পর পার্টির কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হল। শুধু ধনী হওয়ার কারণে কাউকে শ্রেণিশত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে তাকে খতম করার যে নীতি তারা গ্রহণ করেছিল তাতে বিপ্লবীরা ধীরে ধীরে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এ বিষয়টি পার্টিতেও ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয় এবং পার্টি বহুধাবিভক্ত হয়ে যায়। ফলত সিপিআই-এম এল অতঃপর পরিচালিত হতে শুরু করে কমপক্ষে ৩৩টি দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে।[৪] পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করলে কেন্দ্রীয় সরকারের দমননীতিতে হাজার হাজার বিপ্লবীকে কোনো প্রকার বিচার ছাড়াই পুলিশ গুলি করে বা থানায় এনে নির্মম অত্যাচারের পর হত্যা করে। ১৯৭২ সালের মধ্যে এ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

মতাদর্শগত ভাঙনের প্রতিক্রিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির বিচিত্র সংকট—দলীয় নীতি ও আদর্শের বহুধাবিভক্তি ষাট ও সত্তর দশকের রাজনৈতিক কালপর্বে ভারতব্যাপী যে আন্দোলনের পটভূমি সৃষ্টি করেছিল তারই প্রেক্ষাপটে সমরেশ বসু gvbl kw³i Drm[৫] ও gnvKv‡ji i‡_i †Nvov[৬] উপন্যাস রচনা করেন। 'সত্তর দশককে মুক্তির দশকে' পরিণত করার যে আহ্বান চারু মজুমদার জানিয়েছিলেন তা কলকাতার শাহরিক মধ্যবিত্ত তরুণসমাজসহ সারা ভারতের শ্রমজীবী শ্রেণিকে যে স্বপ্নময়তা ও স্বপ্নভঙ্গের পথে চালিত করেছিল সেই সমকালীন সত্যকে কেন্দ্রে রেখে ভারতবর্ষের এক উত্তুঙ্গ রাজনৈতিক পালাবদলকে বিশ্লেষণ করার মধ্যদিয়ে ঔপন্যাসিক রাইফেল নয়, মানুষই যে শক্তির উৎস—এ নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শন ও বিশ্বাসকে উপস্থাপন করেছেন আলোচ্য দুটো উপন্যাসে।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ শক্তির উৎস

উনিশশো ঊনসত্তর-বাহাত্তর সময় পরিসরে নকশালপন্থার সশস্ত্র বিপ্লব পশ্চিমবঙ্গের শহর এবং শহর কলকাতায় আন্তঃপার্টি সংঘাতসহ জোয়ারের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার, শ্লোগান 'রাইফেল শক্তির উৎস', 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' ইত্যাদি।[৭] নকশাল আন্দোলনের ভবিষ্যৎ-মুগ্ধ ষাটের দশকের বিপুল বেকার যুবক, শেষার্ধের ছাত্রসমাজের বিপ্লবী রক্ত-পটভূমির বিরুদ্ধ স্রোতে দাঁড়িয়ে সমরেশ বসু রচনা করেন রাইফেল-বন্দুক নয়, gvbl kw³i Drm। ওই সময়ের রাজনৈতিক কাঠামো-মুগ্ধতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া ছিল নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক। জীবন-পরিসর ও পরিস্থিতি কেবল নিষ্ক্রিয় দেখার বিষয় নয়, বাস্তবতা নতুন রূপে সত্য হয়ে ওঠে অভিজ্ঞতার সাহসী উচ্চারণে।[৮]

†গাপন আশ্রয়ে (আন্ডারগ্রাউন্ডে) চলে যাওয়া বিপ্লবী সুবীরের সঙ্গে দলীয় রণনীতি ও রণকৌশলের মতভেদের সূত্র ধরে নিজ দলের তরুণ সদস্য হিরণ, সম্ভাবনাময় সজলকে ভিন্ন চিন্তা প্রকাশের অপরাধে, শ্রেণিশত্রু বিবেচনায় হত্যা করে। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের 'সাধারণ মেয়ে', মূলত ধনাঢ্য মামার তত্ত্বাবধানে কলকাতায় বেড়ে-ওঠা সাতাশ বছরপ্রায় বয়সী যমুনা, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও বাস্তবতা সম্পর্কে অনাগ্রহী ও বিভ্রান্ত থাকলেও, সজলের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া তাকে রাজনীতি সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শেখায়। প্রকৃত অর্থে ষাট ও সত্তরের দশকের বিচিত্র গতিমুখী বিপ্লবী রাজনীতির 'জটিল কুটিল' ও হিংসাত্মক ভ্রান্তি সম্পর্কে যমুনা তার স্মৃতি ও অন্তর্কথনের সমবায়ে, সজলের নীতি-আদর্শকেই উপস্থাপন করেছে। সমরেশ বসু একই সঙ্গে সময়-দ্রষ্টা ও জীবন-ঘনিষ্ঠ বীক্ষক হিসেবে যমুনা অর্থাৎ বিন্দুকে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। নিকট থেকে দেখা রাজনীতির নির্মম রক্তাক্ত সন্ত্রাস বিন্দুকে ভিন্নতর স্থির এক বিশ্বাসে পৌঁছে দেয়। যার মাধ্যমে সমান্তরালভাবে ঔপন্যাসিকের আত্মদর্শন ও সময়দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে এ উপন্যাসে; যমুনার কাছে লেখা সজলের প্রতিটি চিঠিতে সমরেশ বসুর রাজনীতি ভাবনাও স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে। উল্লেখ বাঞ্ছনীয়, উপন্যাসের অন্তিম অভিজ্ঞতায় পরিশীলিত বিন্দুর ফিরে-দেখার মধ্যদিয়ে অন্তর্বয়িত হয়েছে gvbl kw³i Dr‡mর আখ্যান। বিন্দুর জীবনের অতীত কথার মাঝে সঞ্চারিত হয়েছে বর্তমান বোধ, বিশ্বাস, জীবনভাবনা। অন্যদিকে বিন্দুর অনেক আচরণ ও আবেগের বর্ণনা পরিণামী বোধের দ্বারা পরিমার্জিত ও সংযত হয়েছে। এখানে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক দ্বৈরথ লক্ষ করা যায়। উপন্যাসের শুরুতে যমুনার বিকাশক্রমের স্থলে অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বিন্দুর রাজনৈতিক বিশ্বাস দিয়ে শুরু হয়েছে। যমুনার বর্তমান ও স্মৃতির মধ্যে ঘটনা দ্রুত চলাচল করেছে।

gvbl kw³i Drm আখ্যানে দশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত যমুনা তথা বিন্দুর হয়ে-ওঠার কথকতা; এগারো-বারো পরিচ্ছেদে প্রতিপাদিত হয়েছে ঔপন্যাসিকের জীবন-রাজনীতি-বাস্তবতা সংক্রান্ত তত্ত্ব-তর্ক-ক্রোধ-ঘৃণা-আন্তঃপার্টি সংঘাত ও সজল-হত্যা।

উপন্যাসে ব্যবহৃত সময়ক্রম অনুসারে প্রথম দশটি পরিচ্ছেদের আলোচনা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। স্মরণীয়, এসব পর্যায়ে যমুনার স্মৃতিভাবনায় সঞ্চারিত হয়েছে অন্তিম দুই পরিচ্ছেদের বিন্দুর পরিণত জীবননীতি-রাজনীতি-ইতিহাস ও সমাজভাবনার একগুচ্ছ বিচ্ছুরণ। যেমন কয়েকটি :

ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, এখন একজন মহিলা। সেক্যুলার, ডেমোক্রাটিক ইত্যাদি যে সব নামে এই বিশাল দেশকে ভূষিত করা হয়, সে সবের সত্যতা আমার কাছে কিছু নেই—বিশেষ করে যখন ডেমোক্রাটিক বলা হয়, তখন মিথ্যাটা আরও বড় মনে হয়। অমিতদার কথা মনে পড়ছে, অমিতাভ চৌধুরী, আমাকে একদিন বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষ ডেমোক্রাটিক দেশ নয়—এটা আদৌ সত্যি না। তোমরা যেখানে যে অবস্থায় খুশি এই সরকারের সমালোচনা করতে পারো, প্রধানমন্ত্রীর

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতা, বৈভব ইত্যাদি নিয়ে খোলা ময়দানে অভিযোগ করতে পারো এবং এই যে সব কথা বলতে পারছ, তুমি এটাকে ডেমোক্রাটিক দেশ বলে মানো না, এ সবই প্রমাণ করে, এটা ডেমোক্রাটিক দেশ। পৃথিবীতে এমন রাষ্ট্রও আছে, যে-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রব্যবস্থা বা তার নেতাদের সমালোচনা করলেই, তোমাকে কোতল করে দেওয়া হবে, না হয় শাস্তি পেতে হবে।' (mg‡ik em iPbvej x ॥ এক ॥ পৃ.৯১)

অমিতাভ চৌধুরীর এ কথা ভারতের প্রেক্ষাপটে এগারো-বারো পরিচ্ছেদের পুনর্জাত ছাব্বিশ বছর অতিক্রান্ত যমুনা সত্য বলে মানতে পারেনি। তার মনে হয়েছে :

ওঁর ইঙ্গিতটা বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি। ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার তাই নিয়ম। ফ্যাসিস্ট না হয়েও, সে রকম ব্যবস্থা থাকতে পারে। কেউ যদি বলে, যেখানে কোটি কোটি মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র চলছে, সেখানে রাষ্ট্রব্যবস্থার সমালোচনা মানেই, কোটি কোটি মানুষের স্বার্থের হানি, অতএব সমালোচনা বন্ধ। মুখে কুলুপ এঁটে রাখো। সেক্ষেত্রে সেটাকে আমি অন্যায় মনে করব কেন। কোটির জন্য মুখ বন্ধ আর গোটির জন্য মুখ বন্ধ, দুইয়ের মধ্যে অনেক তফাত আছে। যদিও এই 'মুখ বন্ধ' কথাটার মধ্যে আমি যেন কেমন পাপের গন্ধ পাই। অনেকটা আবছায়া অন্ধকারে উদ্যত ফণা তোলা সাপের মতো। সব ক্ষেত্রেই মুখ বন্ধ না করলে কি চলে না? মুখ বন্ধ কি কোথাও শেষরক্ষা করতে পারে। (॥ এক ॥ পৃ.৯১)

কিন্তু যমুনার কাছে শুধু বাক্‌স্বাধীনতাকেই প্রকৃত স্বাধীনতা মনে হয় না, কিংবা এটিকে 'ডেমোক্রাসি' বলেও মানতে চায় না সে। সকলের মুখে মুখেই নিন্দা ও ধিক্কারপূর্ণ ছিল, দিল্লির তুলনায়, সত্তরের দশকের কলকাতা। কিন্তু যমুনা 'পার্লামেন্ট, মন্ত্রী, এমপি-সরকারি বড় বড় কর্মচারীদের শহরকে' স্বর্গরাজ্য বলে মানেনি। বরং তার কাছে দিল্লি ছিল 'স্বার্থ আর চক্রান্তের শহর' ও 'নারীঘাতী শিশুঘাতী' শহর। সজলের কাছে যেটি ছিল 'নির্বীর্য মৌমাছিদের শহর'।

যমুনার উপলব্ধি ছিল "জীবনের জন্যই রাজনীতির প্রয়োজন।"(পৃ.৯২) কিন্তু সজলের রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডের অভিজ্ঞতায় সে বুঝতে পারে বর্তমান রাজনীতি জীবনকে শুধু প্লাবনের মতো উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে। তাই "তার চোখে অন্ধকার, দৃষ্টি ঝাপসা।" (পৃ.৯২) রাজনীতির কথা ভাবতে না চাইলেও জীবনের সঙ্গে এটা এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছে যে বিন্দু তার বৃত্ত থেকে বেরোতে পারবে না :

আহ্, আবার রাজনীতি। আবার আমি রাজনীতির কথা ভাবছি? রাজনীতি আমার সবই নিয়েছে, সবকিছু নিয়ে আমাকে এইখানে ফেলে রেখে গিয়েছে, যেখানে বসে আজ আমাকে শুরুর কথা ভাবতে হচ্ছে। আজ এই প্রথম, নিজের দিকে ফিরে তাকাবার সময় হল। নিজেকে খুঁজে দেখবার সময় হল। কিন্তু রাজনীতির কথা বোধ হয় ভোলা যায় না। রাজনীতি তো ঈশ্বরের স্থান দখল করেনি। ঈশ্বরকে ভোলা যায়। ঈশ্বরকে না-ও মানা যায়। কিন্তু মৃত্যুকে? রাজনীতি যেন রবীন্দ্রনাথের 'রাহুর প্রেম'-এর মতো। ভুলে থাকতে চাইলেও, তাকে ভুলে থাকা যায় না। নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। সে অমোঘ, অপ্রতিরোধ্য। আমার সমস্ত কিছুর মধ্যে সে আছে। আমি চাই বা না চাই, কী এল গেল! অথচ চেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম, জীবনের জন্যই রাজনীতির প্রয়োজন। কিন্তু সে কোন রাজনীতি, যা জীবনকে প্লাবনের মতো ভরে তুলবে! আমার চোখে অন্ধকার, দৃষ্টি ঝাপসা। সেই রাজনীতি আমি দেখতে পাই না। (॥ এক ॥ পৃ.৯২)

নারী-পুরুষের দাম্পত্য-সম্পর্কের বিশ্লেষণে বিন্দুর উপন্যাস-শেষের অভিজ্ঞতা ও অভিমত যুক্ত হয়েছে প্রথম পরিচ্ছেদে। মস্তিষ্কের উল্লম্ফনধর্মী সময় ব্যবহারে সমরেশ বসু তা বিন্যাস করেছেন :

অধীনতা? তা-ই বা মন্দ কী। সে অধীনতা তো আর শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা নয়। তার মধ্যে মান-অভিমানের কোনও প্রশ্ন নেই। বিদ্রোহেরও কোনো কথা নেই। আমার তো ধারণা, অধীনতার মধ্যেও শান্তি আছে। এমনকী বোধ হয় সুখও আছে। আমি যদি অধীন হতে পারি, আমাকে কেউ যদি অধীন করতে পারে, তার চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে। সামাজিক বিচার বিশ্লেষণ, তত্ত্ব তর্কে যাই হোক, মেয়ে পুরুষের মধ্যে যদি কোনও বিরোধ হয়, বিবাদ হয়, তা কখনও মজুর-মালিকের লড়াই না।...সমস্যা বাইরের না, ভিতরের। আইন বা আইন সভা করে তার কোনও নিরসন হতে পারে না। মূল সমস্যা, নারী আর পুরুষ, তাদের দুজনের মধ্যে নিরসন করতে পারে। (॥ এক ॥ পৃ.৯২)

Dhaka University Institutional Repository

যমুনার বান্ধবী লীলা "যার কোনও বাছ বিচার নেই ছেলে হলেই হল", যার "শরীরটা হল একটা নর্দমা" তার নৈতিকতা, স্বেচ্ছাচারিতা "ভোলাপচুয়াস" মানসিকতা সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে যমুনা তার মূল্যবোধের কথা বলেছে। লীনা তার সীতামাসির জন্য গর্বিত। মাসিমুগ্ধ লীনার ভাষ্য : সীতামাসি একটি রাজনৈতিক দলের নেত্রীস্থানীয়। স্কুল থেকেই রাজনীতি করেন। তারপর কলেজে। ইলেকশনে দাঁড়ান, প্রতিবারই এম এল এ নির্বাচিত হন। সীতামাসির রাজনীতি-তত্ত্ব হল, "আগুন, সীতামাসি তখন ছিল আগুন। ছেলেরা সব বাদলা পোকা। কোনও ছেলেকেই সীতামাসি বাদ দিত না। যাকে ভাল লাগত তাকেই...।" বিন্দুর কথায়, নকশালপন্থী বিপ্লবী হরিশদা হেসে বলেন, "সীতাকে দেখে আমরা সকলেই কম-বেশি মজেছিলাম।" (॥ এক ॥ পৃ.৯৪)

এসব স্মৃতি প্রসঙ্গে যমুনা নরনারীর শরীরী সম্পর্ক, 'সতীত্ব' ইত্যাদি বিষয়ে কিছু অভিমত দিয়েছে, চতুর্থ পরিচ্ছেদে তেরো বছর বয়সের স্মৃতিকথার পূর্বেই :

আইন আর নীতি, নারী-পুরুষের প্রকৃত অর্থের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও কাজ করে না।
কিন্তু এত কথা ভাবছি কেন। আসলে আমি বলতে চাইছি মনের শুচিতায় আমি বিশ্বাস করি। শরীরের স্বাস্থ্যে এবং পরিচ্ছন্নতায়। ঘৃণা করি ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে। স্বেচ্ছাচারিতাকে নিন্দা করি। কিন্তু 'সতীত্ব' নাম দিয়ে, দেহের যে-শুচিতার কথা বলা হয়, তার কোনও অর্থ নেই। সব মেয়েই জানে, তাদের শরীরটা চোর চোর খেলার সামগ্রী না, ছুঁয়ে দিলেই চোর! আমি সাধারণ একটি মেয়ে, নিতান্ত একটি মেয়ে, শরীর নিয়ে স্বর্গবাসের ভাবনা ভাবি না। (॥ এক ॥ পৃ.৯৪-৯৫)

gvbl kw³i Dr‡mর দুই পরিচ্ছেদে সজল খুন হওয়ার পর যমুনার কক্ষে বিপ্লবী সুবীরের ভীতিকর আকস্মিক উপস্থিতি এবং তার কথোপকথনে প্রকাশ পায় আপাত নিরাসক্ত যমুনার স্তব্ধ তীব্র নিরাসক্তি, ঘৃণা ও ক্ষোভ। এক কালের "খাপ থেকে খোলা ছুরির ঝিলিকের মতো" বিপ্লবী সুবীর-মুগ্ধ যমুনা জানত আজ কেন সে এসেছে। সুবীর বলেছিল, "তোমার কাছে দুটো রিভলবার রয়েছে। ও দুটো আমাকে দিয়ে দাও।" (পৃ.১০০) অপর দিকে, তৃতীয় পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত হয়েছে, সজল হত্যার কারণ হিসেবে যমুনার প্রতি রমুর উচ্চারিত 'য়ু আর অলসো রেসপনসেবল' অভিযোগ। রমু জানিয়েছিল :

'হ্যাঁ, ' রমুদা বলল, 'একা, সজলকে ভীষণ একা একা মনে হয়েছে আমার। যমুনা, এমনকী এ কথাও আমার মনে হয়েছে, তুইও আর ওর সঙ্গে নেই, তুইও দূরে চলে গেছিস।'...'সজলকে দেখে মনে হত, ও যাদের সঙ্গে আছে, তাদের সঙ্গে থেকেও যেন আলাদা। যমুনা, তুই সজলকে ভালবাসিস, আমিও সজলকে ভালবাসি। তবে আমার ভালবাসা...চলি'।
না, এভাবে নিজেকে দেখব না। এ ভাবে নিজেকে টুকরো টুকরো কথায় আর জিজ্ঞাসায় ভাসিয়ে দেব না। পিছন থেকে দেখি, দেখতে দেখতে আসি। কোনও দিন নিজের জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে ভাবিনি। মুখোমুখি একবার নিজেকে দেখি। সব কথার জবাব সেখানে আছে। (॥ তিন ॥ পৃ.১০৫-০৬)

যমুনার অন্তর্কথন, স্মৃতিচারণ ও আত্মবিশ্লেষণের শুরু মূলত পরিচ্ছেদ চার থেকে। মূল্যবোধের সংকট সম্পর্কিত এই স্মৃতিকথন শেষ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। কয়লার গোলা ও সংলগ্ন ছোট স্টেশনারি দোকানের মালিক যমুনার বাবা নবীনবাবু কীভাবে কৃষ্ণনগরে দ্বিতল বাড়ির মালিক হলেন সে প্রশ্ন তাকে বিদ্ধ করেছে। রাজনীতিবিদ ও মন্ত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত, কংগ্রেসপন্থী অনঙ্গবাবুর স্তাবক, সহযোগী ও অনুচর তার বাবার হাতে কীভাবে সরকার ও জনসাধারণের ছ'লক্ষ টাকা তছরুপের ভাগ এসেছিল, যমুনা তা আজ ভাবতে থাকে। অথচ এখন সেই... "অনঙ্গবাবু কলকাতায় কোনও আত্মীয়-বাড়িতে, নিতান্ত অভাবের মধ্যে বাস করছেন। শুনেছি, সামান্য কিছুদিনের জন্য তাঁকে হাজতবাসও করতে হয়েছিল।...কৃষ্ণনগর শহরের বাড়ির কথা বলছি। খুশি হয়েছি। কিন্তু পাপবোধ? কই, কখনও তো সে রকম কিছু বোধ করিনি।" (॥ চার ॥ পৃ.১১০-১১)

Dhaka University Institutional Repository

যমুনার অন্তর্গত প্রশ্ন, বাবা কি এখন ক্লেদক্লিষ্ট অনঙ্গবাবুর কথা ভাবেন? সমাজ-পরিবারকে, আদর্শ ও মূল্যবোধকে অতঃপর যমুনা মনোকথনে জেরা করেছে :

আমার বাবার কথা তো আগেই বলেছি। বাবারা সবসময়ে সজ্জনই হয়ে থাকেন, এটাই চিরদিনের বিশ্বাস। কিন্তু বাবারাও অসাধু হন। জীবনের কোনও কিছুই অঙ্কে মেলে না। যা সত্যি আর বাস্তব বলে প্রচলিত, তার সঙ্গেও সব মিলিয়ে নিতে পারিনি। কিন্তু তথাকথিত বাস্তবের সংজ্ঞাটা মেনে নিতে পারি না। বাস্তবের কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। একজনের বাস্তব, আর একজনের কাছে অবাস্তব। কোনটা কার ক্ষেত্রে বাস্তব, সেটা তার জীবনের গতিই নির্ণয় করে।

আর মূল্যবোধ? যারা মূল্যবোধের পরিবর্তনের কথা বিশ্বাস করে না, তাদের চোখের সামনে সারা দেশটাই তো পড়ে আছে। তারাই চেয়ে দেখুক, কোথায় তাদের সেই পুরনো মূল্যবোধ বজায় আছে। তারা নিজেরাই বা কতটুকু রাখতে পারছে। (॥ ছয়॥ পৃ.১২৫)

"এঁদো পাড়াগাঁয়ের মেয়ে" যমুনার জীবনভাবনার রূপরূপান্তর শনাক্ত করতে ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু তার স্মৃতির টানাপোড়েনকে ব্যবহার করেছেন সময়ের বলয়িত প্রতিস্রোতে। যেমন, আর একটি দূরসঞ্চারী স্মৃতি। বিন্দুদের বাড়ির পশ্চাতে রায়েদের পুকুরের পাশে বিশাল বাগানঘেরা পুরনো রায়বাড়ি। বাবার বয়সীপ্রায় সুদেব রায় তেরো বছরের কন্যাপ্রতিম বিন্দুকে প্রতারণা করে অপরাহ্নে স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে বাসায় ডেকে নিয়ে যখন ভোগোন্মত্ত, সেই তেরো বছরের বিন্দুর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা :

একটা মুহূর্তের ভয় আর বিভ্রান্তি। আমি সুদেব রায়ের দু হাতের মধ্যে নিষ্পিষ্ট। ওটাকে আমি কীসের মুখ বলব জানি না। একটা কালো মুখের বীভৎস হাঁ আমার মুখের উপর নেমে এসেছিল। কোনও শব্দ করতে পারছিলাম না। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল।...

কতক্ষণ সে অবস্থায় কেটেছিল, আমি হিসাব করতে পারিনি। হয়তো সময়ের হিসাবে দু-এক মিনিট, আমার কাছে অশেষ। তবু এক সময় কঠিন আক্রমণ শিথিল করতে পেরেছিলাম, প্রথমেই ডেকে উঠেছিলাম, 'কাকিমা!'...

দরজা অবধি পৌঁছতে পারিনি, আবার আক্রান্ত হয়েছিলাম। আক্রমণের লক্ষ্যস্থল স্থির ছিল। আমি কখন কামড়াতে খামচাতে আরম্ভ করেছিলাম।...তবু নিজেকে মুক্ত করতে পারছিলাম না। তারপরে হঠাৎ কী হয়েছিল জানি না। হঠাৎ দলন শিথিল হয়েছিল। একটা ধাক্কা মারতেই, সুদেব রায় সরে দাঁড়িয়েছিল। লোকটার মুখের তখনকার অভিব্যক্তি, আমি বর্ণনা করতে পারি না।...আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে, উঠোন পেরিয়ে ছুটেছিলাম। (॥ ছয়॥ পৃ.১২৮-২৯)

দশ দিনের আতঙ্ক-জ্বর ভোগের পর ক্রমশ শারীরিকভাবে সুস্থ হয়ে ওঠে বিন্দু। কিন্তু 'একটা পাপবোধ'ও সেদিন বিন্দুর মনস্তত্ত্বে উপ্ত হয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছিল। এমনি সব স্মৃতিচূর্ণের রসায়নে, নব নব সংকটে, জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা-সন্ধানে, চেতনার অবচেতনার রুদ্ধ ঊর্ধ্বচাপে সতীত্ব, নর-নারীর সম্পর্ক এবং শরীরী শুচিতা সম্পর্কে যমুনার ভিন্নতর জীবনদর্শন গড়ে উঠেছিল।

মামা রমেশ নিজের পরিশ্রম ও বুদ্ধিকৌশলে আজ কারখানার মালিক, উচ্চবিত্ত শ্রেণিস্তরে উন্নীত। তিনি কন্যাসন্তানের শূন্যতা পূরণের জন্য বোন রুণুর ছয় সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কন্যা তেরো বছর বয়সী বিন্দুকে কলকাতার বাড়িতে নিয়ে আসেন শ্রাবণের প্রবল বর্ষণের জলজটের মাঝে। যমুনার মনোকথন প্রতিরূপকী বর্ণন অনুসরণীয় :

'...ভালই হয়েছে। শ্রাবণে তোর জন্ম , শ্রাবণেই কলকাতায় এলি। সেইজন্যই এত বৃষ্টি।'

আজ মনে হচ্ছে, মামার সেই কথার মধ্যে যেন একটা ইঙ্গিত ছিল। পূর্ণ তেরো বছরে, শ্রাবণ মাসে, কলকাতায় আমার আর এক নতুন জন্ম হচ্ছিল। দুরন্ত বৃষ্টিতে কলকাতা ডুবছিল; আমি কলকাতায় ঢুকছিলাম। কিন্তু কলকাতা ডোবে না। কলকাতা ডোবে আবার ভাসে। কলকাতা আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, সেই ইঙ্গিতই ছিল, ভেসে যাওয়া কলকাতায়। (॥ পাঁচ॥ পৃ.১২২)

Dhaka University Institutional Repository

আত্মজার মতো বিন্দু প্রতিপালিত হতে থাকে কলকাতায়, মামা-মামির দুই পুত্র—রমু, দীপুসহ—উচ্চবিত্ত এক পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিবেশে। কলকাতা আসার পরপরই রমুর আচরণিক কারণে অন্তর্সংঘাত সৃষ্টি হয়। ১৫ বছরের রমুদা, তেরো বছরের সদ্য মফস্বল আগত বিন্দুকে 'আয় তোকে একটু আদর করে দিই', বলেই রমু সরল মনে প্রকাশ্যে চুমু খায়। ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে বিন্দু, তীব্র প্রতিবাদ জানায়। সবকিছুর মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ স্বগত ভাবনায় ব্যাখ্যা করেছে বিন্দু পরিচ্ছেদ ছয়-এ :

সেই ঘটনার পরে, মনে মনে হিংস্র হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু সেই শক্ত আড়ষ্টতা আর হিংস্রতার মধ্যে, আমার পাপবোধও লুকিয়েছিল। সেই জন্যই, সহজ হতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। রমুদা কী করে বুঝবে, কলকাতার প্রথম দিনের আদরে, কেন আমি ও রকম ব্যবহার করেছিলাম। শরীরের শুচিতা বলতে, তখন আমি অন্য রকম বুঝি। রমুদার চুমো আমাকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল, সুদেব রায়ের কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছিল। (॥ ছয় ॥ পৃ.১৩০)

রমু ফার্স্ট ডিভিশনে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করায় বাড়িতে আয়োজিত ভোজ, উৎসবেই সজল, মিহির, বিপ্লব, শ্যামল, মিহিরের বোন রাখী, শ্যামলের বোন ঋতার সঙ্গে যমুনার পরিচয় হয়। তাদের কেউই রাজনীতি সংশ্লিষ্ট ছিল না। কেউ উচ্চবিত্ত পরিবারের মেমসাহেবি জীবনাচরণে অভ্যস্ত (রাখী), কেউ বান্ধবীর সঙ্গে গল্পে মেতে থাকতে ভালোবাসে (রমু-বীথি, দীপু-দীপা), কেউ ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেট খায় (রমু-রাখী) সতেরো বছর বয়সের মধ্যেই স্কচ, হুইস্কির স্বাদ নেয়ার কৌতূহল বোধ করে (রমু)। কেউ উদ্দাম গতিময়তায় ইংরেজি রেকর্ডের সুরে 'টুইস্ট' নাচে (সজল-রাখী)। স্কুলে পড়াশোনা করে, উৎফুল্লকর অকিঞ্চিৎকর গল্প করে, গান করে, সিনেমা দেখে এবং হাসি-ঠাট্টা-রসিকতা ও প্রাণচঞ্চল আনন্দে ভেসে যায় তাদের জীবন।

প্রকৃতপক্ষে gvbl k¦³i Dr‡mর আট পরিচ্ছেদেই সজলের সপ্রতিভ উপস্থিতি ঘটেছে। তখন যমুনার বয়স সতেরো। রমুর কাছ থেকে আগেই সজল যমুনা সম্পর্কে জেনেছে। প্রাণবন্ত সজলের উপস্থিতি যমুনাকে তার প্রতি মনোযোগী করে তোলে। নিচের অংশটি লক্ষণীয় :

সজল রমুদার থেকে মাথায় আর একটু লম্বা। মাখন রঙের ট্রাউজার, পায়ে নতুন ধরনের কাবলি, আগে এ রকম কখনও দেখিনি, গায়ে শার্টের রং অনেকটা ঋতার শাড়ির [সরষে ফুল রঙের] মতো। গায়ের রং শ্যাম, চোখ দুটো বেশ বড়, নাকটা টিকোলো। মুখে মেয়েলি ছাপ আছে। চুলের সিঁথি প্রায় দেখা যায় না, দু পাশ থেকে টেনে তুলে দিয়েছে। কুচকুচে কালো চুল খুব কোঁচকানো নয় বটে, কিন্তু কোঁচকানো। চোখের তারা দুটোও খুব কালো। এখনও ওর গোঁফ রমুদার মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। (॥ আট ॥ পৃ.১৩৮)

রমুর কাছে অধ্যয়ন-উজ্জ্বল সজল ছিল 'দারুণ উইটি স্মার্ট হাসিখুশি'। সে দুষ্টুমি ফাজলামি কিংবা যমুনাকে নিয়ে খুনসুটিতেও যেমন পারদর্শী, তেমনি বন্ধু বিপ্লবের অনুরোধে আবেগঘন কণ্ঠে ইংরেজি রেকর্ডের সুরে 'ও মাই গ্রিন ভার্জিন আইল্যান্ড' কিংবা ঋতার অনুরোধে রবীন্দ্রনাথের 'বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিলে...' গান গেয়ে মুগ্ধতার মোহ বিস্তারেও ছিল অসাধারণ সক্ষম। শহর কলকাতার ধনবাদী সংস্কৃতির ভোগ-উল্লাস, বৈচিত্র্য এবং বৈভব ভাসিয়ে নিচ্ছিল তাদের জীবন।

এভাবেই তিন বছর অতিক্রান্ত হয়। কিন্তু শুধু লেখাপড়া ও নিজেদের আড্ডা-রসিকতাপূর্ণ একঘেয়ে জীবনে জাতীয় ও ছাত্র রাজনীতির অনিবার্য অভিঘাত তাদেরকে শেষ পর্যন্ত পাল্টে দিয়েছে। ঋতা ছাড়া অন্য বন্ধুরা কলেজ স্ট্রিটের কলেজে ভর্তি হয়। সেখানেই ফিজিক্সে অনার্স পড়ে সজল। যমুনা ভর্তি হয় মেয়েদের কলেজে। রমুদা জোর করেই তাকে মাঝেমাঝে কফি হাউসের আড্ডায় নিয়ে যায়। নীতি ও

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শগত পার্থক্যের কারণে তৎকালে ছাত্র-রাজনীতি হয়ে পড়ে বহুখণ্ডিত। মেয়েদের কলেজে ছাত্র-রাজনীতি তীব্রভাবে না হলেও, ছেলেদের সব কলেজে তেমনটিই হয়। কিন্তু যমুনা সে সব নিয়ে না ভাবলেও দর্শক হিসেবে এ অভিজ্ঞতার বৃত্তে তাকে আবর্তিত হতেই হয়।

এমন তরুণ-তরুণী তখন খুব কমই দেখা যেত যারা রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল না। তবে যারা দূরে থাকত তারাও ছিল রাজনীতি সচেতন। কিন্তু প্রচলিত তত্ত্বজীর্ণ রাজনীতির ছকে চলতে চায়নি বলেই তারা হয়ে পড়েছিল বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ ও বিবরবাসী। সুস্থ জীবনবোধ কিংবা মূল্যবোধ ধারণ করে নিজেদেরকে পরিচালিত করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। উপন্যাসে রমু চরিত্র তার প্রতিনিধি। আন্তঃপার্টির সংঘাত ও রণকৌশল সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করায় বিচ্ছিন্ন ও সঙ্গহীন হয়ে পড়ছিল সজল। সজলের বিচ্ছিন্নতাবোধের কারণ অনুসন্ধানে রমু ব্যর্থ হয়নি। যমুনার কাছে সে তা প্রকাশ করেছে সুবীরের কক্ষ ত্যাগের পর, কথোপকথন সূত্রে :

আস্তে আস্তে সজলকে অন্যরকম হয়ে যেতে দেখলাম। ওর কথা শুনে, আর ওকে দেখে, ওসব কথা আমার মনে হয়েছে। আমি ভাই জানি না, "একাকিত্ব" কথাটা তোদের অভিধানে প্রতিক্রিয়াশীল কি না। আমি অবিশ্যি একা হতে ভয় পাই, ব্যাপারটা আমাকে ভীষণ হন্ট করে, সেইজন্য আমি কেবল সঙ্গী খুঁজে বেড়াই। ভাল পাই কি মন্দ পাই, তার কোনও বিচার আমি করি না। তবু মনে হয়, আমাকে যেন একটা রাক্ষস তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমি আর সজল অনেক তফাত। আমার মনে হয়েছিল, সজল নিজেকে বড় একা মনে করছে, ও ভীষণ একা হয়ে গেছে।

'...যমুনা, এমনকী এ কথাও আমার মনে হয়েছে, তুইও আর ওর সঙ্গে নেই, তুইও দূরে চলে গেছিস।' (॥ তিন॥ পৃ.১০৫)

একথা শুনে যমুনার মাঝে প্রতিবাদের পরিবর্তে 'একটা সংশয় আর সন্দেহ জেগে উঠল।' "রমুদা আবার বলল, 'সজলের আর আমাদের লোনলিনেস আলাদা। আমরা সাধারণ মানুষ। আমি মনে করি, সব মানুষই একা। কিন্তু সেটাকে ভুলে থাকবার জন্য, আমরা কত কী করি, কেবল উত্তেজনা খুঁজে বেড়াই। আর রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে' সে গানটার তো আর কোনও অর্থই নেই। বরং একটু বদলে দিয়ে, এ রকম গাইলেই ভাল হয়, 'তবে দলকে চলো রে।' কারণ রবি ঠাকুরের 'একলা' আদর্শের কথা, দলও আদর্শের কথা। এখন আর কেউ একলা চলার কথা বলে না, দলে চলার কথা বলে। সজলও আদর্শবাদী, সেটাই ওর সমস্যা।" (পৃ.১০৬) যমুনার কাছে রমুর 'দলকে চলো রে' কথাকে 'রাগ আর বিদ্রূপ' মেশানো মনে হয়।

কিন্তু রমুর বিচ্ছিন্নতাবোধ ভিন্নমাত্রিক। সে নিঃসঙ্গ হতে ভয় পায়। এজন্য ড্রিংক করে, ভালোবাসার অর্থ না খুঁজে পেয়ে আজকাল বহু-আসক্ত, ভালোমন্দ নির্বিচারে নারী সঙ্গী খুঁজে বেড়ায়। কেমিস্ট্রিতে বিএসসি পাশ করে বাবার ব্যবসায় আকৃষ্ট হলেও রমু বহির্মুখীই রয়ে যায়। গাম্ভীর্য ও বিরক্তি নিয়ে বাইরের মানুষের মতো সে আগন্তুক, অচেনা হয়ে যায় পরিবারে। লেখাপড়া ছেড়ে-দেয়া বান্ধবী ঋতার সঙ্গে বাইরেই দেখা হয়। ঋতাও ভিন্ন জগতের বাসিন্দা হয়ে বহু-আসক্ত হয়ে যায়। দীপুর কাছে এসবই 'বুর্জোয়া ভাইসেস'। রমুদার এ জীবনাচরণ দেখে ছোটো ভাই দীপুর কাছে সে হয়ে ওঠে 'অধঃপতিত জেনারেশনের প্রতিনিধি'। এভাবে বেকারত্ব, রাজনীতি, বিপ্লব, আন্তঃপার্টি সংঘর্ষ, বিপ্লবের বিচিত্র রণনীতির সংঘাত হতাশাক্রান্ত এক প্রজন্মের বিস্তার ঘটায়।

বিএসসি পাশ করে শিবপুরে এঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হয়েছে সজল। তারপরও তিন বছরে সজল অনেকবার এসেছে কলকাতায়। রাখী ইংরেজিতে এম.এ., মিহির ডাক্তারি পড়ছে। শ্যামল, বিপ্লব লেখাপড়ার চেয়ে রাজনীতিতে বেশি সক্রিয় হওয়ার কারণে ফেল করলেও এখনও কলেজে। দীপু এম.কম.পড়ার পাশাপাশি রাজনীতি করছে। যমুনা বাংলা নিয়ে এম.এ. পড়া শুরু করে। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না

Dhaka University Institutional Repository

হলেও কলেজজীবন ও বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা সূত্রে তার রাজনীতিসচেতনতা তৈরি হয়। নয় পরিচ্ছেদ থেকে ঔপন্যাসিক 'আখ্যান'-এর অভিমুখ তৎকালীন রাজনৈতিক বিভ্রান্ত, উত্তেজক, তর্কক্ষুব্ধ পরিসরে ঘুরিয়ে দিলেন, ধীরে ধীরে। এই পরিচ্ছেদে যমুনার মনোকথন :

আমাদের কলেজে সে রকম রাজনীতি হয় না। ছেলেদের সব কলেজেই হয়।...তবে সকলেই বামপন্থী। তার মধ্যে ভাগাভাগি আছে। বিপ্লব ও শ্যামল যে পার্টির সঙ্গে আছে, দীপু সেই পার্টিতে নেই। ওদের মধ্যে প্রায়ই তর্কাতর্কি হয়। তর্কের মধ্যে আর ছাত্র-রাজনীতি থাকে না। পার্টি-নীতি নিয়েই কথা হয়। পার্টি নেতাদের নিয়েই কথা হয়। আর পার্টি-নীতি এবং কৌশল। সকলের দাবি, তাদের পার্টি-নীতি এবং নেতারাই সঠিক। (॥ নয় ॥ পৃ.১৪৫)

রাজনীতি চিন্তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রণয়ভাবনা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে যমুনার চেতন-অবচেতনের ঘূর্ণি-স্রোত; বলয়িত হয় বিহ্বলতা, বিবেচনাহীন ক্ষুব্ধতা। নির্জনপ্রায় বাসায় অঝোর বৃষ্টিমুখর পরিবেশে যমুনা পড়ছিল রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'। সজল বৃষ্টিভেজা ঠাণ্ডাহাত ওর দুই গালে চেপে ধরে। উদ্ধৃতি লক্ষণীয় :

রাগে আমার গায়ে আগুন ধরে গেল। আমি গলা তুলে ঝেঁঝে বললাম, 'কেন তুমি আমার গালে হাত দিলে? কী ভেবেছ তুমি?...

সজল বলল, 'বৃষ্টিতে ভিজে গেছে যে।'

'ভিজুকগে, তুমি হাত দেবে কেন। চলে যাও তুমি আমার ঘর থেকে।

সজল এক মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে থেকে চলে গেল।...

অনেক সময় ভেবেছি, সজল কী চায় আমার কাছে। রমুদা আর ঋতা যে রকম, সে রকম? অসম্ভব, আমি তা কোনও দিনই পারব না। (॥ নয় ॥ পৃ.১৪৭)

রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে ভালো করে মিশতে দ্বিধা থাকলেও প্রত্যেকের প্রতি যমুনার মনে সমীহ মিশ্রিত আবেগ ছিল। সে দূর থেকে 'সমীহ' ভরা দৃষ্টিতে তাদেরকে দেখে। রাজনীতির বাইরে থেকেও যমুনা তাদের জানে। তারা হয়তো কেউ লেখাপড়ায় খুব বেশি ভালো নয়, কেউ কেউ খারাপও নয়। লেখাপড়ার পাশাপাশি তারা পার্টিতে যুক্ত, মিছিল-মিটিং-এ যায়। ধর্মঘটী শিক্ষার্থীদের বদলে-যাওয়া ভাষাভঙ্গি, কর্মকাণ্ড সে প্রত্যক্ষ করে। হেডমিস্ট্রেসকে দেখেও ভয়শূন্য ও বক্তৃতায় পারদর্শী কোনো কোনো মেয়ের সাহসী রূপে সে বিস্মিত হয়। এদের কাউকে কাউকে যমুনার ভালো লেগে যায়। রমা তাদেরই একজন। আইন বিষয় অধ্যয়নরত, ভবিষ্যতে সি.এ. পড়তে ইচ্ছুক। ছেলেবন্ধু বীরুর কথায় একদিকে তার মুখে যেমন 'আনন্দের ঝিলিক' খেলে, তেমনি রাজনীতিতেও প্রবল উৎসাহ তার। রমার দাদাদের কেউ একজন কোনো এক রাজনৈতিক দলের এমএলএ ছাড়াও প্রত্যেকেই রাজনীতিতে সম্পৃক্ত। রমা রাজনীতিতে আরও বেশি জড়িয়ে পড়ার পর যমুনাকে দেখে বিস্মিত হয়েছে, সক্রিয় রাজনীতি থেকে তার বিচ্ছিন্নতা নিয়ে তর্ক করে তাকে উৎসাহিত করতে চেয়েছে। রমা-যমুনার কথোপকথন নিচে অনুসরণীয় :

'দেশের বর্তমান অবস্থাকে তুই মেনে নিতে পারিস? তোর মনে হয় না, এ শাসন-ব্যবস্থা বদলানো দরকার? কিছু লোক সুখ ভোগ করবে, আরামে থাকবে, আর কোটি কোটি মানুষ না খেতে পেয়ে মরবে, এটা কখনও মেনে নেওয়া যায়?'
আমার সহজ বুদ্ধি থেকেই বলেছি, 'না, তা যায় না।'

রমা বলে, 'কিন্তু সে কথা বললে তো হবে না, কিছু করতে হবে। আমরা চাই শ্রমিকরাজ কায়েম করতে। আমাদের দেশে শ্রমিকরা, কৃষকরা লড়ছে, আমাদেরও তাদের সঙ্গে লড়তে হবে।' (॥ নয় ॥ পৃ.১৪৮)

কিন্তু সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য সবাইকেই 'পলেটিকস' করতে হবে—রমার এ কথায় যমুনার আস্থা নেই। রমা তাকে বোঝাতে চায় ভোটদানের মাধ্যমে দেশের সবাই

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছে কিন্তু যারা ভোটার হয়নি—রমা, যমুনার মতো মানুষদের রাজনীতি করতে হবে কৃষক-শ্রমিকদের লড়াইয়ে সহযাত্রী হওয়ার জন্য। কিন্তু যমুনা এতে দ্বিমত পোষণ করে নিরুৎসাহিত হলে উত্তেজিত রমা যমুনার শ্রেণিগত উচ্চ অবস্থানের কথা মনে করিয়ে দেয়। মামার অর্থনৈতিক অবস্থা দৃষ্টে রমা একথা বললেও, যমুনা নিজে জানে তারা যথেষ্ট গরিব। বরং রাজনীতির সূত্রেই তার বাবা নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা ফিরিয়েছেন।

যমুনা দেখেছে রমার রাজনৈতিক ভাবনা ও আদর্শের মধ্যে স্ববিরোধিতা রয়েছে। একদিকে সে ভোটের রাজনীতির প্রতি আস্থাশীল, অন্যদিকে কৃষক-শ্রমিক বিপ্লবে বিশ্বাসী। এ বিরোধিতা ছিল সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতা। শৈশবে যমুনা দেখেছে ভারতবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়েই স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়েছিল। কাজেই যে কোনো আন্দোলনে সফলতার জন্যে সম্মিলিত অংশগ্রহণ প্রয়োজন—যমুনা এটা বুঝলেও প্রচলিত রাজনৈতিক পথে সে হাঁটতে পারেনি। রাজনৈতিক পরিসরের প্রান্তে অবস্থান করে যমুনা সকল ঘটনাপ্রবাহকে বিশ্লেষণ করেছে।

মার্কস ও লেনিনের বই রমা যমুনাকে পড়তে দিলেও সব অর্থ তার কাছে স্পষ্ট হয় না। রমাও বুঝিয়ে বলতে পারে না। কিন্তু যমুনার মস্তিষ্কে প্রশ্ন গেঁথে যায়, যার দাদা নির্বাচনে প্রার্থী হন তার বোন হিসেবে রমা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী হয় কী করে? এ সম্পর্কে রমা জানায় সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি পর্ব পর্যন্ত নির্বাচনী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু নির্বাচনে জিতে গেলে তো আর বিপ্লবের দরকার হবে না—যমুনার এমন কথায় রমা বলেছে বুর্জোয়া শক্তি নিজেদের পতন দেখতে দেখতে এক সময় মিলিটারি লেলিয়ে দেবে কাজেই বিপ্লবের কোনো বিকল্প নেই।

ধীরে ধীরে কলকাতার জীবনে মিশে গেছে যমুনা। সিনেমা, রেস্তোরাঁয় যাওয়া, ময়দানে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাওয়া, ভিক্টোরিয়া ও গঙ্গার ধার ঘুরে বেড়ানো, সাদার্ন অ্যাভিন্যু থেকে ভবানীপুর হেঁটে যাওয়া, চিৎপুরের ট্রামে চেপে জোড়াসাঁকো যাওয়া—এভাবেই দিন কাটছিল তার। কলেজের ছাত্রী ইউনিয়নের সমাজ-সংস্কৃতি বিভাগের সেক্রেটারি হিসেবে যমুনা এ সময়ে কবি-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে অগাধ কৌতূহল, আলোচনা-তর্কের মধ্যদিয়ে নিজেকে নতুন রূপে আবিষ্কার করে।

কবি অংশুমালী গুপ্ত-র সঙ্গে পরিচয় যমুনার জীবনের এক তির্যক বিহ্বল প্রান্ত। কলেজের দ্বিতীয় বছরে যমুনা বিভ্রম বা মোহে পড়ে এ কবিকে কেন্দ্র করে। তাঁকে কেন্দ্র করে যমুনার মন থেকে 'পিউরিটানিজম্, শরীর সম্পর্কে কঠিন শীতলতা এবং পাপবোধ' উধাও হয়ে যায়। যমুনার দৃষ্টিকোণ থেকেই অংশুমালীর রাজনৈতিক বিশ্বাস মূর্ত হয়েছে। বিবাহিত হয়েও নিঃসঙ্গ, একাকী—সংসারে থেকেও সংসারবিচ্ছিন্নতার মধ্যেই তার জীবনের ব্যর্থতা নিহিত। তবুও ক্রুদ্ধতা ও উত্তেজনার পরিবর্তে অপূর্ব শান্ততায় কবিতার মাঝে নিজের বিশ্বাসকে অভিব্যক্ত করেন। তাঁর সান্নিধ্যে এসেই যমুনা উপলব্ধি করে : "জীবন যে-কোনও শিল্পের থেকে বড়।" (পৃ.১৫১)

তৎকালীন পার্টি নেতৃত্বের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ করতে না পারলে কিংবা তাদের সমালোচনা করলে দলীয় সদস্যদের প্রতি যে কুঠারাঘাত নেমে আসত সে সম্পর্কে সমরেশ বসুর অর্জিত অভিজ্ঞতা, কবি অংশুমালীর জীবনের বিশ্বাসের সঙ্গে অনেকাংশে সদৃশ। পার্টির মধ্যে মতাদর্শগত ভিন্নতা থাকলেও গণমানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সকলের উদ্দেশ্য যে অভিন্ন ছিল সেটা অংশুমালী গুপ্ত বিশ্বাস করতেন। আর এটাও জানতেন এজন্য মানুষের সংগ্রাম নিরন্তর। যমুনার কাছে কবি অংশুমালী গুপ্ত-র এ বিশ্বাস অনাবিষ্কৃত থাকেনি। নিচের স্বগত কথন এ সত্যের সাক্ষ্যবাহী :

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর কাছে আমার একটি বড় পাঠ, প্রতিটি নদী স্বতন্ত্র, তবু সব নদী যে পথ দিয়েই হোক, সমুদ্রে যায়। এ অংশুমালীর কবিতারও কথা। আমাদের সকলের স্বাতন্ত্র্য, সকলের একাত্মতার সংগ্রাম। স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিয়ে, মানুষ কোনও মৌমাছিতন্ত্র গড়ে তুলতে পারে না, তা সে যে কোনও তন্ত্রের জন্যই হোক। সেইজন্য নিরন্তর ভাঙা-গড়ার মধ্যদিয়ে, মানুষ সংগ্রাম করে চলেছে, তার শেষ নেই। শেষ নেই কোনও কিছুরই, শেষ ব্যবস্থা বলেও পৃথিবীতে কিছু থাকতে পারে না। হত্যা, ষড়যন্ত্র, এবং পদানত করে রাখার দুর্গম আকাঙ্ক্ষা যাদের, 'শেষ ব্যবস্থা' তারাই হাঁকে, আর মানুষকে চিরদিনই তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। ক্ষুধার অন্ন নিয়ে যেমন কোনও আপস চলে না, তেমনই আপস চলে না, স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে, মৌমাছিতে পরিণত হওয়া। সেই কারণে, মানুষ চিরকাল বিদ্রোহী, আবার একই সঙ্গে, মানুষ তার নিজের কাছে বড় পরাধীন, কেননা, সে দেবতা নয়। মানুষ সেখানে, সংগ্রামী বলার থেকে, কঠিন তপস্যায় রত বলাই ভাল। (॥ নয় ॥ পৃ.১৫২)

রাজনীতি চিন্তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রণয়ভাবনা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে যমুনার চেতন-অবচেতনের ফল্গু স্রোত, সম্মোহন, বিবেচনাহীন ক্ষুব্ধতা; আমরা আগেই তা বলেছি। কারণ যমুনা অংশুমালীর কাছ থেকে কোনো রাজনৈতিক পাঠ নিতে চায়নি। কলেজ অনুষ্ঠানে কবি অংশুমালীকে দেখে যমুনা প্রথম দৃষ্টিতেই 'সম্মোহিত' হয়ে যায়। তারপরেই শুধু একটি কথা :

আমি অংশুমালীর অকূল টানে ভেসে গেলাম। কোথায় ভেসে গেল আমার পিউরিটানিজম্, শরীর সম্পর্কে আমার কঠিন শীতলতা এবং পাপবোধ।...

আচ্ছন্নতা আর ঘোরের মধ্যেও, আমি নিজেকে সম্পূর্ণ নগ্ন দেখেছি, অংশুমালীর বুকে।...

আসলে আমি অংশুমালীর কাছ থেকে কোনও পাঠ নিতে চাইনি, শিখতে চাইনি। আমি চেয়েছি কেবল অংশুমালীকে। এই শরীর, তাহলে বলি, এ শরীরে জোয়ার তখনই উত্তাল, অংশুমালীকে দর্শনমাত্র। কিন্তু তিনি আমাকে গর্ভবতী করেননি, অথচ কৌমার্য হরণ বলে কথাটার যদি কোনও অর্থ থাকে, দেহের সে সংযোগ থেকে আমরা বিরত ছিলাম না। অংশুমালী শরীরের ক্ষেত্রে শিল্পী, তার মধ্যে বিজ্ঞান আর কল্পনা আছে। আমার কোনও যন্ত্রণা ছিল না, কেবল সুখ—সুখ—সুখের স্বপ্ন। (॥ নয় ॥ পৃ.১৫২-৫৩)

কলেজ জীবনের তৃতীয় এবং শেষ বছরে এসে যমুনার সঙ্গে সম্পর্কটাকে নিজের জীবনের 'অন্ধ পরিণতির দিকে' নিতে চাননি বলেই অংশুমালী ক্রমে সরে যান তার কাছ থেকে। সমরেশ বসু রাজনীতিতে 'মৌমাছিতন্ত্রের' অকার্যকরতা প্রতিষ্ঠার জন্য 'অংশুমালী উপাখ্যান' সৃষ্টি করেছেন বলে অনেকে ভাবতে পারেন। কিন্তু শিল্পকে বিঘ্নিত করে সেখানে 'প্রজাপতিতন্ত্রের' অহেতুক অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সুপ্রণীত সৃষ্টিশীল রচনায় স্রষ্টার প্রলোভন-নিরপেক্ষতা অতি জরুরি। যমুনা-চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক পরম্পরার প্রশ্নেও, ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে, অংশুমালী উপাখ্যান অতিদ্রুত, প্রক্ষিপ্ত ও কার্যকারণহীন বলে প্রতীয়মান হয়। সুবীর-যমুনা সংবাদের মধ্যেও এক ধরনের আকস্মিকতা ও অস্থিরতা লক্ষ করা যাবে।

অংশুমালীর নিকট থেকে পরিত্যক্তপ্রায়, বিষণ্ন ও নিঃসঙ্গ যমুনা সজলমুখী হয়ে ওঠে। যমুনার প্রতি মুগ্ধতার স্বীকৃতি পেয়ে সজলও আনন্দিত, উল্লসিত। শুরু হয় যমুনার সজল-প্রণয় অভিযাত্রা। রাখী-দীপু-রমুদা-যমুনার মদালস আড্ডার মাঝে সজল গান ধরে, 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি, অরূপ রতন আশা করি।'

দশ পরিচ্ছেদে যমুনার জীবনের আর এক জটিলতর অধ্যায়ের শুরু। বি.এ.পাশ করে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তার বাংলাসাহিত্য পড়া শুরু হল। সজল এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এসে বেকার; এঞ্জিনিয়ার সজল টুইশনি করতে বাধ্য হল। সজল সম্পর্কে যমুনার চেতনাপ্রবাহ তাৎপর্যপূর্ণ :

সজল যত দিন ছাত্র ছিল, তত দিন অন্য রকম ছিল। তখন ওর চোখে আশা ছিল। তখন ও শিবপুর থেকে ছুটে এলে ওকে অন্য রকম লাগত। আমিও কখনও কখনও চলে গিয়েছি। যখন কিছুতেই ভাল লাগত না, তখনই ছুটে গিয়েছি। সজলের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি, এখনও বেড়াই। মাঝখানে আর এক জনের সঙ্গে ঘুরেছি, অংশুমালী গুপ্ত।...তার ফ্ল্যাটেই গিয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

ওঁকে আমি ভুলে যাইনি। কিন্তু ওঁকে নিয়ে আমার ভিতরে কোনও সমস্যা নেই, ওঁর ওপর আমার কোনও অভিযোগও নেই। সজলকে অংশুমালীর কথা বলেছি। শুনে সজল বলেছে, 'জেলাস হয়ে যাচ্ছি।' আর আমার তেরো বছর বয়সে, কৃষ্ণনগরে রায়বাড়ির ঘটনা শুনতে শুনতে, ওর চোখ ছলছলিয়ে উঠেছিল, বলেছিল, 'উহ, কী কষ্ট!' দু হাতে আমার মুখ তুলে ধরেছিল। (॥ দশ ॥ পৃ.১৫৬)

এঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়নকালীন তার যে চোখে স্বপ্ন ছিল, এখন সে চোখ স্বপ্নহীন, বিবর্ণতায় পূর্ণ। মামিমার কথায় সজলকে মামা তার কারখানায় নিতে চাইলেও ধর্মঘটের কারণে সেটাও হয়ে ওঠে না। সজলের মতো আরও অনেক বেকার তরুণ তখন একই নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি। যমুনার দৃষ্টিকোণ থেকে তৎকালীন আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি :

এই বছরটায়, চারদিকেই পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন আশা আর নিরাশার জটিলতা। বামপন্থী সরকার গঠিত হয়েছে। এক দিকে যেমন উৎসাহের জোয়ার, আর এক দিকে তেমনি নিরুৎসাহের ভাটা। বেকারের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। কলকারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাবার পিছনে কোনও চক্রান্ত আছে কি না, কে জানে। দীপু তা-ই বলে। ও বলে, নতুন সরকারকে বেকায়দায় ফেলবার জন্যই কারখানার মালিকেরা চক্রান্ত করে এ সব করছে। সজলেরও তাই বিশ্বাস। মামাও তার কারখানায় লক আউট ঘোষণা করেছেন। দীপু বলে, 'বাবাকে আলাদা করে দেখবার কিছু নেই। এঁরাও সংঘবদ্ধ, শ্রমিকরাও সংঘবদ্ধ।' মামা চেয়েছিলেন, রমুদা কেমিস্ট্রিতে এম. এ পাশ করে, বিলেত থেকে আরও উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে এসে কারখানার কাজে লাগবে। দীপু এম-কম্ করে, সি.এ পাশ করে, ব্যবসায়ের ফাইনান্স দিকটা দেখবে। রমুদা একভাবে কাজে লাগছে। দীপু কী করবে, বুঝতে পারি না। ও কি সত্যি রাজনীতি নিয়েই থাকবে! আমার সঙ্গে ওর মুখোমুখি কোনও বিবাদ নেই। দুজনের আদর্শই আলাদা। (॥ দশ ॥ পৃ.১৫৬)

কলেজ স্ট্রিটের প্রকাণ্ড বাড়ির নিচের তলার স্যাঁতসেঁতে কক্ষে বামপন্থী প্রৌঢ় নেতা হরিশদার সঙ্গে সজল পরিচয় করিয়ে দেয় যমুনাকে। এভাবে তৎকালীন আর্থ-রাজনৈতিক ও মানবীয় পরিস্থিতির কেন্দ্রে যমুনাকে স্থাপন করেন ঔপন্যাসিক। সেখানে কয়েকজন বিপ্লবকর্মীর উপস্থিতিতেই, হরিশ-সজলের কথোপকথন থেকে যমুনা তাদের সশস্ত্র বিপ্লবী রাজনীতির মতাদর্শ সম্পর্কে একটা প্রত্যক্ষ ধারণা পায়। নির্বাচন-কৌশলকে আপোসমুখী সুবিধাবাদের পথ হিসেবে মনে করেন বর্ষীয়ান এ রাজনীতিবিদ; যা বিপ্লববাদীদের জন্য পরিত্যাজ্য। নির্বাচনে বিজয়ী বামপন্থী সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের তীব্র বিরোধিতা করেছেন হরিশদা। এ নিয়ে দলীয় সদস্য নীরেনের সঙ্গেও তার মতান্তর ঘটেছে। যমুনার সামনেই হরিশ এবং দলীয় সদস্যদের কথোপকথন লক্ষণীয় :

এ সরকার কখনও টিকতে পারে না, সরষের মধ্যেই ভূতগুলো সব বসে।' তিনি এমন কোনও কোনও নেতার নাম করে সমালোচনা করলেন, হরিশদা নিজেই যাঁদের দলের লোক। আরও বললেন, 'একে শ্রেণীসংগ্রাম বলে না, বিপ্লবের পথ-ও বলে না। এসব হচ্ছে মন্ত্রিত্বের পার্টি পলেটিকস, একটি পাক্কা সুবিধাবাদী রাস্তা। "শুয়োরের খোঁয়াড়ে" বসে বিপ্লব করা যায় না। তাই এখন দেখছি, আমরাই সেই সব কৃষকদের আর নেতাদের দমন করতে শুরু করেছি, যারা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী।'...

নীরেন বলল, 'নির্বাচনের সংগ্রামটা ছেড়ে দিয়েই?'

'নির্বাচনকে আমরা মানতে যাচ্ছি কেন। সেই আবহাওয়া আমরা তৈরি হতে দেব না।'

হরিশদার চোখগুলো জ্বলজ্বল করছে। নীরেন বলল, 'কিন্তু সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সময় এসেছে বলে আপনি মনে করেন?'

হরিশদা জোর দিয়ে বললেন, 'সময় আসে না নীরেন, সময়কে তৈরি করে নিতে হয়।"

"নীরেন বলল, 'তারও একটা অবস্থা চাই।'

'সে অবস্থা আছে বলে আমি বিশ্বাস করি।' (॥ দশ ॥ পৃ.১৫৬-৫৭)

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয়ে হরিশদা যমুনার অভিমত জানতে চাইলে সে তার অপারগতা নির্দ্বিধায় প্রকাশ করে। কিন্তু হরিশদা তাকে জীবনের প্রয়োজনে রাজনীতি বোঝার কথাই বলেছেন : "কিন্তু বুঝি না বললে তো হবে না, বুঝতে হবে "। (পৃ.১৫৭)

gvbl kw³i Drm-এর ঘটনাক্রম অনুসরণ করলে স্পষ্ট হয়, সমরেশ বসু এ উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য সম্পাদনের জন্য সংক্ষিপ্তপ্রায় শেষ দুটি পরিচ্ছেদ ব্যবহার করেছেন। এখানকার ন্যারেটিভ এজন্য তথ্যপ্রদানমূলক, বক্তৃতাধর্মী ও সংলাপপ্রধান। এম.এ. পাশ করে যমুনাও বেকার। বিষণ্ন সজল গান করা ভুলে গিয়েছে। বর্তমানে রাজনীতির পাঠ নিয়ে ব্যস্ত। ইতোমধ্যে কয়েক বছর পেরিয়ে গেলেও পরিস্থিতির কোনো উন্নতি না হওয়ায় যমুনার মামা কলকাতার কারখানা বন্ধ রেখে দিল্লির শহরতলিতে নতুন কারখানা তৈরি করেছেন। শীঘ্রই পরিবারের সবাইকে নিয়ে যাবেন দিল্লিতে।

অন্যদিকে হরিশদার কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সম্মিলিত মন্ত্রিসভা দু-দুবার ভেঙে নতুন নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। হরিশদা, সুবীর আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকায়, গ্রেপ্তারের আশঙ্কা নিয়েও সজলকে বাইরে থেকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হচ্ছে। অনেক তরুণ জেলে। হত্যা-পাল্টা হত্যা, পুলিশ কর্তৃক হত্যা, পুলিশকে হত্যা—এসব চলতে থাকে। এমন পরিস্থিতির বছরখানেক আগে, একাদশ পরিচ্ছেদে, যমুনার সঙ্গে সুবীরের দেখা করিয়েছিল সজল। সুবীর সম্পর্কে যমুনা প্রথম জেনেছিল রমুদার কাছ থেকে। রমুর ভাষায় : "সুবীর তো দারুণ দেখতে ছিল! ভেরি হ্যান্ডসাম আর স্মার্ট, আর ও তো বেশ বড়লোকের ছেলে, গাড়িতে আসত, বন্ধুদের খুব খাওয়াত, দারুণ গ্ল্যামার..." (॥ তিন ॥ পৃ.১০১)

সুবীর ষাটের দশকের কলকাতার শীর্ষস্থানীয় কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সারির ছাত্র-ছাত্রীরই প্রতিনিধি যারা অনেক ক্ষেত্রে আন্দোলনের মূল আদর্শ সম্পর্কে সুস্পষ্ট না-হয়েই সমাজবদলের রোম্যান্টিসিজমে উদ্বুদ্ধ হয়ে, বই-খাতা ফেলে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। ষাটের দশকে সারা পৃথিবী জুড়েই তরুণ সমাজের মধ্যে একটা অস্থিরতা চলছিল। নিয়ম রীতিকে ভেঙে নিজের মতো করে এক নতুন বিশ্ব তৈরির প্রবণতা সে সময় ইউরোপ বিশেষত ফরাসি দেশে প্রবল জনপ্রিয় হয়েছিল। সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণচীনের বিপ্লবী সরকার। বাংলার যুবসমাজও একই প্রেরণায় নকশালপন্থী দলে যোগ দেয়। ছাত্র এবং কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত এই নব্য বিপ্লবীর দল ধনিক শ্রেণির মূর্তিমান আতঙ্কে পরিণত হয়। পরিণতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ জনজীবন এবং এসব বিপ্লবী হয়ে পড়ে জনবিচ্ছিন্ন। প্রতিনিধিস্থানীয় সুবীর চরিত্রের মধ্যদিয়ে ঔপন্যাসিক শ্রেণিশত্রু খতম থেকে জন্ম-নেয়া সেসব বিপ্লবীদের জনবিচ্ছিন্নতার স্বরূপ চিত্রিত করেছেন। সজল ও হরিশদার ছেলে হিরণ সুবীরের সমর্থক হলেও তার দলের হাতেই তাদের মর্মান্তিক মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। প্রথমে হরিশদার মতাদর্শকে লালন করলেও সুবীর পরে 'এক্সট্রিমিস্ট' হয়ে যায়। যে দলের ভেতরে কোনো সদস্যের কাছ থেকে দলের কর্মপদ্ধতির কোনো সমালোচনা সহ্য করেনি। সুবীর চরিত্র বিশ্লেষণে ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে প্রবন্ধকারের নিচের উক্তিটি[৯] বিশেষভাবে বিবেচনার দাবি রাখে :

ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক বিতর্ক এবং তাত্ত্বিক আলোচনা ও প্রচারের মধ্যে দিয়ে যে একটি বৈপ্লবিক পরিমণ্ডল তৈরি হচ্ছিল, তা ভারি বেসামাল, এলোমেলো হয়ে গেল। তপ্ত, উত্তেজিত পরিবেশে কে বন্ধু, কে শত্রু বিচার করার সময় থাকলো না। শ্রেণী শত্রুর রক্তে হাত রাঙাতে হাতের কাছে একজন শ্রেণী শত্রু আবিষ্কার করার জন্য সরলীকৃত নানা তত্ত্ব হাজির হলো। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত পুরনো ঝগড়ার জের টেনেও শ্রেণী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই ঘরোয়া যুদ্ধের চেহারা নিল।...কলেজস্ট্রীট থেকে শ্রীকাকুলাম, সব জায়গায় হাতে রাইফেল তুলে তারা চেঁচিয়ে উঠলো, নো সারেন্ডার!

Dhaka University Institutional Repository

সজলের চোখে সুবীর ছিল 'সব্যসাচী', 'অসম্ভব ক্ষমতার অধিকারী'। যমুনাকে সে-ই প্রথম তার কাছে নিয়ে আসে। প্রথম দেখাতেই সুবীরের প্রতি যমুনার মুগ্ধতা সজলকেও ম্লান করে দিয়েছিল। যমুনার বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুবীর :

সত্যি, সব্যসাচীকেই দেখেছিলাম। অজ্ঞাতবাসী অর্জুন, কিন্তু দু চোখে তার আগুনের ঝিলিক। দৃঢ়বদ্ধ দুই ঠোঁটে কঠিন প্রতিজ্ঞা, প্রশস্ত কপাল যেন বিদ্যুতের চিকুর হানা। সমস্ত মূর্তিটাই যেন আগুনের মতো লকলক করছে। সেই আগুনের তাপ যেন আমার গায়ে লাগছে, মনে লাগছে। অথচ সুবীরের চোখের কোল বসা, গালে চিবুকে কয়েকদিনের দাড়ি। (পৃ.১৫৭)

প্রথম দিনই সুবীর-সজলের কথোপকথনে যমুনা বুঝতে পারে উভয়ের মাঝে দলীয় আদর্শের কোনো ভিন্নতা না থাকলেও দলের শ্রেণিশত্রু খতমের কর্মকৌশল সম্পর্কে সজলের ভিন্নমত ছিল। সুবীরের শক্তির উৎস ছিল 'খাঁচায় বন্দি বাঘের মতো অস্থির' আঠারো-উনিশ বছর বয়সী সশস্ত্র হিরণের মতো তরুণ, যারা বুদ্ধির চেয়ে অন্ধ আবেগতাড়িত। সুবীরের কাছে ব্যক্তিমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো মূল্য ছিল না। দলীয় আদর্শের বাস্তবায়নে গৃহীত রণনীতির নির্ভুলতা সম্পর্কে সুবীর সংশয়মুক্ত ছিল বলেই সুগভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সে সজলের সঙ্গে যুক্তিনিষ্ঠ তর্কের অবতারণা করেছে, তাতে 'আগুন' রূপী সুবীর যমুনার মনে গেঁথে যায়। সুবীর বিশ্বাস করে তাদের এখন তাত্ত্বিক নয়, "যোদ্ধার দরকারই বেশি। মারের বদলা মার না, বহুকালের মার খেয়ে, এখন কেবল মার। প্রতিদিন নতুন নতুন শত্রু গজাচ্ছে, সবাইকেই মার।" (পৃ.১৫৮) এ কারণে যোদ্ধা হিসেবে তাদের দলে যোগ দেবার আহ্বান জানিয়ে যমুনাকে সুবীর বলেছে : "ভাববার সময় এসেছে। সূর্য এখন আমাদের রক্তেই লাল, আমাদের তেজেই প্রখর।" (॥ এগারো ॥ পৃ.১৫৮)

সজল প্রত্যুত্তরে বলেছিল, "তেজের কথা বলব না, কিন্তু আরও অনেকের রক্তই লাল নয় কি?" সুবীর প্রায় চাপা গর্জনের স্বরে বলে উঠেছিল : "না। পাপের রক্তে আর পুণ্যের রক্তে তফাত আছে। আমাদের রক্ত পুণ্যের।" সজল অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। সুবীরের কথাগুলো আমার মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করে উঠেছিল। তুলনায় সজলকে আমার কেমন যেন নিষ্প্রভ মনে হয়েছিল। (পৃ.১৫৮)

সজল আশঙ্কা করত তৎকালীন পরিস্থিতিতে 'অনেক অশুভ হাত' পার্টির সঙ্গে মিলে তাদের বিপ্লবের পথকে কালিমালিপ্ত করে তুলতে পারে। এ আশঙ্কা থেকেই সে সুবীরকে বলেছে : পার্টির প্রয়োগগত কৌশলকে সজলের কাছে চ্যালেঞ্জ বলে মনে হয়েছে। অনেক অশুভ শক্তির সক্রিয়তা তাদের শুভ শক্তির উদ্যোগকে ব্যর্থ করে পুরো বিপ্লবের স্বপ্নটাকেই ব্যর্থ পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে—এ সন্দেহবোধে দ্বিধান্বিত সজলকে সুবীর সন্দেহমুক্ত হয়ে আশাবাদী করতে চেয়েছে : "সন্দেহ জিনিসটা বিষের মতো। শহরের সংগ্রামের পদ্ধতি আমরা ঠিকই নিয়েছি। সন্দেহটা ঝেড়ে ফেলিস। আমরা যে সার্থক, তা দেশের চেহারা দেখে কি কিছুই বোঝা যায় না। "এভাবেই আমরা সমস্ত কিছু, ধাপে ধাপে কোলাপস করে দেব।... যমুনা ফেরার পথে লক্ষ করেছিল সজল নিশ্চুপ আচ্ছন্নের মতো ছিল। আমি কেবল সুবীরের কথাই ভেবেছিলাম।" (পৃ.১৫৮)

এরপরও যমুনা সুবীরের ওখানে গেছে; কখনও একলা, কখনও সজলের সঙ্গে। এ প্রসঙ্গের উদ্ধৃতি প্রয়োজন :

আমাকে যেন কেউ ঠেলে নিয়ে যেত।...সজলের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, আমি সুবীরের কথাই বারে বারে বলেছি। জানতাম না, আর একজনকে কোথায় ঠেলে দিচ্ছি। কোন অন্ধকারে।...সুবীরের সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে, সজল প্রায় আমাকে চিঠি লিখত।... ওর মধ্যে ভাবান্তর এবং পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল। পার্টি বা মূল নীতি বিষয়ে ওর সন্দেহ যেন স্থির বিশ্বাসে পৌঁছেছিল। (॥ এগারো ॥ পৃ.১৫৯)

Dhaka University Institutional Repository

সজল তার বিশ্বাসের কথা কাউকে বোঝাতে পারছিল না। হিরণের মনে হয় সজল তাদেরকে 'সাধারণ খুনির মতো' মনে করে। সুবীর কৈফিয়ত চায় 'অশুভ হাত' সে কাকে বলতে চায়। কিন্তু সজল বার বার বোঝানোর চেষ্টা করেছে আন্দোলনের যে সশস্ত্র পথে তারা চলছিল তাতে সুযোগ নিচ্ছিল সমাজবিরোধী কিছু অশুভ শক্তি যাদের দ্বারাই দলীয় 'ইমেজ' নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। নিচের অংশে সজলের সে বিশ্লেষণ প্রকৃত অর্থে সমরেশ বসুর রাজনৈতিক বীক্ষারই প্রকাশ :

যা সমাজের পক্ষে, প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে অশুভ, তাকেই আমি অশুভ বলছি। যারা আমাদের সংগ্রামের সুযোগ নিয়ে, নিজেদের স্বার্থে রক্তপাত করছে, অত্যন্ত নিচু স্তরের খুনি, গুণ্ডা, বদমাইশ, ওয়াগন ব্রেকার্স, ছিনতাই পার্টি, এক কথায় স্যো-কল্ড মস্তান, আর যে দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতায় আসার জন্য সবরকম সর্বনাশের রাস্তা ধরেছে, তারা আমাদের ছায়ায় নিজেদের আড়াল করছে। তাতে দিনের পর দিন আমাদের ইমেজের ক্ষতি হচ্ছে। (॥ এগারো ॥ পৃ.১৫৯)

সুবীরের চোখ বাঘের মতোই জ্বলছিল, কিন্তু সজলের কথা শুনে সে আগুনের ঝিলিকে বিদ্রূপ করে হেসে উঠেছিল; 'সজলবাবু, আপনার যদি বৈপ্লবিক শিক্ষা থাকত, তাহলে এ ভয়টা আপনি পেতেন না।' সুবীর আরও বলেছিল প্রত্যুত্তরে : 'তুমি যাদের গুণ্ডা মস্তান বলছ, আমাদের ভাষায় তারা হল লুম্পেন প্রলেটারিয়েট। তাদের বাদ দিয়ে আমাদের চলবে না। তাদের অশুভ হাতকে শুভ করে তোলার দায়িত্ব আমাদের। তাদের অস্ত্র আর ঘৃণাকে লেলিয়ে দিতে হবে আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে, ভবিষ্যতে তারাই হয়ে উঠবে আমাদের পার্টির এক একটি হিরার টুকরো, বুঝেছ?' এমন তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা বিতর্কের মাঝে যমুনার অন্তর্কথনের আর এক চোরা স্রোত লক্ষণীয় :

আমার মনে হয়েছিল, সুবীরের প্রতিটি কথা, নিশ্ছিদ্র যুক্তি দিয়ে ঠাসা। বুঝি বা না বুঝি, তার বলার মধ্যে এমন একটা প্রত্যয় আর দৃঢ়তা ছিল, তার জ্বলন্ত মুখকে এমন অগ্নিশুদ্ধ মনে হয়েছিল, আমার ভিতরটাই যেন দপদপ্ করছিল। কিন্তু আশ্চর্য, সজল যেন কেবল আগুনে জল ঢালতেই চাইছিল। (॥ এগারো ॥ পৃ.১৫৯)

এখানে সুবীরের প্রতি মুগ্ধতা, সম্মোহন ও আকর্ষণের ধরন 'অংশুমালী গুপ্তের' অতল স্পর্শকাতরতারই নামান্তর প্রায়। আগেই উল্লেখিত হয়েছে যমুনার স্মৃতি ও মনোকথনের মধ্যে স্পাইরালের মতো রাজনীতি ও শরীর এবং প্রণয়াবেগ বিজড়িত। রাজনৈতিক তর্ক, স্মৃতি এবং প্রণয়-ভাবালু বিহ্বলতা যমুনার চেতনাস্রোতে পরস্পরভাবে বিজড়িত হয়েছে।

যাই হোক, সুবীর লেনিনবাদকে ভিত্তি করে যাদেরকে 'লুম্পেন প্রলেটারিয়েট' বলেছে ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সজল তাদের মাঝে সে ধরনের কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পায়নি। এছাড়া সে বিশ্বাস করে পরিবর্তিত বিশ্বে ভারতের মতো একটা বৈচিত্র্যপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দেশে লেনিনবাদকে প্রয়োগ করতে গেলে অন্য কোনো দেশের বিপ্লবের ফরমুলার অন্ধ অনুকরণ না করে "অবস্থা বুঝে উপায় উদ্ভাবন করতে হবে"। সুবীর এসব কথা শুনে তাকে 'নয়া লেনিন' বলে বিদ্রূপ করলেও সজল গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বর্তমানের 'স্যো-কল্ড মস্তান'-দের স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করেছে নিচের অংশে :

সংশোধনবাদী আর দক্ষিণপন্থী অনুচরদেরও 'লুম্পেন প্রোলেটারিয়েট' বলতে হবে? কোনও ফরমুলাই চিরদিন কার্যকরী হয় না। দেশ আর কালচারের মধ্যে, তার অনেক অদলবদল হয়ে যায়।...
পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের লেখা বইয়ে যাদের লুম্পেন প্রোলেটারিয়েট বলে উল্লেখ করা হত, তাদের সঙ্গে আমাদের দেশের মস্তান খুনিদের কোনও মিল নেই। আমার মতে, এরা আসলে ক্ষমতাশালী পার্টিগুলোর এজেন্ট, যারা জনসাধারণের মনে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে, আর পার্লামেন্টারি মতবাদে বিশ্বাসী, বুর্জোয়া, আধাবুর্জোয়া দলগুলো তার সুযোগ নেয়। নিচ্ছে, নেবে। লুম্পেন প্রোলেটারিয়েট এরা কখনওই নয়। কাচকে হিরার টুকরো ভাবা হচ্ছে। (॥ এগারো ॥ পৃ.১৫৯-১৬০)

দলীয় নেতৃত্বের অসহিষ্ণু মনোভাবে সুবীর জানায় পার্টির নির্ধারিত পদ্ধতির বাইরে ব্যক্তির কোনো নিজস্ব ফরমুলা থাকলে তাকে 'পার্টি থেকে বের করে দেয়া হবে'। (পৃ.১৬০)

কিন্তু পার্টি থেকে বের করে দেবার অর্থ যে সজলকে 'শ্রেণীশত্রু হিসেবে' চিহ্নিত করে তার অস্তিত্বকে বিলোপ করে দেওয়াই পার্টির নীতি এটা হিরণ তার কথায় আভাস দিলেও সে নিজেও জানে একথা। তারপরও সুবীরকে সজল প্রশ্ন করেছিল : "মতভেদের কথা আমি বাইরের লোকের সঙ্গে আলোচনা করতে যাচ্ছি না, আমি আলোচনা করছি পার্টির মধ্যেই। পার্টির মধ্যে পার্টির নীতির সমালোচনা কি অপরাধ যে পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হবে?" তীব্র স্বরে সুবীরের উত্তর : "না, পার্টির কোনও সমালোচনাই সহ্য করা হবে না।"(পৃ.১৬০)

কিন্তু সেসব মানুষ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে দলে আসতে না চায়, তাদেরও শত্রু বলার পক্ষপাতী সুবীর। তবে তার বিশ্বাস তারা 'নিজেদের স্বার্থেই সংগ্রামে সামিল হবে'। সজল আবারও তার শঙ্কার কথা সুবীরকে জানিয়েছে : "আমরা যে পদ্ধতিতে চলেছি, তাতে কি তারা আমাদের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসবে?" (পৃ.১৬১)

সুবীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করেছে : "আসবে, আসতে হবে। ইতিমধ্যেই কি তার প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি? শ্রেণীশত্রুদের আমরা ভীত আর সন্ত্রস্ত করে তুলেছি (পৃ.১৬১)।" কিন্তু কলকাতার দিকে তাকিয়ে সুবীরের একথার সত্যতা মেলে না। এজন্যই সজল বলেছে : মানুষই ইতিহাসের রচয়িতা, সভ্যতার মহানায়ক। কাজেই সেই মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তাদের সংগ্রামী ঐক্যের পরিবর্তে রাইফেল কখনো শক্তির উৎস হতে পারে না। এতে করে পার্টি হয়ে পড়ে জনবিচ্ছিন্ন। এ বিশ্বাস সমরেশ বসু তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার আলোকে অর্জন করেছিলেন। কাজেই কমিউনিস্ট পার্টিতে সক্রিয় সদস্য থাকা কালে দলের যে অভ্যন্তর যান্ত্রিক শৃঙ্খলা, গণতন্ত্র-চর্চার অভাব তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তাই প্রকাশ করেছেন সজলের ভাবনার মধ্যদিয়ে।

অতঃপর দীর্ঘ উদ্ধৃতিসমূহের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে পড়ে আমাদের আলোচনায়, কারণ gvbl kw³i Drm-এর রাজনৈতিক প্রতিপাদ্য এ পর্যায়ে সমরেশ বসু, মূলত দৃশ্যবদ্ধ সংলাপধর্মী পরিচর্যারীতিতে উপস্থাপন করেছেন এবং সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যমুনার অন্তর্ভাবনার টুকরো টুকরো উদ্ভাস।

তর্ক প্রসঙ্গে, সুবীর বরফের মতো জমাট ও শীতল; বলেছিল, "সজল, তুমি বড় বেশি জেনে ফেলেছ।" সজল বলেছিল :

'আর জানাটা খুব ভাল লক্ষণ না, সে অভিজ্ঞতা তথাকথিত বিপ্লবী দেশগুলো থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। ক্ষমতা জিনিসটা বড় মারাত্মক অবসেশনের মতো, তারা মনে করে, তারা যা বলছে, সেটাই শেষ কথা, অথচ তত্ত্ব দিয়ে তা প্রমাণ হয় না, অতএব ক্ষমতা প্রয়োগই শেষ কথা। আচ্ছা সুবীর, তুমি কি মনে কর না, মানুষই সব থেকে বড় শক্তির উৎস, একমাত্র মানুষ।'...

'যেখানে কোনও সমালোচনাই সহ্য করা হবে না বলা হচ্ছে, সেখানে মতামত ব্যক্ত করাও অন্যায়।' সজল বলেছিল, 'তথাপি না বলে পারছি না। রিয়্যাল ক্লাস এনিমিদের আমরা যেমন একটু গায়ে হাতও দিতে পারিনি, তেমনি তাদের সন্ত্রস্তও করতে পারিনি। আমরা দক্ষিণপন্থীদের পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছি, অবিশ্যিই না জেনে, পরোক্ষে, আর বামপন্থী সংশোধনবাদী পার্টিগুলোকেও আমাদের সমালোচনার সুযোগ দিচ্ছি, কেন না, ওদের দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদের বিপরীতে আমরাও বামপন্থী সংশোধনবাদের পথে চলেছি। কিছু ইনডিভিজুয়াল ছাড়া, জনতার কোনও অংশই আমাদের সঙ্গে নেই।'...

'অবশ্যি আমার এ সব বলার কোনও মানে হচ্ছে না। তুমি আগেই বলেছ, যারাই তোমার সঙ্গে আসতে না চাইবে, তারাই শত্রু। অতএব, তোমার রাস্তা তো খোলা, চালিয়ে যাও। (॥ এগারো ॥ পৃ.১৬১)

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যুত্তরে সুবীর চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গর্জনের স্বরে জানতে চায়, ও সব কথার মানে কী? সজল ব্যাখ্যা করে বলে : "চালিয়ে যাও বলতে বলছি, যা করছ, তোমার নীতি অনুযায়ীই যখন করছ, করে যাও। তোমার বলতে আমি তোমাদের কয়েকজনের কথা বলছি। তা ছাড়া, তুমি নিজেই বলেছ, পার্টি এরকম নীতির কথা বলেছে, আপাতত ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিয়েও, কেউ অ্যাকশন নিতে পারে। তার মানে প্রত্যেকেই একটা পার্টি। (পৃ.১৬২) সুবীরের চোখের দুই জ্বলন্ত অঙ্গারের দিকে তাকিয়ে যমুনা ভীত কম্পিত হয়ে ওঠে। সে আশা করেছিল, সজল নিজেকে সংযত করবে। কিন্তু সজল সহাস্য হয়ে পুনরায় শান্তভাবে বলেছিল, "আর তোমার জানা মানেই শেষ জানা।" তীব্র তির্যক অঙ্গারস্পর্শের মতো বিদ্রূপ করে সুবীর বলেছিল :

"আমি আরও কিছু জানি। তোমার এখন দরকার কোনও এঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে একটা ভাল চাকরি, আর সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী একটি বউ।" বিদ্রূপের জবাবে সজল হেসে বলেছিল, "ক্লাস এনিমির সঠিক ভূমিকা হয়তো সেটাই, কিন্তু আমার পোড়াকপালে তা আর ঘটছে কই!" (পৃ.১৬২) উপন্যাসের সমাপ্তপ্রায় পরিস্থিতিতে, সজলের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ-সময়েও সুবীরের প্রতি যমুনার সম্মোহিত বিহ্বলতা এবং সজলের প্রতি রুষ্ট কুপিত অনুভূতি লক্ষণীয় :

সজলের ও রকম কথা আমি আশা করিনি। ভেবেছিলাম, তার জীবন উৎসর্গের কথাই ঘোষণা করবে। সে সুবীরের থেকে কোনও অংশে কম সংগ্রামী না, এ কথাই সে জোর গলায় বলবে। কিন্তু সজলের কথায়, দশ জন সাধারণ বেকার যুবকের কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, যা শুনে আমি, রুষ্ট হয়েছিলাম, ওর ভাবী স্ত্রী হিসাবে নিজেকে হীন মনে হয়েছিল। আমি আর বসে থাকতে পারছিলাম না। বিশেষ কারোকে উদ্দেশ না করে শুধু বলেছিলাম, 'আমি যাচ্ছি।'

বলেই বেরিয়ে গিয়েছিলাম, পিছনে সজলের গলার স্বর শুনতে পেয়েছিলাম, 'দাঁড়াও, আমিও যাচ্ছি।' ফেরার পথে, সজলের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। (॥ এগারো ॥ পৃ.১৬২)

বারো বা শেষ পরিচ্ছেদের সাড়ে তিন পৃষ্ঠা পরিসরে gvbl kw³i Drm উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য পুনঃকথিত হয়েছে। আখ্যানটি যেহেতু যমুনার মনোকথন, কাজেই সমরেশ বসুর নিকট সজলের পরের দিনই লেখা পত্রের তথ্য ব্যবহার ছাড়া বিকল্প ছিল না। শেষ পরিচ্ছেদের প্রথমেই জানা গেল, 'বিন্দু' সম্বোধিত সজলের শেষ চিঠিটা যমুনাকে পৌঁছে দিয়েছিল ওরই এক বোন। প্রকৃতপক্ষে সজলের পত্রধৃত অন্তর্কথন বা মনোকথনের মাধ্যমে তার জীবনভাবনা ও রাজনীতিচিন্তার সূত্রগুচ্ছ বয়ন করেছেন ঔপন্যাসিক। সমরেশ বসু তথা সজলের জীবনদর্শন ও পার্টি রাজনীতিচিন্তা সম্যক উপলব্ধি করতে দীর্ঘ উদ্ধৃতি এড়ানোর অবকাশ নেই।

'আন্তর্জাতিকতা' শব্দটিতে সজলের সংশয় ছিল। ভারতীয়রা রাজনৈতিক সংগ্রামে অন্য দেশের বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও সে বিশ্বাস করত নিজ দেশের উপযোগী আদর্শেই এটি পরিচালিত হওয়া উচিত। বিন্দুর কাছে লেখা শেষ চিঠিতে নির্দ্বন্দ্ব সজল আত্মউন্মোচন করেছে এমনভাবে যার মধ্যদিয়ে সমরেশ বসু আসলে পরিবর্তিত পৃথিবীতে ভারতের মতো দেশে পার্টির নীতি আর কৌশল কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত বিশ্লেষণও দেখিয়েছেন। নিচের অংশটি লক্ষণীয় :

এখন থেকে আমার পরিচয় বোধ হয় 'দলত্যাগী' হবে। স্বাভাবিক। আসলে আমি বোধ হয় দলচলের মানুষ না। স্বীকার করতেই হবে, সেই হিসাবে আমি সাম্প্রতিককালের একটি নষ্ট অস্তিত্ব—নষ্ট অর্থে বিনাশ না, নষ্ট। যেমন ধরো, 'আন্তর্জাতিকতা' শব্দটিকে কিছুকাল ধরেই আমি কেমন সন্দেহের চোখে দেখছিলাম। আন্তর্জাতিকতা যখন ভ্রাতৃত্বের চেহারায় ফোটে, তখন খারাপ লাগে না, এবং আন্তর্জাতিক অগ্রজকে সম্মান জানানো, এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, নিজেরই গুণ। কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, আমরা ভারতীয়রা, রাজনৈতিক সংগ্রামে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেউলিয়া দাসের ভূমিকা গ্রহণ করেছি। তার জন্যে আমরা কোনও দেশকে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বলে গালাগালিও দিতে পারব না, কেননা, বিপ্লব করতে গিয়েও আমরা আত্মপরিচয়হীন দাস মাত্র। জাতীয়তাবাদীদের সর্বগ্রাসী ভূমিকা তো দেখছি, কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিকতাবাদীদের দুর্দশা আরও অনেক বেশি, কারণ গোড়া থেকেই দেশের মাটি থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। আমি খুব বেশি দূরের ভবিষ্যৎ দেখতে পাই না, কিন্তু আজ আমাদের জন্য যে বিদেশি রেডিও চিৎকার করে চলেছে, সন্দেহ হচ্ছে, সে স্বর খুব শীঘ্রই নীরব হয়ে যাবে। রাজনীতির গতিবিধি এইরকম। প্রত্যেকটি দেশ তার নিজের গরজেই সবকিছু করে। সেই হিসাবে রাজনীতিকে গালাগাল দিয়ে কোনও লাভ হয় না। প্রত্যেক দেশকেই তার নিজস্ব নীতি অবলম্বন করে চলতে হয়। আমার বিশ্বাস হয় না, স্ট্যালিনকে কখনও চিন—চিনের জেনারেলিসিসো বলে কল্পনাও করতে পারত। (॥ বারো ॥ পৃ.১৬৩)

আদিম সাম্যবাদ, আধুনিক সাম্যবাদ ও শোষণ এবং উৎপাদনযন্ত্র সম্পর্কে সজলের ভাবনা যমুনাকে লিখে জানায় :

যে নামটি এখন সর্বাধিক উচ্চারিত, সেই মার্কসের কথা না বলে, আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ মরগ্যান-এর কথা বলা যায়, প্রায় একই সময়ে তিনি আধুনিক সাম্যবাদের অনিবার্যতার কথা বলেছিলেন। 'উৎপাদনের হাতিয়ারের অভাবে একদা আদিম সাম্যবাদের উদ্ভব হয়েছিল। আধুনিককালে উৎপাদনের হাতিয়ার এখন সবল, এবং উৎপাদকেরা তা নিজেদের মধ্যে সমান অংশে ভাগ করে নেবে।' কিন্তু উৎপাদক বলতে আমরা গোটিকে বুঝি, কোটিকে না। আসলে কোটির উৎপাদিত সম্পত্তিকে ভোগ করছে গোটি, অতএব যুদ্ধ অনিবার্য, এবং সে যুদ্ধ এই শতাব্দীর শুরুতেই শুরু হয়ে গিয়েছে।...

আমার বক্তব্য, সেই যুদ্ধকে রাজনীতি তার চক্রের দ্বারা, বারে বারে ছিন্নভিন্ন করছে। সংগ্রামী মানুষরা সরল। তারা কেউ প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী বা চেয়ারম্যানদের মতো জীবনযাপন করার কথা ভাবে না। (॥ বারো॥ পৃ.১৬৩)

ক্ষমতালোভী নেতৃত্ব সম্পর্কে অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং মানুষের অমিত সম্ভাবনাকে স্বীকার করেই সজল চিঠিতে লিখেছে তার দর্শন-পরিশীলিত বিশ্বাস, চূড়ান্ত অভিমত :

যদুবংশ যেমন শেষ সত্য না, যদুবংশের মহামানবের কথাই যেমন শেষ কথা না, বর্তমানের কোনও মহামানবের কথাই সব সত্য না। এমনকী তার বিজ্ঞানভিত্তিক বিচারও না। আগেও কোটিকে স্বর্গের লোভ দেখানো হয়েছে, আজও আর-এক রূপে সেই স্বর্গেরই লোভ দেখানো হচ্ছে, যে সত্যের স্বরূপও সদা পরিবর্তনশীল। মনে রেখো, উনিশশো সত্তর খ্রিস্টাব্দের বিশেষ কোনও অবস্থায় দাঁড়িয়ে, আমি এ সব কথা বলছি। অন্য যে কোনও অস্ত্রের কথা বাদ দিচ্ছি, এমন শ্লোগানও তো কোনও না কোনও ভাবে শুনতে হচ্ছে, 'দূর-পাল্লার আণবিক ক্ষেপণাস্ত্রই শক্তির উৎস'। কিন্তু শ্লোগান যারা দিচ্ছে, তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ, দম্ভের মুখোশের আড়ালে, বাঁচবার কী করুণ অভিব্যক্তি। অথচ, মানুষের বসতি এই পৃথিবী ধ্বংসের অস্ত্র মানুষই তৈরি করেছে। এবং নিজেরাই সেই অস্ত্রের ভয়ে কাঁপছে। তথাপি, এই নয় যে, কোটি গোটির স্বেচ্ছাচারকে মেনে নেবে। সে অচলায়তন ভাঙবার জন্য, আমরা ভারতীয়রা, আমাদের পথ খুঁজে নেব, নিচ্ছি। কিন্তু নীচের ঈর্ষা এবং যোদ্ধার ঘৃণাকে যেমন এক করে ফেলা যায় না, তেমনি গোটির ধ্বংসের জন্য আন্তর্জাতিকতার নীতির নলে গুলির আশা করব না, আমরা নিজেরাই নীতি সৃষ্টি করব|

মানুষই সব কিছুর স্রষ্টা, সব কিছুর থেকে মানুষই বড়। ইতিহাসের বহু স্তম্ভ আর সিংহাসন সে ভেঙেছে, আরও অনেক গড়বে এবং ভাঙবে। কিন্তু তথাপি, তার সেই স্বর্গলাভ কখনও হবে না, যে স্বর্গের লোভ তাকে দেখানো হয়। সেই হিসাবে, মানুষ চিরকালই অসহায়।

মানুষ যে সব থেকে বড় শক্তির উৎস, তার প্রমাণ, সে যুগে যুগেই তার অসহায়তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, করবে। (॥ বারো॥ পৃ.১৬৩-১৬৪)

বাড়ির কাছে আততায়ীর গুলিতে সজল নিহত হওয়ার পর সুবীর সম্পর্কে যমুনার মোহমুক্তি ঘটে। হাসপাতালে সজলের রক্তে ভেজা মৃতদেহ দেখে সে রমুর বলা কথার অর্থ বুঝতে পারে। সুবীরের দলের ভ্রান্তি প্রত্যক্ষ করে এর ভবিষ্যৎ অনিবার্য ব্যর্থ পরিণাম যমুনার কাছে স্পষ্ট হয়েছে। সজলের চিঠির সব অর্থ সে বুঝতে পারে, উপলব্ধি করে তার আদর্শ, বিশ্বাসকেও। সুবীরের শক্তির উৎস আজ যমুনা বুঝেছে : অস্ত্র সুবীরের একমাত্র শক্তি বলেই সজলের মাধ্যমে তার কাছে রাখা অস্ত্র সে নিতে এসেছিল। তার চোখে ভয় দেখে সজলের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে নতুন একটা পর্বের সূত্রপাত হয়েছে—এ বিশ্বাসবোধ থেকেই সুবীর-শক্তিকে বিনাশ করবার ইচ্ছা জাগে তার মাঝে :

Dhaka University Institutional Repository

না, শেষ না, আর একটা পর্বের শুরু। সুবীরের ভিতরের কাঠখড় সব আমি দেখতে পাচ্ছি। ওর রং লাগানো মাটি সব সজলের রক্তে ধুয়ে গিয়েছে। ও ভয় পেয়ে, রাত্রে আমার কাছ থেকে অস্ত্র দুটো নিয়ে গিয়েছে। ভোর হয়ে আসছে। অস্ত্রে আমার দরকার নেই। নিরস্ত্র অবস্থাতেই আমি ওর কাঠামো টুকরো টুকরো করব। ওর শক্তির উৎস আমি বুঝে নিয়েছি। ওর শক্তির উৎস—হত্যা হত্যা হত্যা। নিশ্চিহ্ন করা, যে কোনও প্রতিবন্ধক, যে কোনও বিরোধিতা। বেঁচে থাকবারও একটা মিনিমাম অধিকার থাকা চাই। সুবীরের তাও নেই। (॥ বারো ॥ পৃ.১৬৪)

সুবীরের মতো চরমপন্থী নেতাদের কথায় বুদ্ধিহীন আবেগ-জড়ানো রাজনীতিতে অনুপ্রাণিত হয় হরিশের মাতৃহারা ছেলে হিরণ—খোকন। সশস্ত্র 'নিঃশব্দ ভয়ংকর শার্দূল' খুন করে সজলকে। সজলকে হত্যার কারণে শেষ পর্যন্ত দলীয় সিদ্ধান্তে তাকেও নিহত হতে হয়। সুবীরের খোঁজে এসে এক নির্মম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় যমুনা। অন্ধকারে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে পুত্রের মৃতদেহের পাশে থাকা হরিশও উপলব্ধি করে এ অপরাধের কারণ পার্টির ভুল নীতি ও কৌশল। এ কারণে তার খোকনের মতো অসংখ্য খোকনে 'দেশ ছেয়ে আছে'। কাজেই সে নিজেও এ হত্যার অংশীদার। অসহায় পিতার শোকের মাঝে যমুনার নিজের শোক একাকার হয়ে যায়। যমুনার শেষ অন্তর্কথন :

আমি আবার হিরণের দিকে তাকালাম। সামান্য আলোর রেশে, ওকে দেখে, সজলের মতোই মৃত্যুর কোলে শান্ত দেখছি। ওর প্রতি আমি কখনও প্রীতি বোধ করিনি। সে রকম কোনও সুযোগও ও আমাকে দেয়নি। ওকে আমার বরাবরই একটি নিঃশব্দ ভয়ংকর শার্দূলের মতো মনে হয়েছে, এবং সামান্য দু-একবার যেটুকু গর্জন শুনেছি, তা আমার কাছে কখনও শুভ মনে হয়নি। কেঁপে উঠেছিলাম, মনে মনে, এক বার ওর সংকেতময় কথা শুনে, শ্রেণিশত্রুর অস্তিত্ব নাশ, যা সজলকে উদ্দেশ করেই বলেছিল। ওকে আমি ঘৃণা করতে পারছি না, ওর প্রতি আমার রাগ হচ্ছে না, আমি ওর ভিতরের আন্তরিক আর আগুন-ভরা প্রেরণার কথা ভাবছি। বিশ্বাসের সঙ্গে ওর হৃদয়াবেগের যতটা গাঢ়তা ছিল, বিচারবুদ্ধি তার সঙ্গে একটুও ছিল না। ওর নিজের মৃত্যুভয় ছিল না, সজলকে হত্যা, ওর কাছে পুণ্যের রূপ নিয়েছিল। আর কী দেখছি? সুবীরের অনিবার্য পরাজয় মেঝেয় গড়াচ্ছে।...

আমার চোখে আর আগুনের জ্বালা বোধ করছি না। মানুষের শক্তির কথা ভাবছি। যে শক্তি তার নিরন্তর অসহায়তার বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল। (॥ বারো ॥ পৃ.১৬৫)

উল্লেখিত অভিমতসমূহের জন্য : বিশেষত স্বাতন্ত্র্যবর্জিত মৌমাছিতন্ত্র, পার্টিতে কৌশল ও রণনীতির সমালোচনার অধিকার না-থাকা, অব্যাহত পার্টিদ্বন্দ্ব ও নির্বিচারে শ্রেণিশত্রু হত্যার বিরোধিতা করা, জনবিচ্ছিন্ন সশস্ত্রযুদ্ধ যে ব্যর্থ হতে বাধ্য প্রভৃতি অভিমতের জন্য—অতিবামপন্থী ও নকশালপন্থী বুদ্ধিজীবী-কর্মীদের দ্বারা সমরেশ বসুকে প্রতিক্রিয়াশীল, বিশ্বাসের সংকটাক্রান্ত, সুবিধাবাদী হিসেবে ধিক্কৃত হতে হয়েছে। জীবননাশের হুমকিতে নিরাপত্তার জন্য কলকাতা ত্যাগও করতে হয় তাঁকে। ক্ষুব্ধ বিস্মিত বেদনাভারাক্রান্ত সমরেশ বলেছিলেন :[১০]

...যদি লিখতেই না পারলাম, তবে বেঁচে থেকে লাভ কী। কোথাও গিয়ে আত্মস্থ হয়ে ভাবতে চাই, লিখতে চাই। এরা কি মনে করে দু'পাঁচটা সমরেশ বসুকে মেরে বিপ্লব করবে, শোষণমুক্ত সমাজ গড়বে। কেন এরা এমন ভাবছে। এরা তো মূর্খ বা অবুঝ নয়।

অথচ পার্টির অভ্যন্তরে রণনীতি, কর্মপদ্ধতি, রণকৌশল বিষয়ে আত্মসমালোচনার গুরুত্ব সম্পর্কে চারু মজুমদার, ৩ এপ্রিল ১৯৬৯ তারিখে, দলিল/রচনা নং ১০-এর (ঘ) অনুচ্ছেদে লেখেন : পার্টির মধ্যে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার আবহাওয়া সৃষ্টি না করে বৈপ্লবিক পার্টি গড়ে তোলার দায়িত্ব কার্যত অস্বীকার করা হচ্ছে।[১১]

চারু মজুমদার স্বয়ং গ্রেফতারের পূর্বে উপলব্ধি করেছিলেন :[১২]

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর শেষ প্রকাশিত লেখা 'জনগণের স্বার্থই পার্টির স্বার্থ'য় (৯ জুন ১৯৭২) যাঁদের একদা 'মধ্যপন্থী' বলে অভিযুক্ত করেছিলেন, তাদের সঙ্গেও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে নামতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন—যারা একসময় আমাদের প্রতি শত্রুতা করেছে বিশেষ পরিস্থিতিতে তারাও আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসবে। এইসব শত্রুর সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মত মনের প্রসারতা রাখতে হবে।

প্রাক্‌পরিগৃহীত মতবাদ দিয়ে সৃষ্টিশীল মুক্ত চিন্তা এবং শিল্পসৃষ্টি বিবেচনা করা অসম্ভবপ্রায় হয়ে ওঠে। সেখানে নতুন চিন্তাকে গ্রহণের প্রশ্নে মনস্তাত্ত্বিক উত্তেজনা, আক্রমণাত্মক মনোভাব কাজ করে। অথচ ইতিহাস আজ অনেকাংশে সমরেশ বসুর ভাবনার ও আদর্শের সাক্ষ্য দেয়।

gvbl kw³i Drm উপন্যাসের আখ্যান-বিন্যাস ও চরিত্রায়ণের প্রশ্নে সমরেশ বসুর মনস্তত্ত্বে একটা দ্বৈরথ ছিল, ছিল বিকশিত পরিণতির প্রশ্নে এক ধরনের দ্রুততা, অস্থিরতা। কৃষ্ণনগরের অকিঞ্চিৎকর এক পরিবারের মেয়ে যমুনা শহর কলকাতায় বেড়ে-ওঠা ও উচ্চবিত্ত পরিবারের যাপিতজীবনের অন্তর্কথনের মধ্যদিয়ে তার পরিণামকে, ছোটো ছোটো ঘটনার অগ্রগতি ও বিপ্রতীপতার ঘূর্ণিসংঘাতে চিহ্নিত করেছেন ঔপন্যাসিক। প্রথমত, এগারো পরিচ্ছেদ পর্যন্ত যমুনাকে রাজনীতি-নিস্পৃহ ভাবাবেগ-বিহ্বল ও প্রণয়মুগ্ধ হিসেবে উপস্থিত করেছেন লেখক। অংশুমালী গুপ্ত-উপাখ্যানের শরীরী উৎসব, কিংবা অংশুমালী-পরিত্যক্ত যমুনার অতিদ্রুত সজলের দিকে আকৃষ্ট হওয়া এবং সাক্ষাৎমাত্র সুবীরের প্রতি মুগ্ধতার এবং সজলকে না-বিপ্লবী হিসেবে তুচ্ছ ভেবে পরিত্যাগ করার মধ্যে লক্ষমুখিতার শিল্পিত সাক্ষ্য সন্ধান দুরূহ। দ্বিতীয়ত, শেষ পরিচ্ছেদ অর্থাৎ বারো পরিচ্ছেদের সাড়ে তিন পৃষ্ঠার মধ্যে, মূলত সজলের শেষ চিঠির মধ্যদিয়ে ও তার খুনের প্রতিক্রিয়ায় যমুনার বোধ হল, "মানুষের শক্তির কথা ভাবছি। যে শক্তি তার নিরন্তর অসহায়তার বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল।" এ দর্শন সজল আগেই জানিয়েছিল। কেন্দ্রীয় চরিত্র সজলই উপন্যাসের মৌল প্রতিপাদ্যের নিয়ামক, অনুঘটক; যমুনা নয়। তাহলে যমুনা-চরিত্র নির্মাণের জন্য এত পরিসর ব্যয় কেন? সমরেশ বসু হয়তো যমুনাকে দিয়ে weei-cRvcwZ-cvZK জাতীয় উপন্যাসের অন্তর্কথন ভঙ্গিতে ভিন্ন আঙ্গিকে নকশাল আন্দোলনের জনবিচ্ছিন্ন রণনীতি ও শ্রেণিশত্রু বিনাশের আখ্যান রচনা করতে চেয়েছিলেন—এটাই মনে হয় ঔপন্যাসিকের 'আসল দায়িত্ব পালন'। বোধ করি নন্দনতাত্ত্বিক নয়, আরোপিত কোনো তাগিদে এগারো-বারো পরিচ্ছেদে উপন্যাস সমাপ্ত করেছেন। সমরেশ বসু এই বিলম্বিত দায়িত্ব সম্পন্ন-করার দৌর্বল্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, বইটির প্রারম্ভের ভূমিকা এ প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ :

...সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে না পারায়, আমার এই উপন্যাসটি অনেক খানি ছাপা হয়েও, অসমাপ্ত হয়ে পড়ে ছিল; কারণ আমি নিশ্চিতরূপে বোধ করেছিলাম, উপন্যাসটি আমাকে আরো কিছু দায়িত্ববোধ নিয়ে শেষ করতে হবে। সেই দায়িত্ববোধ পালন করতে গিয়ে, প্রকাশন ব্যাপারে অযাচিত বিলম্ব হওয়ায়, বইটির আঙ্গিক সৌষ্ঠবে কিছু ত্রুটি ঘটতে পারে। সর্বোপরি, বইটি শেষ করে, আসল দায়িত্ব পালনে সক্ষম হলাম কি না, সে বিচারে পাঠক কখনোই রচয়িতার ত্রুটি স্বীকারে কর্ণপাত করেন না, অতএব আমার আর বলারও কিছু থাকে না। (সমরেশ বসু রচনাবলী ৭, গ্রন্থপরিচিতি, পৃ.৮২৫)

স্মরণ করা যেতে পারে, ঔপন্যাসিকের শিল্পদৃষ্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মবিরোধ উপন্যাসশিল্পের আঙ্গিকসামঞ্জস্য, চরিত্রাঙ্কন সাফল্য ও ভাবঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর।[১৩] এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিশক্তির ঐকান্তিকতা ও সমগ্রতা বাঞ্ছনীয় ছিল। একটু সতর্ক হলেই স্পষ্ট হয়, সমরেশ-সাহিত্য সমালোচকগণ তাঁর রাজনৈতিক সংকট নিয়ে যত চুলচেরা বিশ্লেষণ ও বিতর্ক করেছেন, তাঁর নন্দন-প্রতিভা বিবেচনা ততোধিক উপেক্ষিত হয়েছে।

মহাকালের রথের ঘোড়া

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতার প্রান্তপ্রায় জেলা দার্জিলিং-এর ১২০ কিলোমিটার দূরে শিলিগুড়ির অবস্থান; এই মহকুমাতেই নকশালবাড়ি। ১৯৬৭ সালের ২৫ মে-র পর থেকে স্বপ্নময় বাঙালির কাছে নকশালবাড়ি একটি কৃষক আন্দোলনের অধুনা 'পুরাণে' রূপ লাভ করে, পরিণত রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং তার প্রয়োগরীতির নতুন অভিজ্ঞানে পরিণত হয়। ২৩ ও ২৪ মে আদিবাসী কৃষকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। এক পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর তীরবিদ্ধ হলে পুলিশ চারদিক বেষ্টন করে গ্রাম আক্রমণ করে। নারী ও শিশুসহ ১০ জনের মৃত্যু হয়। এর পর থেকে নকশালবাড়ি কেবল স্থান নাম নয়, রাজনৈতিক কর্মসঞ্চালনের একটি প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমে নকশাল আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। সময়টা ছিল পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমল (১৯৬৭-৬৯)। গোড়ায় সশস্ত্র এই বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার কয়েকজন সদস্য। উগ্রপন্থী সেইসব সদস্যরা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম সহায়ক সমিতি নামে পৃথক একটি গুপ্ত মার্কসবাদী পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত করেন (নভেম্বর ১৯৬৭), তাঁদের অধিকাংশই গ্রেপ্তার হন। জেল থেকে মুক্তির পর তাঁরা দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) গঠন করেন। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের মে দিবসে এক জনসভায় উক্ত পার্টি প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষিত হয়। সি পি আই (এম)-কে নয়া-শোধনবাদী দল আখ্যা দেওয়া হয়। দলছুট বিক্ষুব্ধ কর্মীদের সি পি আই (এম) অতিবাম, হঠকারী ও বাস্তব চিন্তাশক্তিবিহীন বলে সমালোচনা করে।

যদিও নকশালবাড়ি আন্দোলন ও রণনীতি এবং নকশালপন্থীদের জীবন ও মতাদর্শ উপজীব্য করে অনেক গল্প উপন্যাস রচিত হয়েছে, কিন্তু খোদ নকশালবাড়ির ভৌগোলিক পরিবেষ্টনীতে বেড়ে ওঠা কোনো মানুষকে অবলম্বন করে লেখা উপন্যাস বড়ো একটা চোখে পড়ে না। সমরেশ বসুর gnvKv‡j i i‡_ †Nvov[১৪] রুহিতন কুরমি এর ব্যতিক্রম।[১৫] রাজনৈতিক-সামাজিক-ইতিহাস সৃষ্টিকারী নকশাল আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী নায়ক রুহিতন কুরমির রাজনৈতিক জীবনেতিহাস ও অভিজ্ঞতা অনুধ্যানসূত্রে সমরেশ বসু প্রকৃত অর্থে নকশালবাড়ি আন্দোলনের উৎস উদ্‌ঘাটন ও সেই সঙ্গে এর পরিণামী ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানেও মনোযোগী হয়েছেন gnvKv‡j i i‡_ i †Nvov উপন্যাসে। নকশালন্থীরা সাধারণ মানুষকে সংসদীয় রাজনীতির পরিবর্তে গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতিতে সশস্ত্র কৃষিবিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল সে স্বপ্নের অংশী রুহিতন কুরমি আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। কোনো দল বা মতের সমালোচক হিসেবে নয়, প্রায় সাড়ে আট বছরের কারাবাসকালীন অভিজ্ঞতায় এ আন্দোলনের ব্যর্থতা, দলীয় অন্তর্কলহ ও সদস্যদের অন্তর্ঘাতী বিশ্বাসঘাতকতায় শেষ পর্যন্ত তার রাজনৈতিক সত্তায় জেগে-ওঠা বিচ্ছিন্নতাবোধ, একাকিত্ব, প্রকৃতি ও পরিবার ছিন্নতার অন্তর্দহনকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-সঞ্চরণশীলতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগোত্তরকালে তেভাগা ও তেলেঙ্গানার মতো কৃষক বিদ্রোহ, শ্রমিক আন্দোলনসহ বিচিত্র ঘটনাধারার ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও সি পি আই (এম-এল) কিংবা সি পি আই (এম) অথবা অন্য কোনো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিই নকশালবাড়ি বিপ্লবকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়নি। এ ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান, পার্টির রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কে মতদ্বৈধতা, নেতৃত্বের প্রতি অসন্তোষ থেকে ধীরে ধীরে পার্টি সদস্যদের মধ্যে দুটো পরস্পরবিরোধী প্রবণতা গড়ে ওঠে। একদিকে ছিল পার্টি নেতৃত্বের সংসদসর্বস্ব রাজনীতি যা মূলত প্রচলিত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েই নির্বাচনমুখী হয়ে সরকার গঠনের প্রত্যাশী—এক্ষেত্রে গণসংগ্রামগুলো জনসমর্থনের মাধ্যমে ভোট সংগ্রহের দিকে বেশি মনোযোগী হয়। অন্যদিকে ছিল বিপ্লববাদী আদর্শের দ্বারা তথা প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রামের

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর রূপান্তর সাধনের রাজনীতি। এ দ্বিতীয় আদর্শেরই পরিণতি হল নকশাল আন্দোলন।[১৬] ১৯৬৭ খ্রি মে মাসে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় নেপাল সীমানা সংলগ্ন তরাই অঞ্চলে শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া থানা এলাকায় মুক্তাঞ্চল গড়ার স্বপ্ন নিয়ে যে স্ফুলিঙ্গের সূত্রপাত ঘটেছিল তা ধীরে ধীরে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের জন্মস্থল নকশালবাড়ির পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে চুনীলাল মৌজানিবাসী রুহিতন কুরমিও এ আন্দোলনের 'একজন বিশ্বস্ত যোদ্ধা' হয়ে ওঠে। কিন্তু 'মহাকালের রথ টেনে' চললেও দলীয় মতপার্থক্য-বিশ্বাসঘাতকতা ও বিরুদ্ধ অশুভ শক্তির কারণে প্রান্তিক এসব গণমানুষের স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত অচরিতার্থই থেকে যায়।

gnvKv‡ji i‡_i †Nvov উপন্যাসের অন্তর্বয়নে ঔপন্যাসিক কারাবন্দি রুহিতন কুরমির জীবন-পরিক্রমায় বিপ্লব-মুক্তির স্বপ্ন-জীবন-পরিবার ও প্রকৃতির এক অসাধারণ সমন্বয় ঘটিয়েছেন। জেল থেকে জেলান্তরে গাড়িতে নেওয়ার পথে, রুহিতন কুরমির উল্লম্ফনধর্মী স্মৃতি ও সামূহিক নির্জ্ঞানস্রোত এবং আনুভূমিক বিচিত্র কোলাজে সৃষ্টি হয়েছে এ উপন্যাসের কাহিনি ও প্রকরণ। gnvKv‡ji i‡_i †Nvov-র ঘটনা ভঙ্গুর, চরিত্র-চিত্ত দ্বিধাজীর্ণ ও ভগ্নপ্রত্যাশায় সক্রিয়। পুলিশ-নির্যাতিত, কুষ্ঠপীড়িত বন্দি রুহিতন কুরমির স্মৃতিজালে আটকে-পড়া শব্দ-বাক্য-পরিচ্ছেদের ভাবনাস্রোতে রূপ লাভ করেছে নকশাল আন্দোলনের নির্মম ব্যর্থতার কারণ ও তার বিশ্লেষণ। ছেঁড়া-খোড়া, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন স্মৃতিস্রোত হাতড়ে পাঠককে গড়ে নিতে হয় কাহিনি-পারম্পর্য।

আখ্যান বিন্যাস প্রথমত, পুলিশের চলমান জিপ গাড়িতে ডাণ্ডাবেড়ি ও হ্যান্ডকাপ-পরা রুহিতনের চিন্তার স্রোত-প্রতিস্রোত; দ্বিতীয়ত, কলকাতার জেলে কুষ্ঠরোগ শনাক্ত হবার পরের অবস্থান ও রাজনীতির অন্তর্দহন এবং শেষ পর্যায় রুহিতন কুরমির সাড়ে আট বছরের বন্দি জীবনের অবসানের পর চুনীলাল মৌজার গ্রামে, পরিবার-সমাজ-প্রকৃতির মুক্তাঞ্চল-স্বপ্নের বিকীর্ণ অবসান। gnvKv‡ji i‡_i †Nvov সংবেদ, প্রজ্ঞা, হৃদয়সংবেদ্যতা ও মস্তিষ্কশ্রমের নান্দনিকতায় স্বাবলম্ব ও স্বতন্ত্র।

পুলিশের চলমান জিপ গাড়িতে ডাণ্ডাবেড়ি ও হ্যান্ডকাপ-পরা রুহিতনের, রাত্রিশেষের, চিন্তাস্রোতের শব্দরূপ দিয়েই gnvKv‡ji i‡_i †Nvovর শুরু :

> বন্দিরা সকলেই তার জেলের বাইরের পরিচিত ছিল না, দু জন ছাড়া। কিন্তু সকলের ওপর একই শ্রেণীর অভিযোগ ছিল। খুন জখম লুট আগুন লাগানো অরাজকতা সৃষ্টি করা। এবং সর্বোপরি রাজদ্রোহিতা, বলপূর্বক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। সকলের উদ্দেশ্যও এক, অতএব তারা সমধর্মী। যদিও রুহিতন এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিল না সকলেই তারা সমধর্মী, সকলেরই এক উদ্দেশ্য, সকলেই দলের। কথাটা ভাবলেই দাঁতে দাঁত চেপে বসে। চোখের কোণে অনিবার্য সন্দেহ ধারালো হয়ে ওঠে। বুকের মধ্যে ঝলকিয়ে ওঠে ঘৃণা। কারণ অভিজ্ঞতা বড় তিক্ত। বিশ্বাসঘাতকতা আর ক্ষতির পরিমাণ ভয়াবহ, যার কোনও বদলা নেই। পাহাড়ের জোঁকের মতোই অনেক তথাকথিত সমধর্মী ঘাসের সঙ্গে ঘাসের রঙে মিশে থাকে। খাঁটি আর ভেজালে আলাদা করা কঠিন। লাল মাটির সঙ্গে মিশে থাকা মেটে বোরার মতো। এমনকী তার আচমকা ফণাও নেই। হিসিয়ে বা উঁচিয়ে ওঠে না দুরন্ত ফণা। যে সাপগুলোকে সাহসী দর্পী মনে হয়। এই লাল মেটে সাপগুলো, বা ঘাস-রং পাহাড়ি জোঁকগুলো বাইরের থেকে আমদানি করা দালাল। কর্তৃপক্ষের পোষা, ইশারায় চলে। এরা অজানতেই ছোবল মারে। (পৃ.১৬৯)

"রুহিতন সাবধান, সচেতন, তবু সবাইকে সে বিশ্বাস করতে চায়, বন্ধুর মতো থাকতে চায়। যদিও কোনও কোনও বন্দির ক্ষেত্রে তা প্রায় অসম্ভব। সে নিরুপায়। কিন্তু সাতদিন আগে, ওয়ার্ডারের মুখে কথাটা শুনে, বন্দিদের সঙ্গে সে কেন চোখাচোখি করেছিল, অথবা অন্য বন্দিরাই বা কেন, সে কি জানত? তার এবং অন্তত কয়েকজন বন্দির চোখগুলো হঠাৎ কেমন ঝিলিক হেনে উঠেছিল। কেন? কেনই বা

Dhaka University Institutional Repository

রুহিতনের বুকে ঢাকের বাদ্যির মতো ধকধকিয়ে উঠেছিল? কোনও দুরন্ত আশা? না, কোনো ভীষণ ভয়?" (পৃ.১৬৯)

ভয়? রুহিতন কুরমি সে। তাসের নামে রুহিতনের নাম রেখেছিল ঠাকুরদা। ঠাকুরদা ছিল তিন পুরুষের চা বাগানের শ্রমিক। বাবা পোশ্‌পত্‌কে (পশুপতি) নিয়ে তরাইয়ের চা বাগানে চার পুরুষ; রুহিতন কিছুদিন বাবার সঙ্গে কৈশোরে চা-বাগানে কাজ করেছিল, সে হিসেবে পাঁচ পুরুষ। শ্রমিক হিসেবে কাজ করা পশুপতি কুরমির একখণ্ড ভূমির স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্ন থেকেই সে চাষাবাদের কাজে লেগেছিল। জমির স্বত্ব না থাকলেও কোরফা রায়ত হিসেবেই সেই স্বপ্ন পূরণের পথে হেঁটেছিল তার বাবা :

...তার বাবা পোশ্‌পত্‌ (পশুপতি) প্রথম বাগানের কাজ ছেড়ে, আবাদের কাজে লেগেছিল। চা বাগান ছাড়িয়ে ভিতর দিকে, নদীর কিনারে। রুহিতনও আর কখনও চা বাগানে ফিরে যায়নি। সে বাবার সঙ্গে চাষ আবাদের কাজেই লেগে গিয়েছিল। চাষ-আবাদ মানেই ঘর গৃহস্থালি। চা বাগানের জীবন না। এক টুকরো জমি পোশ্‌পত্‌ কুরমি কোরফা রায়ত হিসাবে জোগাড় করতে পেরেছিল। সামান্য এক টুকরো, ভূমিহীন কৃষক নাম ঘোচানোর মতো যথেষ্ট না। জোতদারদের জমি চাষ করাই ছিল আসল কাজ। তবু চার পুরুষের সেই পরিবর্তনের মধ্যে, নিজেকে ফিরে পাবার একটা নতুনের স্বাদ আর উৎসাহ ছিল। ছিল স্থিতি আর স্থায়িত্বের একটা আশা। নেশা না, একটা তৃষ্ণা জমি-চাষ-আবাদ সম্পন্ন গৃহস্থালি। রক্তের মধ্যে এই তৃষ্ণা।

সেই জায়গাটির নাম এখন দুনিয়া জানে। যেখান থেকে রুহিতনদের বাস ছিল, নীচের দক্ষিণ-পূর্বে। তরাইয়ের মেচি নদীর বালুচর থেকে, ঝোরা গা বেয়ে উঁচুতে উঠে যাওয়া বন ঘেরা অঞ্চল। সেই জায়গাটার মতোই, দুনিয়া এখন রুহিতন কুরমির নামটাও জানে। (পৃ.১৬৯-৭০)

স্মৃতি নয়, দুবার জেল পলাতক রুহিতন বর্তমানের আশা ও আশঙ্কার কথা ভাবে। মারা আর মরা, লড়াইয়ে এটা সমার্থক। মারতে হলে যেমন মরতে হয়, তেমনি মারার জন্য বাঁচতে হয়। বন্ধুদের মৃত্যু দেখে সে বাঁচার দরকার কেন তা জেনেছে। জেলের বাইরে মৃত্যু ছিল পায়ে পায়ে। জেলের ভিতরে ছায়ার মতো পায়ে পায়ে। ভয় আর মৃত্যু সমান। দুটোই সে জীবন থেকে খারিজ করেছে :

ভয় না, একটা তীক্ষ্ণ সন্দেহ ঝলকিয়ে উঠেছিল। তার সঙ্গে নিশ্চয়ই একটা আশা! যত সামান্য হোক, সেই আশার নাম মুক্তি। অথবা পলায়ন। অথবা একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ। সেই জন্যই চোখগুলো ঝিলিক হেনে উঠেছিল। আর সন্দেহের কারণ খতম। অন্য জেলে নিয়ে যাওয়ার নাম করে, চিরদিনের জন্য লোপাট। পুলিশি খতমের এটা একটি পদ্ধতি। এক জেল থেকে আর এক জেলে নিয়ে যাওয়ার পথে, কোনও গভীর জঙ্গলে, গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে, অথবা কোনও খরস্রোতা নদীর পাড়ে—অন্ধকার রাত্রে, কোমরের বেল্ট থেকে খোলা 'চেম্বার'-এর কয়েকটা গুড়ুম গুড়ুম শব্দ। ওরা বড় সুখী। কেউ কোনও দিন জানবে না, রুহিতন কুরমি কোন জেলে আছে।...একটি ঘোষণা : 'রুহিতন কুরমি পলাতক।' (পৃ.১৭০)

ইতোমধ্যে দুবার পালাতে ব্যর্থ হয়েছে রুহিতন। কারা কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তার স্বার্থে এবং নির্যাতনের অংশ হিসেবে, এরপর থেকেই ডাণ্ডা-বেড়ি পরতে হয়েছিল। সেখানকার নির্যাতন থেকেই তার শারীরিক অসুস্থতার সূত্রপাত ঘটে। নকশালপন্থীদের উপর পুলিশি নির্যাতনের বিচিত্র পদ্ধতি—গুপ্তহত্যা, খুন, গুম শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের সংবাদ পাওয়া যায় রুহিতন কুরমি মাহাতোর স্মৃতিভাবনায় :

ধরা পড়ে, জেলে আসার পরেও অনেকদিন সে ঘুমোতে পারেনি। ঘুমানো সম্ভবও ছিল না। ঘুমোতে দেওয়া হত না। জিজ্ঞাসাবাদ আর তার কায়িক পদ্ধতিগুলো এমন ছিল, ঘুম আসত না। কখনও কখনও ওরা ঘুমের ওষুধ দিলে আলাদা কথা। ইদানীং সে জেলের মধ্যে ঘুমাত। খাঁচার বাঘ যেমন পদচারণা করতে করতে এক সময় ক্লান্তিতে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। যে ঘুমে, ঘুমের সুখ নেই। নিশ্চিন্তি নেই। কারণ মেচি নদীর দূর তীরের জঙ্গল উত্তর আর দক্ষিণ আর পশ্চিমের তরাইয়ের দিগবিসারি কর্ষিত ভূমি, জঙ্গল আর ঝোরার কলকলানি অষ্টপ্রহর হাতছানি দেয়। প্রতি মুহূর্তেই দেয়। দু

Dhaka University Institutional Repository

বার দুই জেলে মোক্ষম হাতছানির মার সামলাতে গিয়ে রক্তাক্ত অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকতে হয়েছিল। অথচ মরেনি। সেজন্য তার বন্ধুরাই সব থেকে আশ্চর্য হয়েছিল। দুবারের চেষ্টাই ছিল খুব কাঁচা, তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। (পৃ.১৭০)

রুহিতন এখন চলন্ত জিপ গাড়িতে। মস্তিষ্কে স্মৃতির সঞ্চারণ, বর্তমান প্রবেশ করছে তার চেতনাপ্রবাহে। কুরমি মাহাতোর পায়ে বেড়ি পরানো। দুহাতে পরানো হ্যান্ড-কাফ। শেষ রাত্রির হাওয়ায় আরাম লাগবার কথা, অথচ শীত শীত লাগছে। সাত বছর জেলবাসের মধ্যে বছর খানেক জ্বর জ্বর লাগে। পুলিশ সশস্ত্র পুলিশসহ উচ্চ পদস্থ অফিসার তাকে তিনদিন ধরে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে। এখানেই যাত্রার শেষ নয়। আজ থেকে সাতদিন আগে সেল থেকে বের করে ওয়ার্ডার তাকে অন্য জেলে পাঠানোর কথা বলেছিল। এখানেই তন্দ্রার ঘোরে রিভলবারধারী খাকি পোশাক-পরা অফিসারকে দেখেছিল। অনুষঙ্গে রুহিতনের স্মৃতিতে জেগে ওঠে—যুদ্ধ, পরাজয়, বন্দি-হওয়া, নির্যাতনের চেতনাস্রোত :

অফিসারটিকে চিনতে পেরেছিল সে। না চেনবার কোনও কারণ ছিল না। এইবার নিয়ে লোকটির সঙ্গে তার চার বার দেখা। প্রথম দেখেছিল বছর দশেক আগে। লোকটি তখন ছিল খড়িবাড়ি থানার একজন দারোগা। ছোটবাবু। ...তিন বছর পরে, রুহিতন যখন যুদ্ধ করে ধরা পড়েছিল, তখন এই লোকটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। রুহিতন একলাই রক্তাক্ত ছিল না। এই লোকটিও রক্তাক্ত ছিল। লোকটির কাঁধের কাছে রুহিতনদেরই কারোর হাতের ধনুক থেকে তীর বিঁধেছিল। নিশ্চয়ই বিষমাখা তীর ছিল না। তা হলে লোকটির বেঁচে থাকার কথা না। আক্রমণটা আচমকা ঘটেছিল। প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হওয়াই যায়নি। উপরন্তু রুহিতনদের বহু অস্ত্র ধরা পড়ে গিয়েছিল। এই লোকটির হাতে তার রিভলবার এমনভাবে উদ্যত হয়েছিল, যেন যে কোনও মুহূর্তে রুহিতনদের কারোকে গুলি করতে পারত। কিন্তু তার কোনও দরকার ছিল না। ধৃত রুহিতনরা এমনিতেই পর্যুদস্ত ছিল। প্রহারে প্রহারে ছিল জর্জরিত। রুহিতনের দিকেই ওদের লক্ষ্য ছিল বেশি। অবিশ্যি রুহিতন নিজে কখনওই তার নাম বলেনি, বরং পরিচয় অস্বীকারই করেছিল। তাতে অবিশ্যি কোনও ফল হয়নি। এই লোকটি তার চেম্বার তুলে, দাঁতে দাঁত পিষে বলেছিল, 'তুমি যদি রুহিতন কুরমি না হতে, তা হলে এতক্ষণে তোমার মাথাটা আমি গুলি করে উড়িয়ে দিতাম। আমি নিজে দেখেছি, তোমার হাতে আমাদের একজন হেড কনস্টেবল মরেছে। (পৃ.১৭৩)

মনে পড়ে রুহিতন কুরমির বন্দিজীবনের অমানবিক অত্যাচারের কথা, বিশেষত জিজ্ঞাসাবাদ আর স্বীকারোক্তির পর্যায়ে। "...কিছুক্ষণ মাত্র আগেই, প্রচণ্ড প্রহারে সে জর্জরিত ছিল।...তার শরীরে তখন অসহ্য যন্ত্রণা। বিশেষ করে গুহ্যদ্বারে। সেখানে একটা মোটা রুলের অনেকখানি ঢুকিয়ে চাড় দেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে রক্তপাত হচ্ছিল (পৃ.১৭৪)।" তিনদিন আগে দেখা-হওয়া সেই অফিসার, বন্দি রুহিতনকে নিয়ে ছুটছে; কোনো এক জেলে তাকে পৌঁছে দেয়। তাদের মধ্যে নিচু স্বরের কথা, আবার গর্জন করে ওঠে জিপের ইঞ্জিন। কীসের একটা ঘ্রাণ তাকে উন্মন, উদাসীন করে তুলেছিল :

রুহিতন সে সব কিছুই শুনছিল না। হাতে পায়ে বেড়ি পরানো একলা তার পক্ষে ওদের কথাবার্তা শুনে কিছু লাভও ছিল না। একটা অদ্ভুত গন্ধ তার নাকে আসছিল। খুবই চেনা কোনও ফুলের গন্ধ, নাকি কোনও পাতার গন্ধ, অথবা কোনো গাছের গা থেকে নির্গত রসের গন্ধ, সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে ঘরের বাইরে গেলে, এ গন্ধটা পাওয়া যেত।

রুহিতন গন্ধ পেয়ে ভেবেছিল, সে কখনও আশা করেনি, গন্ধটা কীসের। কিন্তু তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল অনেক ছবি, অনেক মুখ আর আরও অনেক চেনা গন্ধ। (পৃ.১৭৫)

ঘ্রাণের অনুষঙ্গে অতল স্পর্শকাতরতা, প্রকৃতি-পরিবেশ-পরিজন এবং আরও মুখচ্ছবির স্মৃতিতে সমরেশ বসু 'লোকমুখে তরাইয়ের ভয়ংকর দাঁতাল' বলে পরিচিত বিপ্লবী রুহিতন কুরমিকে মানবীয় অস্তিত্বে সংবেদনায় বারংবার জাগ্রত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

রুহিতন জানে না, তাকে নিয়ে এই জিপ উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম কোন দিকে ছুটছে। ভোর রাত। নিরাপত্তার কারণে রাতেই তাদের ছুটে চলা। অফিসার তাকে আবার সিগারেট খাবার কথা বলে। এবার সিগারেটের অনুষঙ্গে চেতনায়-অবচেতনায় জেগে ওঠে মুক্তজীবন আর সংসারের স্মৃতি :

অবশ্যি, একদা বরাবরের নিয়মে এ সময়টা তার ধূমপানের সময়। সে যখন জেলের বাইরে ছিল, কাকপক্ষী ডাকবার আগেই সে ঘুম থেকে উঠত। প্রাকৃতিক কাজ সেরে, চোখে মুখে জল দিয়ে ঘরে ফিরলেই কাঠের আগুনের ধোঁয়ার গন্ধ পেত। একই চালার নীচে তার সংসার। পরিবারের সকলের থাকা খাওয়া রান্না শোয়া আর দুটো বলদের আস্তানা।... সে ডেকে না দিলেও মঙ্গলা উঠে পড়ত ঠিকই। পোড়া মাটির ছোট উনানে কাঠকুটো জ্বেলে, অ্যালুমিনিয়ামের একটা বাটির মুখ ঢেকে জল বসিয়ে দিত। রুহিতনের মা চা খায়। তার বুড়ি মায়ের সঙ্গে নাতি-নাতনিগুলোও হা হা করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু মঙ্গলা চায়ের জল বসিয়েই বলদ দুটোকে খাওয়াতে চলে যেত।

'এই নাও।' সামনের আসন থেকে অফিসারের গলা শোনা গেল।...আর সিগারেটটা এসে ঠেকল রুহিতনের ঠোঁটে। রুহিতন তথাপি চোখ খুলল না। কিন্তু অনিচ্ছা আর অস্বস্তির মধ্যেও ধূমপানের একটা সম্পর্ক আছে। নেই শুধু কাঠের আগুনের সঙ্গে গোবরের গন্ধ। সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছুর গন্ধ। চেনা মানুষদের, গাছপালার, আর...। (পৃ.১৭৭)

অফিসারের জ্বালানো সিগারেট লাইটারের আলোয় নিজের শরীরের কেমন একটা রং দেখতে পায়। সিগারেট খেতে খেতে ভাবে, আজকাল তার জ্বর-জ্বর লাগে। তার বেশি খারাপ লাগে শরীরের 'রক্তহীন বাসি মাংসের মতো মেটে রং।' এরই অনুষঙ্গক্রমে চেতনাপ্রবাহে বলয়িত হয়, টুকারিয়াঝাড়ের দেখা কুৎসিত নোংরা চেরা জিভ লকলকিয়ে ওঠা সাপটির স্মৃতি। মেটে রঙের গায়ে লাল চাকা চাকা ঘায়ের মতো দাগ ছিল। ঠিক কেন্নোর মতো ধীরে ধীরে ভেজা মাটির উপর দিয়ে যাচ্ছিল। সম্প্রতি এই বিশ্রী উপসর্গটা দেখা দেওয়ায়, চোখ বুজলেই, মনে পড়ে—রক্তহীন বাসি কাঁচা মাংসের মতো সেই রং, আর তার সঙ্গেই সেই সাপটা। ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু কুষ্ঠ-আক্রান্ত রুহিতনের সঙ্গে সাপের রঙের প্রতীকী দ্যোতনায়, স্বল্প কথায় ভয়ংকর বিপন্নতাকে অনিশ্চিত জীবনের সর্পিল গতির সঙ্গে বয়ন করেছেন।

জিপের সামনের সিটে বসা পুলিশ অফিসার রুহিতনকে বারংবার তার শারীরিক অসুস্থতার কথা পুনরাবৃত্তি করায়, তার মঙ্গলার কথা মনে পড়ে; কেন না সে ভেষজ দিয়ে চিকিৎসা করত পরিবারের সবার। মাথা ব্যথা হলে উচ্চারিত মন্ত্র এঁকে দিত তার কপালে। রুহিতন জানে যন্ত্রণা প্রশমিত হত, কারণ সেটা ছিল মঙ্গলার স্পর্শ গুণ। জেগে উঠল রুহিতনের মনোস্রোতে—মঙ্গলার মুখ, স্নেহপরায়ণ শান্ত দুটো চোখ, কারো কান্না শুনলেই মণির জলের মতো চোখ দুটো ত্রাসে ভরে উঠত।

মগ্নচৈতন্যের গভীর থেকে উত্থিত এসব দুর্বলতম, সংবেদনাময় স্মৃতিময় অনুভূতির কারণে রুহিতন নিজেকেই ধিক্কার দেয়। সর্বজ্ঞদৃষ্টিকোণের ঔপন্যাসিক, রুহিতনের প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহার করে, সে সব অনুষঙ্গের শব্দরূপ দিয়েছেন :

'তোমার চেহারার মধ্যে কেমন অন্য একটা ভাব এসে গেছে।' সামনের আসন থেকে অফিসারের স্বর ভেসে এল।
রুহিতন মনে মনে চমকিয়ে উঠল। তার নিজের কাছেই অবাক লাগল। বাড়ি—মঙ্গলার কথা ভাবছিল সে? অফিসার লোকটি কি সেই থেকে কথা বলেই যাচ্ছিল নাকি? রুহিতন কিছুই খেয়াল করেনি। অবিশ্যি অফিসারের সঙ্গে কথার জবাব দেবার তার কিছুই ছিল না। কারণ সে কোনও বিষয়েই অফিসারের সঙ্গে কথাবার্তা বা আলোচনা করতে চায় না। তাদের সে সম্পর্ক না। কিন্তু মঙ্গলার কথা কেন ভাবছিল সে? এমনকী, তার বুকের ওপর পড়া মঙ্গলার স্পর্শের কথা, তার নিশ্বাসের গন্ধও যেন সে পাচ্ছিল। কিন্তু এ রকম হওয়া উচিত না। এ সব ভাবনা তার জন্য না। এ সব মনকে দুর্বল করে। তার লড়াই তো কেবল নিজের জীবনকে পণ করে না, তার সমস্ত কিছুকে পণ করে সবাইকে পণ করে। মঙ্গলা আলাদা কিছু না। কেউ না। মঙ্গলা যদি নিজের থেকে আলাদা করে ভাবে বা কিছু করে, তার সঙ্গে রুহিতনের কিছু নেই। কিন্তু মঙ্গলার মধ্যে সে রকম কিছুই দেখা যায়নি। বরং সে ছিল রুহিতনদেরই একজন। ওর সাহসের কথা অনেকেই জানে না। অথচ

Dhaka University Institutional Repository

ইদানীং—হ্যাঁ, ইদানীং-ই রুহিতনের মনের অবস্থা এ রকম হয়েছে। মঙ্গলা, ছেলেমেয়ে আর মায়ের কথা হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়। এত বেশি মনে পড়ে যায়, যেন সবাই তাদের স্পর্শ আর গন্ধ নিয়ে তার সামনে এসে পড়ে। (পৃ.১৮০)

পুলিশের জিপ কলকাতার উপকণ্ঠের রাস্তা ধরে চলছে। পুব আকাশ লাল হয়ে উঠেছে, সূর্যোদয়ের আসন্ন আভা। কথা বলতে বলতে পুলিশ অফিসার বলে, "তোমার বাঁ দিকে। দ্যাখো তো, ওটা কী যাচ্ছে চিনতে পারো কি না এই প্রসঙ্গ-সূত্রেই রুহিতনের স্মৃতিচারণ। চোদ্দ কিংবা পনেরো বছর কিংবা তারও কম সময় হতে পারে রুহিতন একবার মনুমেন্টের পাদদেশে 'জমায়েত'-এ অংশ নিতে কলকাতায় এসেছিল। তখন দিনকাল আর দলের চেহারা ছিল অন্যরকম। তরাইয়ের চা শ্রমিক আর ভূমিহীন কৃষকদের নেতৃত্ব করে নিয়ে এসেছিল সে। তার মাথার উপরে ছিল দিবা (দিবাকর) বাগচি, ভবানী রায়, আরও কেউ কেউ। তরাইয়ের বাগানে আর জোতে, তারাই ছিল সংগঠক নেতা। সঙ্গে ছিল ভাদুয়া মুণ্ডা, চা বাগানের জবরদস্ত লড়িয়ে নেতা। রুহিতনকে দলে এনেছিল দিবা বাগচি। বর্ধমান থেকে কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে, মিছিল করে, হেঁটে এসেছিল মনুমেন্টের নীচে। রুহিতনের জীবনে সেটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা, আশার এবং হতাশার :

কলকাতায় ঢোকবার মুখেই, সেখানকার লোকজনও যেন পাগল হয়ে উঠেছিল। চা বাগানের মালিক বলো আর তরাইয়ের বড় বড় জোতদার বলো, সবাইকে কী তুচ্ছ মনে হয়েছিল। সব মিলিয়ে এমন একটা বিশাল আর প্রচণ্ড শক্তি মনে হয়েছিল, যে কোনও শক্তিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেওয়া যায়। মনের মধ্যে কেমন একটা বেপরোয়া ভাব এসে গিয়েছিল।...

মনুমেন্টের নীচে সভাটা হয়েছিল প্রকাণ্ড। মানুষ মানুষ আর মানুষ। কিন্তু রুহিতন যে কী আশা নিয়ে গিয়েছিল, নিজেই তা জানত না। সভা শেষ হতেই তার মনটা কেমন হতাশায় ভরে উঠেছিল। সভায় অনেক অনেক বক্তৃতা হয়েছিল। কী বেজায় হাততালি আর হইচই, তারপরেই যেন ঠিক ভাঙা মেলার হাল। ফিরে যাবার সময় কলকাতাকে আর মোটেই পাগল হতে দেখা যায়নি। রাত্রিটা মাঠে-ময়দানে শহরের বন্ধ দোকানপাটের আশেপাশে আর স্টেশনে কেটে গিয়েছিল। ফেরবার সময় কেউ আর একটি কথাও ডেকে জিজ্ঞেস করেনি। হাততালি দিয়ে চিৎকার করেও কিছু বলেনি। খাবারও দেয়নি কেউ। (পৃ.১৮১)

সমরেশ বসু একটি কথা বারবার বলার চেষ্টা করেছেন যা gvbl kw³i Drm উপন্যাসের সজল চরিত্রের ভাবনার মধ্যদিয়েও তিনি প্রকাশ করেছেন যে, জনবিচ্ছিন্ন হয়ে কোনোদিন কাঙ্ক্ষিত বিপ্লব সম্ভব নয়। এ জমায়েত তাঁর সে কথা তথা জনশক্তির ঐক্য প্রচেষ্টাকেই নির্দেশ করেছে। কিন্তু সৎ, যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্বের অভাবে বার বার ব্যর্থ হয়েছে জনশক্তির বিপ্লব প্রচেষ্টা। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আপসকামী মধ্যপন্থী সংশোধনবাদী নেতৃবৃন্দের বক্তৃতাসর্বস্ব জমায়েত কারো মনে কোনো আশা জাগাতে পারেনি। চা বাগানের লড়াকু নেতা ভাদুয়া মুণ্ডার কণ্ঠে এ ব্যর্থতার আক্ষেপ উচ্চারিত হয়েছে।

ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে জিপে করে সশস্ত্র প্রহরায় ভোরের আলোছায়ায় কলকাতার উপকণ্ঠের চলতি পথে, মনুমেন্টের তলে জমায়েতের স্মৃতি-অনুষঙ্গে রুহিতনের চেতনায় ভেসে উঠেছে তার পূর্বজীবন। চা বাগানের সাহেব আর বড় জোতদার মহাজনের বাড়ি ছাড়া যেখানে কেউ 'সিকিমি মোরগ' কেনার কথা কল্পনাও করতে পারে না, সেখানে রুহিতনের ঠাকুরদা 'মুখ্য আর গণ্য ব্যক্তি' হওয়ার পরও 'নকশালবাড়ি পূর্বাঞ্চল চা বাগানের মজুর' পশুপতি কুরমিকে 'চা বাগানের গজেন সাঁওতালের মেয়ে গঙ্গাকে' বিয়ে করার জন্য কন্যাপণ বেশিসহ দুটো সিকিমি মোরগ দিতে হয়েছিল। পূর্বপুরুষদের লালিত স্বপ্নকে মনে ধারণ করেই পশুপতি কুরমি অগ্রসর হয়েছিল জীবনের পথে। কিন্তু তাদের মতো সর্বহারাদের সে স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায় চিরকাল। অতীত স্মৃতি হাতড়ে রুহিতন তার বাবার সে স্বপ্ন অনুধাবনের চেষ্টা করে :

পশুপতি কুরমির আমলে, সব থেকে বড় ব্যতিক্রম চা বাগান ত্যাগ করা। জমি জিরেত চাষবাসের দিকে তার মন টেনেছিল। এটা একজন কুরমির আদিম পিপাসা। নিজের একটা ঘর, এক জোড়া বলদ লাঙ্গল, আর কিছু চাষের জমি। ঠাকুরদারও মনে এই আকাঙ্ক্ষা ছিল। পারেনি। উড়িষ্যা বিহারের সীমান্তে ফিরে গিয়েও, সে সম্ভাবনা আর ছিল না। (পৃ.১৮৩)

Dhaka University Institutional Repository

নকশালবাড়ি অঞ্চলে সমস্ত রকমের জমির ওপর চৌধুরী, জোতদার, মণ্ডল আর টিক্‌কাদারদের দখলী স্বত্ব ছিল। বাঙালি অফিসার হিসেবে চৌধুরীরা জমির ভাগ-বণ্টন, খাজনা আদায়সহ 'সরকারের প্রতিনিধি' হিসেবে সকলের বিচার ও শাসন পরিচালনা করত। জোতদার ও টিক্‌কাদারদের নিজের লোক হিসেবে ছিল মণ্ডল যারা 'আধিয়ারদের' শোষণ করতেই ব্যস্ত ছিল। এতো কিছুর মধ্যেও একজন চৌধুরীর সুদৃষ্টিতে পড়ে নদীর কিনারে একখণ্ড জমি পেয়েছিল পশুপতি কুরমি। কিন্তু সেখানে তার কোনো স্বত্ব ছিল না।

না, তার বাবা একজন সাধারণ টিক্‌কাদারের অধিকারও জমিতে পায়নি। পেয়েছিল শুধু উঠ্‌বন্দি প্রজাস্বত্ব, যাদের বলে দার টিক্‌কাদার, অথবা কোরফা রায়ত। তারা বাস করে, চাষ করে, কিন্তু জমির ওপরে কখনওই কোনও অধিকার জন্মায় না। ওঠ্‌ বললেই ওঠো, যাও বললেই ভাগো। (পৃ.১৮৩)

শুধু এটুকু পেয়েই পশুপতি এতোটা আনন্দিত হয়েছিল যে কিছুদিন 'পচাই' খেতেও ভুলে গিয়েছিল। জোতদার মোহন ছেত্রীর জোতের সীমানার মধ্যে পশুপতি চৌধুরী সাহেবের কৃপায় যে জমি পেয়েছিল তাতে কালো মাটি সামান্য থাকলেও চুনের অভাব ও বালি মেশানো সাদা ভাগ বেশি থাকায় চাষের অযোগ্য ছিল। সে 'শুখা ক্ষেতে' তথা বন্ধ্যা ভূমিতে মেচি নদীর পলি তুলে এনে ছড়িয়ে ও গোবর সার মিশিয়ে চাষের যোগ্য করে তুলত। অথচ "সেই ভূমিখণ্ডের গাছপালার মালিক জোতদার। একটা বাঁশঝাড়, তার মালিকও জোতদার।" (পৃ.১৮৪)

তবুও আশায় বেঁচে পশুপতি কুরমি জমি তৈরি করছিল। এ কাজে রুহিতন ছিল তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। বাবার চোখে যে অপরাজেয় স্বপ্ন দেখেছিল তাই সঞ্চারিত হয়েছিল তার মনেও।

পোশপত্‌ কুরমি দমেনি। এক রকম ভূমিহীন আধিয়ার ছাড়া সে কিছুই ছিল না। তবু সে যে কোরফা রায়ত। উঠবন্দি প্রজা। হয়তো তার মনে আশা আর স্বপ্ন ছিল, এক দিন সে রায়তি স্বত্ব পাবে। টিক্‌কাদার যাকে বলে। যা সে কোনওকালেই পায়নি। রুহিতন চা বাগানের বালক মজুর থেকে, চাষের কাজে লেগেছিল। মেচি নদী থেকে, বেতের ঝোড়ার বাঁকে, মন মন পলি মাটি ঘেঁটে নিয়ে আসত। ঝোরা আর আশপাশের সরু নালি স্রোতস্বিনীর জল ধরে রাখত, চার পাশে আল বেঁধে। পোশপত্‌ কুরমির ব্যাটা সে, বাবার তৃষ্ণাটা তার রক্তেও লেগেছিল। সেই তৃষ্ণাতেই সে যেন গায়ে গতরে সাজোয়ান হয়ে উঠেছিল। (পৃ.১৮৪)

এই পিপাসার্ত জীবনবোধ কিংবা সযত্ন লালিত স্বপ্ন পশুপতি কুরমি কিংবা তার ছেলে রুহিতন কুরমির একার ছিল না, ছিল সকল কৃষকের—যাদের প্রতি মুহূর্তে সামন্ত-প্রভু, জোতদার, টিক্‌কাদার, চৌধুরী কিংবা মণ্ডলদের দ্বারা শোষিত হতে হত। এ স্বপ্ন পূরণের জন্যই নিবেদিতপ্রাণ রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে রুহিতন সর্বস্ব পণ করা লড়াইয়ে নেমেছিল।

চলতি জিপে অফিসার রুহিতনকে অনেক কথা বলছিল, নিঃশব্দপ্রায় ছিল সে। হঠাৎ করেই রুহিতন পুলিশ অফিসারের কাছে জানতে চায়, চুনীলাল মৌজার খবর। সেখানকার মানুষের খবর। কেমন আছে সব? অফিসার সহজ করেই বলেছিল, 'চুনীলাল? ওহ্‌, তোমার গ্রাম আর বাড়ির কথা বলছ?... সে সব খবর কিছুই জানি না।' কিছুক্ষণ পর অফিসার পুনরায় বলল : 'ট্রাম আর রাস্তাঘাট দেখে বুঝতেই পারছ আমরা কলকাতার মধ্যে ঢুকে পড়েছি।' অফিসার আরও কী সব বলে যেতে লাগল। রুহিতনের কানে কিছুই ঢুকছে না। নিজের প্রতি জাতক্রোধের যন্ত্রণা থেকে কলকাতার সেই পুরনো নিষ্ঠুর স্মৃতিতে আবার ফিরে এল :

দিবা বাগচিকে তাদের থেকেও খারাপ লাগছিল। তার মুখটা দেখাচ্ছিল কঙ্কালের মতো রুগ্‌ণ অসুখী আর রাগী। কিন্তু ভাদুয়া মুণ্ডা বলে উঠেছিল, 'এই পয়লা আর আখেরি। শালা কলকাতায় আর না।' ভাদুয়া মুণ্ডা আর খেলু চৌধুরী সকলের

Dhaka University Institutional Repository

জন্যই কিছু খাবার জোগাড় করেছিল। আর ব্যস্ত কলকাতা তাদের দিকে নির্বিকার চোখে তাকিয়েছিল। কলকাতার সে কী চেহারা।...বাইরে একটা স্টেশন থেকে দুপুর নাগাদ তারা একটা রেলে উঠেছিল। লোকজনে ঠাসাঠাসি কামরা। কেউ কেউ রুহিতনদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল। চড়-চাপড়ও মারেনি এমন না। ফিরে যেতে পারার জন্যই তারা তখন আকুল হয়ে উঠেছিল। তাদের সেই নীল বনানীর দেশে, পাহাড় যেখানে আকাশের গায়ে ঠেস দিয়ে থাকে। (পৃ.১৮৬)

আবার এক বার কলকাতার লাল-আভা ভোরে, সশস্ত্র রক্ষীবেষ্টিত জিপে, হাতে পায়ে বেড়ি পরা অবস্থায় সেই পুরনো দিনের কথাগুলো এখন আরশির বুকে মুখ দেখার মতো মনে পড়ে গেল। রুহিতন কি আজকাল দুর্বল হয়ে গিয়েছে? আজ কেন চুনীলাল মৌজার কথা অফিসারকে জিজ্ঞাসা করল, যে খবর আজও কোনো জেলে কেউ তাকে দেয়নি। কলকাতা জমায়েত থেকে ব্যর্থ-ভগ্ন মনে তরাইয়ে প্রত্যাবর্তনের পর, দিবা বাগচিই তাকে সশস্ত্র বিপ্লবের রাজনীতিতে, শ্রেণিশত্রু খতমের রণনীতিতে দীক্ষিত করেছিল, জোড়া লেগেছিল রুহিতনের ভাঙা মন :

দিবা বাগচিই একটা শোলোক নিয়ে এসেছিল, গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরতে হবে। শহরকে গ্রামের কবজায় ঘিরতে হবে। কলকাতায় জমায়েত না। দক্ষিণের যাবৎ শহর ঘিরতে ঘিরতে, কলকাতাকেও গ্রাম দিয়ে ঘিরতে হবে।
রুহিতন সেই থেকে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার লড়িয়ে। জান কবুল, কিন্তু শত্রুর শেষ রেখো না। রুহিতন রাখেনি। খতম আর ঘেরাও, এক নাগাড়ে। সে সেই লোক।...মুখের চেহারা বদলিয়ে যাচ্ছে? কান নাক মোটা হয়ে যাচ্ছে। আর চোখ বুজলেই সেই লালচে মেটে সাপটার রং ভেসে ওঠে। হ্যাঁ, তার নিজের গায়েও সেই রকম কতকগুলো দাগ ফুটে উঠেছে। (পৃ.১৮৭)

কলকাতার আন্ডার ট্রায়াল বন্দিশালার গেট পেরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় রুহিতন কুরমিকে। ডান্ডা বেড়ি পরানো নেই কুরমির। দুজন ওয়ার্ডারের মাঝ খান দিয়ে খোলা হাতে পায়ে এখন হেঁটে যাচ্ছে জেলের অফিসে। অন্য বন্দিদের চোখে স্বাভাবিক কৌতূহল হয় : "কে এল? ঘরানা? ঘরানার কথা ভাবে অবিশ্যি অন্য ধরনের অপরাধীরা। পকেটমার চোর ডাকাত খুনি কেপমারি নারী-ধর্ষণকারী, বহু রকমের অপরাধী। সরকারের আইনের চোখে, রুহিতনও একজন অপরাধী। তার বিরুদ্ধেও খুন, লুট, আগুন লাগানো, রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল, বহুবিধ অপরাধের অভিযোগ। তথাপি সে আলাদা। কারণ সে নিজেকে একজন অপরাধী ভাবে না। তার মতো যারা থাকে, তারা নতুন কোনও বন্দিকে জেলে আসতে দেখলেই, তাদের মনে প্রথম প্রশ্ন জাগে, কোন দলের? অথবা বেনোজল? চলতি কথায় যাকে টিকটিকি বলে। ঘাসের মধ্যে ঘাস রঙের রক্তশোষা জোঁকের মতো। নাকি আমাদের কেউ।" (পৃ.১৮৯)

দ্বিতীয় সকালে রুহিতনকে ওয়ার্ডাররা অন্য ওয়ার্ডে নিয়ে গেল। সমরেশ বসু এ পর্যায় থেকে কারারুদ্ধ রুহিতনকে জেলের সংকীর্ণ পরিসরের মাঝে বিন্যস্ত করে তার চেতনা-স্মৃতিস্রোতকে বিস্তৃত করেছেন, বাইরের জীবন-জগত-রাজনীতি এবং প্রকৃতিতে। চলন্ত পুলিশি জিপে ডান্ডাবেড়ি-হ্যান্ড-কাপ পরা রুহিতনের ভাবনাস্রোত ছিল অনেক দ্রুত ও ভঙ্গক্রম; কলকাতার জেলের স্থির ও স্থবির পরিবেশে তার চিন্তা ও চেতনাস্রোত হয়ে উঠবে পর্যায়ক্রমিক, আত্ম-বিশ্লেষণধর্মী ও বিস্তৃত। সমরেশ বসু এ উপন্যাসে সর্বজ্ঞদৃষ্টিকোণ ব্যবহার করলেও, পদ্ধতিগতভাবে তিনি রুহিতনের প্রেক্ষণবিন্দু-ই প্রধানত ব্যবহার করেছেন; জেল পরিসরের স্মৃতিচারণের ক্ষেত্রে সমরেশ বসু কোথাও কোথাও সর্বজ্ঞদৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন। ফলে আমরা আখ্যানকে দ্বি-মাত্রায় অবলোকন করতে পারি।

অনেক জেলেই রুহিতনকে কাটাতে হয়েছে। সব জেলেই সে পায়রার ওড়াওড়ি দেখেছে। সর্বশেষ কলকাতার জেলেও সে লক্ষ করেছে যে পাগলা ঘণ্টির মাথার ছাউনির ওপরও দুটো পায়রা, মুখোমুখি ঘাড় ফুলিয়ে, মাথা নাড়ছে। পায়রার অনুষঙ্গে রুহিতনের স্মৃতিতে বারো-তেরো বছর বয়সের একটি ঘটনা মনে

Dhaka University Institutional Repository

পড়ে। চা বাগানের কাজ করে নিজের সঞ্চিত অর্থে তার মা আরিশজোতে রামধনের কাছে অনুষ্ঠিত শিবরাত্রের মেলা থেকে দুটো ধাড়ি পায়রা পায়রি, আর চারটি বাচ্চা কিনে দেয়। ছোট ভাই হরতনের সঙ্গে মিলে সে পায়রা পুষত। কিন্তু মাস ছয়েক পরে নেশাগ্রস্ত পশুপতি পায়রার মাংস খেয়ে ফেলায় দু ভাই বাঁশের লাঠি নিয়ে তাড়া করেছিল বাবাকে। আর মুখে উচ্চারণ করেছিল : "কোথায় পোশপত্ কুরমি? আমার পায়রার মাংস যে খেয়েছে তার মাংস আজ আমি খাব (পৃ.১৯৩)।" সশস্ত্র বিপ্লবী ও শ্রেণিশত্রু খতমে দুঃসাহসী 'তরাইয়ের ভয়ংকর দাঁতাল' বলে পরিচিত রুহিতনের মাঝে কৈশোরেই জন্ম নিয়েছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনা, ক্রোধ ও প্রত্যাঘাতের স্পৃহা।

বন্দি খেলু চৌধুরী 'রুহিত্তন! কমরেড' বলে রুহিতনকে জড়িয়ে ধরে। আরও বিপ্লবী কমরেড বন্দি এই জেলে। এদের কাছ থেকে নিশ্চিত হয়, দিবা বাগচিও ধরা পড়েছে। রুহিতন খেলু চৌধুরীকে অলিঙ্গন করে, চিৎকার করে গোঙানো স্বরে, 'অই ওহে খেলুবাবু! আহ্ ! খেলুবাবু হে !!' বন্দিদের অধিকাংশের চোখে বিস্ময় জেগেছিল, ফিসফিস করে তারা বলছিল, "সেই রুহিতন কুরমি? নকশালবাড়ির? এই মানুষকে কোনও দিন দেখতে পাব ভাবিনি। জীবনটা সার্থক হয়ে গেল। কমরেড রুহিতন কুরমি, জিন্দাবাদ।"(পৃ.১৯৫)

মহাত্মা গান্ধীকে যে ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল, সেই একই ওয়ার্ডে রুহিতনকে আনা হয়েছে। বন্দি কমরেডদের কাছ থেকে এটা শুনে গান্ধীর স্মৃতিচারণ করে সে :

> মহাত্মা গান্ধী, এই একটি নামের নামের সঙ্গে তার জীবনের কোনও সম্পর্ক নেই। বরং আছে আকাশ জমিন বিরোধ। গাঁধীবাবার নাম সে তার ছেলেবেলাতেই শুনেছে। ছবি দেখেছে। তাদের চা বাগানে কুলি ধাওড়ার ঘরের দেওয়ালে অনেকগুলো ছবির মধ্যে, একটি চশমা চোখে হাসি মুখ বুড়ো মানুষের ছবিও ছিল। বোধ করি তাঁর কপালে লাল বা সাদা কোনও ফোঁটাও ছিল। গায়ে কোনও জামা ছিল না। মহাজন আর মুদি দোকানি চৌবের চেহারার সঙ্গে ছবিটার মোটামুটি একটা মিল ছিল। কিন্তু হাসি? হাসিটা ছিল তার ঠাকুরদার থেকেও অনেক সুন্দর। মনে হত এমনি কি আর ছবিটাকে সবাই নমস্কার করে? চৌবে চৌদ্দবার জন্মালেও এ রকম হাসতে পারবে না।
>
> রুহিতন বাপ ঠাকুরদার কাছেও গাঁধীবাবার নাম শুনেছে। নামটা বলবার সময় তারা কপালে হাত ছোঁয়াত। (পৃ.১৯৫)

রুহিতনের বাবা-ঠাকুরদা কপালে হাত ছুঁইয়ে নামটা উচ্চারণ করলেও, কিশোর রুহিতন গান্ধীর চেয়ে বিপ্লবীদের প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হয়েছিল। পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীরা বাংলার গভর্নর জেনারেল স্যার জন আন্ডারসনকে লেবং-এ হত্যার চেষ্টা করেছিল। ঐ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় পুরো এলাকায় পুলিশি তাণ্ডব চলে। বাবার কাছ থেকে শোনা এ কাহিনিতে আট বছর বয়সী রুহিতনের মনে শত্রুবিনাশের বীজ রোপিত হয়েছিল। বেশ কিছুকাল পরে এ প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছিল। পনেরো বছর বয়সে কৌতূহল মেটাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লেবং গিয়েছিল রুহিতন।

"রুহিতনের মাথায় ঘটনাটা গেঁথে গিয়েছিল। কেন? এটাই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, সে নিজেও জানে না। শত্রু নিধনঃ শ্রেয়ঃ। তার অন্তরের এই কথা সে নিজেও যথার্থ কখনও শুনতে পায়নি, কিন্তু রক্তের মধ্যে তা সক্রিয় ছিল। রুহিতন লেবং গিয়েছিল। মোটর বা রেলগাড়িতে চেপে না। চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সে, কয়েকজন বন্ধু মিলে, গায়ে কাপড় জড়িয়ে, চোর বাটো দিয়ে পাহাড়ে উঠেছিল। খেলতে খেলতে পাহাড়ে ওঠার মতো উঠে তারা লেবং গিয়েছিল। মিরিক আর জোড়বাংলো পাহাড়ের চা বাগান দিয়ে, লেবং।...

তার কয়েক বছর পরেই দার্জিলিং হিমালয়ান রেল মজুরদের ধর্মঘট। গোটা পাহাড়ে তরাইয়ে এঞ্জিনের ধোঁয়া ওড়েনি। রেলের চাকা ঘোরেনি। মাঠে মেচির পলি ছড়াতে ছড়াতে, রুহিতনের রক্ত টগবগিয়ে উঠেছিল। কেন? কোম্পানির সাহেবরা, মারোয়াড়ি-বিহারি মহাজনেরা, বাঙালি-রাজবংশি, নেপালি জোতদাররা ক্ষেপে উঠেছিল। গরিবদের চিরশত্রুদের পরাজয়ে বুকের রক্ত টগবগিয়ে উঠেছিল। নিজের

Dhaka University Institutional Repository

এই চরিত্রটা তার অজানা ছিল। দিবাবাবুরা তখন চা বাগানে আর শহরে আন্দোলন করছিল। চেনা শোনা হয়নি। রেল ধর্মঘট করেছিল অন্য একটা দল। সেই সার্থক ধর্মঘট এখনও তার মস্তিষ্কে বিঁধে আছে। বিঁধে আছে, তারপরের অনেক লড়াইয়ের ঘটনা।" (পৃ.১৯৫)

গান্ধীর ওয়ার্ডে রুহিতন কুরমির ভাবনার তির্যক তীক্ষ্ণ দ্বান্দ্বিক চোরাস্রোত প্রবাহিত হয় :

কিন্তু রুহিতন যে কারণে আজ একজন খুনি, লুণ্ঠনকারী অগ্নিসংযোগকারী এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী, এবং আরও অনেক অভিযোগে অভিযুক্ত সেই কারণগুলোর মধ্যেই রয়ে গিয়েছে, তার সঙ্গে গাঁধীবাবার বিরোধ। রুহিতন জানে, দুজনের মত আর পথের জন্য তারা পরস্পরের শত্রু। তবু এই ওয়ার্ডে গাঁধীবাবা ছিলেন, এই সংবাদ তার মনে কেমন একটা বিস্ময় আর চমক সৃষ্টি করল। সে শুনেছে, তিনি ইংরাজদের সঙ্গে অন্য এক রকমের লড়াই করেছিলেন, তার নাম অহিংসার রাস্তা।...সাত বছরের জেল-জীবনে, সেও কয়েক বার অনশন করেছে। আর এই অনশনের হাতিয়ার নাকি তিনিই দিয়ে গিয়েছেন। যদিও দিবা বাগচি মাঝে মাঝে রেগে আর ঠাট্টা করে বলত, 'উপোস করা একটা আন্দোলন নাকি? ওকে বলে মাগভাতারের ঝগড়া। ভাতারের গুঁতোয় মাগ উপোস দিয়ে পড়ে থাকে। আবার ভাতার গিয়ে তাকে খোশামুদি করে খাওয়ায়। খলে ওষুধ না মাড়লে আবার অন্য রোগ ধরবে। ও সব হল মাগভাতারি আন্দোলন। (পৃ.১৯৬)

রুহিতন প্রথমে যখন এ কথা শুনেছিল, বিশ্বাস করেছিল। অনশন যে একটা হাতিয়ার এটা সে জেলের মধ্যে প্রথম জানতে পেরেছিল। প্রত্যক্ষ ফলও পেয়েছিল। রুহিতনদের মতো মানুষদের পক্ষে জেলের মধ্যে যে কোনও মানবিক অধিকারের জন্য অনশন ছাড়া উপায় নেই। এখন তার দলের সবাই এটা মেনে নিয়েছে।

ওয়ার্ডের লোহার খাটিয়ায় বসে রুহিতন খেলু চৌধুরীর নিকট জানতে চাইল তরাইয়ের নকশালবাড়ির মুক্তাঞ্চলের ঘাঁটিতে পুলিশি আক্রমণে সে কীভাবে গ্রেফতার হল। সে বলে অর্ধমৃত পদম তাকে দেখতে পায়নি। খেলু চৌধুরী বিবরণ দেয় :

পদমের টঙ থেকে আমি দেখেছিলাম, ওরা আমাদের কীভাবে ঘিরে ফেলেছে। জিপ আর ট্রাক দিয়ে সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। আমাদের থেকে দলে ওরা অনেক বেশি ছিল, প্রত্যেকটা বন্দুকের ডগায় বেয়নেট লাগানো ছিল, রাত্রে জঙ্গলে শিকার ধরার ফ্লাশ লাইট তো এনেছিলই। জিপ আর ট্রাকের আলোয় দিনের মতো হয়ে গেছিল। সেই আলোয় দেখলাম, ওরা চারদিক গিজগিজ করছে। তার মধ্যে জোতদার রোকনুদ্দিন চৌধুরীকে পষ্ট দেখেছি ওদের সঙ্গে, হোমরা চোমরাদের সঙ্গে কথা বলছিল। আরও কে কে ছিল কে জানে। আমাদের আস্তানাগুলো যে ওদের নখদর্পণে ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।...আমি টুকারিয়াঝাড়ের জঙ্গলের দিকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। রাতটা সেখানে কাটিয়ে, পরের দিন ভোরে মেচি নদী পেরিয়ে নেপালের মোরাং-এর পথে রওনা দিয়েছিলাম আর ধরা পড়লাম সেখানেই। (পৃ.১৯৯-২০০)

খেলু চৌধুরীকে মোরাং-এর পথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ধরিয়ে দিয়েছিল কেউ একজন। খেলু চৌধুরীর সঙ্গে কথোপকথনে রুহিতন বুঝতে পারে গত সাত বছরে অনেক কিছুই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। দলীয় সদস্যদের পারস্পরিক অবিশ্বাস, মতপার্থক্য তাদের মাঝে যে সংঘাত তৈরি করেছিল সেটা জেলজীবনেও প্রত্যক্ষ করেছে সে। শ্রমমুক্ত কারাবাস নিশ্চিত করার জন্য খেলু চৌধুরীদের অনশন করতে হয়েছে। কারাভ্যন্তরেও দলীয় সদস্যদের মতাদর্শগত ভিন্নতার পরিণতি হাতাহাতি পর্যন্ত পৌঁছত। এজন্য একই জেলখানায় ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় রাখা হত তাদের। সুবিধাবাদী সংশোধনপন্থী সংসদীয় রাজনীতিতে আস্থাশীল কর্মীদের সঙ্গেই এটা বেশি হত, যারা মাঝে মাঝে জেলে যাওয়া-আসা করত। এসব সদস্যদের রুহিতন 'গর্তের শিয়াল' বলে মনে করে। তাদের নীতিবর্জিত রাজনৈতিক কৌশল সম্পর্কে খেলু চৌধুরীর সঙ্গে রুহিতনের কথোপকথন নিচের অংশে লক্ষণীয় :

Dhaka University Institutional Repository

রুহিতন ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, 'তার মানে, সবখানেই এক ব্যবস্থা। আর গর্তের শিয়ালরা কী কয়? তাদের যাওয়া আসা আছে নাকি?'

খেলু চৌধুরীর বদলে সুকুমার নামে একটি তরুণ জবাব দিল, 'এখন নেই। আগে আগে দু-চারটের যাওয়া আসা ছিল, আর আমাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিলেই মারামারি লেগে যেত। পরে অবিশ্যি আমরাই মার খেতাম বেশি।'

খেলু চৌধুরী হেসে বলল, 'নিশ্চিন্ত থাকো রুহিতন ভাই, গর্তের শিয়ালরা গর্তেই আছে। জেলখানায় ওরা আর আসবে না। ওরা কাগজ ছাপিয়ে লড়াইয়ের লাইন বাতলাচ্ছে, আর ভোটের ভাগাভাগি করছে। ওরা গর্ত থেকে বেরিয়ে, খোঁয়াড়ে যাবে।'

সবাই হেসে উঠল। রুহিতন বলল, 'বুঝলাম, লাইনে গলদ নাই।' (পৃ.২০১)

কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই রুহিতন বুঝে গেছে তার সময়ের সঙ্গে এখনকার খেলু চৌধুরী কিংবা তরুণ-যুবাদের রাজনৈতিক ভাবনার সঙ্গে একটা বৈপরীত্য তৈরি হয়েছে। শ্রেণিশত্রু চিহ্নিতকরণে তাদের আক্রমণাত্মক ভঙ্গি দেখে যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েছে সে। বিশেষ করে খেলু চৌধুরীর নির্বিকার ও নিরাসক্ত কণ্ঠে তার রাজনৈতিক জীবনের দীক্ষাগুরু দিবা বাগচির গ্রেপ্তার ও হার্টফেল করে মারা যাওয়ার সংবাদ শুনে অন্য সকলের উপস্থিতি ম্লান হয়ে গেছে তার সামনে থেকে, মানসপটে উজ্জ্বল হয়েছে 'পুরনো সংগ্রামী বন্ধু'-র মুখ। কারণ এই বন্ধুই

...তাকে প্রথম নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। নতুন জীবনের সেই স্বপ্ন কদাপি বিফল হবার না। সেই সফল স্বপ্নে, অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পায়। বোবায় কথা কয়। বন্ধ্যা নারীর সন্তান হয়। ভূমিহীনে ভূমি পায়। জনমজুরে রাজ্য চালায়! ... রুহিতন কুরমির সাবালক জীবনে এই প্রথম শোকের আঘাত! সে দুই চোখ বুজল। তার বন্ধ চোখের সামনে দিবা বাগচির মুখ ভাসতে লাগল। (পৃ.২০১)

রুহিতনকে বিমর্ষ ও দুঃখিত হতে দেখে খেলু চৌধুরীরা কমরেড রুহিতন কুরমিকে জানিয়ে দেয় দিবাকর বাগচি ছিল একজন জঘন্য জোতদারের ছেলে। খেলু চৌধুরী আরও জানায়, এক সময় তাকে নেতা মেনেছিল, এখন আর মানে না। সে নিজে ছিল শ্রেণিশত্রু, তাই শেষ পর্যন্ত সে পার্টিকে ভুল পথে চালিয়েছিল। রুহিতন মনে মনে বিভ্রান্ত হলেও স্থির বুঝেছিল :

তাদের সেই জগতের নানান জায়গায় ভাঙচুর ফাটল ধরেছে। নিজেদের মধ্যে ঘৃণা আর রাগ, সেই প্রথম জানতে পেরেছিল। বড় যন্ত্রণা বোধ হয়েছিল তার। শ্রেণীশত্রু কাকে বলে? কাদের? খেলুবাবুর বাবার তো অনেক চা বাগানের মোটা শেয়ার আছে। এই তরুণ কমরেডদের কার কী আছে, সে জানে না। পার্টিকে ভুল পথে চালানো? আগে কেউ বুঝতে পারেনি? নাকি দিবাবাবুর নেতৃত্ব সফল হয়নি বলে, আজ তার মড়া নিয়ে টানাটানি। (পৃ.২০৩)

রুহিতন কুরমির মতো 'বিশ্বস্ত যোদ্ধা' কোনোরকম সন্দেহের ঊর্ধ্বে উঠেই দিবা বাগচির মতাদর্শের প্রতি আস্থা স্থাপন করেছিল। কাজেই আজ সহযোদ্ধা খেলু চৌধুরী জোতদারপুত্র বলে তাকে শ্রেণিশত্রু চিহ্নিত করে তার ভুল নেতৃত্বের সমালোচনা রুহিতন মানতে পারেনি। সে প্রতিবাদ জানিয়ে স্মরণ করিয়েছে মুক্তাঞ্চল গড়াকালীন দিবা কর্তৃক বাবা দীনু বাগচির সমস্ত জমি কোরফা রায়ত আর আধিয়ারদের মধ্যে বণ্টন করে দেবার কথা। কিন্তু দলীয় তরুণ কর্মীর বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে রুহিতন জেনেছে তাদের স্বপ্নের অপমৃত্যুর কথা। কারণ লিখিতভাবে বণ্টন না হওয়ায় আন্দোলনের ব্যর্থতার পরেই জোতদাররা সমস্ত আধিয়ারদের কাছ থেকে জমির দখল নিয়ে তাদের পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। রুহিতনের মতো ভূমিহীন আধিয়াররা জানে না 'লেখাপড়া করে বিলি বাঁটোয়ারা কেমন করে হয়'। তার কাছে দিবা বাগচির মুখের কথাই সত্য ছিল। এ কারণে রুহিতন দিবা বাগচির মৃত্যুর পর তার কর্মপদ্ধতির বিচার করতে রাজি নয়।

Dhaka University Institutional Repository

রুহিতন কুরমি আত্মবিশ্লেষণ করে তার রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু দিবা বাগচি সম্পর্কে। ফাঁসিদেওয়ার জোতদার—দীনু বাগচির ছেলে দিবা বাগচি। শিক্ষাজীবন থেকেই 'চা-বাগান ও ক্ষেতে-জোতে' ঘুরে কৃষক-শ্রমিকের জীবনবাস্তবতা প্রত্যক্ষ করার মধ্যদিয়ে তাদের অধিকার সচেতন করেছে। কমিউনিস্ট রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার সূত্রে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির দু বছরের মধ্যে কারাবন্দি হয় সে। তিন বছর পর কারামুক্ত হলে তার বাবা সাংসারিক জীবনের বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছিল। কিন্তু দাম্পত্যজীবন, সন্তানস্নেহ সব ছেড়ে তিন সন্তানের পিতা দিবা বাগচি, পরিবর্তিত রাজনৈতিক পটভূমিতে সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে নতুন করে নিজস্ব রাজনৈতিক পথে হাঁটতে শুরু করে। নিজের বাবার জোতদারি এলাকা ফাঁসিদেওয়ায় সে কখনো যায়নি। সেখানে যেত খেলু চৌধুরীর মতো রাজনৈতিক নেতা যাদের তৃণমূল পর্যায়ের বৃহৎ জনশ্রেণির সঙ্গে কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। ভাবনার মাঝেই জিজ্ঞাসা করে রুহিতন :

'সে দোষ কি দিবাবাবুর?' রুহিতন বলেছিল, 'মরার পরে এখন তার বিচার করেন কেন?'
খেলু চৌধুরী বলেছিল, 'তখন বিচারের কথা ওঠেনি, তাই বিচার হয়নি। আমাদের দলের ধর্ম এই, মরার পরেও কেউ রেহাই পায় না।' (পৃ.২০২)

সেই থেকে রুহিতনের প্রতি খেলু চৌধুরীদের সকলের ভাবভঙ্গি বদলিয়ে যাচ্ছিল। যে রুহিতনকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে খেলু চৌধুরী মহাত্মা গান্ধীর চাইতে শ্রেষ্ঠত্বের অভিধা দিয়েছিল, তরুণতম বন্দি কমরেডরা যার একটু সান্নিধ্য পাওয়া কিংবা সংগ্রামী দিনগুলোর কথা শোনার জন্য, তার খাটিয়া নিজেদের খাটিয়ার পাশে পাতার জন্য উদগ্রীব ছিল তারাই শ্রেণিশত্রু হিসেবে চিহ্নিত দিবা বাগচির প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য ও সহমর্মিতা প্রকাশের অপরাধে 'মাত্র তিন রাত্রি পোয়াবার পরের সকালে' (পৃ.২০১) তাকে নিচের ঘরে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল। অথচ প্রকৃত সত্য গোপন করে খেলু চৌধুরী তাকে বলেছে ডাক্তারের পরামর্শেই এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, রুহিতনের শরীরে কুষ্ঠরোগের উপসর্গ দেখা দেওয়ার কারণ সম্পর্কেও তার অতীতজীবনে নারীসঙ্গজনিত পাপাচারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে অমানবিক আঘাতে জর্জরিত করেছে। যার সঙ্গে রুহিতনের কোনো সম্পর্কই ছিল না। এ রোগের কারণ না জেনেই জোতদারপুত্র বড়কা ছেত্রীর সঙ্গে মেলায় মেলায় রং পাঁচালি মান পাঁচালি গান শুনে, জুয়া খেলে কাটানো দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দীর্ঘকালের সহযাত্রী কমরেডকে খেলু চৌধুরী নির্মমভাবে বলেছে :

তুমি তো আর চিরকাল এই রুহিতন কুরমি ছিলে না। সেইজন্য তোমাকে দোষ দিই না।---বাপ ঠাকুর্দার রোগ পেয়েছ, না নিজেই বাধিয়েছ, তা তুমিই জানো।---

... মনে করে দেখ, তখন আরও কী কী ফুর্তি করেছ। মদ পচুই হাঁড়িয়া গিলেছ, আর বড়কা ছেত্রীর টাকায় লুবু খাঁকড়ির (নরম বা মেয়ে কাঁকড়া) সঙ্গ করেছ। এখন সেই খাঁকড়িরা সব রক্তে ফুটে উঠেছে। (পৃ.২০৪)

চা বাগানের বড়ো শেয়ারের মালিক-পুত্র, আজকের বিপ্লবী খেলু চৌধুরী শেষ আঘাত এনেছে এভাবে : "কিন্তু আমি তোমাকে দোষ দিই না রুহিতন। তোমার বাপ ঠাকুর্দা ছিল চা বাগানের কুলি। তুমি একজন ভূমিহীন—।" (পৃ.২০৪)

রুহিতন জানে স্ত্রী মঙ্গলার আগে জোতের মালিক শুকু পোঙানির মেয়ে স্বামীগৃহে নির্যাতিতা টেঁপড়ির সঙ্গেই শুধু তার ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। এ ছাড়া অন্য কোনো নারীর সংস্পর্শে সে আসেনি। টেঁপড়ির গায়ে দাদের ঘা ছিল। তাছাড়া তাদের দেশে এমন ঘর খুব কমই ছিল যেখানে কারো দাদের ঘা ছিল না। মেলায় খাবার ও দাদের মলম সমপরিমাণে বিক্রি হতো। কিন্তু রুহিতনের মতে খেলু চৌধুরীর ধারণা অনুযায়ী টেঁপড়ি তো টাকায় কেনা লুবু খাঁকড়ি ছিল না। এছাড়া তার জীবনে দ্বিতীয় ও শেষ নারী

Dhaka University Institutional Repository

মঙ্গলা তার জীবনকে যেভাবে পূর্ণ করেছিল তাতে অন্য নারীর কোনো অস্তিত্ব ছিল না রুহিতনের জীবনে। মঙ্গলাকে নিয়ে তার এ পূর্ণতার অনুভব নিচের অংশে প্রকাশিত হয়েছে :

হ্যাঁ, ঝোরার জলের ধারা যেখানে গভীর কূপের মতো কুণ্ডকে ভরিয়ে তোলে, তখন তার নাম হয়ে যায় মণি। সেই কুণ্ড তখন হয়ে ওঠে মাতৃকূপের প্রতীক। আর সেই প্রতীককে মানুষ পূজা করে। জলের প্রাচুর্যের প্রার্থনায়। আসলে, তরাইয়ের পানীয় জলের একটি প্রাকৃতিক আধার। গভীর জল সেখানে বারো মাস। মণি তো স্ত্রী ইন্দ্রিয়ের আর এক নাম। রুহিতনের মনে হত মঙ্গলার সেই কুণ্ডের গভীর কালো জলের মতো চোখে তার সতেরো বছরের জীবনটা ডুবে গিয়েছে। (পৃ.২০৬)

কাজেই বড়কা ছেত্রীর টাকায় লুবু খাঁকড়ির সঙ্গ কখনো তার প্রয়োজন হয়নি। এ কারণেই খেলুবাবুর মতো জনবিচ্ছিন্ন নিষ্ঠুর অমানবিক নেতার প্রতি তার উচ্চারণে সর্বকালীন নিপীড়িত শ্রেণির কণ্ঠই ধ্বনিত হয় যা জোতদার শ্রেণির লালসামত্ত জীবনের ইঙ্গিতবাহী :

খেলুবাবু, আমি কুরমি মাহাতো। সাঁওতাল কুরমি ওঁরাও মুণ্ডা, অনেক তো চা বাগানে, জোতে দেখেছ। টাকা দিয়ে মেয়েমানুষের সঙ্গ, আমরা জানি না। তোমার হিসাব নেই, আমাদের দুঃখী মেয়েগুলোকে কারা কিনতে চায়? (পৃ.২১২)

এক সময়ের দলীয় সহযাত্রী খেলু চৌধুরীর এমন অধঃপতিত রূপ দেখে রুহিতন এতটাই আঘাত পেয়েছিল যে এ পর্যন্ত শুনে সে চিৎকার করে থামিয়ে দেয় তাকে। রুহিতনের 'অপ্রত্যাশিত গর্জনে' ও ক্রমঅগ্রসর গতিতে খেলুসহ অন্যান্য বন্দিরা আক্রমণের আশঙ্কায় শঙ্কিত হলেও সে তা করেনি। গভীরতর বেদনাবিদ্ধ রুহিতনের স্মৃতিতে জেগে ওঠে মায়ের মুখে শোনা সেই গান যা নিজের মনে আওড়াতে থাকে সে :

উত্তরে উনাইল ম্যাঘ
পচ্ছিমে বরষিল গ!
ভিজি গেল গাবানি কাপড়।

এই রকম কি জীবন? উত্তরে মেঘ ঘনায়। অথচ বর্ষায় পশ্চিমে? আর শখের রঙিন কাপড় ভিজে যায়? আগুন জ্বলছে তার বুকের মধ্যে। রাগের থেকে এ আগুনে বুকের পোড়ানি বেশি। এই আগুনে বুকের ঝোরার জল ঝরে। তার নাক থেকে গাঢ় রস গড়িয়ে পড়ে। সে হাতের পিঠ দিয়ে মুছে নিল। সিঁড়ির নিচে থমকিয়ে দাঁড়াল। (পৃ.২০৫)

একজন বাঙালি ওয়ার্ডার কুরমিকে নিয়ে যাচ্ছিল জেলের ভেতর অঙ্গন দিয়ে তার জন্য নির্ধারিত সেলে। একটা গাছে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল সে। মোটর গাড়ির গর্জন যেন তার কাছ দিয়ে চলে যাচ্ছে। "সে চোখ বুজল। তবু তার চোখের সামনে ভেসে উঠল রক্তহীন কাঁচা মাংসের রং। তার ওপরে নড়ে চড়ে উঠল সেই মন্থরগতি মেটে রঙের সাপটা। রুহিতন চমকিয়ে উঠে চোখ মেলে তাকাল। মনে হল সেই সাপটাই যেন তার শরীরের ভিতরে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল বন্দুক হাতে বড়কার মূর্তি (পৃ.২০৭)।" ওয়ার্ডার জানতে চাইল সে দাঁড়িয়ে আছে কেন। গায়ে কাঁটা-দেওয়া-ভাবের দৃষ্টি দিয়ে রুহিতনকে জানালো, 'এখানে গান্ধীজি প্রার্থনা করতেন, যখন এই জেলে ছিলেন।' রুহিতনের চিন্তা ও জিজ্ঞাসার জগৎ :

...কিন্তু সেই মানুষটির মতো কোনও প্রার্থনা রুহিতনের জানা নেই। প্রার্থনা করলে কী হয়? পরাধীনরা স্বাধীন হয়? ভূমিহীনে ভূমি পায়? জন-মজুরে রাজ্য চালায়? প্রাণের এই যে যন্ত্রণা, দুঃখে অপমানে পুড়ে যাচ্ছে, এর কি উপশম হয়? রুহিতন ওয়ার্ডারের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পশ্চিমের দেওয়ালের ধারে, ছায়া ঘেরা জমির দিকে পা বাড়াল। (পৃ.২০৭)

উপন্যাসে দুবার গান্ধীপ্রসঙ্গ সংযোজনের কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক বলেছেন : "সমরেশবাবুর ইঙ্গিতটা, 'গান্ধীপন্থা গ্রহণই শ্রেয়'—এদিকেই যেন ধাবিত হয়। রুহিতন একটু একটু করে

Dhaka University Institutional Repository

হেরে যাচ্ছে। বিভিন্ন জেল জীবন, সাথীদের বিশ্বাসঘাতকতা, অমানবিক ব্যবহারই তাকে হারিয়ে দিচ্ছে। এখন তার বুক তোলপাড় করে ওঠে।" উপরিধৃত গান্ধীর প্রার্থনা প্রসঙ্গে রুহিতনের প্রশ্নগুচ্ছে, তার গান্ধীপন্থায় আস্থার কোনো সূক্ষ্মতর সূত্র অন্তত gnvKv‡j i i‡_i †Nvovয় পাওয়া যায় না। বরং প্রশ্নগুলোর মাঝে তির্যকতা ও জন-অধিকারের বিষয়টি কেন্দ্রীয় পরিসরে এসেছে। সমালোচকের 'এদিকেই যেন ধাবিত হয়' বাক্যাংশের সংশয়সূত্রটিই গুরুত্ববহ।

বন্দি কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তদের বিচ্ছিন্ন জায়গায় রুহিতনের জন্য পৃথক একটা সেল নির্দিষ্ট ছিল। সেখানে স্থানান্তরিত করে তার চিকিৎসা শুরু হয়েছে। তরুণ সহানুভূতিশীল ডাক্তার তার সুচিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেয়, সে সুস্থ হয়ে উঠবে, তবে কিছু ক্ষতচিহ্ন এবং বিভিন্ন অঙ্গের বিকৃতি ও দুর্বলতা স্থায়ী হয়ে থাকবে। তরুণ ডাক্তার সহাস্যে জানিয়ে দেয়, এটা কোনো নারীসংসর্গ ঘটিত রোগ নয়; হয়তো কোনো এক কালে কুষ্ঠরোগীর সংস্পর্শ থেকে এসেছে। জেলের মাঝে খাদ্যে বিষক্রিয়ায়ও এটা ঘটেনি। কিছুটা শান্ত হয় রুহিতনের বিক্ষুব্ধ ও অবিশ্বাসী মন। "রুহিতন তার পিছনের জীবনটাকে ওলট পালট করে দেখার চেষ্টা করছে। ঝরঝরে শুকনো ধানে মরা ধান খোঁজার মতো খুঁজছে। কিন্তু কিছুতেই একটি কুষ্ঠ রুগিকে খুঁজে পায়নি। এখন এই দলের বন্ধুহীন বিচ্ছিন্ন একাকী জীবন অনেকটা ঘনায়মান সন্ধ্যার মতো ঝাপসা। পিছনের জীবনটাই সবসময়ে আলোয় ফট ফট করে। বিশেষ করে সেই সময়টা যখন গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। আর তারই অঙ্গ হিসেবে যখন নিজেদের একটা শত্রুমুক্ত স্বাধীন অঞ্চল গড়ে তোলা শুরু হয়েছিল। একটা রীতিমতো যুদ্ধ বলা যায়।" (পৃ.২১১)

বিপন্ন, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ও অসহায় রুহিতন কুরমির চেতনাস্রোতে ভেসে আসে তরাইয়ের নকশালবাড়ির এলোমেলো টুকরো টুকরো স্মৃতি এবং সঙ্গে নকশাল আন্দোলনকে ফিরে দেখা :
জোতদার ও মহাজন শ্রেণি, গরিব ও ভূমিহীনদের এ স্বপ্নকে স্পর্ধা ভেবে, এতটাই ক্রুদ্ধ হয়েছিল যে নিজেরাই বেছে বেছে তাদের হত্যা করতে শুরু করেছিল। তারা সব সময় সশস্ত্র হয়ে চলাফেরা করত। মোহন ছেত্রী, রুকনদ্দিন আহমদ, শনিলাল, এমনকি টেঁপড়ির বাবা মাঝারি জোতদার শুকু পোঙানিও বন্দুক কাঁধে করে ঘুরত। কিন্তু রুহিতনরা সংঘবদ্ধ হয়ে পুব-দক্ষিণে টুকারিয়া ঝাড় থেকে উত্তরে মেচি এবং পশ্চিমে ডালকঝাড় জঙ্গল পর্যন্ত বিশাল এলাকার জোতদারদের বন্দুক ছিনিয়ে নিয়েছিল। বড়কা ছেত্রী ছিল তার ছেলেবেলার বন্ধু। সে যখন বুঝেছিল রুহিতনের প্রকৃত পরিচয় কী তখন সেও জোতদারপুত্র হিসেবে বন্ধুত্বের সমস্ত বাঁধন ছিন্ন করেছিল। জোতদার মোহন ছেত্রীর ছেলে হওয়ায় রুহিতনের কাছে সেও শ্রেণিশত্রু বলে বিবেচিত হয়। তার সামনেই বন্দুকের বাঁট দিয়ে গোবরা সাঁওতালকে পেটানোসহ আরও অনেককে হত্যার অপরাধে রুহিতন ঘুষি মেরেই তাকে হত্যা করে। বন্ধুত্বের নানা স্মৃতির সঙ্গে এসব স্মৃতিও মনে আসে তার। রুহিতনের খণ্ড খণ্ড স্মৃতিচারণার মধ্যদিয়েই ঔপন্যাসিক নকশালবাড়ি আন্দোলনের পুরো চিত্র এঁকেছেন। সে দিনগুলোর কথা মনে করে আত্মজিজ্ঞাসা জাগে তার মাঝে :

বড়কা বন্ধু ছিল? হ্যাঁ বন্ধু ছিল। তারপরে শত্রু। জীবন তো এইরকমই। সকল জীবের যদি নিজের ধর্ম থাকে, তবে ভূমিহীন কৃষক রুহিতন কুরমিরও একটা ধর্ম আছে। সেই ধর্মের কাছে শত্রুর একটাই মাত্র বিচার। মরো, না হয় মারো। (পৃ.২১৩)

এ সময়ে পুরো অঞ্চলের সাধারণ জনশ্রেণির মধ্যে প্রথাবদ্ধ অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবনকে পেছনে ফেলে মুক্তাঞ্চল গড়ার সংগ্রামে লক্ষমুখী হয় তারা। বর্ণহিন্দু বাঙালি, কিছু বিহারি মুসলমান, দু চারজন নেপালি মিলিয়ে সমস্ত জোতদার শ্রেণি এবং দোকান-আড়ত-তেজারতি-সুদখোরি কারবারি মারোয়াড়ি

Dhaka University Institutional Repository

মহাজন ক্রমে সমগ্র চা বাগান থেকে শুরু করে তরাই অঞ্চলের যাবতীয় ভূমিখণ্ড—অরণ্য, শস্য-সম্পদ পর্যন্ত নিজেদের থাবা বিস্তার করেছিল। মুক্তাঞ্চল গড়ার প্রত্যয়ে সর্বপ্রথমে সেসব শোষক শ্রেণির উদ্দেশেই আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল। আকস্মিক এ পরিকল্পিত আক্রমণের মুখে অপ্রস্তুত সীমান্তরক্ষী পুলিশ ও সেনাবাহিনী সাময়িকভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কারারুদ্ধ, খেলু চৌধুরীদের দ্বারা নিঃসঙ্গ রুহিতন আজও মুক্ত অঞ্চলের কথা ভুলতে পারে না; ভুলতে পারে না, তার উত্থান আর ব্যর্থতার কথা :

সেই সময় তরাইয়ের জঙ্গলে গ্রামে গ্রামে মানুষদের কী আশ্চর্য উৎসাহ আর সাহস। সে নিজে সব গ্রাম বা বিভিন্ন আস্তানায় ঘুরে ঘুরে দেখেছে। ছেলেবুড়ো, মেয়েমদ্দ, সকলের চোখমুখের চেহারা বদলিয়ে গিয়েছিল। সত্যি কি তারা একটা নতুন জীবন পেয়েছিল? এমনকী অনেকে হাঁড়িয়া খাওয়া, বউ পেটানো বন্ধ করে দিয়েছিল।...

রুহিতনদের মুক্ত অঞ্চলে তখন একটা ভিন্ন হাওয়া বইছিল। ডেয়ং খাওয়ার বিষয়ে বা আরও কোনও কোনও বিষয়ে কোনও নির্দেশ বা নিষেধ ছিল না। মুক্ত অঞ্চল গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মধ্যেই একটা পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছিল। সকলেই কেমন সচেতন আর কঠোর হয়ে উঠেছিল। কঠোরতা এই কারণে, সকলেই নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালন করতে চেয়েছিল। মুক্ত এলাকাকে সবাই অতন্দ্র প্রহরীর মতো পাহারা দিত। (পৃ.২১৩)

কিন্তু উত্থানের যোদ্ধারা "শহরের মাস্তান গুণ্ডা শকুনগুলোকে ঠিকমতো রুখতে পারেনি। গোরু মরলে যেমন মাছিরা গিয়ে আকাশে শকুনিদের খবর দেয়, আর তারা ঝাঁপিয়ে এসে মরার উপর পড়ে, সেই ভাবে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। উত্থানের সুযোগ নিয়ে, ওরা ট্রাক আর লরি করে, লক্ষ লক্ষ টাকার মাল লুটপাট করে নিয়ে গিয়েছিল। উত্থানের আগেই, ঠিক পরের মুহূর্তের চেহারা কী দাঁড়াতে পারে, সে বিষয়ে সকলের সম্যক কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। আর সেই সব গুণ্ডা মাস্তানরা, যাদের অনেকের দলীয় রাজনীতির ছদ্মবেশও ছিল, ওরা যে কোনও অবস্থার সুযোগ নেবার জন্য প্রস্তুত থাকে।" (পৃ.২১৩) এই অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতি ও নেতৃত্বের অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে, সুসংগঠিত সীমান্তরক্ষী পুলিশ-সেনাবাহিনীসহ জোতদার শ্রেণি, কিছু বিশ্বাসহন্তার সহায়তায়, গভীর রাতে মুক্ত-অঞ্চলের উপর, তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রক্ত-জর্জরিত রুহিতন কুরমি, অনেকের সঙ্গে গ্রেফতার হয় সেই রাতে।

সমরেশ বসু বিশ্বাস করতেন, জীবনের জন্যই রাজনীতি—রাজনীতির জন্য জীবন নয়। ব্যক্তির রাজনৈতিক সত্তাকে পরিবার-বিচ্ছিন্ন কোনো দূরবর্তী দ্বীপ হিসেবে দেখেননি তিনি। বরং এ দুটো সত্তার অবিমিশ্র সমন্বয় দ্বারা সম্পূর্ণ ব্যক্তিমানসের অন্বেষণই সমরেশ বসুর রাজনৈতিক ভাবনার কেন্দ্রে ছিল। রুহিতনের চেতনায় এ কারণেই পারিবারিক জীবনস্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে বার বার। ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞদৃষ্টিকোণ ও রুহিতনের প্রেক্ষণবিন্দুর মিশ্রিত উদ্ধৃতি অনুধাবণীয় :

অসুস্থ বিচ্ছিন্ন এই জেল-জীবনে এসব কথা মনে হলেই আরও কিছু কিছু ইচ্ছা তার বুকের মধ্যে তোলপাড় করে ওঠে। শিশু যেমন মায়ের গায়ের গন্ধে সচকিত হয়ে ওঠে, মঙ্গলার গায়ের গন্ধে তারও সে রকম হত। এতগুলো বছর পার হয়ে গিয়েছে, তবু সেই গন্ধটা চিনে উঠতে ভুল হয় না। এখন রুহিতন কুরমির জীবনে এটা কি দুর্বলতা না? বুধুয়া করমা দুধিকে দেখার ইচ্ছায় বুকটা টনটনিয়ে ওঠে। হঠাৎ হঠাৎ প্রাণটা উদ্বেগে চমকিয়ে ওঠে, অন্ধ মা ঝোরার কাছে গিয়ে আলগা পাথরের ওপর পা দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে না তো?" (পৃ.২১৪)

রুহিতনের এ সুপ্তোত্থিত ইচ্ছা সম্পর্কে সমালোচকের নিচের বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ :[১৭]

রুহিতন তার স্বভূমি ফিরে যাওয়ার সুপ্ত বাসনা নিয়েই যেন প্রতীক্ষা করে চলে। এটাই কী সেই Identity ফিরে পাওয়ার বাসনা! রাজনীতির জীবনে, বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির জীবন মানুষকে শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে, মানুষ হিসাবে তার Identity হারিয়ে যায়—এ রকম প্রশ্নের মুখোমুখি সমরেশবাবু আমাদের দাঁড় করিয়ে দেন।

কমিউনিস্ট বিশ্ববীক্ষা কমিউনিস্টদের শিকড়-চ্যুত হয়ে শোষণ-মুক্তির সংগ্রামের কথা শেখায় না। মাও-জে-দঙ—'জল আর মাছের' উপমা টানেন। শিকড়চ্যুত হয়ে শোষণমুক্তির লড়াই হয় না। শিকড় থেকেই এ লড়াইয়ের শুরু।

Dhaka University Institutional Repository

সমরেশবাবু—রুহিতনকে শিকড়চ্যুত বিচ্ছিন্ন মানুষ হিসেবেই চিত্রিত করেন। না হলে একটা লড়াইয়ের সাময়িক ব্যর্থতাকে হতাশার অন্ধকারে ডুবিয়ে দেওয়া যায় না। এ উপন্যাসের নায়ক রুহিতনের চেতনা প্রবাহে তিল তিল করে ডুবে যাওয়ার আখ্যানই আমরা পাই গোটা উপন্যাস জুড়ে।"

"রাজনীতির জীবনে, বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির জীবন মানুষকে শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে, মানুষ হিসাবে তার Identity হারিয়ে যায়—এ রকম প্রশ্নের মুখোমুখি সমরেশবাবু আমাদের দাঁড় করিয়ে দেন।" সমরেশ বসুর উপর এই অভিযোগটি অতি সরলীকৃত অভিযোগ। রুহিতন আট বছরের অধিক কাল বহির্জগৎ বিচ্ছিন্ন হয়েই সদর্থক ছিল; কুষ্ঠরোগাক্রান্ত রুহিতন শারীরিক-মানসিকভাবে কমরেড-সমাজ-পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই ছিল; তার প্রমাণ কলকাতার জেল-অভিজ্ঞতা—পার্টির অন্তর্কলহ, রণনীতিসংঘাত, বিশ্বাসঘাতকতা এবং কুষ্ঠরোগীর পৃথক সেল। চুনীলাল গ্রামের পরিবার-পরিজন, সমাজ ও 'চোরাচালানের মুক্ত অঞ্চল'-এর ভগ্নস্বপ্ন বুলেট তাকে যন্ত্রণায় জর্জরিত, নিঃশেষিত করেছিল। তবুও শেষে, মাটিতে লুকিয়ে রাখা দো-নলা বন্দুক নিয়ে রুহিতন যখন আঙুলহীন হাত দিয়ে ট্রিগার চাপে, একে 'লড়াইয়ের সাময়িক ব্যর্থতাকে হতাশার অন্ধকারে ডুবিয়ে দেওয়া' বলা যায় কি? বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে আমাদের কাছে আজ স্পষ্ট, ইতিহাস রুহিতনের বিরুদ্ধে ছিল। সার্বিক মানবীয় পরিস্থিতি ছিল তার বিরুদ্ধে। ব্যর্থতা যে সাময়িক ছিল না পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ইতিকথা অন্তত তাই বলে। নকশালবাড়ি আন্দোলনের তত্ত্ব ও রণনীতি, মাও জে দঙ্-এর পিকিং বেতার অনুপ্রাণিত করলেও, সেটাই ছিল বরং সাময়িক। কেন না, এখন তাদের রাষ্ট্রীয় পুঁজি ও অস্ত্রব্যবসা বিশ্বকে গ্রাস করছে, বিপন্ন করে তুলছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের স্থিরতা। রুহিতনের বিশাল বিপ্লবী ভাস্কর্য, সময় ও ইতিহাস সমরেশ বসুর হাত দিয়ে বিপন্ন নয়, পুনর্নির্মাণ করেছে।

কলকাতার জেলে, বন্দি কুষ্ঠরোগীদের সীমানায় এক বছর কয়েক মাস অতিক্রান্ত হল। রুহিতন জানতে পারে তার কুষ্ঠ রোগের কারণ। হঠাৎ একদিন বিদ্যুৎ চমকের মতো স্মরণে আসে, শনিলালের জোতে কাজ করত, নাম পেরওয়া (পায়রা)। রুহিতনের প্রায় সব সময়ের সঙ্গী ছিল সে। মুক্ত এলাকা যখন আক্রান্ত হয়েছিল, পেরওয়া ওদের গুলিতে প্রথম নিহত হয়। রুহিতনের স্মৃতিতে জেগে ওঠে :

মারা যাবার কয়েক মাস আগে থাকতেই পেরওয়ার হাতে মুখে লাল ডুমো ডুমো দাগ দেখা যেত। ওর নাক কান ভুরু আর মুখের চামড়ার চেহারাও কেমন বদলিয়ে যাচ্ছিল। পেরওয়া অবিশ্যি দাদের মলমই মাখত। রুহিতনের তখন সে সব বিশেষ নজর করে দেখার সময় ছিল না। পেরওয়ার সঙ্গে তার প্রায়ই একসঙ্গে খাওয়া শোয়া বসা ছিল। (পৃ.২১৫)

"এখন রুহিতনের শরীরে কোথাও ক্ষত নেই। কিন্তু পায়ের আঙুল প্রায় একটাও অবশিষ্ট নেই। হাতের আঙুলগুলো অর্ধেকের ওপর খসে গিয়েছে। এ জীবনে তার শরীরে আর নখ বলে কিছু গজাবে না। নাকের সামনের উঁচু জায়গাটা একেবারে সমান হয়ে গিয়েছে। ঠোঁটের ওপরে পাতলা চামড়া ঢাকা দেওয়া দুটি ছিদ্র কেবল। হাতে পায়ে, বিশেষ করে মুখে, চোখের কোলে, গালে কপালে তার নতুন চামড়া গজিয়েছে। ঘায়ের ওপর গজানো নতুন চামড়ার মতো তা লাল দেখায়। চোখের পাতা আগের মতোই পুচ্ছহীন লাল। ভুরুতে চুল গজায়নি। মাথার চুল ফাঁকা, চকচক করে। দুই কানেরই লতি খসে গিয়েছে। ছেলেবেলায় মায়ের বিঁধিয়ে ফুটো করা কানে, সেই মোটা কাঠি দুটো আর নেই।" (পৃ.২১৫) এ কোন রুহিতন? হাত-পায়ের আঙুলহীন, চুল-ভ্রূ-পুচ্ছহীন চোখের পাতার রুহিতন, চলৎশক্তিহীন রুহিতন, নিজের সুটকেসটি তুলতেও ব্যর্থপ্রায় রুহিতন। কাজেই জেল থেকে 'ছুটি হয়ে গেল' তার। তাকে পথ খরচার টাকাও দিয়ে দেয় জেল কর্তৃপক্ষ। "নিজের জামা কাপড় পরে, আট বছর কয়েক মাস পরে, নিজেকেই তার নিজের

Dhaka University Institutional Repository

কাছে অচেনা লাগল।...রুহিতনের বুকের কাছে একটা কথাই বাজছিল, ছুটি। ছুটি? কোথায় যাবে রুহিতন? এ কীসের ছুটি? এই ধরনের ছুটির কথা সে কখনও ভাবেনি, চায়নি, মনে কোনও প্রস্তুতিও নেই। (পৃ.২১৪-১৫)

চুনীলাল মৌজায় ফিরে আসার পর রুহিতনের বিচ্ছিন্নতাবোধ আরও তীব্র হয়। কারণ তার চেনা সেই মুক্তাঞ্চলের কোনো অস্তিত্ব আর নেই; এলাকায় এবং নিজের কাছেও সে আগন্তুক অচেনা।। মুক্তাঞ্চল সম্বন্ধে কারাবাসকালে যেসব কথা শুনেছিল তার প্রমাণ রুহিতন প্রত্যক্ষ করেছে। 'ঘন ঘন পুলিশের চেক পোস্ট, ছাউনি আর মিলিটারি ঘাঁটি' (পৃ.২১৭)। যে রুকনুদ্দিন আহমেদ শ্রেণিশত্রু হিসেবে রুহিতনদের দলের হাতেই নিহত হয়েছিল তার ভাই কাছিমুদ্দিন তাকে বাড়ির পথে নিতে এসেছে। 'বড় কর্তা, বড় নেতা, ধনী বাগানের মালিক আর ব্যবসায়ীদের সঙ্গে' (পৃ.২১৭) ঘনিষ্ঠতা থাকার কারণে কাছিমুদ্দিনের প্রতি তার ভাইয়ের বেশ নির্ভরশীলতা ছিল। মুক্তাঞ্চল গড়ার লড়াইয়ের সময় মিরিকের খাসমহল থেকে দার্জিলিং পালিয়ে গিয়েছিল সে। তার সঙ্গে রুহিতনকে নিতে আরও এসেছে প্রাণ বেঁচে-যাওয়া শনিলালের ছেলে বরাহলাল। রুহিতন লক্ষ করেছে গরিব সাধারণ মানুষের কেউই আসেনি এখানে। যারা এসেছে তারা প্রত্যেকেই 'ব্যবসায়ী মহাজন বা জোতদারের মতো' (পৃ.২২০) দেখতে—যাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিল রুহিতন। পরিবর্তিত হয়ে গেছে চারদিকের বাড়িগুলোর ধরন। উঁচু কাঠের মেঝের ওপর ঝকঝকে বাড়িগুলো দেখে সাধারণ ভূমিহীন কৃষকের বাড়ি বলে চেনার কোনো উপায় নেই। সরকারি সাহায্যে চাষের জমিসহ নিজের বাড়ির পরিবর্তিত অবস্থা দেখল রুহিতন যা দেখতে অনেকটা 'জোতদার মহাজনের বাড়ির মতোই' (পৃ.২২১)। বাবার আমলের পুরোনো ঘরটা 'কোমর ভাঙা বুড়ো মানুষের মতো' পড়ে থাকলেও সেটা চিনতে রুহিতন ভুল করেনি। পাল্টে গেছে তার চিরচেনা আপনজনেরাও। নরসিং ছেত্রীর দলে যোগ দেয়া রুহিতনের দুই ছেলে বুধুয়া ও করমার কাছে রুহিতন অচেনা (outsider) হয়ে ওঠে। বড়কা ছেত্রীর মতো পাতলুন, হাওয়াই শার্ট, রবারের স্যান্ডেল ও ঘড়ি পরিহিত রুহিতনের ছেলেরা এখন রেডিও, সাইকেলেরও মালিক।

সব পাল্টে গেলেও রুহিতনের স্মৃতিস্রোতে ভেসে ওঠে অতীতের দারিদ্র্যক্লিষ্ট দিনগুলোর কথা। মায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে একমাত্র আশ্রয় মঙ্গলাকে ঘিরে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছিল সে। মুক্তাঞ্চল গড়াকালীন স্ত্রী মঙ্গলার সাহসী রূপ রুহিতনের স্মৃতিতে জাগে। নানামুখী কুসংস্কারে বিশ্বাস করলেও মঙ্গলা সে সময় নিজেই "ঝাড়ফুঁক গুনিন ওঝা ভাগো। সব বুজরুকি" বলে ডাইনি পোড়ানোর প্রতিবাদ জানায়। 'লড়িয়ে নেতা' রুহিতনের স্ত্রী মঙ্গলার একথা গ্রামবাসীর মনে সাড়া জাগিয়েছিল। আর আজ তাকে দেখে রুহিতনের বিস্ময়ের ঘোর কাটে না :

মঙ্গলা! মঙলিই তো? কিন্তু এও কি অপদেবতার কারসাজি? ওর যেন বয়স আগের থেকে কমে গিয়েছে। সিঁথিতে কপালে মেটে সিঁদুরের দাগ আর টিপ। চুল টেনে আঁচড়ানো, খোঁপা বাঁধা। দু হাতে দুটো রুপোর মতো বালা। সত্যি রুপোর বালা নাকি? মিলের লাল পাড় শাড়ি পরা। নাকেও কী একটা চিক চিক করছে। ও ঠিক ওর ছেলেদের মতোই গম্ভীর মুখে অচেনা অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। রুহিতনকে যেন চিনতে পারছে না। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাকে দেখল। ওর চোখের দৃষ্টিতে যেন ভয়।

রুহিতনের ভিতরের উত্তেজনার কেন্দ্রে যেন ভূমিকম্প হল। মা মারা গিয়েছে। মঙ্গলা তার দিকে অবাক ভয়-ত্রস্ত চোখে দেখছে। সে কি কাঁদবে না, মঙ্গলার দিকে তাকিয়ে হাসবে? তার বুকের ঝোরায় কলকল করছে। মঙ্গলাও কি তার কাছে আসবে না? (পৃ.২২১-২২২)

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্মিত রুহিতনকে মঙ্গলা বলে : "বদলে তো যাবেই। সবই বদলে গেছে। তোমার সময়ে এক রকম ছিল, এখন আর এক রকম হয়েছে। আমরা যে বেঁচে আছি, সেটাই তো তাজ্জব (পৃ.২২৩)।" তবে রুহিতন বুঝতে পারে তার কারণে সরকারি সাহায্যে মারাংবুরুর দয়ায় বিশ্বাসী মঙ্গলা ও তার সন্তানদের এ বেঁচে থাকার মধ্যে রুহিতনের কোনো স্থান নেই।

কুষ্ঠরোগের রেখে যাওয়া ক্ষতচিহ্ন তাকে যে বিকৃতদর্শন করে তুলেছিল তা দেখে মঙ্গলাকে নিয়ে রুহিতনের আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়। হাসিমুখে একটু কথাও বলেনি মঙ্গলা, বরং বিরক্তি প্রকাশ করেছে বারবার। ছেলেদের সঙ্গেও তার দেখা হয় না। দিল্লি থেকে মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে তারা ব্যস্ত। মোহন ছেত্রীর ভাইপো নরসিংসহ বুধুয়া-করমা কাছিমুদ্দিনের সঙ্গে একই পতাকাতলে ঘুরে বেড়ায়—এ সংবাদ রুহিতন মঙ্গলার কাছ থেকেই পেয়েছে। নতুন গৃহে তার স্থান হয় না। পরিত্যক্ত বাড়ির এক কোণ সংস্কার করে সেখানেই তার থাকবার-খাবার পৃথক ব্যবস্থা করে দেয় মঙ্গলা। রুহিতনের সঙ্গে মঙ্গলাও থাকবে কিনা এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সে জানায় : "আমি কী করে তোমার কাছে থাকবো? তুমি জেলে যে রকম ছিলে, সে রকম আলাদাই থাকবে (পৃ.২২৪)।" কিন্তু রুহিতন কারণ বুঝতে পেরে মঙ্গলাকে অভয় দিয়ে বলেছে : "মঙলি, আমার ব্যামো এখন আর নেই। আমি ভালো হয়ে গেছি। তোমার সঙ্গে, তোমাদের সকলের সাথেই আমি থাকতে পারি।" (পৃ.২২৪)

মঙ্গলা অবিশ্বাস, বিরক্তির সঙ্গে নির্দয়ভাবে বলেছে : "সে তো তোমাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এ সব ব্যামো কারোর হলে লোকেরা তাকে ঘরে রাখে না। ছেলেরা তো তবু তোমাকে এই পুরনো ভিটায় রাখতে রাজি হয়েছে।" কথা শেষ না হতেই পুরুষ কণ্ঠের আহ্বানে 'বুধুয়ার বউ মাংরি একা রান্না করছে' বলে মঙ্গলা চলে যায়।

গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার বিশ্বস্ত যোদ্ধা হওয়ার অপরাধে আট বছর কয়েক মাসের কারাজীবনে রুহিতনের সমস্ত বিশ্বাস ভেঙে গিয়েছিল। জানতে পেরেছিল, চারদিকে ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকতা। পারিবারিক জীবনেও বিশ্বাসের এ অপমৃত্যু দেখে আপসহীন এ কমরেডের কাছে জীবন একেবারে নিরর্থক মনে হয়। মায়ের সেই গানই তার কানে বেজে ওঠে যে গানের কথা, খেলু চৌধুরীর কাছ থেকে আঘাত পাওয়ার পরও তার মনে এসেছিল

'উত্তরে উনাইল ম্যাঘ/পচ্ছিমে বরষিল গ!/ ভিজি গেল গাবানি কাপড়।'...কী জীবন! কোথায় মেঘ ঘনায়, কোথায় বর্ষায়। জীবনের রঙিন কাপড়খানি কেবল ভিজে যায়।' (পৃ.২২৫)

ক্ষুধা থাকলেও মঙ্গলার আনা ও আলাদা পাত্রে ঢেলে দিয়ে যাওয়া ভাত তরকারি মুখে তুলতে পারেনি রুহিতন। সে অতীতে মঙ্গলার মুখে শোনা মন্ত্র পড়া জলের ছোঁয়ায় কুমির হয়ে যাওয়া বরের জন্য বউয়ের দুঃখময় জীবনের গল্পের কথা ভাবতে ভাবতে 'অবাক-ত্রাসে' কুকুরের ভাত-তরকারি খাওয়া চেয়ে চেয়ে দেখেছে। গভীর রাতের অন্ধকারে ঘর ছেড়ে রুহিতন দূর থেকে ভেসে আসা মেচি নদীর স্রোতের কলকল শব্দ শুনতে শুনতে 'সর্বাঙ্গ ঠেলে' এগিয়ে যায় ময়নাগুড়ি মৌজার দিকে—'হামা দিয়ে' ওঠে দীঘির উঁচু পাড়ে অর্জুন গাছের নিচে পাথর চিহ্নিত একটি স্থানে, যেখানে মুক্তাঞ্চল গড়ার স্বপ্নবিজড়িত দিনের বিশ্বাস ও শক্তির উৎস একটি ডবল ব্যারেল বন্দুক মাটিতে পুঁতে রাখা ছিল। জীবনে সবদিক থেকে উপেক্ষিত, অপমানাহত, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ, অচেনা রুহিতন শেষ পর্যন্ত তার বিপ্লবী বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে প্রকৃতির মাঝেই শেষ আশ্রয় খুঁজেছে। নিচের অংশটি সেই মর্মন্তুদ পরিণতিরই সাক্ষ্যবাহী :

Dhaka University Institutional Repository

রুহিতন পাথরটা পা দিয়ে ঠেলে, সেখানে বসল। বসতে গিয়ে, হড়কে যাচ্ছিল। শুয়ে পড়ে পতন আটকাল, তারপর দু থাবায় গাছের ডাল দিয়ে মাটি খোঁচাতে লাগল। এত শক্ত? যেন পাথর! কিন্তু তাকে থামলে চলবে না। খোঁচাতে খোঁচাতে এক সময় নরম মাটি পাওয়া গেল। নরম মাটির এক জায়গায়, একটা গর্ত বেরিয়ে পড়ল। ঝুর ঝুর করে মাটি ঝরে পড়ল। সেই মুহূর্তেই চোখে পড়ল, সেই জিনিসের একটা অংশ। রুহিতন দু হাত ঢুকিয়ে, মুখ থুবড়িয়ে পড়ে, বন্দুকের বাঁট থাবায় চেপে টানল। সহজে ওঠবার নয়। অনেকক্ষণ চেষ্টার পরে, ডবল ব্যারেল একটা বন্দুক বেরিয়ে এল। আশেপাশে ছিটকে পড়ল মাটি। একটি ছোট বাকসোও দেখা গেল।

রুহিতন বন্দুকটা দুই হাঁটুতে চেপে ধরে, বাকসোটা তুলল। মোটা পিজবোর্ডের বাকসো, হাত দিতেই খসে খসে পড়ল। তার সঙ্গে কতগুলো টোটা। থাবায় তুলে টোটার গন্ধ শুঁকল। মাটির সোঁদা গন্ধ, গা স্যাঁতসেঁতে। সে বন্দুকটা তুলে নিল। গাছের ফাঁক দিয়ে আবছা আলো এসে পড়েছে। দেখা গেল, কাঠের বাঁটে পোকা বা উইয়ে খাওয়া ফুটো ফুটো দাগ। দুই ব্যারেলের মুখেই মাটি জাম হয়ে রয়েছে।

রুহিতন তার ডান হাতের তর্জনীর অবশিষ্ট তিন ভাগের এক ভাগ দিয়ে ট্রিগারে রাখল। বুকের কাছে বাঁট চেপে, ট্রিগারে ক্ষয়প্রাপ্ত তর্জনী দিয়ে চাপ দিল। জঙ ধরার একটা শব্দ হল। কিন্তু ট্রিগার নড়ে উঠল। এই ক্ষয়প্রাপ্ত আঙুল এখনও ট্রিগার টিপতে সক্ষম। রোদ খাইয়ে শুকোলে কি আবার এ বন্দুক চালানো যাবে? টোটাগুলো কাজ করবে? ব্যারেলের মুখ থেকে মাটি বের করে দিলে, গুলি বেরোবে? সে হাঁফাচ্ছে।

রুহিতনের সর্বাঙ্গে দরদর ঘাম ঝরছে। মুখের ভিতর থেকে জিভটা বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। না, বসে থাকা সম্ভব না। বুকের মধ্যে নিশ্বাস রাখবার জায়গা নেই যেন। সে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল। বন্দুকটা রইল তার বুকের পাশে মাটিতে। কাত হয়ে মাথাটা রাখল জোড়া ব্যারেলের ওপর। পুচ্ছহীন লাল চোখের পাতা বুজে এল। তার মনে এখন একটি মাত্র সান্ত্বনা, সে অপমান আর অভিশপ্ত আশ্রয় থেকে নিজের যথার্থ জায়গায় ফিরে এসেছে, সে বুঝতে পারছে, গভীর ঘুম আসছে তার।

বিশাল দিঘির কালো জল বাতাসে শিহরিত হচ্ছে। ঘন গুল্মের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ এক একটি রুপোলি ঝিলিক দিচ্ছে। গভীর কালো জলের লতাগুল্মের মধ্যে সেই রুপোলি ঝিলিক ধারালো রেখায় বেঁকে উঠছে।" (পৃ.২২৫-২৬)

রাজনৈতিক ও পারিবারিক উভয় জীবনে আপসহীন চরিত্র রুহিতন সম্পর্কে সমালোচকের এ কথাই[১৮] যথার্থ মনে হয় : রুহিতনের মতো ব্যক্তি একটি আন্দোলনের আর্কেটাইপ। সে রাজনীতির প্রতি সমর্পিত প্রাণ। রাজনীতির ব্যর্থতা রুহিতনেরও জীবনের ব্যর্থতা। আবার পক্ষান্তরে রুহিতনের ব্যর্থতা কেবল তার একার নয়, রাজনীতি এবং সময়ের ব্যর্থতা। রুহিতনের জীবনদর্শন একজন জঙ্গী নকশাল নেতাকেই মনে করায়। কারণ খতম অভিযানের বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগ ছিল না।...রুহিতন তার ব্যর্থ জীবন দর্শনের ভিতরই তার স্বপ্নটাকে আঁকড়ে ধরতে চায়। সে যদি খেলুদের মতো হতে পারত তাহলে তার পরিণতি ভিন্ন হতো। রুহিতন তা নয়। কারণ সে একটি ব্যর্থ অধ্যায়ের বিশ্বস্ত ইতিহাস।

তথ্যনির্দেশ

১ প্রদীপ বসু, bKkvjewoi ceÿY, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স : কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০১২। বিশদ দ্রষ্টব্য : দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ.১৬-১৪০

২ অমলেন্দু সেনগুপ্ত, †Rvqvi fvUvq lvU-mËi, পার্ল পাবলিশার্স : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৯৭, পৃ.১৫২-১৫৩

৩ নিত্যানন্দ ঘোষ, "সি.পি.আই. (এম-এল) গঠন : সংগ্রাম ভাঙ্গন পুনর্গঠন গণআন্দোলন, " চন্দন সাহা ও রাখাল রাজ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, †PZbv (বিশেষ ক্রোড়পত্র), উত্তর চব্বিশ পরগণা : কলকাতা ২০০০, পৃ.২৭৪-৭৫

৪ "সি.পি.আই. (এম-এল) গঠন : সংগ্রাম ভাঙ্গন পুনর্গঠন গণআন্দোলন", †PZbv, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৫-২৮৭

৫ gvbl kw³i Drm আনন্দ পাবলিশার্স থেকে ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালের অক্টোবর মাসে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত mg‡ik em iPbvejxi ৭ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয় ২০০২ সনে।

Dhaka University Institutional Repository

৬ ১৯৭৬-এর শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে ১৯৭৬

৭ শৈবাল মিত্র, "ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলন : পশ্চিমবঙ্গ", 'অনুষ্টুপ' শীত সংখ্যা ১৯৮৭, কলকাতা পৃ.৫৫-৫৬

৮ তপোধীর ভট্টাচার্য, evLwZb ZË I c‡qvM, পুস্তক বিপণি : কলকাতা, মার্চ ১৯৯৬, পৃ.১৫

৯ অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত, "জিজ্ঞাসা ও আত্মানুসন্ধান", mg‡ik em : ¯§iY mgxÿY (সত্যজিৎ রায়চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত) PqwbKi : কলকাতা, প্রকাশ ১৯৯৪, পৃ.১৪৮

১০ উদ্ধৃত : অশোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, "জিজ্ঞাসা ও আত্মানুসন্ধান, " প্রাগুক্ত, ১৪৮

১১ নকশালবাড়ির পূর্বক্ষণ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৩

১২ সুমন্ত ব্যানার্জি, "নকশালবাড়ি আন্দোলন ও সত্তর দশক", 'অনুষ্টুপ', ১৫বর্ষ শারদীয়া ১৩৮৭, কলকাতা ॥ উদ্ধৃত, ঝুমা রায়চৌধুরী, K_vmwn‡Z¨ mg‡ik em : mvgwMK gj¨vqb, পূর্বাশা : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৭, পৃ.৫০৭

১৩ সৈয়দ আকরম হোসেন, ie»'bv‡_i Dcb¨vm : †PZbv‡jvK I wkíi¡c, ধ্রুবপদ : ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৬, পৃ.৪০-৪১

১৪ 'মহাকালের রথের ঘোড়া' ১৯৭৬ সালের শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় ১৯৭৭ সালে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত mg‡ik em iPbvejxi ৭ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয় ২০০২ সনে।

বইটির শুরুতে একটি ভূমিকা ছিল যাতে লেখক স্পষ্ট করেছেন এ উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনা তাঁর কল্পনা থেকে সৃষ্ট। অন্য পাতায় ছিল নিচের গদ্যছন্দে লেখা প্রারম্ভিক অংশ যাতে তিনি রুহিতনের মতো সমর্পিত-প্রাণ বিশ্বস্ত যোদ্ধাদের প্রতি নিজের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন—

...সারথ্য করেছেন যাঁরা
নেপথ্যে ভূমিকা মন্ত্রণাদাতার
নেতা যাঁরা মত ও পথের নীতির স্রষ্টা
সৈনাপত্যবিদ্যাকুশলী যাঁরা
ধারক মারণাস্ত্রের নিপুণ গাণ্ডীবধারী
হুংকার করেছেন বীরদর্পে
কেহ বা বয়সোচিত অভিজ্ঞতায়
ছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞ বিষণ্ন
ভয়ংকর জ্ঞাতি বিবাদে।
হা সত্য! গৌরব করি হে তোমার
ধিক্কার, মিথ্যা! তোরে
যে যাঁর কণ্ঠে নিয়ে বাণী
করেছেন প্রচার।
ইতিহাসে খ্যাতনামা তাঁরা
কী হয় বিচার আঠারো অক্ষৌহিণীর।
দলীয় বিশ্বাসে বিশ্বস্ত
সমর্পিত-প্রাণ-নেতাদের প্রতি
লড়েছিল জান কবুল কী নাম ওদের? শহীদ?
অতীতেও লড়েছিল ওরা মরেছিল নামহীন
তারো পরে হাজার হাজার বছর
বহু মত ও পথের সিদ্ধান্তে
নয়া নয়া নীতির ধ্বজা ঘাড়ে
লড়ে চলেছে ওরা নামহীন আঠারো অক্ষৌহিণী।
বিশ্বস্ত প্রশ্নহীন যোদ্ধারা লড়ে চলে

Dhaka University Institutional Repository

লেখা হয়ে চলে ইতিহাস।
ধ্বংস আর নব-নির্মাণের মাঝে
অখ্যাত সেই কোটিদের নাম কী।

যেন দেখি নিরন্তর
ছুটে চলে মহাকাল।
বিশ্ব নিয়মের অধীন ওরা অশ্ববাহিনী
চিরকাল টেনে চলে রথ।

১৫ কিশলয় সেন, "মহাকালের রথের ঘোড়া : এক অনুভব", স্বপন দাসাধিকারী (সম্পাদিত), mg‡ik em : gvb‡li K_vKvi 'এবং জলার্ক' (দ্বিতীয় পর্ব), পুস্তক বিপণি : কলকাতা, ১১ই ডিসেম্বর ২০০০, পৃ.২৫৫

১৬ উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় নেপাল সীমানা সংলগ্ন তরাই অঞ্চলে নকশালবাড়ি এলাকায় ১৯৬৭ খ্রি মে মাসে একটি কৃষক আন্দোলন থেকে ক্রমে নকশাল আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। সময়টা ছিল পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমল (১৯৬৭-৬৯)। গোড়ায় সশস্ত্র এই বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার কয়েকজন সদস্য। উগ্রপন্থী সেইসব সদস্যরা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম সহায়ক সমিতি নামে পৃথক একটি গুপ্ত মার্কসবাদী পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত করেন (নভেম্বর ১৯৬৭), তাঁদের অধিকাংশই গ্রেপ্তার হন। জেল থেকে মুক্তির পর তাঁরা দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) গঠন করেন। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে ১৯৬৯ খ্রি মে দিবসে এক জনসভায় প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষিত হয়। সি পি আই (এম)-কে নয়া-শোধনবাদী দল আখ্যা দেওয়া হয়। দলছুট বিক্ষুব্ধ কর্মীদের সি পি আই (এম) অতিবাম, হঠকারী ও বাস্তব চিন্তাশক্তিবিহীন বলে সমালোচনা করে।

প্রতিষ্ঠাকালে এক রাজনৈতিক প্রস্তাবে ভারতের বিপ্লবের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলা হয় যে ভারত হল একটি আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততন্ত্রী দেশ, বৃহৎ ভূস্বামী ও তাঁবেদার বুর্জোয়া পুঁজিপতির কুক্ষিগত, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক রাষ্ট্র। বর্তমান পর্যায়ে ভারতীয় বিপ্লবের প্রকৃতি হল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের, যার প্রধান লক্ষ্য ও কার্যক্রম হওয়া উচিত কৃষি বিপ্লব এবং সামন্ততন্ত্রের অবসান। সেজন্য নতুন পার্টির কর্তব্য হল সংগঠিত কৃষক আন্দোলন ও সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জনযুদ্ধ ও শাসনক্ষমতা দখল ; সংগ্রামের মূল কৌশল হবে †Mwij v h‡×i রীতি অনুসরণ ও বৈপ্লবিক মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি। সংসদীয় শাসনব্যবস্থা ও সংসদীয় নির্বাচনকে পার্টি সম্পূর্ণ বর্জন করে। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের জন্য চাই জনযুদ্ধের গেরিলা পদ্ধতিতে সংগ্রাম। নেতৃত্ব দেবে যে পার্টি সেটা শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়ে গঠিত হবে। গ্রামাঞ্চলে যে সব বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে উঠবে সেগুলি এক সময়ে শহরগুলিকে ঘেরাও করে ক্ষমতা দখল করবে। চারু মজুমদার ও কানু সান্যাল ছিলেন দলের প্রধান তাত্ত্বিক নেতা ও সংগঠক।

নকশাল আন্দোলনে যুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে সক্রিয় ছিল। উল্লিখিত মে দিবসের সমাবেশে সেইসব গোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানের পরিবর্তে সি পি আই (এম-এল) দলে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়। অনেক গোষ্ঠীই নানা যুক্তি দেখিয়ে তাতে যোগ দেয়নি। অবশ্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় গড়ে ওঠে।

অন্ধ্রপ্রদেশে টি নাগি রেড্ডির নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী পার্টির গোড়াপত্তন হয় (জুন ১৯৬৮)। কিন্তু চিরাচরিত প্রথায় পার্টি সংগঠন পরিচালনে তাঁর সঙ্গে চারু মজুমদারের মতদ্বৈধ ঘটে। তাই অন্ধ্রের নাগি রেড্ডি গোষ্ঠী ও পশ্চিমবঙ্গে অসিত সেন গোষ্ঠী সি পি আই (এম-এল) দলের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। তাঁদের দৃষ্টিতে ওই দল মাও-এর মতাদর্শ বিকৃত করে চে গুয়েভারার পথ অনুসরণ করে। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে এবং গ্রামভিত্তিক গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলের কর্মসূচিতে তাঁরা দ্বিতীয় সি পি আই (এম-এল) গঠন করেন।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতিবাম ও উগ্র বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত সি পি আই (এম-এল) তার সদস্যদের কাছে বিস্তারিত (১৫ মে ১৯৬৯) খসড়া এক রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলে যে এখন হল মাওবাদের যুগ এবং মাও-এর নেতৃত্বে সকল দেশের মুক্তিযুদ্ধকে একত্র আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করা কর্তব্য। তাতে মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র এবং সহায়তাকারী পুঁজিবাদ হল কমিউনিজমের চার প্রধান শত্রু।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭০ খ্রি মে মাসে একটি খসড়া দলিলে চারু মজুমদার বলেন চীনের চেয়ারম্যান হলেন সি পি আই (এম-এল) দলের চেয়ারম্যান এবং চীনের পথই তার পথ। সি পি আই ও সি পি আই (এম)-কে শ্রমিক শ্রেণীর শত্রু এবং নাগি রেড্ডি ও অসিত সেনের গোষ্ঠী হল নয়াশোধনবাদী রেনিগেড (দলত্যাগী)। সি পি আই (এম-এল) দলের ওই মাসে অনুষ্ঠিত প্রথম পার্টি কংগ্রেসে চারু মজুমদারের থিসিস গৃহীত হয়। তাতে গেরিলা যুদ্ধে কৃষক বিপ্লব ও গ্রামীণ এলাকায় মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। জুলাই-আগস্ট মাসে পার্টিতে বিভেদ দেখা দেয়। অন্ধ্রের বিশিষ্ট নেতা নাগভূষণ পট্টনায়ক এবং এম আপ্পালা সুরি পার্টির কর্মসূচি অনুযায়ী শ্রেণীশত্রু হিসেবে ভূস্বামীদের নিধন গ্রামীণ জনগণকে পার্টির প্রতিকূল করে তুলছে বলে মনে করেন। তাঁরা মাও-এর নামে ব্যক্তিপূজার সমালোচনা করেন। ফলে চারু মজুমদার পার্টির প্রধান সংগঠক কানু সান্যালকে মধ্যপন্থী হিসেবে অভিযুক্ত করেন। ১৯৭০ খ্রি সেপ্টেম্বরে পার্টির মুখপত্র 'দেশব্রতী' পত্রিকায় বিগত এক বছরে দেড় শত ভূস্বামী ও সুদখোরকে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়। (দ্র. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ivRbxwZi Awfavb, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ.১৪৫-১৪৬)

১৭ "মহাকালের রথের ঘোড়া : এক অনুভব", প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৬

১৮ ড. ঝুমা রায়চৌধুরী, K_vmwn‡Z¨ mg‡ik em : mvgwMK gj¨vqb, প্রথম খণ্ড, পূর্বাশা : কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ.৪৬৮

পঞ্চম অধ্যায়

সমরেশ বসুর উপন্যাসে রাজনৈতিক জীবন ও তার রূপায়ণ

অন্ত্য পর্যায়

যুগ যুগ জীয়ে শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে খণ্ডিতা

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সমরেশ বসুর উপন্যাসে রাজনৈতিক জীবন ও তার রূপায়ণ

অন্ত্য পর্যায়

যুগ যুগ জীয়ে শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে খণ্ডিতা

যুগ যুগ জীয়ে

hM hM Rx‡q[১] সমরেশ বসুর দীর্ঘতম ও মহাকাব্যোপম উপন্যাস। উপন্যাসটি আত্মজীবনীমূলক না রাজনৈতিক সে বিষয়ে সমালোচক মহলে মতান্তর রয়েছে।[২] সবর শ্রী নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত hM hM Rx‡q উপন্যাসকে আত্মজৈবনিক মনে করলেও সমরেশ বসু রচনাবলী-সম্পাদক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়েছেন, নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের "ভাষ্যের সঙ্গে আমার সর্বৈব ঐকমত্য নেই।" তিনি আরও অভিমত দিয়েছেন, "আবার, কোনও নিবিষ্ট পাঠক 'যুগ যুগ জীয়ে'র মধ্যে রাজনৈতিক প্রলেপ দৃষ্টে উপন্যাসটিকে রাজনৈতিক বলার পক্ষপাতী। এই অভিমতও সর্বাংশে গ্রাহ্য বলে আমি মনে করি না।"[৩] মতান্তরের ও সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিন্ন মতের মীমাংসা করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

রাজনৈতিক উপন্যাসে নিঃসন্দেহে গুরুত্ব পায় রাজনৈতিক বাস্তব কাঠামো, চরিত্রাবলি সক্রিয় হয় রাজনৈতিক পরিবেশে। মানবীয় অভিজ্ঞতা ও অস্তিত্ব মূলত নিয়ন্ত্রিত হয় রাজনৈতিক আধিপত্যবাদী নিয়ন্ত্রক শক্তি দ্বারা, কিংবা প্রতিরোধী আদর্শ দ্বারা। স্মরণীয়, শাসন-শোষণ কাঠামোকে পাল্টে দেওয়ার মানবীয় কর্মক্রিয়াও রাজনৈতিক উপন্যাসের উপকরণ। তবে উপন্যাসকে অর্থবহ হতে গেলে অবশ্যই তাকে নান্দনিক প্যাটার্নে রূপায়িত হতে হবে। Political Novel is a book which ædirectly describes interprets or analysis a Political phenomena." He further adds that in the political novel the characters æmust carry out political acts and more in a political environment.'' It has been described and interpreted human experience, selectively taking the facts of existence and imposing order and from upon them in an aesthetic pattern to make them meaningful.[৪]

এ প্রসঙ্গে Irwing Howe-এর অভিমত উদ্ধৃত করা যেতে পারে :[৫] By Political Novel I mean a novel in which political milieu is the dominant setting. Perhaps, it would be better to say : a novel in which we take to be dominant political ideas or political milieus, a novel which permits this assumption without thereby suffering any radical distortion and it follows, with possibility of some analytical profit.

রাজনৈতিক প্রত্যক্ষ সাংঘর্ষিক ঘটনা, নতুন স্বপ্ন, পৃথিবীকে পাল্টে দেওয়ার প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-দ্রোহ কেবল উপন্যাসের উপকরণ হলেই রাজনৈতিক উপন্যাস সংজ্ঞার্থে যথার্থ হবে, এমন কথা নয়; ওরেলিয়ন-উত্তর রাজনৈতিক উপন্যসের সংজ্ঞার্থ পুনর্নির্মিত হয়েছে। এখন রাজনৈতিক ঔপন্যাসিকগণ, প্রধানত

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক সম্প্রসারণবাদী ও আধিপত্যবাদী এবং পুঁজিবাদী শোষণের বহির্চাপের মানবীয় পরিস্থিতি– রাজনৈতিক হতাশা, স্বৈরাচারপীড়িত বিচ্ছিন্নতা, উৎপীড়নজনিত নিঃস্ববোধ, নৃশংস-অত্যাচার উৎসারিত বিচিত্র অবক্ষয়কেও গুরুত্ব দেন। এমন কী প্রথাবিরুদ্ধভাবে গ্রুনটার গ্রাস, গ্যাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, আলেহো কার্পেনতিয়ার, গ্রাহাম গ্রিন, বি.এস. নইপাল এবং মিলান কুন্ডেরাও রাজনৈতিক উপন্যাসের সীমানাকে সম্প্রসারিত করেছেন।

hM hM Rx‡qর তিনটি খণ্ডের ঘটনা পরম্পরায় ত্রিদিবেশের, অনেকাংশে সমরেশ বসুর, রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, যুদ্ধের অনিবার্য অভিঘাতে সৃষ্ট মন্বন্তর, কালোবাজারি, কলকাতার জনজীবনে জাপানি বোমার ভয়াবহ আতঙ্ক, চিনা-বাঙালি সংঘর্ষ, জাতীয় কংগ্রেস এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট (অখণ্ড) পার্টির মতপার্থক্য ও মুখোমুখি সংঘাত, সুভাষ বসুর ভূমিকা, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মুসলিম লিগের ভিন্ন অবস্থান, দেশভাগ, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের বিদ্রোহ ও আন্দোলন এবং পরবর্তীতে কংগ্রেসের কমিউনিস্ট বিরোধী নীতি, পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা, আন্ডারগ্রাউন্ডে অবস্থান, আন্তর্জাতিক পটভূমিতে কমিউনিস্ট পার্টির নতুন নীতি ও কৌশল এবং তার অন্তঃসারশূন্য ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া রূপায়ণের মধ্যদিয়েই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সুতরাং hM hM Rx‡q যে রাজনৈতিক উপন্যাস এ সম্পর্কে দ্বিধান্বিত হওয়ার সুযোগ আছে বলে আমরা মনে করি না।

hM hM Rx‡qর আত্মজৈবনিক উপাদান সম্পর্কে স্মরণীয়, সুপ্রণীত উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের জীবনাভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে অনিবার্য ভূমিকা পালন করে। সরোজ বন্দ্যোধ্যায়ও প্রকারান্তরে তা স্বীকার করেছেন : "ত্রিদিবেশের গঠনে আর সমরেশের গঠনে, ত্রিদিবেশের গতিশীল অভিজ্ঞতায় আর সমরেশের নানা বিস্ফোরক জীবনব্যাখ্যায় সার্বিক সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য। আপাত সাদৃশ্য যেটুকু আছে তা তো ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট নায়ক চরিত্রে প্রত্যাশিত স্রষ্টার ছায়া।"[৬]

চল্লিশের দশকের উত্তাল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে সমরেশ বসুর hM hM Rx‡q উপন্যাসের পটভূমি। hM hM Rx‡q উপন্যাসের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক স্রোতে ব্যাপক স্রোত-প্রতিস্রোতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বাস্তবতায় জাতীয় কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মতপার্থক্যের সূচনা হয়। শর্তানুসারে নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা কারামুক্ত হয়ে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্ত অনুসারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ফ্যাসিস্ট বিরোধী 'জনযুদ্ধ' ঘোষণা করে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশরাজকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। এর পূর্বেই ১৯৩৯ সালের ২৮ এপ্রিল এম. কে. গান্ধীর সঙ্গে নীতিগত পার্থক্যের সূত্র ধরে সুভাষ বসু সভাপতির পদ ত্যাগ করে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯। ১১ আগস্ট ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪১-এর ১৭ জানুয়ারি গৃহবন্দি থাকা কালে ছদ্মবেশে গৃহত্যাগ করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বাস্তবায়নের স্বপ্ন নিয়ে গোপনে জাপান যাত্রা করেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে নাৎসিবাদ, ফ্যাসিবাদ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসানের লক্ষ্যে ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ জুলাই মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা অধিবেশনে 'কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি' ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে এম. কে. গান্ধীর 'ভারত ছাড়ো'(Quit India) আন্দোলনের প্রস্তাব অনুমোদন করে। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ আগস্ট কংগ্রেসের কার্য-নির্বাহক সমিতি এ প্রস্তাবের আইনগত স্বীকৃতি দানের পর ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ৯ আগস্ট 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' এ ধ্বনি কণ্ঠে নিয়ে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সূচনা হয়।[৭]

ব্রিটিশ সরকার এ আন্দোলনের জন্য কংগ্রেসের এম. কে. গান্ধী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, জওহরলাল নেহরু, আবুল কালাম আজাদ, জে. বি কৃপালনীসহ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি কংগ্রেসকে বেআইনি বলে ঘোষণা করে। সরকারি দমননীতির প্রতিবাদে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ছাত্র-

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষক, কৃষক-শ্রমিকসহ সকল শ্রেণির মানুষের অংশ গ্রহণে ব্যাপক গণআন্দোলনে রূপ নেয়। আন্দোলনের নানা কর্মসূচি পালনের ওপর ব্রিটিশ সরকারের নিষেধাজ্ঞার কারণে এ আন্দোলন হিংসাত্মক আকার ধারণ করে। এতদ্ব্যতীত ছেচল্লিশের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এবং ভারত বিভক্তি প্রভৃতির প্রেক্ষাপটেই hM hM Rx‡q উপন্যাসের বিন্যাস।

উপন্যাসের প্রথম খণ্ড ষোলো পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় খণ্ড পঁচিশ পরিচ্ছেদ ও তৃতীয় খণ্ড উনিশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় চরিত্র ত্রিদিবেশের জীবনলগ্ন ঘটনাপুঞ্জ ও অভিজ্ঞতা এ উপন্যাসের কথকতা; বলা চলে hM hM Rx‡q অনেকাংশে ঔপন্যাসিক সমরেশ বসুর যাপিতজীবনের রূপকল্প, শিল্পরূপ।

সমরেশ বসু hM hM Rx‡q উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ত্রিদিবেশের ব্যক্তিক-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ভারতবর্ষের ঘটনাবহুল চল্লিশের দশকের সময়-পরিসর, বিস্তৃত ক্যানভাসে অঙ্কন করেছেন। এ উপন্যাসে সময়, ব্যক্তি ও রাজনীতির সমান্তরাল বহতা পরিসরের অন্তর্বয়ন, ঔপন্যাসিকের অন্যতম শিল্পকৌশল হিসেবে অনুসৃত হয়েছে। ত্রিদিবেশের দেখা রাজনৈতিক জীবন-স্রোতের বিভিন্ন ধারায় রয়েছে– সবিতাব্রত পণ্ডিত-ইন্দ্রনাথ-মোহন-অজয় যারা কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী। অন্যদিকে মোহনের দাদা রমণ, তার বাবা, সবিতা পণ্ডিতের মেশোমশাই ব্যারিস্টার নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, দয়াল মিশির, বৈজু প্রসাদ, ছোটন, শীতল জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত। এ ছাড়াও রয়েছে স্কুল হেডমিস্ট্রেস মধুমতী রায়, হিমাংশু ডাক্তার, দাঙ্গায় আহতদের সেবিকা সালমা, তুরাপ মিয়াঁ, অনিল ব্যানার্জি ও চন্দ্রনাাথের মতো দলীয় ও নির্দলীয় উদারনৈতিক চরিত্র, যাদের কাছে ভ্রান্ত ও আত্মঘাতী পার্টিনীতির স্থলে, মানবতাই মুখ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। ত্রিদিবেশ, সাহু, ফুলবাসিয়া আর সাধুদের গঙ্গাতীরের আস্তানার দৃশ্যাংশ থেকে উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের শুরু। সংঘটিত দ্বৈরথ-দৃশ্যটি আপাত বিশ্লিষ্ট হলেও, প্রতীকী তাৎপর্যে গুরুত্ববহ– ফণা তোলা গোখরা, গাঢ় পিঙ্গল বর্ণ নেউলের অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধ। ত্রিদিবেশ দেখে নেউল "নখাগ্র থাবার সুদীর্ঘ টানে পিঠের দিকে লম্বা করে চিরে দেয়। এক বার না, বারে বারে ঝাঁপিয়ে পড়ে, গোখরাকে ছিন্নভিন্ন করতে থাকে। শত্রুর শেষ রাখতে নেই, যেন এই প্রতিজ্ঞায় সে অটল। (প্রথম খণ্ড ॥ এক ॥ পৃ.২৯০)।" এই সাংকেতিক বর্ণন-বুনটের মধ্যদিয়ে hM hM Rx‡qর বিসর্পিল জীবনস্রোতের মৌল সংঘাত, ক্ষরণ ও রক্তাক্ত কালান্তর দ্যোতিত হয়ে ওঠে।

বকুলতলা ক্লাবের নিয়মিত সদস্য বাইশ-তেইশ বছর বয়সী সবিতাব্রত সেন। সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে, হাতে বিদেশি সিগারেট। বিদেশি সুগন্ধী ব্যবহারকারী সৌখিন তরুণ। চোখে এখনও 'কৈশোরের স্বপ্নের আবেশ' জড়ানো। পূর্ব বাংলার টান রয়েছে তার কথায়। বি এ পাশ করার পর 'জনযুদ্ধ' পর্যায়ে সে কলকাতার নামকরা বিলিতি কোম্পানিতে চাকরি পেলেও 'অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট' লড়াইয়ের সময় বিনা নোটিশে মাসখানেকের বেশি অফিসে অনুপস্থিত থাকে। বকুলতলা ক্লাবে তার আড্ডা। বঙ্গবাসী কলেজে কিছুদিন পড়াশোনা-করা অসমবয়সী চন্দ্রনাথের সঙ্গে সে তাস খেলে। বর্তমানে জমিদারপ্রায় চন্দ্রনাথের ভাইপো-ভাইঝিদেও হোম টিউটর সবিতাব্রত। "এই সবিতাব্রতই সমরেশ জীবনের সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, সত্য মাস্টার।[৮] তার সমবয়সী অন্য ছেলেদের থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী সবিতাব্রতকে চন্দ্রনাথ ডাকেন পণ্ডিত। সে আগে নিয়মিত রেসের মাঠে গেলেও এখন সে আর আগ্রহ বোধ করে না। বর্তমানে তাস খেলার চাইতে সবিতাব্রত ভারতীয় অখণ্ড কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জনযুদ্ধ' পড়ায় বেশি আগ্রহী। পত্রিকা পড়ে "পণ্ডিতের রক্তে রাগ ছড়াতে থাকে, মুখ শক্ত, ডাগর চোখে ঘৃণা ঝলকিয়ে ওঠে।" (প্রথম খণ্ড ॥ দুই ॥ পৃ.২৯৩)

সবিতাব্রতর বাবা পূর্ববঙ্গ থেকে এই অঞ্চলে এসেছিলেন। তাঁর দাদা রেলে চাকরি করে মাকে নিয়ে বাংলার বাইরে থাকেন। সবিতার মেসোমশাই নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত কলকাতার বিখ্যাত আইনজীবী। তিনি বঙ্গীয় পরিষদের কংগ্রেস ও সরকারি কংগ্রেস দলের বিশেষ উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতা। নরেন্দ্রনাথের ছেলে নিশিকান্ত, বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার। লন্ডনে থাকাকালীন কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং

Dhaka University Institutional Repository

সেখানেই দীক্ষা লাভ করেন। হ্যারি পলিটের প্রীতিভাজন ছিলেন। পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সভ্য হওয়ার প্রস্তাব থাকলেও সেটা গ্রহণ না করে তিনি পার্টির মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা করেই পার্টিতে ভূমিকা রাখতে চান। উল্লেখযোগ্য, "সমরেশ বসুর ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনে চিঠির মুসাবিদা ও আনুষঙ্গিক সাহায্য করতেন কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় সদস্য বিমল দত্ত, যিনি তখন আলিপুর কোর্টে প্র্যাকটিস করতেন এবং যাঁকে 'যুগ যুগ জীয়ে' উপন্যাসে সরাসরি উপস্থাপিত করা হয়েছে।"[৯] পিয়ানো বাজিয়ে উচ্চস্বরে গান করেন : 'সারা সন্সার হমারা হ্যায়। / হমারা হ্যায়। মুজলোমে নে মুলকো অব্ / ঝান্ডা লাল উঠায়া হ্যায়...' (প্রথম খণ্ড ॥ নয় ॥ পৃ.৩৭৬)–গান করেন তিনি।

নিশিকান্তই সবিতাব্রতকে কমিউনিস্ট মতবাদের দিকে আকর্ষণ করেন। পার্টি নিষিদ্ধ থাকা কালে ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে কাজ করা, আন্ডারগ্রাউন্ড নেতৃবৃন্দ ও জগদ্দল অঞ্চলে চটকলের মল্লিক সর্দারের বাড়িতে কয়েকদিন কাটানোর সময় মুজাফ্ফর আহমেদের সঙ্গেও সবিতাব্রতর সংযোগ ঘটে। কিন্তু রুশ আন্তর্জাতিক কমিনটার্নের নীতির বদলে জনযুদ্ধের রাজনীতি[১০] আসায় সবিতাব্রত বিব্রত ও বিপন্ন বোধ করে। সে সময় পর্যন্ত পি সি যোশীসহ বাইরের আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টি জনযুদ্ধের ডাক গ্রহণ করেনি।

মুসলিম লিগের নেতা শরাফত হোসেন সবিতাব্রতর সাংগঠনিক সম্মোহক শক্তিকে পছন্দ করে। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মুসলিম লিগের কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের নামে কাজ চালিয়ে যাওয়া কংগ্রেসি ওয়ালা সূরষপ্রসাদের সঙ্গে 'আখিরি ফাইট'-এর ইচ্ছা সে পোষণ করে। সবিতাব্রতর শুদ্ধচিত্তকে মুসলিম লিগেরই অন্য এক সমর্থক ভয় পায় কারণ এর মধ্যেই সে অনেককে পার্টির পতাকাতলে সমবেত করতে সমর্থ হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি কখনো মুসলিম লিগের সঙ্গে হাত মেলাবে কিনা এটা নিয়ে সে যথেষ্ট সন্দিহান সবিতাব্রত। শরাফত হোসেনের কাছ থেকেই জানা যায় লাল ঝাণ্ডা পার্টি তথা কমিউনিস্ট পার্টিতে বাবর মিয়ার মতো পাকিস্তানপন্থী নেতাও রয়েছেন। যাকে সে বাঘের সঙ্গে তুলনা করেছে। ১৯২৮ সালে বাবর মিয়া চটকল শ্রমিকদের খুব বড় লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তখন বঙ্কিম মুখার্জি, কংগ্রেসি নীহারেন্দু দত্তমজুমদার, আর প্রভাওতী দেবীও অনেক বড়ো লড়াই করেছে। বাবর মিয়ার মতো শুদ্ধচিত্ত, সম্মানিত নেতাকেও সবিতাব্রত নিজের পার্টিতে এনেছে। তাকে অনুসরণ করে আরও অনেকেই লালঝাণ্ডার দলে এসেছে। লছমনের মতো খলিফাও এ দলে এসেছে।

hM hM R‡qর প্রথম খণ্ডে বকুলতলা ক্লাবের রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্ক বলয়ের মাঝ দিয়ে কুণ্ডলী-আকারে (spiraling) প্রবাহিত হয়েছে ত্রিদিবেশের জীবনকথা, ত্রিদিবেশ-শিউলীর প্রণয়াখ্যান। এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে অতীত প্রক্ষেপণ রীতি, এক ধরনের উল্লম্ফনধর্মিতা। সমরেশ বসু অতীত প্রক্ষেপণরীতিতে উপস্থাপন করেছেন ত্রিদিবেশ-শিউলীর প্রণয় সম্পর্কের উৎস ও বিস্তার। প্রথম খণ্ডের বারো পরিচ্ছেদে শিউলীর মন চলে যায় চার বছর পিছনে, স্মৃতিময়তায়। পনেরো বছর বয়সী ত্রিদিবেশ দুরন্ত, উদ্দাম। প্রথাবদ্ধ শিক্ষাজীবন তার ভালো লাগে না। শিক্ষাজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোতেই তার আনন্দ। এ বয়সেই ধূমপানে অভ্যস্ত। মামারা কেউই পিতৃহীন এ কিশোরের প্রতি সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু ত্রিদিবেশ ভালো ছবি আঁকে। সমরেশ বসুরই প্রতিচ্ছবি hM hM R‡qর ত্রিদিবেশ।[১১] চাটুজ্যে পাড়ার কেদার চক্রবর্তীর কাছে এস্রাজ বাজানো শেখে। বন্ধু রাখাল মজুমদারের বাবা প্রতাপ মজুমদার তাকে ডাকেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্কুলগামী মেয়েদেরকে বখাটেদের উত্ত্যক্ত করার প্রতিরোধ করে ত্রিদিবেশ একাই। সমরেশ জীবনের বাস্তব ঘটনা এটি।[১২] বন্ধুর বোন ত্রয়োদশী শিউলী তথা ফুলির চোখে সে তখন অভিমন্যু হয়ে ওঠে। হাতে লেখা ম্যাগাজিনের জন্য শহরের উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের হেড

Dhaka University Institutional Repository

মিস্ট্রেস মধুমতী রায় গর্কির গল্প 'এক শরৎ সন্ধ্যায়' অনুবাদ করেন। সে গল্পের অনুলেখক ও সংশ্লিষ্ট ছবি আঁকিয়ে ত্রিদিবেশ। শিউলীর সামনে এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে মধুদির চোখে তার প্রতিভার জন্য বিস্ময়, মুগ্ধতা, প্রীতি ও স্নেহ প্রকাশ পায়। মধুদির ব্যক্তিত্ব ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ শিউলীর কাছে, ত্রিদিবেশও নতুন রূপে প্রকাশ পায়। তেরো, চৌদ্দ, পনেরো পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ত্রিদিবেশ-শিউলীর অন্তর্ময় আবেগী প্রণয়ের অগ্রপশ্চাৎ অভিমুখের দ্বন্দ্ব, ধূমাবতীর মন্দির প্রাঙ্গণের আত্মসমর্পণ, মধুদিকে নিয়ে ঈর্ষাচঞ্চল উদ্বেগ-আবেগ ইত্যাদি আবর্তিত হয়েছে। প্রথম খণ্ড পনেরো পরিচ্ছেদে সমরেশ বসুর শব্দবয়ন ও মনস্তত্ত্ব বিবেচনা তাৎপর্যপূর্ণ :

সিঁড়ির বাঁকে যেতে, এবং সিঁড়ির বাঁক থেকে ধূমাবতীর পোড়োয় যেতে সময় লেগেছিল দুবছর, কিশোর কিশোরীর অনেক ভালো লাগা না-লাগার দ্বন্দ্ব আর ধন্দের মধ্যদিয়ে, এক একটি মুগ্ধ মুহূর্ত এবং তীক্ষ্ণ বিদ্ধ সন্দেহের মধ্যদিয়ে, অনুরাগ বিরাগ, মান অভিমান এবং হঠাৎ হঠাৎ অদর্শনের মধ্যদিয়ে, এবং সিঁড়ির বাঁক থেকে ধূমাবতীর পোড়ো, দুজনের জীবনে আর একটি পথ খুলে দিয়েছিল। যেপথ আগের সঙ্গে আগের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন না হলেও, যেন এক বাঁক থেকে একেবারে ভিন্ন এক পথে, যার মধ্যে ছিল ঝড়ের বেগ, অথচ এক অতলান্ত গভীরতা। (প্রথম খণ্ড ॥ পনেরো ॥ পৃ.৪২৪)

কালক্রমে 'ধূমাবতীর পোড়োর জঙ্গলের সুদৃশ্য অজগরটি' যেন শিউলীকে বিজড়িত করে। আমরা ক্রমশ প্রত্যক্ষ করি শিউলীর বিপন্ন মানসিকতা, উৎকণ্ঠিত মনস্তত্ত্ব ও সমাধানহীন সংকট। শিউলী সন্তানসম্ভবা। মোহনের হাতে পাঠানো শিউলীর চিঠি :

'আমি জানি না কী হবে। দাদা বউদিকে একটা ওষুধ এনে দিয়েছিল, ওইসব ব্যাপারের জন্য। ...সেই ওষুধ আমি কাল খেয়েছিলাম। নিয়ম কানুন কিছুই জানি না, খেয়ে ফেলেছি। আরও খাব ভাবছি। ...জান, এক এক সময় ভীষণ কান্না পাচ্ছে। তুমি ছাড়া কাকে বলব। চিঠি পাওয়া মাত্র দেখা করবে, না হয়তো লিখে জানাবে। ...আর ঈশ্বরের দয়ায় তোমার যদি একটি চাকরি হয়ে যায়, তা হলে তো কথাই নেই। আমার এখন আর কেই নেই। প্রণাম নিও। ইতি– তোমার শিউলী।' (প্রথম খণ্ড ॥ পাঁচ ॥ পৃ.৩২৪)

চারিদিকে পুঞ্জিভূত হচ্ছে সংবর্ত, সংঘটিত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, ফ্যাসিস্ট বিরোধী বিশ্বযুদ্ধ এবং আপসহীন লড়াই–'ভারত ছাড়ো'। পর্যুদস্ত, বিপর্যস্ত ত্রিদিবেশ চায় একটা কাজ, একটা চাকরি– শিউলীর জন্য।। সে শুধু এটুকু জানে বিশ্বযুদ্ধকালীন এ আর পি, সিভিকগার্ড, ফায়ার ফাইটিং সারভিসের মতো কাজ অনেকেই পাচ্ছে। কিন্তু এসব কারা পাবে সেটা ঠিক করবে অ্যাসেম্বলির কর্তাব্যক্তিরা :

...একটা কাজ, যে কাজে আশ্রয় আর খাবার জুটবে। বাড়ি থেকে, বলতে গেলে, ও একরকম বহিষ্কৃত। ওর বয়স আঠারো। শিউলী–শিউলীর কত?... পণ্ডিতদার সঙ্গে দেখা করেই বা কী হবে? উনি নিজে একটা ভাল চাকরি করেন, কলকাতার এক অফিসে। সেখানে ত্রিদিবেশের চাকরি হতে পারে না। অথচ অনেকে অনেক কাজ পাচ্ছে। নতুন নতুন চাকরি, এ আর পি, সিভিকগার্ড, ফায়ার ফাইটিং সারভিস। এ বিষয়ে কাল না আজ কাগজে কী বেরিয়েছে, এ সব চাকরি কারা পাবে না-পাবে, তার জন্য অ্যাসেমব্লিতে ভোটাভুটি হয়েছিল। অ্যাসেমব্লি–ফজলুল হক–প্রমথ ব্যানার্জি–হবিবুল্লা– নলিনাক্ষ স্যানাল–কিরণশঙ্কর রায়; সবাই দেশ শাসন করে, রক্ষা করে, আরও কী সব করে, ত্রিদিবেশ কোনও ব্যাপারটাই ঠিক বোঝে না।" (প্রথম খণ্ড ॥ চার ॥ পৃ.৩০২-০৩)

ত্রিদিবেশ চাকরি প্রত্যাশায় স্কুল বন্ধু রশীদের জন্য রুজভেল্ট টাউনের প্লাটফর্মহীন স্টেশনে নামে। কাঁচড়াপাড়া আর মদনপুর দুই স্টেশনের মাঝামাঝি জায়গায় রুজভেল্ট টাউন, আমেরিকান যুদ্ধ ঘাঁটি, চাঁদমারি এবং এয়ারবেস তৈরির জন্য সামরিক ঘোষণাবলে কয়েকশো গ্রাম প্রায় নিশ্চিহ্ন করা হয়। জীবিকাসন্ধানী ত্রিদিবেশ বড়ো দোকানদার মাহমুদ সাহেবের ছেলে স্কুলের সহপাঠী বন্ধু, পরিবারের বন্ধনমুক্ত রশীদের কাছে কাজের সন্ধানে এসে এসব গ্রামের বাস্তুহারা মানুষের অসহায় জীবন প্রত্যক্ষ করে। যুদ্ধ, খাদ্যদ্রব্যের অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধি আর দারিদ্র্যের কশাঘাতে কীভাবে মুখ থুবড়ে পড়ছে বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক সম্পর্ক, নৈতিকতা আর শুদ্ধতা। আর্মিদের জন্য নারীরা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারত না। শুধু রবার্ট নয়, আরও অনেক আমেরিকান সৈন্যের জন্য নারী সংগ্রহ করত রশীদের বন্ধু সন্তোষ। এসব নারীদের অধিকাংশই যে রুজভেল্ট টাউন তৈরির জন্য উদ্বাস্তু পরিবারের স্ত্রী-কন্যা, ত্রিদিবেশ তা উপলব্ধি করে। বৃষ্টিমুখর অন্ধকার রাতে তুলসী, আশমান, কমলা, আমিনার মতো গৃহস্থঘরের এসব নারীদের প্রতি মার্কিন সেনাদের পাশবিক উন্মত্ত আচরণের মধ্যে ত্রিদিবেশ কুকুরের পৈশাচিকতা লক্ষ করে। পারিবারিক এমনি সব জীবনের চালচিত্র hM hM R‡qর অন্যতম বাস্তবতা।

নগদ অর্থ উপার্জনের আশায় সন্তোষ করছে এ হীন কাজ। হাসমত চুনুরির বউ আশমানের কাছে সন্তোষ যখন শুনতে পায় মোহনপুরের পেঁচোর বউ কমলাও এসেছে তখন বিস্মিত হয়ে সে জানতে চেয়েছে :

"...তোর ভাতারের না হয় কালে ধরেছে, পেঁচোর বউ এসে জুটেছে কেন? শুনেছিলাম গয়েসপুরের দিকে ধান জমি কিনেছে। পেঁচো বলছিল আউশ কাটছে এখন?" (প্রথম খণ্ড ॥ চার ॥ পৃ.৩০৮)

উত্তরে আশমান জানায় :

"তা কাটছে, তা সে আর কতটুকু। ওই ধানে কদিন চলবে? এখন তো এক বেলা জোটে। নগদ করকরে টাকা–একবার আড় ভেঙে গেলে কি আর ছাড়া যায়?"(প্রথম খণ্ড ॥ চার ॥ পৃ.৩০৮)

মিলিটারিদের সঙ্গে মদ্যপান করে মদের ঘ্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারে না কমলা। বামুনবাড়িতে কাজ করা মায়ের কাছে রাত কাটিয়ে প্রত্যাবর্তন করে স্বামীগৃহে। কমলার জীবনের এ বাস্তবতা তার মা জেনেও অস্তিত্বের বিনিময়ে সেটা মেনে নেয়। মন্বন্তরপীড়িত নারীরা শুধু ধুকড়িবাগান নয়, মিলিটারি সাহেবদের কাছ থেকে নগদ প্রাপ্তির আশায় বিভিন্ন স্থানে ভিড় করত। সামাজিক আর নৈতিক মূল্যবোধ অক্টোপাসের মতো শোষণ করছে যুদ্ধ, ঔপনিবেশিক শাসন। ত্রিদিবেশের অভিজ্ঞতা নিচের অংশে :

"করপোরেশন স্ট্রিট, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, নিউ মার্কেট এরিয়া, গ্র্যান্ড হোটেল, ব্রিস্টল হোটেল, ধর্মতলার মসজিসের গলির পাশ দিয়ে বেরিয়ে স্টেটসম্যান পত্রিকার পাশে নতুন যে বাড়িটা তৈরি হচ্ছে–আমেরিকানরা যে-বাড়িটায় তাদের অফিস করেছে–সবখানে দেখতাম অন্ধকার, আশেপাশে মেয়েদের ভিড়। কোথা থেকে আসত তারা? সকলেরই লক্ষ্য মিলিটারি সাহেব।" (প্রথম খণ্ড ॥ তেরো ॥ পৃ.৪৯৭)

যুদ্ধকালীন সামরিক তাণ্ডব, প্রশাসনিক ব্যর্থতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও কালোবাজারিতে সৃষ্ট মন্বন্তরে মানুষের অসহায়ত্ব, পারিবারিক মূল্যবোধের বিপর্যয় এভাবেই সংবেনশীল মন নিয়ে উপলব্ধি করেছে শিল্পী ত্রিদিবেশ এবং ক্লেদাক্ত এ অভিজ্ঞতা তাকে বিপন্ন করেছে। জীবিকাসন্ধানী ত্রিদিবেশ সকল ঘটনার ক্ষুব্ধ অথচ নীরব দর্শক মাত্র। রুজভেল্ট টাউনের অভিজ্ঞতা ত্রিদিবেশের শিল্পীমনকে এতটাই নাড়া দিয়েছিল যে সে পরবর্তীতে সেখানকার ছবি এঁকেছিল। 'অস্পষ্ট ছায়া-ছায়া অন্ধকারে ঝোপঝাড় আর নানানভাবে জড়াজড়ি করা' নারী-পুরুষের ছবি রশীদ বুঝতে না পারলেও ত্রিদিবেশ শিউলীকে বুঝিয়ে দেবার পর সে বুঝেছিল ছায়াগুলো আসলে 'কুকুরের মতো' দেখতে।

নারী সংগ্রহের দালাল কেবল সন্তোষই নয়, যুদ্ধের সময় নীতিবর্জিত এক শ্রেণির মানুষ নগদ অর্থ উপার্জনে বিকৃত, রুচিহীন সুযোগসন্ধানী হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে কালোবাজারি।

রশীদের সঙ্গে ইছাপুর স্টেশন থেকে ডাউন ট্রেনে কলকাতায় যাত্রাপথে ট্রেনের যাত্রী রিপন কলেজের অধ্যাপক ধরণী মজুমদার ও যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের তরুণ শিক্ষার্থীর রাজনৈতিক তর্ক, ত্রিদিবেশের মনোযোগ আকর্ষণ করে, শুনতে থাকে তাদের বিতর্ক। ধরণী মজুমদার ১৯৪২ এর আগস্টের আগেই

Dhaka University Institutional Repository

কংগ্রেসের ডিস্ট্রিক্ট কমিটি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন। বর্তমানে তিনি সুভাষচন্দ্র বসু ও 'ফরোয়ার্ড ব্লকে'র সমর্থক। কিন্তু সহযাত্রী যুবক কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আস্থাশীল। চিনা-বাঙালি রায়ট নিয়ে কথা বলতে গিয়ে চিয়াং কাইশেক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে, যুবক উচ্চারণ করে যে তিনি ভারতবর্ষের মুক্তির কথা বলতেই এখানে এসেছিলেন। কিন্তু ধরণী মজুমদারের বিশ্লেষণ ভারতবর্ষের মানুষের স্বাধীনতা আন্দোলন আপাতত বন্ধ রেখে 'অ্যান্টি অ্যাক্সিস লড়াইয়ে' সামিল হওয়া প্রয়োজন–এদেশীয় নেতাদের এটা বোঝানোর জন্যই চিয়াং কাইশেককে ব্রিটিশ সরকার এদেশে এনেছিল। তা না হলে তিনি কখনো এখানে আসার অনুমতিই পেতেন না। ধরণী মজুমদার কমিউনিস্টদের 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু', 'ব্রিটিশদের হাতে হাত মেলানো সাথী' উল্লেখ করায় যুবক ধরণী মজুমদারকে ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে হাত-মেলানো সুভাষ বসুর সমর্থক দেশদ্রোহী বিবেচনা করে উত্তেজনায় 'বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ' দেখায়। কিন্তু নিজ বিশ্বাসে অনড় ধরণী জানান :"টাইম ইজ এ গ্রেট ফ্যাকটর, টাইম মে অ্যানসার য়ু। (প্রথম খণ্ড ॥ আট ॥ পৃ.৩৬১)"। যুবকও দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করে : "সময় কারোর উইশফুল অ্যানসার দেবে না, তার আর এক নাম ইতিহাস, আপনি সেটা দয়া করে মনে রাখবেন।" (প্রথম খণ্ড ॥ আট ॥ পৃ.৩৬১)

ত্রিদিবেশ ইতোমধ্যে বকুলতলা ক্লাবের রাজনৈতিক বিতর্ক শোনার পাশাপাশি সবিতা পণ্ডিতের কাছ থেকে কমিউনিস্ট মতাদর্শ সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে।[১৩] কাজেই ধরণী মজুমদারের চাইতে যুবকের বলা 'তার আর এক নাম ইতিহাস' তার কানে 'কবিতার মতো বাজে' এবং যুবকের কথার মাঝে সে সবিতাব্রতের আদর্শের প্রতিফলন দেখতে পায় :

ত্রিদিবেশের মনে পড়ে যায়, ধরণী মজুমদার কে। ও ধরণী মজুমদারের বক্তৃতা শুনেছে। এবং দুজনের কথাবার্তায় আরও অনেক কথা মনে পড়ে যায়। বিশেষ করে সবিতা পণ্ডিত, মোহন, বিপিন আর বকুলতলা ক্লাবের তর্কের ঝড়, এবং প্রবীণ কংগ্রেসের বয়স্ক নেতাদের প্রতি ওর তেমন কোনও আস্থা নেই, মনে হয় ওঁরা দূরর মানুষ, অপরিচ্ছন্ন, অস্পষ্ট এক দূর জগতের মানুষ এবং কংগ্রেস একটি অপরিচিত জগৎ। সবিতা পণ্ডিতকে ও ভালবাসে, সেটা সবিতা পণ্ডিতের ব্যক্তিত্ব এবং সেই ব্যক্তির যে মত ও পথকে বিশ্বাস করে, সেই সেই মত ও পথকে মিথ্যা বা হীন মনে করতে পারে না। সেই হিসাবে যুবককে ওর বেশি সমর্থন জানাতে ইচ্ছা করে, কিন্তু চিয়াং কাইশেককে নিয়ে এত সব কথা, এত বিবাদ বিসম্বাদ ভাল লাগে না, বিরক্তি বোধ করে। (প্রথম খণ্ড ॥ আট ॥ পৃ.৩৬১)

চাকরি সন্ধানী উদ্বিগ্ন ত্রিদিবেশের মন সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ নীতি শাসিত নয়। এজন্য যুবক ও ধরণী মজুদারের রাজনৈতিক তর্কের চেয়ে তার কাছে চিনা-বাঙালি রায়টে রক্তাক্ত চিনার জন্য কিংবা ট্রেনের যাত্রী কর্তৃক লাঞ্ছিত লাল ফ্রক পরা অবাঙালি মেয়ের জন্য বেদনাবোধই মুখ্য হয়ে ওঠে। কারণ ত্রিদিবেশ জানে এক কারখানায় কাজ করে নিজেদের মধ্যে রক্তারক্তি করা নিরর্থক। সংঘাতপূর্ণ ট্রেনের কামরাকে তার কাছে 'নিখুঁত নরকের চলমান মঞ্চ' মনে হয়, যে নরকের দিকে দিকে বিভিন্ন দৃশ্য, প্রবহমান ঘটনা, ক্রিয়াশীল চরিত্রবৃন্দ, নরকের সেই ছবিটার মতো, যা টাঙানো থাকে দোকানেই বেশি। (প্রথম খণ্ড ॥ আট ॥ পৃ.৩৫৭)।' এ সংঘাতের মাঝে ত্রিদিবেশ অনাগত কালকেই প্রত্যক্ষ করে। নিজের কাছেই তাঁর প্রশ্নবিদ্ধ উচ্চারণ :

...এইসব ঘটনাবলীর মধ্যে কি কোনও বিশেষ সংকেত রয়েছে? কোনও ইঙ্গিত? এই সময়ের বা অনাগত কালের? অন্যথায় এটা কেমন করে সম্ভব, দিনের বেলা ট্রেনের কামরায় একটি মেয়েকে, সে যাই হোক, তাকে এক দল পুরুষ আক্রমণ করে তার পোশাক ছিঁড়ে দেয়! এমন না যে ধর্ষণ করে, আসলে নাকি শাসন করে, ক্রুদ্ধ জনতা এবং তারা সুনীতিসম্পন্ন, কেননা তাদের ক্রুদ্ধ গর্জনে সেইসব কথা শোনা যায়, 'একটা কুত্তি বেশ্যা ভদ্দরলোকদের গা ঘেঁষে বসে!' বা 'একটা বেশ্যার এত বড় সাহস গায়ে হাত তোলে!' এবং অতএব 'শালীকে মেরে ফেলে দাও, ছুড়ে ফেলে দাও গাড়ি থেকে।'...

Dhaka University Institutional Repository

নীতি শাসন প্রহার, ভদ্দরলোক আর তাদের ছেলেদের, ওদের হাতে কী পুঞ্জীভূত প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা, দলদলা মাংসের গা খাবলিয়ে লাল জামার টুকরোর পতাকা মুঠোয় তোলে, অথচ ত্রিদিবেশের মনে হয় চলমান ট্রেনের কামরায় এক বেশ্যাকেই জনতা ধর্ষণ করে এবং ওদের ক্রুদ্ধ চোখ যেন রাত্রের অন্ধকারে শেয়ালের চোখ, তৃপ্তির লালা এবং এখনও গান শোনা যায়, 'একে দিলি, তাকে দিলি'...এবং কখন? যখন রাজনৈতিক মতবিরোধে দুজনের আলোচনা সোচ্চার এবং যে কারণে মতবিরোধের উত্থাপন, সেই নিমিত্তের ভাগী রক্তাক্ত আহত অবস্থায় এখনও বন্ধ বাথরুমে। (প্রথম খণ্ড ॥ আট ॥ পৃ.৩৫৭)

যুদ্ধবিপন্ন উৎকণ্ঠিত কলকাতায় বন্ধু রশীদের কাছে কাজের সন্ধানে এসে বাধ্য হয়ে ত্রিদিবেশকে ধুকড়িবাগানের বারাঙ্গনাপল্লিতেও থাকতে হয়েছে। কপদ্দকহীন রশীদ ধুকড়িবাগানের জামালের হোটেলে বলে দিয়েছিল। সেখানেই দুজন খেত। গরুর মাংসও খেত ত্রিদিবেশ। সেখানে এসে সে দেখেছে মন্বন্তরের শিকার অসহায় স্বামী কর্তৃক নিরাপদ, সুনিশ্চিত ও সুশৃঙ্খল গৃহজীবন থেকে এ পল্লিতে নারীর নির্বাসন, মায়ের বুক থেকে কেড়ে নেয়া শিশুর লাঞ্ছনা, বারাঙ্গনাদের ওপর যুদ্ধের প্রয়োজনে আগত 'টমি'-দের অত্যাচার। সব বিষয়ে বন্ধু রশীদের নির্বিকার ভাব দেখে ত্রিদিবেশ বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েছে। ধুকড়িবাগানে সে দেখেছে ২৪ ঘণ্টাই নারীদের কাছে পুরুষদের আসা-যাওয়া। 'মাতালের হল্লা, মেয়েদের মাতাল হাসি, ঝগড়া, চিৎকার করে যা-তা খিস্তি খেউড়', উলঙ্গ নারীর দল। (দ্বিতীয় খণ্ড ॥ সাত ॥ পৃ.৪৯৫) শিল্পশহরের বিভিন্ন পাড়ার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দারিদ্যপীড়িত স্বৈরিণীদের জীবনবাস্তবতা শৈশব থেকেই ত্রিদিবেশ দেখেছে। বয়স হারিয়ে তাদের কেউ দাসীর কাজ করত, কেউ দুধ বিক্রি করত গৃহস্থ পাড়ায়। সেসব নারীরা ত্রিদিবেশের কাছে কেউ কেউ ছিল মাসিতুল্য। কলকাতায় ধুকড়িবাগানের দোতলার সামান্য অংশ ছাড়া যে বাড়ির পুরোটাই বেশ্যালয় সেখানকার বিপন্ন নারীর জীবন এ কারণেই ত্রিদিবেশের শিল্পীচৈতন্যকে স্পর্শ করেছিল। এ জীবনে ত্রিদিবেশ অসুস্থ হয়ে উঠেছিল। দেখেছিল মন্বন্তরতাড়িত অসহায় মজিদ স্ত্রী-পুত্রসহ ধুকড়িবাগানে এসে উঠলেও, আজ সে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইলেও পারেনি। বারান্দায় ছিটকে পড়া সাত-আট মাসের শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে রক্তাক্ত মা মজিদের স্ত্রী পোড়া কপালেরই দোষ দিয়ে চোখের জল ফেলেছিল। এ দৃশ্য দেখে ত্রিদিবেশ সেখান থেকে শেষবারের মতো বেরিয়ে পড়ে। তার বেদনাময় প্রতিক্রিয়া নিচের অংশে :

"নরকযন্ত্রণার যে সত্যিকারের বিষক্রিয়া, তখন তা আমার বুকে শুরু হয়েছিল। মায়ের কথাগুলো আমার কানে বাজছিল আর শিশুর ফুঁপিয়ে ওঠা। তার ঠোঁট থেকে খুলে যাওয়া অমৃতের বোঁটা। ওখানে মায়েরাও ছিল, জানতে পারিনি।" (প্রথম খণ্ড ॥ সাত ॥ পৃ.৫০০)

কমিউনিস্ট পার্টি কর্মী সবিতা পণ্ডিত, ইন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও নীলাম্বর মিস্তিরির কাছ থেকে ত্রিদিবেশ ধুকড়িবাগানের বিকৃতি আর নরক থেকে জীবন্মুক্তির পথ-নির্দেশনা পেয়েছিল। সবিতাব্রতর পরামর্শ অনুয়ায়ী চাকরির সন্ধানে নীলুর সঙ্গে দেখা করতে ইউনিয়ন অফিসে এসে, ইন্দ্রথের সঙ্গে ত্রিদিবেশের পরিচয় হয়। প্রিয়নাথের ভাই দেবনাথের সঙ্গেও এখানে দেখা হয় তার। প্রিয়নাথ মিত্র কলকাতার একজন বড় সারির কমিউনিস্ট নেতা। 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। প্রিয়নাথের ভাই দেবনাথ সবিতা পণ্ডিতের প্রায় সমবয়সী, দুএক বছর বেশিও হতে পারে। নিজের প্রতি উদাসীন, বাঁ হাতে সিগারেট আর ডানহাতে শ্রমিকদের দরখাস্ত লেখে। ইউনিয়ন অফিসের খাটিয়াতে রাতে ঘুমায়, অনেক সময় কোনও মজুরের সঙ্গে তার বস্তি-ঘরেও থাকে।

ইন্দ্রনাথ ব্যানার্জি সুদর্শন, অত্যন্ত মেধাবী। এম এ পাশ করেছেন। লক্ষপতির সন্তান হয়েও তিনি আরও অনেকের মতো কংগ্রেস না করে কমিউনিস্ট পার্টি করেন। অনেকদিন রাশিয়ায় কাটানো লেখক রাহুল

Dhaka University Institutional Repository

সংকৃত্যায়ন তাকে ভালোবাসেন। নীলু মিস্তিরির বিশ্বাস, কমিউনিস্ট বলেই নীলুর মতো মিস্তিরিকে তিনি 'নীলুদা' বলে সম্বোধন করেন। সবিতাব্রত ও মোহনের কাছে ত্রিদিবেশের ছবি আঁকার পারদর্শিতার কথা ইন্দ্রনাথ আগেই শুনেছিলেন। নিরহংকারী এ মানুষটি নিজেই ত্রিদিবেশের সঙ্গে কথা বলেন, নীলু মিস্তিরির মাধ্যমে চটকলে তাকে কাজ পাইয়ে দেবার আশ্বাস দেন। চটকলের নীলাম্বর মিস্তিরি শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িত। সে মদ খায়, বস্তিবাসী শ্রমিকদের সুদে টাকা ধার দেয়, স্ত্রীকে প্রহার-করা শ্রমিকদের শাসন করে। রশীদের সঙ্গে কাটানো ধুকড়িবাগানের জীবনযাপনের গ্লানি থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল ত্রিদিবেশ। এজন্য কলকাতার অমানবিক অভিজ্ঞতা নীলু মিস্তিরিকে জানালে, আহ্বানে ত্রিদিবেশ বস্তি-বাড়িতেই শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নেয়।

প্রায় দশদিন পর নীলু মিস্তিরির চেষ্টায় বড়বাবুর স্কেচ ও অফিস মাস্টার সাহেবের স্কেচ এঁকে দেবার পরে জুটমিলের সব ফার্নিচারে রং তুলি দিয়ে নাম্বার লেখার 'মার্কিং বয়' হিসেবে সপ্তাহে ছ টাকা মাইনের চাকরি পায় ত্রিদিবেশ। পাশাপাশি মিল ও মিলে কাজ করা শ্রমিকদের ছবি আঁকে। সবিতাব্রতর নির্দেশে ইউনিয়ন অফিসে বসে পার্টির পোস্টার লেখাসহ আরও কিছু কিছু কাজ করে।[১৪] মজুমদার বাড়ির মেয়ে শিউলীর কথা জানার পর রানাঘাটে ভদ্রলোকদের পাড়ায় নীলুদার ঠিক করে-দেয়া মাসিক সাত টাকা ভাড়াবাড়িতে শিউলীকে নিয়ে ত্রিদিবেশ সংসারজীবন শুরু করে। দীর্ঘসময় পর, ত্রিদিবেশ গিয়েছিল সন্তানসম্ভবা শিউলীর কাছে। ঘটনাংশ যেমন ভয়ংকর তেমনি নাটকীয়; অথচ কী অমঙ্গল, কী দুর্বৎসর ছিল তখন :

মহিশ-কালো আকাশ। ...গাঙ্গেয় উপকূল পিছনে, পুবে, দক্ষিণে, একমাস আগে বিধ্বংসী ঝড়ের ঘায়ে সর্বহারা মেদিনীপুর আর একবার মার খায়। আর গাঙ্গেয় উপকূল ধরে কলকাতা, সমগ্র চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, রূপনারায়ণের কূল ধরে হাওড়া, পুব দক্ষিণের যশোহর খুলনা, অন্য দিকে মুর্শিদাবাদ, পদ্মার কূলের সঙ্গে হাত মেলায় সামুদ্রিক ঝড়। ধ্বংসের তাণ্ডবে মাতে, শাসায়, এমনকী ধাওয়া করে যায় আরও উত্তরে পশ্চিমে। ...বহু জাগে, বহু রূপে, পশু, কোনও কোনও পক্ষী, পতঙ্গ, মানুষ এবং জাগে প্রতাপ মজুমদারের পরিবার। একটি চিরকুটকে বাতির সামনে রেখে, 'তোমরা আমাকে অভিশাপ দিয়ো না। আমার আর থাকা চলে না। আমার নিজের জায়গাতেই আমি যাচ্ছি। জানি না, কী করলাম, আমার কী হবে। যদি ঘৃণা কর সবাইকে বোলো, আমি মরে গেছি। ইতি– ফুলি। (প্রথম খণ্ড ॥ ষোলো ॥ পৃ.৪৩০-৩১)

ত্রিদিবেশ ওই বিধ্বংসী গাঙ্গেয় উপকূলের একই ঝড়ের সন্ধ্যায় উপস্থিত হয়েছিল, অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষিপ্ত সন্তানসম্ভবা শিউলীর কাছে। আজ রাতেই সে আত্মদাহ করবে; জোগাড় করে রেখেছিল 'সাত বোতল কেরোসিন তেল।' দ্বিতীয় খণ্ডের সাত পরিচ্ছেদের শেষে ত্রিদিবেশের ভাষ্য :

আমাকে অবাক করে দিয়ে ফুলি বলেছিল, 'তোমাকে আর বাড়িতে ঢোকবার দরকার নেই। কথা যা হবার পরে হবে। আমি পাঁচ মিনিট পরেই আসছি। আজ, এখুনি তোমার সঙ্গে চলে যাব।' আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ...ও আমাকে চাপা গলায় ধমকে উঠেছিল, 'ছি ছি, তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে। শিগগির চলো। আমি বাবাকে চিঠি লিখে রেখে চলে এসেছি। আর ফিরে যাব না। ...

যেখানে ঘোড়ার গাড়িগুলো থাকে, ফুলি সেখানে গিয়ে একটা গাড়ির মধ্যে উঠে বসেছিল, বলেছিল, 'কোথায় যেতে হবে, গাড়োয়ানকে বলে দাও।'... আর গাড়ি ছাড়তেই ফুলি অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়েছিল। (দ্বিতীয় খণ্ড ॥ সাত ॥ পৃ.৫০৪)

গৌরীকে নিয়ে সমরেশের আতপুরের বস্তিতে উঠার ঘটনাও অনুরূপ :

...তখন তো রাস্তায় বাস বা রিক্‌শা ছিল না। সমরেশ একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে নৈহাটির রথতলা থেকে গৌরীকে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। গৌরী দুঃসহ মানসিক টেন্‌শনে ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে ঢুকেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন।"[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

জুট মিলে মার্কিং বয়ের কাজ করে ত্রিদিবেশ। বস্তিপ্রায় বাসা থেকে বেরিয়েই বড়ো রাস্তার মোড়। মোড়ের চায়ের দোকানে বসে থাকা আড্ডারত ছেলেরা শিউলীকে নিয়ে অনেক অশালীন মন্তব্য করে : 'মেয়ে মানুষ নিয়ে থাকে'; '...তুমি প্রতাপ মজুমদারের মেয়েকে বাগিয়ে নিয়ে চলে এসেছ, না? (পৃ.৫০৮) যা শুনে ত্রিদিবেশ অপমানিত ও অসহায় ক্রোধে উত্তেজিত ও বিচলিত হয়। এমনকি কমিউনিস্ট ত্রিদিবেশকে সুভাষ বসুর কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলে "জাপানিরা আসছে, এবার প্যাঁদানি কাকে বলে বুঝবে।" কিন্তু ইন্দ্রনাথ এসে তিনজনের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিতেই তারা এসব 'অসভ্যতা' বন্ধ করেছিল।' গৌরীকে নিয়ে আতপুর বস্তির অভিজ্ঞতা ছিল এমনি কদর্য :[১৬]

আতপুরের তরফদার পাড়ার অধিকাংশই চটকলের মিস্তিরি। একটু পুবে গেলেই বাগ্‌দিপাড়া। ...এই রকম বাঙালীদের পল্লীতে এসে পড়ায় সমরেশ আর গৌরীর বয়স ও চেহারার তারতম্য নিয়ে ক্রমশ বেশ একটা রসালো আলোচনা দানা পাকিয়ে উঠতে লাগল। বস্তীর আলোচনা ছিল এক ধরনের কিন্তু এবারের আলোচনা আরও কদর্য। ...শেষ পর্যন্ত, সেই আলোচনা চলে গেল এমন একটা জায়গায়, মানে, ওই পাড়ায় যাদের ভদ্রলোক বলা যায়, তারা বলতে লাগল, ওদের এই পাড়ায় আর থাকতে দেওয়া হবে না। ...পুলিশ এসে সমরেশকে বলল, তুমি একজন মহিলাকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছ, এর জন্য টাকা দিতে হবে। ...ব্রজেন ভট্টাচার্য এসে সমরেশের পাশে দাঁড়ালেন।

আড্ডারত ছেলেদের মাঝে মিত্তির বাড়ির ছেলেরাও আছে। যাদের এক ছেলে এখন জেলে। "কমিউনিস্টদের ওরা ভীষণ ঘৃণা করে। সেরকম কোনও ঘৃণা ত্রিদিবেশের মনে জাগে না, কিন্তু ওদের ব্যবহারে ঘৃণা জাগে।" (পৃ.৫০৯) বেঁচে থাকার অনিবার্য প্রয়োজনে জীবিকার উৎস হিসেবে কোয়ার্টারে গিয়ে মেমসাহেবদের পোর্ট্রেট এঁকে কখনো আট আনা, তিন টাকা এমনকি কিছুই না পেয়ে বেয়ারা কর্তৃক প্রহৃত হয়ে প্রতিবাদ করতে না পারার অক্ষমতায় নিজেকেই আঘাত করে ত্রিদিবেশ। কিন্তু কারখানার ব্যাচিং বিভাগের ওভারশিয়ার ফিলিপ ক্যুকাম্‌বারের স্ত্রী মিসেস ক্যুকাম্‌বারের ছবি আঁকতে গিয়ে তার জীবনের গল্প শুনতে শুনতে বেদনাবোধ করে। মিসেস ক্যুকাম্‌বারের কাছ থেকেই ত্রিদিবেশ জানতে পারে মদ্যপ সাহেব কর্তৃক নারী শ্রমিকদের উত্ত্যক্ত করার কথা। শুধু তাই নয়, এসব সাহেবদের 'প্রায় ঈশ্বরের মতো' রক্ষাকর্তা ছিল এদেশীয় সর্দার যাদেরকে সব সাহেবই খুশি করবার চেষ্টা করে। সর্দারেরা শ্রমিকদের জীবনে একই সঙ্গে অভিভাবক ও শাসক।

চাকরির পাশাপাশি ত্রিদিবেশ বস্তিতে বস্তিতে গিয়ে শ্রমিকদের সংগঠিত করবার কাজে ব্যস্ত। এরই মাঝে ইন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সঙ্গে সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়েছে। তার লেখা 'দুর্ভিক্ষ' প্রবন্ধের অনুলেখন হয় ত্রিদিবেশের হাতে। 'নতুন লাইব্রেরি ও স্টাডি সার্কেল' গড়ে তোলার আলোচনা হয় ইন্দ্রনাথের বাসায়। দুই চোখে 'গভীর প্রেরণা' নিয়ে আসে ইন্দ্রনাথের বোন জয়া, বেথুন কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। 'পেনসিলের রেখায়' ভেসে ওঠে তার মুখ। জয়া ত্রিদিবেশকে যুদ্ধ বিষয়ে নিজের ভাবনার ছবি আঁকার প্রেরণা দেয়। ত্রিদিবেশের শিল্পীমন তার সযত্ন উৎসাহ-প্রেরণায় বিকাশের পথ খুঁজে পায়। যুদ্ধের ছবি বলতে ত্রিদিবেশ বোঝে শ্রমিক বস্তির 'ছায়া ও কম্পিত রক্তিম আলোর মাঝে মাঝে জেগে থাকা নানা মুখ–যেন গুহার গভীরে।' (পৃ.৬২৬) এসব মুখে 'গালের উঁচু হাড়ে গ্লানি মাখা এবং ভুরুর নীচের গভীর অন্ধকারে এক বিন্দু ম্লান ঝিকিমিকি', তারা স্রষ্টাকে স্মরণ করে গানের সুরে আর ত্রিদিবেশ বস্তিতে এলে তার কাছে 'শ্রমিকরাজ সন্ধানের সংবাদ শুনতে' কৌতূহলী হয়। সবিতাব্রত 'হোলটাইম পার্টি অর্গানাইজার' হিসেবে বিহার প্রদেশের কৃষকশ্রেণি থেকে শ্রমিকশ্রেণিতে রূপান্তরিত জনগোষ্ঠীর উদ্দেশে হিন্দিতে বক্তৃতা করে। নারীশ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর এবং ছত্রিশগড় রাজ্যের। বক্তৃতার মাঝে মাঝে স্পিনার গওহর রেশন চালুর দাবিতে শ্লোগান দেয়। বন্দুক হাতে যুদ্ধ না করলেও কলকারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু রাখার মাধ্যমে অ্যান্টিফ্যাসিস্ট লড়াইয়ে শ্রমিকরা ইংরেজদের সাহায্য

Dhaka University Institutional Repository

করছে বলে সবিতাব্রত মনে করে। এ কারণে সে শ্রমিকদের বোঝাতে চেষ্টা করে রেলওয়ে শ্রমিক, বন্দুক কারখানার শ্রমিকদের রেশন চালু থাকলে চটকল শ্রমিকদেরও সেটা দিতে হবে।

ত্রিদিবেশ চাকরির সন্ধানে কলকাতায়। সংসার জীবন, পেশাগত ও রাজনৈতিক জীবনের বলয়িত স্রোতে ক্রমাগত এগিয়ে চলে ত্রিদিবেশের জীবন। বাড়ি যাওয়ার সময় ছিল না। অনেকগুলো জরুরি পোস্টার লেখার কাজ ছিল। আর ছিল অর্থ আয়ের জন্য এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলার ছবি আঁকার ব্যস্ততা। দীর্ঘকাল পর সবিতাব্রতর পরামর্শক্রমে সে যায় হেড মিস্ট্রেস মধুদির বাসায়। এই সূত্রেই অনতিক্রমণীয় দুর্ভোগ নেমে আসে ত্রিদিবেশ-শিউলীর জীবনে, যেমন বাস্তবে এসেছিল গৌরীর জীবনে।[১৭] মধুদির বাসায় ওদের আপাত দূরত্ব নিকটতর হয়ে ওঠে কথাক্রমে, নিকটতম হয়ে যায় জাপানি বিমান আক্রমণের আতঙ্কগ্রস্ত পরিবেশে :

মধুদিকে নিয়ে সিঁড়ির মুখে পৌঁছুতেই বিমান বিধ্বংসী কামান কয়েক বার দেওয়াল কাঁপিয়ে শব্দ করে এবং সেই মুহূর্তে বিমানের শব্দ নীচের দিকে যেন নেমে আসে। ... মধুমতীর স্বরে গোঙানি শোনা যায়, হয়তো কিছু বলেন, অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য, এবং ত্রিদিবেশ বুঝতে পারে, ওর নীচের ঠোঁটে, শক্ত কঠিন ধারালো দংশনে ক্রমে, মৃত্যুর সঙ্গে আপ্রাণ যুদ্ধে, কেটে যেতে থাকে, কিন্তু ওর যেন কোনও ব্যথার অনুভূতি নেই। মধুমতীর দুহাত সবেগে উঠে আসে ত্রিদিবেশের মাথায়, ওর চুলের মুঠি আঁকড়ে ধরেন প্রাণপণ শক্তিতে, যেন তাঁকে কেউ ছিনিয়ে নেবে, ছিটকে যাবার ভয়, এবং তাঁর শরীর যেন সজোরে পিষ্ট হতে চায় ত্রিদিবেশের শরীরের অদি ও অন্তের গভীরে, বাঁচবার চেষ্টায় পরিখার গভীরে, গুহায়। ...বাইরের নানা বিধ্বংসী শব্দ কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে মধুমতীর মূর্চ্ছাবিকারের আঁকড়ানো কোঁকড়ানো শরীর স্তিমিত হয়ে আসে। ...ত্রিদিবেশের খেয়াল থাকে না ওর আলোয়ানটা সিঁড়িতেই পড়ে থাকে। (দ্বিতীয় খণ্ড ॥ তিন ॥ পৃ.৪৬৭)

কিন্তু সন্তানসম্ভবা শিউলীর জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে আসন্ন বিপদ ভুলে কলকাতা থেকে বাসায় ফিরে এসে ভয়ার্ত শিউলীকে শান্ত করে ত্রিদিবেশ। ত্রিদিবেশের প্রতি মধুদির স্নেহের আতিশয্য স্কুলছাত্রী পঞ্চদশী শিউলীর মাঝে যে ঈর্ষা সঞ্চার করেছিল সেটা তার অজানা ছিল না। এ কারণে শিউলীর শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে সে ঐ রাতে মধুদির বাড়িতে যাওয়ার কথা না বলে রশীদের বাড়ি যাওয়ার কথা জানিয়েছিল তাকে। মধুদির বাড়িতে ফেলে আসা চাদর প্রায় এক বছর এক মাস পরে মধুদি মোহনকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে, শিউলীকে প্রকৃত সত্য জেনে যায়। ত্রিদিবেশের বারংবার কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করে, শিউলী আর্তস্বরে বলে, 'তুমি আমার জীবনটা শেষ করে দিয়েছ। তোমার জন্য আমি আমার অমন বাবা মাকে ছেড়ে এসেছি, উহ্!' (পৃ.৬২৪) মিথ্যাচারিতার দণ্ডে দণ্ডিত করে ত্রিদিবেশকে ঘর থেকেও বিতাড়িত করে শিউলী। "না না না, তুমি যাও, তোমার মধুর কাছে।" ঘর থেকে বহিষ্কৃত ত্রিদিবেশ খালি পায়ে হাঁটে, গন্তব্যহীন। সমরেশ বসুর বয়নকৌশল প্রকৃতি-উপকরণে দ্যোতনাময় :

রাত্রের পাখিদের দেখা যায় না। কিন্তু যে কোনও ঋতুর তুলনায় গভীরতম নিঃশব্দ শীতের এই রাত্রে কোথায় কী বিচিত্র অতি ক্ষীণ শব্দ বেজে যায়। বাতাসহীন, নিশ্চল অন্ধকার প্রকৃতি। তার স্তব্ধতার মধ্যে সহসা কখনও ঝিল্লিস্বর শোনা যায়। হঠাৎ কোথায় টুপটাপ আচম্বিতে দু-একটি অতি মৃদু শব্দ, যেন শীতে কোঁকড়ানো উঁচু গাছের পাতা থেকে নীচের বুক-খোলা ডাগর পাতায় ঝরে শিশিরের ফোঁটা। (দ্বিতীয় খণ্ড ॥ উনিশ ॥ পৃ.৬২৫)

শিউলী কর্তৃক অপমানিত ও বিতাড়িত ত্রিদিবেশ নিজেকে মনে করে 'অজ্ঞাত অপরাধে অভিশপ্ত'; তার জীবন নরকে নিক্ষেপিত। 'নানা বিস্মিত জিজ্ঞাসা' তাকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে। ক্রমশ উপলব্ধি করে ত্রিদিবেশ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমূহ সর্বনাশ কেবল তার জীবনে নয়, নিষ্ঠুর সত্য হয়ে দেখা দেয় জাতীয় জীবনে :

"এখন এক বারের জন্যও মনে আসে না সন্ধ্যা রাত্রের কথা, ইন্দ্রনাথ-মায়াকোভস্কি-ইলিয়া এহরনবুর্গ-পারীর পতন-জয়নাল আবেদিনের ছবি–তুলির টানে ক্ষুধার গোঙানি শোনা যায়–আর সেই অভূতপূর্ব স্থির চিত্রসমূহ ক্যামেরায় ধরা, সোঁদা গন্ধ

Dhaka University Institutional Repository

কচি ডাঁটার মতো মেয়েরা চলে যায় ট্রাকভরতি–বিমান অবতরণের ক্ষেত্র তৈরি করতে–অন্নের সন্ধানে, প্রকৃতপক্ষে সৈনিক ক্রেতার সন্ধানে, নিজেদের বিক্রয়ার্থে। স্থির চিত্রের নীচে শুধু একটি জিজ্ঞাসা মুদ্রিত, 'কন্ট্রাকটররা এদের কোথায় নিয়ে যায়? কাজের সন্ধানে অথবা আত্ম-বিক্রয়ার্থে?' জিজ্ঞাসা অকারণ, নয় কি? অথবা বিদ্রূাত্মক? সকলই অনিবার্য, যুদ্ধের কারণে। ত্রিদিবেশের প্রশ্নে ইন্দিরদা–ইন্দ্রনাথ বিব্রত জবাব দেন, ভারতের যুদ্ধরত ফৌজের চরিত্র সাম্রাজ্যবাদী–" (দ্বিতীয় খণ্ড ॥ উনিশ ॥ পৃ.৬২৬)

শিউলীর ঘৃণাপূর্ণ অপমানে অসহায় বোধে অজানা গন্তব্যে হাঁটতে-থাকা ত্রিদিবেশ জঙ্গল সর্দারের ধাঙড় বস্তির মঙলি ও তার চটকল কোম্পানির ঝাড়ুদার মদ্যপ স্বামী গুরুয়াকে কাঁচা নর্দমা পেরিয়ে বস্তিতে পৌঁছে দিতে গিয়ে গভীর রাতে ধাঙড়দের বিচিত্র এক সংস্কৃতির মুখোমুখি হয়। গুরুয়া-মঙলির একান্ত অনুরোধে বস্তির ঘরে রাত কাটায় ত্রিদিবেশ। স্বামী-সন্তানদের প্রতি মঙলির সেবা-যত্ন এবং অতিথিপরায়ণতায় মুগ্ধ ও বিস্মিত হয় সে। অন্যদিকে, ত্রিদিবেশকে 'রামজী বাবা' হিসেবে বিবেচনা করে স্বামী গুরুয়ার অনুরোধে তাকে 'সেবা হিসেবে' মঙলির দেহসান্নিধ্য প্রদান; পরের দিন মিলে হাজিরার শেষ বাঁশির সংকেতে গুরুয়া-মঙলির নিরাসক্ত আচরণসহ বিচিত্রসব অভিজ্ঞতা অর্জন করে ত্রিদিবেশের সংবেনশীল শিল্পীসত্তা।

দ্বিধাবিচলিত ত্রিদিবেশ উপলব্ধি করে, গৃহবিতাড়িত সে আশ্রয় পেতে পারে ইন্দ্রনাথ ও তার বোন জয়াদের বাসায়। চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, মুশিদাবাদ এলাকার বিশাল ভূসম্পত্তিসহ বারোটি বাড়ি ও দোকান ঘরের মালিক ইন্দ্রনাথের বাবা ত্রিদিবেশের সঙ্গে দেখা হলে কোনো কথা বলেন না, বিরক্তি ও অবহেলা ভরে একবার দৃষ্টিপাত করেন মাত্র। ইন্দ্রনাথের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দাদাও তাকে উপেক্ষা করে। কিন্তু বহিরাগত হিসেবে অন্দরমহলে তার প্রবেশাধিকার না থাকলেও পুবদিকের একতলা ঘরে ইন্দ্রনাথ ও জয়ার দ্বারা অভ্যর্থিত হয় ত্রিদিবেশ। এজন্য বাসায় না ফিরে জঙ্গল সর্দারের বস্তি থেকে রক্তাক্ত ফাটা পা, ধূলিমলিন বেশে দ্বিধান্বিত হয়েও শেষ পর্যন্ত সে এখানেই আসে। অবশ্য আসার পূর্বে খাবার দোকানে খেতে গিয়ে তার শিউলীর কথা মনে পড়ে, দুশ্চিন্তা হয়। সাপ্তাহিক বেতনের টাকা এখনও শিউলীর হাতে আছে মনে পড়ায় ত্রিদিবেশ নিশ্চিন্ত বোধ করে।

মধুদিকে কেন্দ্র করে শিউলীর সঙ্গে সৃষ্টদাাম্পত্য সংকট কিংবা গুরুয়া-মঙলির সঙ্গে বস্তিতে রাত কাটানোর কথা ইন্দ্রনাথ কিংবা জয়াকে বলা যায় না। এ কারণে ত্রিদিবেশের শিল্পীমন লছমনের বস্তিতে গানের আসরে রাত কাটানোর কল্পকাহিনি বর্ণনা করে যায়। মূল গায়েন শুখালু মুচির গাওয়া গানের মধ্যদিয়ে হরিশচন্দ্র আর শৈব্যার অভিশাপের কাহিনি ইন্দ্রনাথের কাছে ত্রিদিবেশ এমন বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে যে, ইন্দ্রনাথ এসব কাহিনিতে 'মানুষের শক্তির জয়গান'কে সত্য মনে করে। ছেলে নিয়ে শিউলী বাড়িতে একা রাত কাটানোয় ইন্দ্রনাথ ত্রিদিবেশকে মৃদু তিরস্কার করে বটে, কিন্তু মুগ্ধ বিস্ময়ে সে বস্তির গানের আসরের বর্ণনা শুনে যায় :

'দারুণ, ইন্দিরদা। একটা মাত্র লম্ফর সামনে অনেকগুলো মানুষ, যাদের আলাদাা করে চেনা যাচ্ছিল না। যারা গাইছিল, আর যারা শুনছিল, সবাই এমন তন্ময় হয়ে গেছল, সবাইকেই আমার একরকম লাগছিল। সকলের চোখেই প্রায় জল ছিল। ...

ত্রিদিবেশের কানে বাজে সেই অদ্ভুত বাজনা এবং গানের সুর ও বাণী, এবং লম্ফর কম্পিত রক্তিম আলোর সামনে গায়ক এবং শ্রোতাদের সেইসব মুখ, যা চোখের জলে চিকচিক করে। যে বর্ণনা আপাতত মিথ্যা, কিন্তু প্রকৃতই বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত। ও যেন ধ্যানের আচ্ছন্নতা থেকে বলে, 'তারপর, ইন্দিরদা, আপনি যে রিদ্‌মের কথা বললেন, গোটা ছবিটার মধ্যেও সেই রিদ্‌ম ছিল। সব ছবিতেই একটা রিদ্‌ম থাকে।' (দ্বিতীয় খণ্ড, ॥ একুশ ॥ পৃ.৬৪৪)

Dhaka University Institutional Repository

এখানে উল্লেখ বাঞ্ছনীয়, সমরেশ বসু দ্বিতীয় খণ্ডের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিবেচনা ও অভিমতগুলো দৃশ্যশ্যবদ্ধ সংলাপপ্রধান-রীতিতে উপস্থাপন করেছেন। ফলে সময়ের বিস্তার ও দ্রুততায় ঘটনাগুচ্ছকে তিনি কোলাজরীতির উল্লম্ফনধারায় বিন্যাস করেছেন। কোথাও ব্যবহার করেছেন তথ্যপ্রদানধর্মী আসক্ত-নিরাসক্ত শব্দবয়ন-কৌশল। গৃহবিতাড়িত ত্রিদিবেশের গৃহ প্রত্যাবর্তনের দেড় দিন-রাতের মাঝে ঘটেছে অনেক ঘটনা, আলোচিত হয়েছে নানামুখী রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

ওই দিন সকালে ইন্দ্রনাথ গৃহচ্যুত ত্রিদিবেশের মাঝে, কথাপ্রসঙ্গে, জাত শিল্পীকে আবিষ্কার করেছিলেন। যার কথার মধ্যে ম্যাক্সিম গর্কির লেখা ও ভ্যান গখের ছবির মিল দেখেছিলেন তিনি। ইন্দ্রনাথ ভানগখের প্রিন্টেড অ্যালবাম দেখানোর জন্য কমরেড হীরেন মুখার্জির বাড়িতে ত্রিদিবেশকে নিয়েও যেতে চান। কমিউনিস্ট রাজনীতিতে বিশ্বাসী জয়াও ত্রিদিবেশের শিল্পীসত্তার সন্ধান পেয়েছিল। জয়া 'স্টুডেন্ট ফ্রন্টে' কাজ করে। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থী ইছাপুরের সুকুমার ঘোষ হাতে-লেখা ম্যাগাজিনে ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের ওপরে একটা লেখা দিয়েছিল। সে লেখার অলঙ্করণে ত্রিদিবেশ একটা যন্ত্রের ছবি এঁকেছিল। সে থেকেই তার আঁকা ভালো লাগে সুকুমারের; জয়াই ত্রিদিবেশকে জানায় সে কথা। শিউলীর রান্না ও সেলাই করা, ঘুমন্ত অবস্থা, চুল বাঁধাসহ প্রাত্যহিক জীবনের নানা ছবি আঁকে ত্রিদিবেশ। কখনও তার ন্যুড ছবি এঁকেছে কি না জয়ার জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে তার নির্বিকার উত্তর, সে চাইলেও শিউলী রাজি হয়নি। তবে নগ্নিকা ছবি এঁকেছে বিদেশি অ্যালবাম থেকে নকল করে।

'সুবাসিত ঘৃতের গন্ধ'যুক্ত গরম পরোটা দিয়ে ত্রিদিবেশকে নিয়ে নাশতা করেন ইন্দ্রনাথ। পাশাপাশি চলে সমকালের রাজনৈতিক আলোচনা। রাঁধুনি বামুন ঠাকুরুন ভোলার মায়ের 'দুঃখের পাঁচালি'–'বাজারে চাল পাওয়া যাচ্ছে না'–কালোর মাধ্যমেই অঙ্কন করেন সমরেশ বসু। তাদের কাছ থেকেই জানা যায় ইন্দ্রনাথ শুধু গরিব গুরবোর জন্য মার্কসবাদী লড়াই করেন না, তাদের জন্য লঙরখানার ব্যবস্থা করেন। যাদের ঘরে চাল-কেরোসিন-খুদ-আটা নেই তাদের খোঁজ নিয়ে সেটার ব্যবস্থাও করেন ইন্দ্রনাথ।

সংবাপত্রের খবর পড়ে ত্রিদিবেশের সঙ্গে কথোপকথনকালে ইন্দ্রনাথ জাপানিদের পরাজয়ে, পশ্চাৎগমনে উল্লসিত হন। মে-ডে'তেই রাশিয়ার রাইখস্ট্যাগে কমিউনিস্ট পার্টির লাল পতাকা উড়বে–এ বিশ্বাসে আগুনের উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে তার কণ্ঠে। ত্রিদিবেশ বলে, যুদ্ধ ব্যাপারটা এমন বিরাট, সে কিছুই ভাবতে পারে না। ইন্দ্রনাথ বলে, "ঠিকই বলেছ তুমি, আমরা কিছুই দেখলাম না। আমরা দেখছি খালি স্টারভেশন আর ডেথ, দুর্ভিক্ষ আর মড়ক।" (পৃ.৬৪৭) যুদ্ধরত অন্যান্য দেশেও 'কি দুর্ভিক্ষ হয়নি?'–ত্রিদিবেশের এমন জিজ্ঞাসার উত্তরে ইন্দ্রনাথ জানিয়েছে আমাদের দেশের মতো কালোবাজারি আর মজুদদারেরা সেসব দেশে 'দেশের শত্রু, ফিফথ কলামিস্ট, শত্রুর অনুচর' বলে চিহ্নিত হয় এবং তাদের পরিণাম হয় জেল কিংবা মৃত্যু। আমাদের দেশে সেটা সম্ভব নয় কেন–ত্রিদিবেশের এমন প্রশ্নে তিনি জানান ব্রিটিশের উপনিবেশ হিসেবে ব্রিটিশ সরকারের 'অপদার্থ' ভাইসরয়, গভর্নর জেনারেল, অফিসাররা সবাই 'লুটেরা' হওয়ার কারণে সেটা এখানে সম্ভবপর নয়। কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক নীতির কারণে এ যুদ্ধে ব্রিটেনকে সমর্থন করতে বাধ্য হলেও ইংরেজ শাসকদের সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হননি ইন্দ্রনাথ। দলীয় আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কংগ্রেসের ভবিষ্যত সংঘাতপূর্ণ অনিবার্য আশঙ্কার কথা উঠে এসেছে তার নিচের এ কথায় :

"গভর্নর কেসি সেদিন গ্র্যান্ড হোটেলে সাংবাদিকদের কী বলেছে, দেখনি কাগজে? দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সম্পর্কে বলেছে, এরা শহরে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে কেন, আর রাস্তার ডাস্টবিন থেকে ছাইপাঁশ কুড়িয়ে খাচ্ছে? এরা তো নিজেদের গ্রামে ফিরে

Dhaka University Institutional Repository

গিয়ে, চাষবাস করে ভালভাবে জীবনযাপন করতে পারে। এই সব সেয়ানা শয়তানদের তুমি কী বোঝাবে? যুদ্ধ না মেটা পর্যন্ত আমরা এদের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়তে পারছি না। এদের আর দেশের শত্রুদের আমরাই শায়েস্তা করব। ...

"...তবে যুদ্ধের পরেই, আমাদের প্রবলেম শুরু হবে, আমার ধারণা। কংগ্রেসের নেতারা নিশ্চয়ই চিরদিন জেলে থাকবে না, থাকতেও পারে না। তাদের কী পজিশান হবে, আর ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি কী দাঁড়াবে, তারই ওপর অনেকখানি নির্ভর করছে।" (দ্বিতীয় খণ্ড ॥ একুশ ॥ পৃ.৬৪৭)

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা লাভের লড়াইয়ের পথ নিয়ে মত পার্থক্য স্পষ্ট ছিল বটে, কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি কখনোই যে আপস করেনি ইন্দ্রনাথের উপর্যুক্ত বিশ্লেষণই তার প্রমাণ।

পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের মাঝে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্য ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি ও কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখার্জি জি বি-তে আসবেন। ত্রিদিবেশকেও সেখানে যেতে হয়, কারণ প্রতিটি সভ্যের সেখানে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক, পার্টির বিশেষ নির্দেশ ছিল। ইন্দ্রনাথের পোশাক-চটি পরে ত্রিদিবেশ এগিয়ে যায় রেলস্টেশনের দিকে। কয়েকটি বস্তি পেরিয়ে দূর থেকে রেললাইন চোখে পড়ে। স্মৃতিবিধুর হয়ে ওঠে 'বিষণ্ন, দুঃখিত' ত্রিদিবেশ। রেলস্টেশনে যাওয়ার পথে কারখানার বয়লারের ছাইয়ের বিশাল ডাঁই খুঁচিয়ে কয়লার সন্ধানে ব্যস্ত মায়ের খোলা বুকে দুগ্ধপানরত সন্তানকে দেখে ত্রিদিবেশের সাদা থান-পরা মায়ের ছবি চোখে ভাসে। মারও কি তার কথা মনে পড়ে?–এটা মনে হতেই বুকে বিদ্ধ খোঁচায় আকাশের দিকে দু হাত বাড়িয়ে দেয়, ছলছল করে ওঠে তার দু চোখ। মনে পড়ে তার ভরণপোষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত 'বিরক্ত ক্ষুব্ধ' মামার মুখ, বউদির 'সুখী' মুখ। কল্পনার চোখে দেখতে চেষ্টা করে মা ছাদে বসে শেষবেলার রৌদ্রটুকু গায়ে লাগাচ্ছে কি না।

জি-বিতে যাওয়ার পথে দু আনা পয়সা বাঁচাবার জন্য, ভীত-উৎকণ্ঠিত ত্রিদিবেশ একাকী বিনা টিকেটে ট্রেনে উঠে পড়ে। তার ভয়কে সত্য করে 'চোখ দুটি নরম মাংসে ঢাকা মোটা বেঁটে ফরসা টাক মাথা কালো কোট চেকার' মাত্র এক আনি রেখে শ্যামনগরগামী ত্রিদিবেশের সকল পয়সা তুলে নেয়। বয়স্ক লোক ও যুবক কেষ্টার কথা থেকে যুদ্ধের বিভীষিকা– দেশের সামাজিক-নৈতিক ধস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জানা যায় বিনা টিকেটে ট্রেনে চড়ার কথা, চেকারকে পয়সা দিয়ে মুখ বন্ধ রাখা, শিয়ালদহ স্টেশনের গেটে কিছু পয়সা দিয়ে মাল পার করিয়ে নেয়া সবই যুদ্ধকালীন বাস্তব চিত্র। দ্রষ্টা ত্রিদিবেশ বয়স্ক ব্যক্তির কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে কিন্তু কোনো উত্তর দেয় না। দুর্ভিক্ষের সময় থেকেই কীভাবে গ্রামীণ জীবনরূপ বদলে যেতে থাকে। গাঁয়ের ছেলেরা, কলকারখানার লোক ও তাদের দালালেরা নিজেদের ঘরের নারীদের টাকার রোজগারের জন্য মিলিটারিদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। ওভারটাইমের টাকায় নিজেরা বায়স্কোপ, থিয়েটার দেখছে আর সিগারেট খাচ্ছে। তবে যুদ্ধ থামলে যে এরাই আবার চুরি-ডাকাতিতে নামবে সে বিষয়ে বয়স্ক ব্যক্তির কোনো সন্দেহ নেই। সে তার নিজের পরিবারের অভিজ্ঞতা থেকেই একথাগুলো বলে যায়। কাগজের আলপিনের বদলে বাবলা কাঁটা বিক্রি করে নগদ টাকার মালিক ছেলে, তার মেয়েও ঘরছাড়া, পুত্রবধূও কন্ট্রাকটর। মোটর নিয়ে গ্রামে আসে, তার সামনেই লোকজন নিয়ে মদ্যপানসহ উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে। অসহায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নির্বাক। ট্রেনে বসে মনের ক্ষোভ সকলের হয়ে প্রকাশ করে। রাতের ট্রেনে ব্ল্যাক আউটের মাঝেই চলে নারী কেনা-বেচার ব্যবসা আর চোরাই মাল পাচার।

Dhaka University Institutional Repository

ফার্স্ট ক্লাসের দুই শ্বেতাঙ্গ যাত্রী এদেশীয় কিছু যাত্রীকে প্রথম শ্রেণির কামরায় উঠতে না দিয়ে তাদেরকে 'গেট আউট', 'ব্লাডি সোয়াইন' ও 'বাস্টার্ড' বলে গালাগাল করায় ক্ষুব্ধ যাত্রীদল কর্তৃক আক্রান্ত সামরিক পোশাকধারী শ্বেতাঙ্গ দুজনের জন্যও তার সহানুভূতি প্রকাশ পায়। 'এক পা গাড়ির পা-দানিতে, আর এক পা কামরার মধ্যে', দরজার ফাঁকে আটকানো হাত, সেই দরজায় পাঁচ-ছজনের ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ–উদ্বেগে ও উত্তেজনায় ত্রিদিবেশের নিজের দাঁতে ছিন্ন করা দুটো আঙুল রক্তাক্ত হয়। সে খেয়াল নেই তার। সম্মিলিত আক্রমণের প্রতিবাদ করা নিরর্থক ও বিপজ্জনক, কারণ ক্রুদ্ধ আক্রমণকারীর মতে, শ্বেতাঙ্গ হত্যা মানে দেশের কাজ করা। তবু ত্রিদিবেশ বলে 'এবার লোকটা মরে যাবে।' "...শ্বেতাঙ্গর গলায় আর্তনাদের গোঙানি শোনা যায়, এবং ত্রিদিবেশ দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে বলে, 'মারুক লাথি, ভগবান ওকে একটু শক্তি দাও, এই কুকুরদের মারবার জন্য..." (দ্বিতীয় খণ্ড ॥ চব্বিশ ॥ পৃ.৬৬৪) শীতল, সংবেনশীল ও উদাসীন ত্রিদিবেশের কাছে জীবন তথা মানুষই একমাত্র সত্য–বিশেষ কোনো যান্ত্রিক মত বা আদর্শ নয়।

শিউলী কর্তৃক গৃহবিতাড়িত অপমানিত অসহায় ত্রিদিবেশ সারারাত বাসায় না ফেরায়, সকালে সে খবর নেয় ইউনিয়ন অফিসে। ইদ্রিশ খবর নেয় মিলে, ত্রিদিবেশ হাজিরা নেয়নি, সাহেব কুঠিতে ছবি আঁকতেও যায়নি; সবিতাব্রতর গিয়ে জানতে পারে মোহনের বাড়িতেও সে যায়নি। বঙ্কিম মুখার্জি, জেলা সেক্রেটারি নিত্যান্দ চৌধুরী জি বি-তে আসেন। এখানে উপস্থিত ত্রিদিবেশের পূর্ব পরিচিত ও তার প্রতি যথেষ্ট স্নেহশীলা স্কুলের দিদিমণি অলকা দাস, সুষমা, আরতি, 'মিলিট্যান্ট' প্রকৃতির মনোরমা, বিপিনের বোন লীলা– সকলেই তার প্রতি মধুদির স্নেহাতিশয্য, নিয়মিত তার বাড়িতে ত্রিদিবেশের যাতায়াত আছে–ইত্যাদি কল্পকথা বলে তির্যক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে এবং তারই 'ঘটনা পরম্পরার আকস্মিকতা'-য় ত্রিদিবেশ উদ্বেগ-আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

এ অবস্থা থেকে তাকে মুক্তি দেয় জে বি-তে নিত্যানন্দ চৌধুরীর পাশে বসে থাকা সবিতাব্রত। সে ত্রিদিবেশকে তার কাছে ডেকে নেয়। নিত্যান্দ চৌধুরীসহ পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ত্রিদিবেশের মেমসাহেবদের ছবি আঁকা পছন্দ করেন না। কমরেড ত্রিদিবেশ বলে তাকে সম্বোধন করেন। তিনি তাকে লেনিনের ছবি আঁকতে বললে কোনো বইয়ে বা অন্য কোথাও দেখা 'সুবৃহৎ টাক, স্বল্প কেশ, বিরাট কান, কপালের মাঝখানে ভাঁজ, লোমশ কিন্তু ছোট ভুরু, উন্নত নাক, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি' বিশিষ্ট জ্বলজ্বলে মুখের ছবি ভেসে ওঠে তার চোখে। দ্রুত বাঁ দিক না এঁকেই ফুটিয়ে তোলে লেনিনের সম্পূর্ণ মুখ। একপাশ থেকে দেখা নিত্যানন্দ চৌধুরী সে মুখের ছবি বুঝতে না পারলেও তার চমৎকারিত্ব ইন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রশংসিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মুখ ত্রিদিবেশ আরও তাড়াতাড়ি আঁকতে পারে বলে মোহন ইন্দ্রনাথকে জানায়। যার মুখ মনে থাকে তার মুখই আঁকতে পারে ত্রিদিবেশ। জি বি-তে সংকোচ সত্ত্বেও ইন্দ্রনাথের আহ্বানে সে সামনের সারিতে বসে। প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী বঙ্কিম মুখার্জির হিন্দি বক্তৃতায় মূলত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বর্তমান পরিস্থিতি এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের সম্ভাব্য পরিবর্তিত ভবিষ্যৎ পটভূমি উঠে আসে। যুদ্ধ শেষ হলেই যে শাসক ইংরেজ ও মালিকশ্রেণির স্বরূপ পাল্টে যাবে সেটা ইন্দ্রনাথও উপলব্ধি করেছিলেন। মোহন ও ত্রিদিবেশের কাছে তিনি সেটা প্রকাশও করেছিলেন। বঙ্কিম মুখার্জিও তার বক্তব্যে কল-কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকসহ উপস্থিত সকলকে উত্তেজিত করেন। অন্যদিকে পার্টির আন্তর্জাতিক ভূমিকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার পার্থক্য দেখিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে কীভাবে কমিউনিস্ট পার্টি সারা বিশ্বে পার্টিকে নিজ নিজ দেশে সংগ্রামের সঠিক পথ-নির্দেশনা দেয় সেটাই নিত্যানন্দ চৌধুরী তাঁর বক্তৃতায় প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে ভারতীয়

Dhaka University Institutional Repository

কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান কাজ ও নীতি– জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা ও পার্টি-ফান্ড বৃদ্ধির জন্য কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণের কথাও তিনি বলেন।

আন্তর্জাতিক নির্দেশ ছাড়া ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি নিজে থেকে কিছু করতে না পারলেও যুদ্ধের পরেই সংগ্রামকৌশল কী হবে ইন্দ্রনাথের এমন প্রশ্ন উত্থাপনে নিত্যানন্দ চৌধুরীর 'জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে'র দিকে ইঙ্গিত করে মোহন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা জানায়। মোহনের প্রতিক্রিয়ায় বিস্মিত ইন্দ্রনাথ অশুভ-ভবিষ্যতের আসন্ন ছায়া দেখতে পায়।

ত্রিদিবেশ কমরেড লোহি মিয়াঁকে নিজের আঁকা স্ট্যালিনের যে ছবি দিয়েছিল সেটা দেখে মুগ্ধ নিত্যানন্দ চৌধুরী সম্ভব হলে তাকে পার্টির 'হোলটাইমার কমরেড' হিসেবে রেখে দিতেন। জীবিকার জন্য তার সাহেব-মেমসাহেবদের ছবি আঁকার বিষয়টি মানতে পারেননি তিনি। ত্রিদিবেশের সঙ্গে তার শিল্পবোধ নিয়েও মতান্তর ঘটেছে। জয়নুল আবেদিনের মতো 'রিয়্যাল জীবনের ছবি' আঁকতে উদ্বুদ্ধ করেছে। শ্রমিক ও শ্রমিক বস্তির অনেক ছবি এঁকেছে ত্রিদিবেশ। তার নিজের জীবনও 'মন্বন্তর কবলিত'। তবু পার্টির প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য কিংবা সাধারণ মানুষের সঙ্গে আত্মিক বন্ধন অনুভব করলেও দুর্ভিক্ষের ছবি তাকে টানে না, বরং 'ক্লান্ত করে'। কিন্তু নিত্যানন্দ চৌধুরী তার মাঝে বুর্জোয়া ভাবধারার প্রতিফলন শনাক্ত করে এবং শিল্পীর সংবেদন অনুধাবনে ব্যর্থ হয়। নিত্যানন্দের মতে, পেশার কারণে একজন বারাঙ্গনা কখনো ধর্ষিত হতে পারে না বলে তার বিশ্বাস। মফস্বলের দক্ষিণাঞ্চলের কোনো এক বারাঙ্গনাপল্লিতে 'মাথায় হেলমেট পরা, ল্যাংটো কতগুলো টমি একটা উলঙ্গ মেয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ধর্ষণ করছে'–ত্রিদিবেশের আঁকা এমন ছবি 'মোস্ট অবসিন' বিবেচিত হয় নিত্যানন্দ চৌধুরীর কাছে। কিন্তু শিল্পী ত্রিদিবেশ চরিত্র-অনুধাবনে টমিদের আচরণ ও পুরুষ কুকুরের আচরণের মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পায়নি। পার্টির পক্ষ থেকেই বলা হয়েছে পার্টির কয়েকজন কমরেডের মালিকানাধীন প্রকাশনা সংস্থায় ত্রিদিবেশের চাকরির জন্য, কিন্তু তাকে চটকলের ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টেই থাকতে বলা হয়।

গত সান্ধ্য-রাতে বিতাড়িত ত্রিদিবেশ শিউলীর ঘরে ফিরে যায়নি। পার্টির আঞ্চলিক সভা শেষে ইন্দ্রনাথ, সবিতা পণ্ডিত, মোহন একত্রে ত্রিদিবেশের দাম্পত্য কলহের মীমাংসায় শিউলীদের ঘরে যায়। উদ্বিগ্ন ও উত্তেজক পারিবারিক পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে, সবিতাব্রত চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে বলে, "শোনো শিউলী, আমি দুটো কারণে নিজে এলাম। তোমাদের ঝগড়াঝাটি মিটিয়ে নাও, মাই রিকোয়েস্ট। আর একটা কথা, সংসার করেও তোমাকে পার্টির কাজকর্ম কিছু করতে হবে।" (দ্বিতীয় খণ্ড ॥ পঁচিশ ॥ পৃ.৬৮৭) সেখানে গিয়ে বারাকপুর মহকুমায় আত্মরক্ষা সমিতিকে আরও সক্রিয় করবার জন্য, নারী সদস্য সংগ্রহের প্রয়োজন। সবিতা পণ্ডিতের প্রস্তাবের মাধ্যমে ক্রমশ পার্টির কাজে জড়িয়ে পড়ে শিউলী|

hM hM Rx‡qর তৃতীয় খণ্ড শুরু হয়েছে– ব্ল্যাকআউটের রাত শেষ হয় ১৯৪৫ সালের ১ মে থেকে। বার্লিন বিজয়োৎসব ১৪ মে। এ সভায় বক্তৃতা করবেন কমরেড নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কমরেড নীরেন ঘোষ, কমরেড সবিতা পণ্ডিত। তৃতীয় খণ্ডের তিন পরিচ্ছেদ, প্রধানত কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লকের সমর্থকদের কমিউনিস্টদের প্রতি দলীয় হিংসা-প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ এবং আক্রমণ-প্রতি আক্রমণের রক্তাক্ত বিবরণ। কমিউনিস্ট পার্টির কাছে কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লক হয়ে ওঠে ইংরেজদের সহযোগী 'ঘাতক ও খুনি', 'সাম্রাজ্যবাদীর দালাল' ও 'পঞ্চম বাহিনী'। অন্যদিকে সুভাষ বসুর সমর্থকদের কাছে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা হয়ে ওঠে 'ইংরেজেদের দালাল', 'ব্রিটিশের পোষা কুত্তা'। পার্টি সদস্যদের মাঝে দেখা দেয় পারস্পরিক অন্তর্কলহ, অবিশ্বাস ও সন্দেহ। বিপিন সুভাষ বসুর সমর্থক হলেও কমিউনিস্ট সভায় অংশগ্রহণ করেছে, অজয়ের কাছ থেকে এ সংবাদ পেয়েও সবিতা বিশ্বাস করে না। শীতল, ছোটন, দয়াল

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃক আক্রান্ত ও রক্তাক্ত হয়েও সবিতার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে এ দয়ালকেই সে সাত-আট বছর আগে প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখত। বয়সে বড় হয়েও দয়াল সবিতাকে 'পণ্ডিতদা' বলে ডাকে। দয়ালকে গ্রেপ্তারের পর তাকে পুলিশের আঘাতের প্রতিবাদ, পুলিশ কর্তৃক সবিতাকে 'জনযুদ্ধওয়ালা' বলে বিদ্রূপ, পরিণতিতে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলার কথাও মনে পড়ে তার। অজয়ের কাছ থেকে উগ্র কমিউনিস্ট বিরোধীদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব-পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের কথা জেনে, কালিয়ার মাঠে আয়োজিত কংগ্রেসের সভায় আশপাশের এলাকা কিংবা কলকাতা থেকে উগ্র বিরোধীদের সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ থাকলেও একই শহরের একই পাড়ার স্থানীয় ছেলেদের দ্বারা এমন আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা সবিতাপণ্ডিত মনেও স্থান দেয়নি। অথচ হার্টের রোগি কমরেড অ্যাডভোকেট বীরেন ঘোষও তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় না। সবিতার নামে মিথ্যা ফোনকল পেয়ে বকুলতলা ক্লাবে আসার পথে পাঁচ মাইল দূর থেকে আগত ইন্দ্রনাথকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসে কংগ্রেসপন্থী দয়াল মিশিরের দল। মারতে মারতে চুলের মুঠি ধরে ছোটন মোহনকে ডাস্টবিনে এনে রুমালের কোণে ইটের টুকরো বেঁধে মাথায় ক্রমাগত আঘাত করে। এ দৃশ্য দেখেও ওরাা রমণের বক্তৃতা বন্ধ হয় না। রমণ পালিয়ে মেদিনীপুরে গেলেও সবিতা পণ্ডিতের দলের জন্যই পুলিশি গ্রেপ্তারে সে হাতের তিনটি আঙুল হারিয়েছে–এ ক্ষোভ প্রকাশিত হয় তার বক্তৃতায়। বকুলতলা ক্লাবে আসা তরুণদের সকলেই চন্দ্রনাথের স্নেহধন্য। কাজেই অন্তর্সংঘাত তাকে বিপন্ন করে। সকলকে শান্ত করবার জন্য তিনি রাজনৈতিক সমাধানে যোশী-গান্ধী পত্র-বিনিময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কিন্তু শীতলের মতো তরুণেরা তাকে নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসেবে দূরে থাকার পরামর্শ দেয়। বৈজু আক্রমণ করে রক্তাক্ত করে ইন্দ্রনাথকে। রক্তাক্ত হয়েও তার উচ্চারণ 'ভারত আমারও মা'। কিন্তু কারও কথায় তিনি 'ভারতমাতা কি জয়' বলতে রাজি নন। একইভাবে তাকে মেরে ফেললেও নেতাজিকে জিন্দাবাদ দিতে মোহনও রাজি নয়। দয়ালের দলের পূর্বপরিকল্পিত আক্রমণ থেমে গেলে কয়েকজন সেপাইসহ দারোগা শিব গুপ্ত এসে আক্রমণকারীদের বিষয়ে তথ্য চাইলে এসকল কাপুরুষ গুণ্ডার রাজনৈতিক গুণ্ডামি বলে অভিহিত করে। আক্রমণকারীদের নাম স্থানীয় প্রবীণ কংগ্রেসি নেতারা বলতে পারবেন বলে মোহন জানায়। দারোগা প্রতিবাদ জানালে অজয় সরাসরি এটিকে 'কংগ্রেসিদের ষড়যন্ত্র' বলে উল্লেখ করে।

সবিতা পণ্ডিতের চেষ্টায়, ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী মুজাফর আহমেদের মাধ্যমে কলকাতায় 'প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক পত্রিকা এবং পুস্তক প্রকাশনা অফিসে' ত্রিদিবেশের চাকরি হয়। চিরচেনা শিল্পাঞ্চল ছেড়ে কলকাতায় নিজেকে তার খাপছাড়া, বিচ্ছিন্ন মনে হয়। কলকাতা মানেই তার কাছে রশীদের সঙ্গে কাটানো ধুকড়িবাগানের বীভৎস অভিজ্ঞতা। মাঝে মাঝে স্মৃতিতে ভেসে ওঠে রশীদের ও সন্তোষের কথা। কাঁচড়াপাড়ার ট্রেনিং সেন্টারে রশীদ প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। ট্রেনিং হোস্টেলে সন্তোষের সঙ্গে ওর তিনবার তার দেখা হয়েছে। কমিউনিস্টদের সন্তোষ ঘৃণা করে এবং কংগ্রেসের গোঁড়া সমর্থক। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে নগদ অর্থ উপার্জন করে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই নিজের অবস্থা পুরোপুরি পাল্টে ফেলেছে সন্তোষ। কাঁচড়াপাড়া আর রুজভেল্ট টাউনের দূরত্ব মাত্র দু মাইল হওয়ায় রশীদের কাছে নিয়মিত আসা-যাওয়া আছে তার :

> সন্তোষ এখন বিরাট বড়লোক। কলকাতা থেকে বারাকপুর মহকুমায় এখন ওর জমি বাড়ি সম্পত্তির পরিমাণ প্রচুর। সেই সন্তোষ আর নেই, রুজভেল্ট টাউনের আমেরিকান সৈনিকদের বন্ধু, স্ত্রীলোক সংগ্রহকারী, মদ এবং টিনজাত খাদ্যের প্রসাদপুষ্ট। এই কয়েক বছরের মধ্যেই সন্তোষের চেহারায় পরিবর্তন অভূতপূর্ব। সেই রোগা কালো শুকনো চেহারা নেই, কথায় কথায় খিস্তি আর হাসি নেই। রীতিমতো মাংসলো ঝকঝকে চেহারা, দামি জামা প্যান্ট গায়ে। কথাবার্তায় গম্ভীর,

Dhaka University Institutional Repository

চোখের দৃষ্টি ভিন্ন–রাগি আর তীক্ষ্ণ। গাড়ি চালিয়ে ঘোরে। কখনও একটা জিপ, কখনও পিছন দিকটা প্রায় অর্ধবৃত্তাকার একটা কালো গাড়ি। (তৃতীয় খণ্ড ॥ পাঁচ ॥ পৃ.৭৪৫)

সন্তোষ কংগ্রেস সমর্থক হলেও পাকিস্তানের সমর্থক রশীদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব আজও নিবিড়। শুরু থেকেই কমিউনিস্ট ত্রিদিবেশকে সন্তোষ বিদ্বেষের চোখে দেখত। বর্তমানে তার রাজনীতি-সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে না জানলেও ত্রিদিবেশ সন্তোষের প্রকৃত চরিত্র জানে বলেই কমিউনিস্টদের প্রতি তার ঘৃণাকে মেনে নিতে পারেনি। স্পষ্ট ভাবেই জানিয়েছে : "তোমার আবার কংগ্রেস কমিউনিস্ট কীসের? তোমার ঘৃণাতে কমিউনিস্টদের কিছু যায় আসে না, কংগ্রেসও তোমার মতো লোকের সাপোর্ট চায় না।" (পৃ.৭৪৫) এ কথার প্রত্যুত্তরে সন্তোষ ত্রিদিবেশকে জানায় কংগ্রেস-নেতাদের মোটা অঙ্কের চাঁদা দেওয়ার বিনিময়ে কংগ্রেসিদের সঙ্গে তার চলাফেরা। অন্যদিকে মুসলিম লিগ সমর্থক রশীদও মনে করে কমিউনিস্টদের 'খেল' শেষ হয়ে আসছে। পরবর্তীতে ত্রিদিবেশও লক্ষ করেছে কংগ্রেসের সভা-সমিতিতে সন্তোষের নিয়মিত উপস্থিতি, কংগ্রেসের লোকজনের সঙ্গে ওঠা-বসা।

সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা-বিদ্বেষ, স্বার্থকলুষ ও সংঘাতপূর্ণ ভ্রান্ত রাজনীতি কালক্রমে এগিয়ে গেছে আত্মঘাতী পরিণতির দিকে। মুসলিম লিগ ঘোষিত ষোলোই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের দুপুরে, 'প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক পত্রিকা এবং পুস্তক প্রকাশনা অফিসে' অবরুদ্ধপ্রায় ত্রিদিবেশ–ঘটে যাওয়া হিংস্র, পাশবিক ও রক্তাক্ত নানা ঘটনার দ্রষ্টা ও শ্রোতা। সমরেশ বসু এ প্রসঙ্গে প্রগতিশীল ও কমিউনিস্ট সংস্কৃতিবান ব্যক্তিদের বহির্চরিত্র ও অন্তর্লোক উন্মোচন করেছেন। ত্রিদিবেশের অফিসের তিনজন ডিরেক্টরের মধ্যে একজন পার্টি সদস্য, দুজন পার্টির সমর্থক এবং আদর্শে বিশ্বাসী। বিমল চক্রবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি মেধাবী ছাত্র শান্ত, নিরীহ, নিরহংকারী। রঞ্জন সেন বা প্রশান্ত রায় বিত্তবান হলেও তাদের কৃত্রিমতাপূর্ণ আচরণ, কথাবার্তা কমিউনিস্ট আদর্শের সঙ্গে মেলে না।

তিন ধনাঢ্য ডিরেক্টরের জন্য বিকেলের টিফিন 'বাটার টোস্ট কলা ডিম চা ভালো সিগারেটের প্যাকেট' এলেই গম্ভীরভাবে তারা ত্রিদিবেশের দিকে তাকায়। সংকুচিত ত্রিদিবেশের জন্য বরাদ্দ থাকে এক কাপ চা। কাজেই ডিরেক্টরদের অস্বস্তি ঘোচানোর জন্য সে বেলা চারটার দিকে চৌরঙ্গির খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে সশস্ত্র পুলিশ আর মিলিটারি গাড়ির ছুটে চলা ও প্রাপ্ত সংবাদে উৎকণ্ঠিত ত্রিদিবেশ, সম্প্রতি সংঘটিত নানা ঘটনার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা খুঁজে পায়। সিমলায় নেতাদের সম্মেলনের ব্যর্থতার তিন সপ্তাহ পরেই ৭ ও ৯ আগস্ট হিরোশিমায় আণবিক বোমা নিক্ষেপ, ১৯৪৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি নৌ সেনাদের বিদ্রোহ, বম্বে কমিউনিস্টদের সে বিদ্রোহ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য কংগ্রেসের প্রাণপণ চেষ্টা, শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ (কমিউনিস্ট পার্টির কাছে যেটা ছিল বিশ্বাসঘাতকতা), ২৪ মার্চ ক্যাবিনেট মিশনের ভারতে আগমনের চার মাস পরেই মুসলিম লিগ ঘোষিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ছুটি ঘোষণা। অনিবার্য পরিণামে হিন্দু-মুসলিম দুপক্ষের সংঘর্ষ ও খুনোখুনি, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ দেখেও পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা– সবকিছুই অর্থপূর্ণ 'রাজনৈতিক নাটক' ও 'শয়তানের খেলা' মনে হয় ত্রিদিবেশের কাছে।

দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে সারা কলকাতায়। ট্রাম, ট্রেন বাস চলাচল বন্ধ। গর্ভবতী শিউলীর জন্য উৎকণ্ঠিত ত্রিদিবেশ, কোনো খবরও পাঠাতে পারছে না– টেলিফোন অপারেটর পর্যন্ত নেই; সবরকম সংযোগ বিচ্ছিন্ন। উদ্বিগ্ন ত্রিদিবেশ ছেচল্লিশ ধর্মতলা পার্টি অফিসে থেকে যাওয়ার কথাও চিন্তা করে। কিন্তু রঞ্জন সেন দাঙ্গা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে তাকে সতর্ক করে দেয়। বিমল চক্রবর্তী নিজ বাড়িতে তাকে থেকে যাওয়ার প্রস্তাব দিলে, ত্রিদিবেশের চোখে ২৪৯ নং বউবাজারের ট্রেড ইউনিয়ন অফিস ভেসে ওঠে। রঞ্জন

Dhaka University Institutional Repository

তাকে বলে, "আপনি ময়দানের রাস্তা দিয়ে গভর্নর হাউসের পাশ দিয়ে ডালহৌসি হয়ে বউবাজার যেতে পারেন।" (পৃ.৭৫১) প্রত্যুত্তরে ত্রিদিবেশ বলে, "আপনারা যান, আমি দেখি, কী করি।" শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত লাটভবন, ডালহৌসি, লালবাজার, ক্লাইভ স্ট্রিট ছাড়া দাঙ্গার শহরের সব অঞ্চলেই প্রতি মুহূর্তে ঘাতকের আক্রমণের আশঙ্কা। সমরেশ বসু ত্রিদিবেশের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে দাঙ্গার আতঙ্কিত পরিস্থিতি ও তার মানসিক অন্তর্চাপ উন্মোচন করেছেন। বর্ণনায় স্পন্দিত হয়েছে হিন্দু-মুসলমানের উপর নয়, মানুষের উপর বিশ্বাস। ত্রিদিবেশ রাস্তায় নেমে আসে :

ময়দান আজ নিঝুম, নির্জন। ...করপোরেশন স্ট্রিট, ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের মোড়, ধর্মতলা-ওয়েলেসলির মোড় সবই এখন বিপজ্জনক। ও ধর্মতলা মসজিদের দিকে তাকায়, একটা পুলিশের গাড়ি সেখানে দাঁড়িয়ে এবং আরও কিছু লোক আশে পাশে ঘোরাফেরা করে। ওদিকে নির্ভয়ে যাওয়া যায় না। (তৃতীয় খণ্ড ॥ ছয় ॥ পৃ.৭৫২)

ত্রিদিবেশকে চমকিয়ে দিয়ে ওর পিছনে দূরে ফায়ার ব্রিগেডের বিপদসূচক ঘণ্টাধ্বনি বেজে ওঠে। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি ময়দানের পশ্চিমের রাস্তায় ছুটে যায়। কোথায়? খিদিরপুরে? ত্রিদিবেশ পায়ে পায়ে কার্জন পার্কের সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলে। মনুমেন্টের দিকে একবার তাকায়। পার্টির কয়েকটা বড় বড় সভায় ওখানে ও কয়েক বার এসেছে, কমরেডদের সঙ্গে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের নিয়ে। আজ কিছুক্ষণ আগে সেখানে দাঙ্গাবাজরা সভা করে গিয়েছে। ...বৃষ্টি নামে। বৃষ্টি ওর সাহস ফিরিয়ে দেয়।

ত্রিদিবেশের মনে হয়, বুকের ভেতরের ধকধক শব্দ এখুনি সমস্ত প্রাণটাকে ছিঁড়ে দিয়ে হাঁ মুখ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসবে। প্রায় উলঙ্গ, চটের মতো কিছু গায়ে একটা মানুষ দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। একটা গাছের আলোছায়া তার গায়ে, অস্পষ্ট মুখ, কিন্তু অপলক চোখদুটো স্পষ্ট দেখা যায়। দৃষ্টি ত্রিদিবেশের প্রতি। ঘাতক? হিন্দু না মুসলমান? ২৪৯ বউবাজার আর মাত্র এক নিশ্বাসের দূরত্ব।

'উল্‌টা গলি সে চলা যা বাবু।' হঠাৎ গোঙানো স্বর শোনা যায়, 'টিরাম রাস্তা পর পুলিশ গাড়ি খাড়া হায়।'

ত্রিদিবেশ আবার সেই চোখের দিকে তাকায়, মনে গভীর সন্দেহ। তথাপি যেন চোখ দুটোর লক্ষ্য থেকে বাঁচবার জন্য ও ছিটকে রাস্তায় পড়ে এবং দৌড়ে গলির মধ্যে ঢোকে। ...লোকটা কে? হিন্দু না মুসলমান, এবং কেন এই সময়ে সে ঘরের বাইরে। মনে থাকবে কেবল একটা মানুষ, আর তার গোঙানো স্বরের কথাগুলো কানে বাজবে। (তৃতীয় খণ্ড ॥ ছয় ॥ পৃ.৭৫৪)

দুঃসাহসী ত্রিদিবেশ বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে অবশেষে ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে পৌঁছে। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ঋষিকেশ ব্যানার্জি, নিত্যানন্দ চৌধুরী, প্রাদেশিক কমিটির নেতা তারক মল্লিক, কামারহাটি আলমবাজারের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড শরাফত আলীসহ উপস্থিত সকলেই লালবাজার ও মফস্বলের বিভিন্ন থানায় ফোন ও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দাঙ্গা পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহে ব্যস্ত। ত্রিবিবেশের দৃষ্টি যায় দেওয়ালের ওপরে পাশাপাশি দুটো ছবির দিকে, বর্তমানের আত্মঘাতী ও বিভক্ত রাজনৈতিক বাস্তবতারই যেন প্রতীকী দ্যোতক ও দ্যোতনা। লক্ষণীয় :

গলা বন্ধ কোট, স্ট্যালিনের ছবি, জেনারেলিসিমো কমরেড স্ট্যালিন–রঙিন। তার পাশে লেনিন। পাখার ব্লেডের ছায়া ছবি দুটোর ওপর দিয়ে নিরন্তর চক্রবৎ ঘুরে যেতে থাকে। দেওয়ালের ওই জায়গায়, ছবি দুটো ত্রিদিবেশ আগেও দেখেছে, দিনের বেলায়। তখন পাখার ছায়া ছবির গায়ে পড়ে না। রাত্রের আলোয় এখন ব্লেডের ছায়া ছবি দুটোর ওপর দিয়ে নিরন্তর ঘুরে যায়। যেন ছিন্নভিন্ন করতে চায়, কিন্তু পারে না। ছবির মূর্তিরা নিশ্চল। বরং ঘূর্ণিতে ছায়ার ছবি দুটো যেন সজীব মনে হয়। যেন তাঁদের মুখ নড়ে, চোখের পাতা কাঁপে, দৃষ্টি ঘন ঘন সঞ্চালিত হতে থাকে। (তৃতীয় খণ্ড ॥ ছয় ॥ পৃ.৭৫৬)

ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে সবিতাব্রতকে দেখে ত্রিদিবেশ কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেও বেশিক্ষণ সেটা স্থায়ী হয় না। ত্রিদিবেশের এলাকা নর্থ বারাকপুর আপাতত দাঙ্গা মুক্ত হলেও 'মানুষ সৃষ্ট' দাঙ্গা যে কোনো সময়েই যে কোনো জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে পারে। শিউলীকেও কোনো খবর দেওয়া সম্ভব নয় জেনে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে ত্রিদিবেশ।

Dhaka University Institutional Repository

দাঙ্গাকালীন উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় মহল্লায় মহল্লায় শান্তি কমিটি তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা জানায় সবিতাব্রত। ইতোমধ্যে শান্তিরক্ষী-বাহিনী গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত, পতাকাশোভিত জিপগাড়িতে করে দাঙ্গা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে-আসা কমরেডদের কাছে জানা যায়, পার্টির নতুন ক্যাডারদের অনেকেই দাঙ্গায় নেমে পড়েছে। পার্টির জিপে করে সবিতাব্রতর সঙ্গে মধুদির বাড়িতে আসার পথে কলকাতার দাঙ্গাবিধ্বস্ত হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় লুটপাট, মৃতদেহ, হত্যার নির্মম বর্ণনাসহ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে ত্রিদিবেশ। সম্প্রদায়িক দাঙ্গা যে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রতন্ত্রের অংশ সেটা বোঝার ক্ষমতা এদেশীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নেই, ত্রিদিবেশের মন এটা মানতে পারে না কিছুতেই। রশীদের কথা মনে পড়ে যাকে :

রশীদকে মনে হয় অনেকটা অভিমানাহত ক্ষুব্ধ ছেলেমানুষের মতো। হিন্দু বন্ধুদের বাড়িতে ওর প্রতি আচরণ এবং ভবিষ্যতের প্রতি সংশয় আর অবিশ্বাস। পাকিস্তান না হলে মুসলমানরা কখনও উন্নতি করতে পারবে না, তাদের প্রতিভার বিকাশ হবে না। এ কথা যদি সকলের জানা, আর এই যদি বিশ্বাস, ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ উভয়েরই শত্রু, তবে নিজেদের মধ্যে মিটমাট কেন হবে না? যেন মন্ত্র দেওয়া একটা গোপন কিছু এর মধ্যে ক্রিয়াশীল, ডাকিনীর মন্ত্রের মতো। সকলেই সম্মোহিত। (তৃতীয় খণ্ড ॥ সাত ॥ পৃ.৭৬১)

হেডমিস্ট্রেস মধুমতী রায় অর্থাৎ মধুদির বাড়ি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় হলেও সকলের প্রিয় দিদিমণি'র বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছে সব হিন্দু পরিবার। তাদের পাহারা দিচ্ছে মুসলিম ক্যাডাররা। আহত মানুষের গোঙানি, ধর্ষিতা নারীর মায়ের আর্তনাদ ও হাহাকারপূর্ণ পরিবেশে এসে নতুন এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় ত্রিদিবেশ। পার্টি মেম্বার ডাক্তার হিমাংশু ঘোষ ও বিশ-বাইশ বছর বয়সী মুসলিম নারী সালমা, মধুদি সকলেই আহতদের সেবায় ব্যস্ত।

ডাক্তার হিমাংশু ঘোষ একজন পার্টি মেম্বার। প্রতি সপ্তাহেই একদিন বা দুদিন শিল্পাঞ্চলে গরিব শ্রমিক কমরেডদের দেখতে যান। দীর্ঘ বলিষ্ঠ সুপুরুষ, প্রসন্ন মেজাজের মানুষ। ডাক্তার হলেও নানা বিষয়ে আগ্রহী। শিল্প সাহিত্য গান, সব বিষয়েই কথা বলেন, আলোচনা করেন, আর অনেক মজার গল্প ওঁর ভাণ্ডার ভরা। সব গল্পই পার্টির ছেলেমেয়েদের নিয়ে, তাদের প্রেম ভালবাসা ঝগড়া বিবাদ বোকামি সাহসিকতা এমনকী কারোর পার্টি-বিরোধী ভূমিকা নিয়েও হেসে ঠাট্টা করে গল্প করেন। (তৃতীয় খণ্ড ॥ সাত ॥ পৃ.৭৬৪-৭৬৫)

অহীন মুখার্জি-মধুদির কথোপকথনে দাঙ্গার বাস্তবচিত্র ফুটে ওঠে। অহীন মুখার্জি সেলিম নামের মুসলিম তরুণের ছদ্মবেশে সুলতান, করিম, পীযূষকে নিয়ে দাঙ্গাপীড়িত এন্টালি থেকে পার্ক সার্কাস এলাকায় ঘুরে বেনিয়াপুকুর, এন্টালি, তালতলার হিন্দু পরিবারকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেয়। পুলিশের গুলির ভয় নিয়েও আহত লোকদের হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। হিন্দু এলাকায় বাধা পেয়ে রক্তাক্তও হয়। রাতের আঁধারে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাকে অহীনের মনে হয় 'স্ট্যালিনগ্রাডের হাতাহাতি লড়াই'।

একজন উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীর ছেলে বত্রিশ-তেত্রিশ বছর বয়সী অহীনের মেধার তীব্রতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, খেলাধুলা ও বিভিন্ন শারীরিক কৌশলে ছিল পারদর্শিতা। কিন্তু সম্ভাবনাময় এ তরুণ শেষ পর্যন্ত 'মধ্যবিত্ত পরিবারের নষ্ট হয়ে যাওয়া ছেলে' হয়ে উঠেছিল। মধুদি যাকে 'বায়স্কোপের অ্যাডভেঞ্চারিস্ট হিরো' বলেছেন। বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্টতার কারণে আশেপাশের এলাকার মানুষের কাছে অহীন নামটি হয়ে উঠেছিল ভীতির উৎস। কারাবাস, পুলিশি নির্যাতনের শিকারও হয়েছে সে। অহীনের একই পাড়ার বাসিন্দা 'টেররিস্ট' যুগের বিপ্লবী কমরেড প্রকাশ মল্লিক (বর্তমানে যিনি কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির মেম্বার) নিজের আদর্শ বজায় রেখে ব্যায়াম সমিতি, জিমনাসিয়াম স্থাপনের মাধ্যমে এলাকার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ক্লাব কার্যক্রম পরিচালনা করেন। 'বিপ্লবী, দেশপ্রেমিক, ব্রহ্মচারী

Dhaka University Institutional Repository

কমিউনিস্ট' হিসেবে তিনি এলাকার শান্তি বজায় রাখার প্রয়োজনে বুদ্ধিকৌশলে পাঞ্জায় হারিয়ে উন্নাসিক, অহংকারী অহীনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে বিভিন্ন ক্রীড়াকৌশল শেখান। উত্তর কলকাতার আখড়ার সবাইকে পেছনে ফেলে অহীন ব্যায়াম সমিতির নেতা হয়ে ওঠে। অহীনের সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবে থেকে প্রকাশ মল্লিক সম্ভাবনাময় এ তরুণের জীবনকে পতন থেকে রক্ষা করেন। বিজলি শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সংগঠক কমরেড হিসেবে তিনি অহীনকে এ আন্দোনের সঙ্গে যুক্ত করে কমিউনিস্ট বিপ্লবে দীক্ষা দেন। অন্ধকার পথ অতিক্রম করে আলোকিত পথে তার এ উত্তরণ এত দ্রুত হয়েছে যে এটা মধুদির কাছে 'ব্যক্তির বিপ্লব' হয়ে উঠেছে। ডাক্তার হিমাংশু স্কুল সহপাঠী শৌখিন যুবক 'মুসলমান ছদ্মবেশী' অহীনকে দেখে বলে ওঠে :

'কিন্তু তুই সত্যি সত্যি কিছু কাজ করছিস, না কি নিজেই চোরাগোপ্তা ছুরি চালিয়ে যাচ্ছিস? ... তোকে বিশ্বাস নেই ভাই অহি। তুই যা ছেলে, দাঙ্গার চেহারা দেখ তুই নিজেই হয়তো ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিস।' (তৃতীয় খণ্ড ॥ নয় ॥ পৃ.৭৭৫)

কিন্তু ডাক্তার হিমাংশু জানে প্রকাশ মল্লিকের মাধ্যমে কথাটা প্রাদেশিক কমিটিতে তুলতে ভুল হবে না অহীনের। প্রকৃত অর্থে অহীনের কমিউনিস্ট সত্তায় অবিশ্বাস থেকেই হিমাংশু কথাটা বলেছে এবং সে মনে করে এ ধরনের ব্যক্তি পার্টিতে থাকায় পার্টির ক্ষতিরই আশঙ্কা। নীরব পর্যবেক্ষক ত্রিদিবেশ পাশ থেকে দেখে অহীনের সঙ্গে কবি বায়রনের সাদৃশ্য পেয়েছে। অভিনয়সুলভ কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গিতে 'ইংরেজি ফাইটিং পিকচারের হিরো' মনে হয় তাঁকে। মধুদিকে 'চোটপাট' ও 'ধমক-দেওয়া' কথাবার্তা শুনে ত্রিদিবেশ অহীনকে 'মিলিট্যান্ট কমরেড' নেতা গোছের ব্যক্তি মনে করে। অহীনকে ভালো না-লাগার কারণ সে ব্যাখ্যা করেছিল। ত্রিদিবেশের উপস্থিতিতেই, ডাক্তার হিমাংশু মধুদির সঙ্গে কর্তৃত্ববাদী অহীন প্রসঙ্গে আলোচনাসূত্রে পার্টি সমালোচনা করতেও কোনো সংকোচ বোধ করেনি। পার্টি আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান কমরেড হিমাংশু কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অভাব ও ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের অন্তঃসারশূন্য পরিণতির কথা ভেবে শঙ্কা ও বিচ্ছিন্নতা বোধ করে। উদ্ধৃতি অনুসরণীয় :

'ত্রিদিবেশ কী বলতে চায়, আমি তা বুঝে গেছি, কিন্তু মধুদি, আমি বা আপনি–আমরা শখের কমিউনিস্ট নই। যা সত্যি মনে হবে, তা মুখ ফুটে বলতে পারব না, এরকম পরিস্থিতি ভাল নয়। আসল গোলমাল কোথায় তা জানি। আসলে তো পার্টি মধ্যে ভদ্দরলোকেরা আসর জমিয়ে বসে আছেন। কলকাতার বনেদি বড়লোকের ছেলে আর জমিদারের ছেলেরা পার্টিতে এলে, কোনও কোনও নেতার জিভ দিয়ে লালা ঝরে–গরিব কমরেডদের কাছে সে সব আবার গ্লোরিফাই করা হয়। আর আমাদের গরিব কমরেডরা ভাবে, যাদের কংগ্রেসে যাবার কথা ছিল, তারা যখন কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছে তাদের মতো মহান লোক আর হয় না। এর রেজাল্ট কী?' হিমাংশুর দুই চোখ জ্বলজ্বলিয়ে ওঠে। (তৃতীয় খণ্ড ॥ নয় ॥ পৃ.৭৭৭)

পুলিশের উস্কানিমূলক নিষ্ক্রিয় ভূমিকা, গভীর ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা, সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠীর অদৃশ্য আক্রমণে ক্রমবর্ধমান দাঙ্গায় কলকাতার জীবন বিপন্ন, দাঙ্গাকারীদের দ্বারা অবরুদ্ধ সাধারণ মানুষ। মধুদির বাসায় স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান কমরেডরা সভা করে শান্তিবাহিনী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিভিন্ন মহল্লায় দাঙ্গাবিরোধী প্রচারণা, দাঙ্গাবিধ্বস্ত মানুষকে উদ্ধারে কাজ করে। শিল্পী হিসেবে ত্রিদিবেশ নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না। সেও শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়ে। ব্যক্তিক ও সাংসারিক জীবনকে সাময়িকভাবে পিছনে ফেলে 'হত্যা আর রক্তে মাখামাখি' জগতে প্রবেশ করে ত্রিদিবেশ। দশম পরিচ্ছেদের পুরোটা জুড়েই সমরেশ বসু ত্রিদিবেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নির্মম নিদারুণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, এর নেপথ্য কুশীলব ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ভূমিকার ব্যাখ্যা করেন এবং মন্বন্তরের সময়ের মতো, দাঙ্গাকালেও পার্টির দ্বিধান্বিত দুর্বল ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন।

শান্তিবাহিনীর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে ত্রিদিবেশ বুঝতে পারে 'কয়েকজন ব্যক্তির ক্ষমতা, জেদ, আর ক্রোধ সংক্রামিত হয়েছে শত শত মানুষের মধ্যে।' (পৃ.৭৭৯) 'তাদের রাজনীতির শিকার' হিসেবে যুদ্ধের

Dhaka University Institutional Repository

চেয়েও বীভৎসতার মুখোমুখি আজ সাধারণ মানুষ। শ্রুত কিংবা অধীত জ্ঞানে নয়, স্বোপার্জিত অভিজ্ঞানের মধ্যদিয়েই সমরেশ বসু ত্রিদিবেশ চরিত্রের মাধ্যমে এ নির্মম সময়কে উপস্থাপন করেছেন।

ত্রিদিবেশ ওর চোখের সামনে দেখছে, দগ্ধ অর্ধদগ্ধ নারীপুরুষের মৃতদেহের স্তূপ। শরীর ছিন্নভিন্ন করা লাশের স্তূপ। মানুষের বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। যে সংখ্যার কোনও সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। যে সব মৃতদেহের কোনও হিসাব নেই। ওর চোখের সামনে ঢাকা-গাড়িতে তুলে কোথায় পাচার করা হয়েছে কেউ তা জানে না। গলিত দুর্গন্ধ মৃতদেহ দেখেছে ও নর্দমার পাঁকে। নিহত শিশুর মৃতদেহ ওর চোখের সামনে নিজের ছেলের মুখ তুলে ধরেছে। ও থাবা বসিয়েছে নিজের বুকে। সদ্য শেষ বিশ্বযুদ্ধের অনেক ছবি দেখেছে ও, বীভৎস, মর্মন্তুদ, করুণ। কিন্তু এই দুদিনের দেখা ঘটনা ওর চোখে বীভৎসতর। যুদ্ধ মনে নিয়ে আসে এক অপ্রত্যক্ষ, অনেকটা অচেনা অজানা এক ভয়ংকর ভাবনা। কলকাতার দুই দল মানুষের মারামারি কাটাকাটির ভয়াবহ ছবি অতি প্রত্যক্ষ, তীব্র ঘৃণা আর যন্ত্রণা ওকে প্রতি মুহূর্তে উদ্বেলিত করতে থাকে। নিজেকে ওর এত অসহায় কখনও মনে হয়নি। অসহায়, কারণ ও ভেবে পায় না, কী করা উচিত? শান্তি কমিটি গঠন? মহল্লায় আর এলাকাগুলোতে গিয়ে শান্তির আবেদন? কারা এর জন্যে দায়ী?" (তৃতীয় খণ্ড ॥ দশ ॥ পৃ.৭৮০)

–এ আত্মজিজ্ঞাসার সূত্র ধরেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণসন্ধানী ত্রিদিবেশ পৌঁছেছে ঐতিহাসিক সত্যে– এককভাবে শুধু ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসক নয়, বরং ১৯৪৬ সালে ভারতবিভাগের প্রাক্কালে গান্ধী-শরৎ বসু-মাউন্টব্যাটেনের অখণ্ড বঙ্গের প্রস্তাবের বিপরীতে, জওয়াহরলাল-জিন্নাহ-শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জনবিচ্ছিন্ন ভূমিকার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। নিচের অংশ দ্রষ্টব্য :

ত্রিদিবেশের মনে জিজ্ঞাসা জাগে, এই কি শেষ কথা, কেবল মাত্র ইংরেজ সরকার এর জন্য দায়ী? এই শয়তানির খেলার সব ঘুঁটি আর চাল কেবলমাত্র তাদেরই হাতে? আর দেশের রাজনৈতিক নেতারা একান্তভাবে তাদের ক্রীড়নক মাত্র? অবিশ্বাস আর ঘৃণায় রক্তাক্ত পেভমেন্টের বুকে ও থুথু ছিটিয়েছে। এ ঘটনা প্রাকৃতিক দুর্যোগ না। মানুষের তৈরি। তারা কি সত্যি মানুষ? না কেবল এক শ্রেণির ক্ষমতাবান জীব, যাদের কাছে হাজার হাজার মানুষের জীবনের কোনও মূল্য নেই? কী সান্ত্বনা আছে মানুষের, কী নিরাপত্তা বোধ থাকতে পারে! আর বিশ্বাস? কাদের প্রতি? শান্তি অবিশ্যিই চাই, এবং দাঙ্গার প্রতিরোধ। কিন্তু নিজের পার্টিকে, সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অতি দুর্বল মনে হয়। যেমন দুর্বল মনে হয়েছিল মন্বন্তরের সময়। উপবাস আর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল পার্টি দুর্বল, তার ক্রুদ্ধ চিৎকারে আর্তনাদের স্বর বেজেছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষের অনাহারে মৃত্যুকে রোধ করা যায়নি। মন্বন্তরও মানুষের সৃষ্টি, কিন্তু সেই সব মানুষেরা এমনই ক্ষমতাশালী, তাদের গায়ে কেউ আঁচড় কাটতে পারেনি। এ দাঙ্গাও মানুষের সৃষ্টি, সেই সব ক্ষমতাশালীদের, যারা চিরদিন লৌহযবনিকার আড়ালে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করে। পার্টি যেন তাদের কাছে অসহায় দুর্বল।" তৃতীয় খণ্ড ॥ দশ ॥ পৃ.৭৮০)

মন্বন্তরের সময় ও দাঙ্গার ভয়াবহ রাতে মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখছিল ত্রিদিবেশ। কিন্তু,

এই আকস্মিক বাঁচার মধ্যে, বেঁচে থাকার সান্ত্বনার থেকে, মৃত্যুর অনিবার্যতাই মনের মধ্যে জেগে থাকে। আর এই অনিবার্য মৃত্যুর সব কারণই মানুষের দ্বারা সৃষ্ট। জরা এবং ব্যাধি না। বেঁচে থাকা যে কী দুর্লভ প্রয়াস, কখনও কখনও যুক্তির অগম্য ভাগ্যের দ্বারা পরিচালিত, তা মনে রেখে গঙ্গার এই হত্যালীলার সামনে দাঁড়িয়ে তীব্র ঘৃণা আর যন্ত্রণা ওকে অস্থির করে তোলে। সমস্ত হিসাব বহির্ভূত, কলকাতার নিহত হাজার হাজার মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা কারা? (তৃতীয় খণ্ড ॥ দশ ॥ পৃ.৭৮০)

দাঙ্গার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের মারতে না পারার ব্যর্থতাজনিত ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ত্রিদিবেশ মধুদির কাছে প্রকাশ করে। সুগভীর বেদনা–ঘোর অমানিশার মাঝেও তার শিল্পীচৈতন্যে দীপশিখা হয়ে দেখা দেয় সেবাময়ী নারী সালমার অঙ্কিত মুখ।

মার্কসিস্ট তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক সৈয়দ বদরুদ্দোজার মেয়ে আহতদের সেবায় অক্লান্ত সালমার ভূমিকা ত্রিদিবেশকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের সভা, মুসলমান নেতাদের নেতৃত্ব আর মুসলমান সম্পর্কে তার মনে একটা বিদ্বেষই ঘনিয়ে উঠেছিল যে, এ ঘটনা 'পূর্বপরিকল্পিত একটা ষড়যন্ত্র'। কিন্তু 'মুসলিম কমিউনিস্ট' ও 'পার্টিপন্থীরা' দাঙ্গা বিরোধী হিসেবে লড়াইয়ে অবতীর্ণ ও আহত-আক্রান্তদের সেবায় নিয়োজিত, তাদের মধ্যে 'বিষণ্ন গম্ভীর' কিন্তু হাসিতে ঔজ্জ্বল্য ছড়ানো 'একা সালমা

Dhaka University Institutional Repository

যেন সকল সংগ্রামের প্রতীক' হয়ে ওঠে শিল্পী ত্রিদিবেশের চোখে। এক অভূতপূর্ব বিস্ময় আর মুগ্ধতা নিয়ে সে সালমাকে দেখে। হিমাংশু ঘোষ মধুদির বাড়িতে ত্রিদিবেশকে দেখে তিন ঘর ভর্তি আহত মানুষের ছবি এঁকে 'সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির শিকার' নাম দেবার কথা বললেও সে তাতে সাড়া দেয়নি, বরং মধুদির আহ্বানে সে নিজেও সেবার কাজে নেমে পড়ে। তৃতীয় দিনে মানুষের সকল ভালোত্ব আর সৌন্দর্য নিয়ে সালমার মুখ আঁকা হয়ে যায় তার হাতে।

ত্রিদিবেশ কলকাতা থেকে ফিরে নিজ শিল্পাঞ্চলে দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ আন্দোলনের জন্য পার্টি নির্দেশিত সকল কর্মকাণ্ড নির্দ্বিধায় সমর্থন ও বাস্তবায়ন করলেও পার্টির 'সাময়িক ট্যাকটিকস' হিসেবে পুলিশের ছত্রছায়ায় শ্রমিকদের হাতে-থাকা প্রাত্যহিক জীবনের অভ্যস্ত-অপরিহার্য উপকরণ লাঠি কেড়ে নেয়ায় তার মন সাড়া দেয়নি। তার মনে হয়েছে এতে পার্টি হয়ে পড়বে লোকবিচ্ছিন্ন। এ বিষয়ে ইন্দ্রনাথের সঙ্গেও তার মতান্তর হয়। পার্টি নির্দেশ অমান্য করায় পাপবোধে আক্রান্ত ত্রিদিবেশের মনে শাস্তির ভয় আচ্ছন্ন করলেও, অবিশ্বাসী পুলিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শান্তি আন্দোলন করতে সে নৈতিক সমর্থন পায় না। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ত্রিদিবেশ পার্টি থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নিজেকে মনে করে 'একাকী, নিঃসঙ্গ ও পরিত্যক্ত'।

ত্রিদিবেশের নৈঃসঙ্গ্য অতিক্রম করতে সহযোগিতা করেছে প্রবীণ শ্রমিক নেতা তাঁতি সর্দার তুরাপ মিয়াঁ। ইন্দ্রনাথকে সে বোঝাতে চেয়েছে মানুষের 'ইনসানিয়ত'-ই আসল। কাজেই পার্টি তাকে বিবেকবিরোধী কাজে বাধ্য করতে পারে না। পার্টির কর্মপদ্ধতির সমালোচনাও করেছে রাজনীতিসচেতন এ নেতা। ইন্দ্রনাথ পার্টি নির্দেশ বাস্তবায়নের অপরিহার্যতা নিয়ে কথা বললে তুরাপ তাকে জানায় :

" 'তোমরা ছেলেমানুষ।' তুরাপ গোঁফ দাঁড়ির ভাঁজে হাসি ফুটিয়ে বলে, 'পার্টির নির্দেশ কি সবাইকে একরকমভাবে মানাতে হয়? ওই শালা পুলিশদের সঙ্গে আমি তো কখনও হাত মিলিয়ে কাজ করব না। তো সেটা কি আমার পার্টিও খিলাফ কাজ হবে?' তুরাপ হুঁ হুঁ করে হেসে ঘাড় নাড়ে এবং আবার বলে, লিগ লিডারদের আমি জানি, আর কংগ্রেসি আর শ্যামাবাবুর লিডারদেরও জানি। জানি পুলিশকেও। তো ইনসানিয়ত বলে একটা কথা তো আছে, কি নেই? মজুরদের লাঠি কেড়ে নেবার মতলবে কী কাজ হবে?" (তৃতীয় খণ্ড ॥ এগারো ॥ পৃ.৭৯২)

ইন্দ্রনাথ তুরাপ মিয়াঁর সঙ্গে এ বিষয়ে একমত পোষণ করলেও পার্টির কৈফিয়তের জবাব দেয়ার জন্য ত্রিদিবেশকে তৈরি থাকতে বলে।

'ত্রিদিবেশ' নাম উচ্চারণে জটিলতার কারণে তুরাপ মিয়াঁ ত্রিদিবেশকে 'দরবেশ' বলে ডাকে। তুরাপের কাছে তার আঁকা স্ট্যালিনের ছবি জীবন্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের সঙ্গে কাজের পরিবর্তে ত্রিদিবেশকে দিয়ে 'দাঙ্গার তসবির' আঁকানোর পরামর্শ দেয়ার জন্য ইন্দ্রনাথকে জানায় তুরাপ। ইন্দ্রনাথের চোখে দেখা দেয় হাসির ঔজ্জ্বল্য। দ্বন্দ্বমুক্ত ত্রিদিবেশ পেয়ে যায় 'অন্তর্লোকের পথনির্দেশ'। রাজপথে নেমে পার্টির্র শান্তি আন্দোলনের পদ্ধতি দেখে সে বুঝতে পারে কীভাবে পার্টি জনবিচ্ছিন্ন হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। "রাস্তায় ছুটির ভিড়ে লাল পাগড়ি আর লাল টুপিগুলো দেখা যায়। মসজিদের সামনেই জায়গাটা নির্দিষ্ট। দক্ষিণ দিকে ফিরে পা বাড়াতেই কয়েকজন শ্রমিক সারা গায়ে চটকলের মেশিনের গন্ধ মেখে এগিয়ে যায়, একজনকে বলতে শোনা যায়, 'লাঠিটা পাঁচ সাল আগে আমি মুলুক থেকে নিয়ে এসেছিলাম। শালাদের ওটা নিয়ে কী দরকার পড়ল?' তারপরের ভাষাগুলো উচ্চারণের অযোগ্য।" (পৃ.৭৯৩) ত্রিদিবেশ শ্রমিকদের মুখের দিকে তাকায়। সকলেই দ্রুত ধাবমান :

মনে হয় উত্তর দিক থেকে যারা আসে, সকলেই পুলিশ, লাল ঝাণ্ডাওয়ালা আর লাঠি কেড়ে নেবার প্রসঙ্গে কথা বলে। কেবল বলে না, তাদের কথায় নানান ঠাট্টা আর বিদ্রূপ। তুরাপ মিয়াঁর মুখ মনে পড়ে। ইন্দিরদা একজন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল তারকা, সে হয়তো মজুরদের মনের কথা যথার্থ বুঝতে পারে না। কিন্তু কারখানার অন্যান্য মিস্তিরি মজুর কমরেডরা

Dhaka University Institutional Repository

তাদের সহকর্মীদের চরিত্র কি জানে না? চটকলের অধিকাংশ শ্রমিক গ্রামের মানুষ, তাদের চালচলন সবই দেহাতের মতো। কী হিন্দু কী মুসলমান, গলায় বা মাথায় একটা গামছা, বগলে বা হাতে একখণ্ড লাঠি দেখলেই চেনা যায়। একমাত্র কিছু কিছু তাঁতি আর স্পিনারদের অন্যরকম লাগে। চটকলের মিস্তিরি অবিশ্যি সকলেই প্রায় বাঙালি। কারখানা থেকে বাড়ি ফিরে গেলে তারা সকলেই ভদ্রলোক। (তৃতীয় খণ্ড ॥ এগারো ॥ পৃ.৭৯৩)

শ্রমিক আন্দোলন এবং পার্টির কাজে গঙ্গা তীরবর্তী চটকল এলাকায় সমরেশ বসু নব্বই বছরের বেশি বয়সী নবকুমার দাশের কাছ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে তৈরি-হওয়া চটকলের ইতিহাস শোনেন। তুরাপ মিয়াঁর চরিত্রচিত্রণে সমরেশ বসুর চেতনে-অবচেতনে নবকুমার দাশের চরিত্র সক্রিয় ছিল বলে অনুমিত হয়।

ট্রেড আন্দোলনের ইতিহাস তুরাপ মিয়াঁর জানা। রাজনীতির সূত্রে বেশিরভাগ নেতার চরিত্র ও ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। উনিশশো আটাশ সালে চটকল ধর্মঘটে অংশগ্রহণের কারণে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত নেতাদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেতিবাচক। নিজেদের সংকটে বিলিতি কোম্পানির শ্রমিকদের দ্বারা ধর্মঘট সংঘটিত করার কৌশল, 'হাসুয়া হাতুড়ি ছাপাই' বই ও পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রীর তার কাছ থেকে অন্যান্য নেতা সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তির চেষ্টা– সবই তুরাপ মিয়াঁ ত্রিদিবেশকে বলেছিল। তার প্রতিটি অভিব্যক্তি বড়ো রহস্যময় মনে হয় ত্রিদিবেশের কাছে। বিশেষ করে শোষিত শ্রেণির নিরন্তর সংগ্রামের কথাই যেন সে ঘোষণা করে : "'লড়াই হচ্ছে হরদম। লড়াইয়ের কোনও সন তারিখ সময় নেই। লড়তে লড়তে যাও, ইয়ে জিন্দেগি হ্যায় লড়াই।'..." (পৃ.৭৯৪)

তুরাপ মিয়াঁ কথিত 'দাঙ্গার তসবির' আঁকার প্রেরণায় ত্রিদিবেশের উচ্ছ্বসিত মুখ দেখেই স্ত্রী ফুলি বুঝে নেয় সে নতুন কিছু আঁকার প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেখা-শোনা দাঙ্গার ঘটনাগুলোর ছবি এঁকে গল্পের আকারে সাজানোর জন্য প্রয়োজনীয় সাদা মোটা কাগজ, কালো লাল চায়নিজ কালি, বাঁশ ও দরমা কেনার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে দুশ্চিন্তার কথা ত্রিদিবেশ ফুলিকে জানালে কলকাতার অফিস থেকে অর্থ দেবে কিনা সে জানতে চায়। কিন্তু ত্রিদিবেশ এ বিষয়ে তার অনাগ্রহের কথা জানায় :

"...ওই অফিসে আমি আর কোনও দিন যাবই না। পণ্ডিতদাকে জানিয়ে দেব, ও সব সাহেব মার্কা প্রগতিশীল কমরেডদের আমার একটুও ভাল লাগে না। ওরা চাইলেও পয়সা দেবে না। ওরা অন্য রকম লোক, জব্বারদাই ওদের সম্পর্কে ঠিক কথা বলে। ওরা হল কমিউনিস্ট কাচপোকা।" (তৃতীয় খণ্ড ॥ এগারো ॥ পৃ.৭৯৬)

শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রনাথ ও জয়ার আন্তরিক উৎসাহ ও সহযোগিতায় ত্রিদিবেশ এগিয়ে চলে তার স্বপ্নের পথে। তার মাথায় কী করে এমন ছবি আঁকার ভাবনা এল এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সে জয়াকে বলে তার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কথা, উপলব্ধির কথা–যেখানে মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোভী ব্যক্তির রাজনীতির শিকার সাধারণ জনশ্রেণি। ত্রিদিবেশ তার শিল্পের মধ্যদিয়ে এ সময়-সত্যকেই তুলে ধরতে চায়।

তা জানি না। অনেক পোস্টার তো দেখি, সেগুলো আমার মাথায় ঘুরছিল। তারপরে মনে হল, দাঙ্গার ওপরে কতকগুলো বড় ছবি আঁকব, এক-একটা ঘটনা, অবিশ্বাস, সন্দেহ, বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে, নিজেদেরই মা বোন বউকে অপমান করছে, খুন করছে। আসলে তারা সকলেই অন্যের হাতের পুতুল হয়ে এ সব করছে। পোস্টারগুলো হবে সবই পুতুল খেলার ছবি, পুতুলগুলোকে যারা নাচাচ্ছে–যাদের হাতে সুতো তাদের হাতগুলো কেবল দেখা যায়, আর মাথায় মুখে সারা গায়ে কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা। ভয়ংকর আর কুচ্ছিত তাদের দেখতে, দেখলে ভয় লাগে। তারপরে পুতুলগুলো হঠাৎ মানুষের মতো বেঁচে দাঁড়ায়, যারা তাদের নাচায় তাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়, ঝাঁপিয়ে পড়ে আর তাদের মুখোশগুলো খুলে পড়ে, তাদের চেনা যায়।' ত্রিদিবেশ থামে। ওর ওর দৃষ্টি দক্ষিণের জানালার বাইরে অন্ধকারে অন্যমনস্ক। যেন আরও কিছু বলতে চায়, বলতে পারে না, আসলে কী ভাবে সমস্ত ফ্রেমগুলোকে সাজিয়ে তুলবে আর আঁকবে এবং মুখোশ-খোলা লোকগুলোর মুখ খুব চেনা মুখের আদলে আঁকবে কি না, এই ভাবনায় ডুবে যায়। (তৃতীয় খণ্ড ॥ এগারো ॥ পৃ.৭৯৯)

Dhaka University Institutional Repository

ইন্দ্রনাথের নির্জন ঘরে 'তিন দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা-রাত্র' পর্যন্ত ইন্দ্রনাথ ও জয়ার সহযোগিতায় শেষ পর্যন্ত ত্রিদিবেশের ছবি আঁকা শেষ হয়। ইউনিয়ন অফিসে নেবার পূর্বে শিউলী বিমুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে ছবি দেখে। সম্প্রদায়িক দাঙ্গার অমানুষিক সব দৃশ্যের ভয়াবহতায় শিউরে ওঠে সে। রক্তস্নাত ছবিতে 'কালো কালো জানোয়ার'গুলো ইন্দ্রনাথের কাছে চিহ্নিত হয় 'সাম্রাজ্যবাদী' হিসেবে। ত্রিদিবেশের আঁকা ছবির পোস্টার দর্শনার্থীদের কাছে বিচিত্র মাত্রা পায়। কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রশংসিত হয় ত্রিদিবেশের ছবি।

ত্রিদিবেশকে দারিদ্যপীড়িত সংসারের দৈন্যের কথা জানিয়ে শিল্পীর সাধনায় বিঘ্ন ঘটাতে না চাইলেও পাঁচদিন পরেই আসন্নপ্রসবা শিউলী 'থালায় কয়েকটা রুটি, কয়েক টুকরো পেঁয়াজ, দুটি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ম্লান হেসে জানিয়েছিল পরবর্তী বেলার খাবার নিঃশেষিত, কলকাতায় পত্রিকা অফিসের চাকরি ছেড়ে দেয়ায় নতুন কাজের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিল। অপরাজেয় ত্রিদিবেশকে শিল্পী হয়ে-ওঠার পথে এভাবেই এগিয়ে দিয়েছে স্ত্রী শিউলী, যেমন গৌরী দিয়েছিলেন সমরেশ বসুকে।[১৮] পরবর্তীতে শিউলীও ধীরে ধীরে পার্টির কাজে যুক্ত হয়। এক্ষেত্রে ত্রিদিবেশ তাকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করে।

১৯৪৭ সালের পরেই পি. সি. যোশীর নেতৃত্বের পরিবর্তে বি. টি. রণদিভের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য পার্টির অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি চলছিল। ভারতের বিপ্লবের পথ ও লড়াইপদ্ধতি রুশ বিপ্লব নাকি চীন বিপ্লব অনুসারী হবে–এ নিয়ে মতপার্থক্যের সূত্র ধরে ধীরে ধীরে পার্টি এগিয়ে যায় সন্ত্রাসের পথে। পার্টির অভ্যন্তরে তখন নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব-সংঘাত-পারস্পরিক অবিশ্বাস-সংশয়-সন্দেহ-ঈর্ষা। পরিণামে কমিউনিস্ট পার্টি আবার বে-আইনি ঘোষিত হয়। উপন্যাসের শেষে সমরেশ বসু এ সময়কেই ধরতে চেয়েছেন। পার্টির প্রতি উৎসর্গীকৃতপ্রাণ কমরেডদের তখন লড়াই করতে হচ্ছিল পুলিশ, পার্টি ও অ্যান্টি পার্টির সঙ্গে। পার্টির জেলা কমিটি থেকে ঠিক সে মুহূর্তে, নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব-ঈর্ষা-প্রতিহিংসার শিকার কমরেড অনিলের প্রতি 'আন্ডারগ্রাউন্ড শেলটার' ত্যাগ করে প্রকাশ্যে শ্রমিকদের নিয়ে সভা- সমাবেশের মাধ্যমে আন্দোলন করার নির্দেশ আসে। জেলা কমিটির নির্দেশ অমান্য করার অপরাধে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হতে হবে জেনেও ত্রিদিবেশ নিরপরাধ কমরেডকে বাঁচানোর দায় স্বীকার করে। এ কারণেই চটকলের ব্যাচিং বিভাগের মিস্তিরি কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক বৈষ্ণব নরসিং (নৃসিংহ)-এর বাড়িতে অনিলকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে আসে।

এক বছর আগে রুড়কি অর্ডন্যান্স কারখানা থেকে ছাঁটাই হয়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা মাথায় নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে আসে অনিল ব্যানার্জি। কিন্তু দক্ষ সংগঠক, শ্রমিকদের সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা-অভিজ্ঞতা, হিন্দিতে উদ্দীপনাময় বক্তৃতা প্রদানের পারর্শিতা থাকায় পার্টি তাকে কাশীপুর ইছাপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিসহ বিভিন্ন শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লব সংগঠিত করবার কাজে কলকাতা থেকে এ অঞ্চলে পাঠায়। জব্বলপুর ছাত্র আন্দোলনের সময় থেকে কমিউনিস্ট পার্টিতে আসার কারণে এ তরুণ পরিবার-বিচ্ছিন্ন, পরিবার-পরিত্যক্ত। শিউলীদের বাড়িতে এক সপ্তাহ অবস্থানের সূত্রে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে আগ্রহী প্রায় তিরিশ বছর বয়সী অনিল, ত্রিদিবেশকে ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা সম্পর্কে জানতে প্রেরণা দেয়, তার ছবির সমালোচনা করে তাকে উৎসাহিত করে এভাবে :

" 'আপনাকে রাশিয়ান বা চিনা শিল্পী কেউ হতে বলবে না, একজন ভারতীয় শিল্পী হতে হবে আপনাকে। একজন ভারতীয় কমিউনিস্ট শিল্পী। আমার মনে হয় শিল্পের ব্যাপারে পেছনে আমরা অনেক কিছু ফেলে এসেছি, যা এখনকার বৈপ্লবিক আধুনিকতার থেকেও বেশি ম্যাচুর। এবারকার শারদীয় পত্রিকায় আপনার যে আঁকাটা দেখলাম, ওটাকে আমার বেশ জগাখিচুড়ি মনে হয়েছে। আপনি একসঙ্গে তিন জনকে নিয়ে পড়েছেন–নন্দলাল, যামিনী রায় আর পিকাসো।'

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত তিন শিল্পী অনুকরণের যোগ্য হলেও অনিল বলেছিল "আমরা ত্রিদিবেশকে চাই, একজন একবারে নতুন আর অনন্য শিল্পীকে।" (তৃতীয় খণ্ড ॥ পনেরো ॥ পৃ.৮১৮)

কমিউনিস্ট পার্টি নির্দেশিত পথে চলতে গিয়ে পার্টি নীতি ও আদর্শের সঙ্গে নিজস্ব বিশ্বাস ও আদর্শের সংঘাত বাঁধে অনিলের। ত্রিদিবেশকে শিল্পীর রংতুলির পরিবর্তে হাতিয়ার নিয়ে বিপ্লব করতে বলা তার কাছে গ্রহণীয় নয়। নিজস্ব বিশ্বাসের কথা নির্দ্বিধায় সে ত্রিদিবেশকে বলেছিল :"শিল্পীর অনুভূতিতে একটা বিশ্বপ্রতিফলিত আর প্রকাশিত হতে পারে বলেই একজন শিল্পী শিল্পী হতে পারেন।" (তৃতীয় খণ্ড ॥ পনেরো ॥ পৃ.৮১৮)

এ কারণেই পিকাসোর আঁকা স্ট্যালিনের ছবিকে ন্দানভ 'প্রতিক্রিয়াশীল ছবি' বললেও শিল্পী পিকাসো স্পষ্ট ভাষায় জানান তিনি কখনও স্ট্যালিনকে না দেখলেও তাঁর কল্পনায় স্ট্যালিন যেমন তেমনিভাবেই তিনি তাঁকে এঁকেছেন। পার্টির বর্তমান নীতি, বিপ্লবকৌশল ত্রিদিবেশের মনে যে দ্বিধা ও সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল তাতে অনিলের কথার মাঝে আত্মভাবনার সাদৃশ্য দেখতে পায়; মনে পড়ে শ্যামবাজারের জি বি মিটিংয়ে নিজের হাতে আঁকা লেনিনের মুখচ্ছবি নিয়ে তর্কালোচনা। অনিলকে সবিতাব্রত, ইন্দ্রনাথ সকলেই প্রীতির চোখে দেখেন। তীক্ষ্ণধী অনিল চটকল এলাকায় আসার অল্প কালের মধ্যেই 'সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে' সমর্থ হয়েছিল। ঘটনা ও সময়সতর্ক হওয়ার কারণে পার্টি বে-আইনি ঘোষণার বিশ দিনের মধ্যেই নিজের গ্রেপ্তারি পরোয়ানার আশঙ্কা আগেই বুঝতে পেরে অনিল সময়মতো আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গিয়েছিল।

কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিতীয়বারের মতো নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার কিছুদিন আগে আঞ্চলিক শ্রমিক সেল-এর নেতৃত্ব নিয়ে অহীন কলকাতা থেকে 'চটকল ও বিজলি শ্রমিকদের' এলাকায় চলে আসে। পরে সে অ্যাকশন কমিটির আঞ্চলিক প্রধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। দলীয় কর্মপরিকল্পনা–সভা, বৈঠক, আলোচনা সবকিছুতেই অহীনের একচ্ছত্র আধিপত্য ও কর্তৃত্ব। 'আগে বিপ্লব' মন্ত্রে উজ্জীবিত বই-খাতা-পরিত্যক্ত ষোলো-সতেরো বছর বয়সী ছাত্রদের নিয়ে অহীন তার অ্যাকশন বাহিনী গড়ে তোলে। এদের মাঝে কোনো রাজনৈতিক শিষ্টাচার ছিল না, অহীনের নেতৃত্বে সেটা াকা সম্ভবও ছিল না। ইন্দ্রনাথ কিংবা নিত্যানন্দ চৌধুরীর মতো কমরেডদের সামনে বসে তারা সিগারেট খায়। নায়কসুলভ আচরণ-বাকভঙ্গির কারণে অহীনের প্রতি মুগ্ধ বিস্ময় আছে বিশেষ মধ্যবিত্ত শ্রেণির। কিন্তু নিত্যানন্দ কিংবা ইন্দ্রনাথের প্রতি আছে সকল শ্রমিক কমরেডদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। অহীন জানে তাদের উচ্চতায় সে কখনো পৌঁছতে পারবে না। এক নিদারুণ হীনম্মন্যতাবোধে আক্রান্ত হয়ে সে আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকা কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরীকে 'ধারালো আর বিদ্রূপ' মেশানো ভাষায় কথা বলে। সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী উগ্রপন্থী এ নেতা সকল কমরেডের ভালোবাসা ও সম্মানপ্রাপ্ত ইন্দ্রনাথকেও পুরোনো পার্টিনীতির স্থলে নতুন নীতি অনুসারে চলতে বলে। 'বিষণ্ন হেসে' তাঁর অসহায়তা প্রকাশ করে নিত্যানন্দ চৌধুরী। ইন্দ্রনাথও অহীনের কথা নির্দ্বিধায় মানতে পারেন না। নিচের অংশ দ্রষ্টব্য :

...'কমরেড, আপনাদের সাবেকি ঢিলেঢালা অভ্যাসগুলো ছাড়ুন, বর্তমান অবস্থার মুখোমুখি হবার চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, কেকেড়া কেকেড়া নাম বাতাও-এর যুগ এটা নয়, আর আপনি কোন কালে কলকাতা কর্পোরেশনের শ্রমিকদের সঙ্গে শীতের রাতে আগুন জ্বালিয়ে খোলা আকাশের নীচে কাটিয়েছেন, সে সব মনে রেখেও লাভ নেই।'

নিত্যানন্দ চৌধুরী বিষণ্ন হাসেন, ওর মোটা লেন্সের আড়ালে বড় বড় চোখ দুটো কেমন অসহায় দেখায়, তাঁর সেই কিছুটা গ্রাম্য উচ্চারণে বলেন, 'হ্যাঁ কমরেড, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তো নিশ্চয়ই চলতে

Dhaka University Institutional Repository

হবে, কিন্তু সেই পুরনো দিনগুলোকে ভুললে নিজেকেই যে ভুলে যেতে হয়। সেটা বোধ হয় পারব না। তবে হ্যাঁ, বর্তমানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। কিন্তু আপনাদের মতো কি আর এই বুড়ো হাড়ে হবে? চেষ্টা নিশ্চয়ই করব।'

অহীন ভুরু ঝাঁকিয়ে বলে, 'চেষ্টাটা একটু ঠিক মতো করবেন কমরেড।' এবং প্রায় একই ধরনের কথা সে ইন্দিরদাকেও বলে, 'এখন এই সশস্ত্র বিপ্লবের সময়ে মধ্যবিত্ত ইনটেলেকচুয়েল মার্কা শ্রমিক আন্দোলন চলবে না, দরকার হলে আলুর ব্যাগ (বোমার ব্যাগ) আপনাকেও হাতে তুলে নিতে হবে। এখন আমাদের সকলের ভূমিকা এক, সশস্ত্র প্রতিরোধ, সুযোগ বুঝে আক্রমণ।' ইন্দিরদা অবিশ্যি হেসে প্রতিবাদ করে, 'পার্টির লাইনেই আমি আছি, মধ্যবিত্ত ইনটেলেকচুয়েল মার্কা শ্রমিক আন্দোলন আমি করছি না। পার্টি আমাকে আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে বলেছে, আমি গিয়েছি, কিন্তু আপনার নির্দিষ্ট জায়গায় আমাকে থাকতে হবে, পার্টির এরকম কোনও নির্দেশ নেই। ওপর থেকে বললে আমি নিশ্চয়ই যাব।' (তৃতীয় খণ্ড ॥ পনেরো ॥ পৃ.৮১৯)

চটকলের নকশাঘরের 'নকশাবাবু' অর্থাৎ ড্রাফটসম্যানের চাকরির সুবাদে ত্রিদিবেশের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। কিন্তু পার্টির অ্যাকশন কমিটির আঞ্চলিক অধিনায়ক অহীনের ব্যক্তিস্বার্থনির্ভর সশস্ত্র, সহিংস বিপ্লববাদী কর্মকৌশল ত্রিদিবেশকে বিভ্রান্ত করে তোলে। পার্টি সদস্য না হয়েও 'মেয়েদের একটি গুপ্ত সেল'-এর নেত্রী স্ত্রী শিউলীর সঙ্গেও তার রাজনৈতিক আদর্শিক সংকট দেখা দেয়। ত্রিদিবেশ মধুদির কাছ থেকে অহীনের বিগত জীবনকথা জানলেও, শিউলীর সেটা অজানা থাকায় অহীনের সশস্ত্র পন্থার প্রতি তার মুগ্ধতাই বেশি ছিল। ত্রিদিবেশের দাম্পত্যজীবনেও বিশেষ করে জয়াকে কেন্দ্র করে শিউলীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির পেছনেও অহীনের প্রভাব সক্রিয় ছিল। ত্রিদিবেশ অহীন সম্পর্কে নিজের উপলব্ধি প্রকাশ করলে, শিউলী ক্রুদ্ধভাবে প্রত্যাঘাত করে :

'কার বিষয়ে কী বলছ তুমি? কমরেড অহীন মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করে বেড়ায় না, সে একজন বিপ্লবী যোদ্ধা। তোমার মুখ থেকে আমি ওর সমালোচনা শুনতে চাই না।' (তৃতীয় খণ্ড ॥ পনেরো ॥ পৃ.৮২০)

'রক্তে ঢেউ তোলা' ও 'শিল্পসৃষ্টির গভীরতর অনুপ্রেরণার জগতে এগিয়ে দেবার' সহযাত্রী জয়াকে ত্রিদিবেশ যেমন উপেক্ষা করতে পারে না, তেমনি পারে না অস্বীকার করতে শিউলীর প্রতি আত্মসমর্পণ, দায়িত্ব ও ভালোবাসা। সামাজিক সংস্কৃতির দৃষ্টিতে মধুদি কিংবা জয়ার সঙ্গে সম্পর্কটা অন্যায্য হলেও শিল্পী ত্রিদিবেশ এতে কোনো মালিন্য বোধ করে না। কিন্তু তার দাম্পত্যজীবনে অহীনের অনধিকার প্রবেশ ও প্রভাব ত্রিদিবেশ কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। গোপন বৈঠকে, পার্টির গৃহীত কোনো অন্যায় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানালেও শিউলী তাকে অহীনের পক্ষ হয়ে আক্রমণ করে :

'তুমি একজন কাপুরুষ। বিপ্লবী ধারণা তোমার মাথায় নেই। প্রাণ দিতে ভয় পাও, তাই যুক্তি খোঁজ। তোমার মতো আজ যারা প্রাণ দিতে ভয় পায়, পার্টিতে তাদের ঠাঁই হওয়া উচিত না।' (তৃতীয় খণ্ড ॥ পনেরো ॥ পৃ.৮২০)

ষোলো পরিচ্ছেদে পার্টির অন্তর্ঘাত ও অন্তর্বিরোধ উপস্থাপনে সমরেশ বসুর ব্যক্তিক নির্মম অভিজ্ঞতা বাস্তব উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির একটা সহায়ক দল হিসেবে অ্যাকশন কমিটির সক্রিয় নীতি ছিল, কমরেডদের পুলিশের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। এক্ষেত্রে অনিল মুখার্জির সঙ্গে সিদ্ধান্ত-সমন্বয় করেই অহীনের কাজ করার কথা। কিন্তু পার্টির নীতি ও কৌশলকে উপেক্ষা করে অহীনের একক সিদ্ধান্তে সকল কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ ও অহীনের একচ্ছত্র আধিপত্য সবাই মেনে নিলেও, অনিল ব্যানার্জি তা মানেনি। এ অপরাধে নিত্যানন্দ চৌধুরীর বিপদের মিথ্যা আশঙ্কার কথা বলে কৌশলে তাকে আন্ডারগ্রাউন্ড শেল্টার ছাড়তে বাধ্য করে। অহীনের চেষ্টায় 'স্পেশাল কুরিয়র'-এর মাধ্যমে জেলা কমিটির

Dhaka University Institutional Repository

কাছ থেকে চিঠিও আসে। কিন্তু ত্রিদিবেশ অনিলকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে দেওয়ার অপরাধে, শিউলীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে, অহীন ও তার সমর্থকদের কাছে সে পার্টির নির্দেশ অমান্য করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। ষোলো বছরের ছাত্র নিশীথও মারমুখী হয়ে ওঠে ত্রিদিবেশের প্রতি। জেলা কমিটির সার্কুলার পড়ে কিংবা বারবার কৈফিয়তের মুখোমুখি হয়েও ত্রিদিবেশ অনিলকে আশ্রয় দেবার কথা অহীনের কাছে স্বীকার করে না।

অনিলের বিরুদ্ধে পার্টিবিরোধী কী কী অভিযোগ আছে ত্রিদিবেশ সেটা জানতে চাইলে, এক টুকরো কাগজ তাকে দেখানো হয়। ত্রিদিবেশ গম্ভীর স্বরে বলে,

‘আমাদের জানানো উচিত, কমরেড অনিল মুখার্জি পার্টিবিরোধী গুরুতর কী কী কাজ করেছেন। সে সব আমরা কিছুই জানি না।
অহীন তৎক্ষণাৎ ঘাড় বাঁকিয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ ধারালো স্বরে জিজ্ঞেস করে, ‘আপনি কি জেলা কমিটির ডিসিশনকে চ্যালেঞ্জ করছেন?’...
শিউলীর নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়, অহীনের দিকে তাকিয়ে বলে, ‘ সব কথা কি আমাদের জানা উচিত? জানাবার মতো হলে জেলা কমিটি নিশ্চয়ই সার্কুলারে তা জানিয়ে দিত, তাই না?
‘ঠিক বলেছেন কমরেড শিউলী।’ অহীন ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে, ‘ইচ্ছা করলেই আমরা সব কথা জানতে পারি না, আমরা প্রশ্ন করতেও পারি না, সেটাও এক রকমের পার্টিবিরোধী কাজ হতে পারে।’ (তৃতীয় খণ্ড ॥ ষোলো ॥ পৃ.৮২৪)

ত্রিদিবেশ অ্যাকশনে যাওয়ার রুট সম্পর্কে অহীনের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত সম্পর্কেও দ্বিমত পোষণ করে। এই পার্টি সিদ্ধান্ত কমরেড গোবিন্দ(নিত্যানন্দ চৌধুরী)-সহ অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য বিপজ্জনক ও পার্টিকে লোকসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে– ত্রিদিবেশের এমন ব্যাখ্যায় অহীনের চোখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। পার্টির সার্বিক অন্তর্ঘাতী পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, “দু পাশে ঝোপঝাড় মাঠের অন্ধকার পথে” নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথ ত্রিদিবেশকে সাবধান করেন। ত্রিদিবেশের প্রতিক্রিয়া যেন gvbl kW³i Drm উপন্যাসের সজলের ভাবনারই প্রায় অনুরূপ :

‘ইন্দিরদা, কী ভাবে সাবধান হব?’ ত্রিদিবেশ বলে, ‘আপনাকে একটি কথা আমি পরিষ্কার বলতে পারি, আমার নিজের মনে কোনও পাপ নেই। আমি পার্টির বিরুদ্ধেও নেই। কিন্তু যা আমি বিশ্বাস করতে পারি না, তা মেনেও নিতে পারি না। গত মার্চের আন্দোলনের সময় আমি পার্টির কাছে আমার মতামত খুলে বলেছিলাম। আমরা বোমা মেরে একজন নির্দোষ মজুরকে খুন করেছিলাম, মজুরেরা পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল আমাদের আঠারো বছরের অজয়কে। জেলা কমিটির লিডার আমাকে বলেছিলেন, আমার মতামতের কথা ভেবে দেখা হবে। কিন্তু দেখা কী হয়েছে, আমি জানি না। আমি এখনও বিশ্বাস করি, আমরা টেররিজমের পথে চলেছি, এটা আমাদের বিপ্লব নয়, তবু পার্টির নির্দেশই আমি মেনে চলব। এই মেনে চলার মধ্যে হয়তো এমন ঘটনা থাকতে পারে, যা আমি পার্টি মোতাবেক করতে পারি না। মনুষ্যত্বকে আমি জলাঞ্জলি দিতে পারি না। ইন্দিরদা, আমার ভয় হয়, আমি বোধ হয় আমাদের এই বিপ্লবের থেকে মনুষ্যত্বকে বড় চোখে দেখছি।’ (তৃতীয় খণ্ড ॥ ষোলো ॥ পৃ.৮২৭)

ইন্দ্রনাথদের মতো ব্যক্তির কাছ থেকেই ত্রিদিবেশ কমিউনিস্ট পার্টির শিক্ষা লাভ করেছিল। অথচ পার্টির ভ্রান্ত নীতি-আদর্শ আর অন্তর্বিরোধের কাছে তারা আজ ‘অসহায়-বিভ্রান্ত’। ‘দেশ সমাজ জনবিচ্ছিন্ন’ এই রাজনৈতিক আদর্শবাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ‘পার্টির কাছে সম্পূর্ণ লয়াল’ থাকার ইচ্ছা থাকলেও, ত্রিদিবেশের ‘মনুষ্যত্বকে বড় করে দেখার ভয়’ নামক বিস্ময়াহত অদ্ভুত কথা ইন্দ্রনাথের চেতনাকে এতটাই নাড়া দিয়েছিল যে পার্টির ‘আন্ডারগ্রাউন্ড শেল্টারে’ না গিয়ে সে রাতে নিজ বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেন।

পার্টি বে-আইনি ঘোষিত সত্ত্বেও অহীন কমরেড গোবিন্দ (নিত্যানন্দ চৌধুরী)র নেতৃত্বে সরকারবিরোধী মিছিল-সমাবেশ নিয়ে এগিয়ে যাবার যে রুট নির্ধারণ করে ত্রিদিবেশ তাতে দ্বিমত পোষণ করে, বলে :

Dhaka University Institutional Repository

"...ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের সামনে থেকে আমরা যখনই বড় রাস্তায় পড়ছি, আর নর্থের দিকে যাচ্ছি, তখন প্রায় আধ মাইলেরও বেশি রাস্তার দু পাশে কারখানার দেওয়াল। পুলিশ আমাদের অ্যাটাক করলে কোনও দিকেই আমরা পালাতে পারব না। পাঁচিল টপকে কারখানার মধ্যে ঢোকা মানে, বাঘের খাঁচায় পড়া, দারোয়ানরা পিটিয়ে মারবে, পুলিশে ধরিয়ে দেবে। (পৃ.৮২৫)।" ত্রিদিবেশের এমন অভিমতের মধ্যেও অহীন পার্টির বিরোধিতা আবিষ্কার করে। শিউলী এক্ষেত্রেও অহীনকে সমর্থন করে ত্রিদিবেশের যুক্তিকে 'কাপুরুষের যুক্তি'[১৯] আখ্যা দেয়, যেমন ঘটেছিল সমরেশ-গৌরীর জীবনে :

নিশীথ এবং আরও কয়েকজন একই ভাবে শিউলীকে সমর্থন করে। অহীন আবার বলে, 'পুলিশ নিশ্চয়ই চুপচাপ বসে থাকবে না, কিন্তু পুলিশ আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে, আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়ব। তা ছাড়া মনে রাখবেন, রাস্তায় শুধু আমরাই থাকব না, অন্য লোকেরাও থাকবে। পুলিশ তাদের সঙ্গে আমাদের আলাদা করতে পারবে না, মার খেয়ে সাধারণ লোকও পুলিশের ওপর ক্ষেপে যাবে। জনসাধারণকে এভাবেই আমাদের নিজেদের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।' (তৃতীয় খণ্ড ॥ ষোলো ॥ পৃ.৮২৬)

ত্রিদিবেশের আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়, নিত্যানন্দ চৌধুরী গ্রেপ্তার হন। পুলিশের লাঠির আঘাতে সে নিজেও আহত হয়। বৃদ্ধ কমরেড নওরঙ-পুত্র বিরিজ, সেপাইয়ের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করেও শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তার এড়াতে পারে না। অহীনের অ্যাকশন কমিটির পক্ষ থেকে 'ঘন ঘন বোমা ছিটকে এসে' ফাটতে থাকলে পথচারীরা ভয় পেয়ে লালঝাণ্ডাওয়ালাদেরই গালাগাল জুড়ে দেয়। এমনকী কমরেড নওরঙের ছেলে বিরিজ পুলিশকে আক্রমণ করায় তার বিরুদ্ধে কথা বলে পথচারীরা। বিস্মিত ত্রিদিবেশের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে সমরেশ বসু এভাবেই বাম-বিচ্যুতিজনিত পার্টির জনবিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ ও স্বরূপ চিহ্নিত করেছেন।

'যুদ্ধের সেনাপতির' মতো অহীন নওরঙের বস্তিতে পৌঁছে উল্লেখিত ঘটনা নিয়ে আলোচনায় বসতে চাইলে ত্রিদিবেশ অনাগ্রহ প্রকাশ করে। অহীনের মতো তথাকথিত সশস্ত্র বিপ্লববাদী যারা প্রকৃত অর্থেই সন্ত্রাসবাদকে আশ্রয় করেছিল তাদের প্রতি সর্বশেষ বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ত্রিদিবেশের :

" 'আমি আলোচনায় বসছি না, এখনই বাড়ি যাব।' ত্রিদিবেশ ঘটি থেকে বাঁ হাত টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, শক্ত স্বরে বলে, 'বলেছিলাম, কমরেড গোবিন্দকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া কথাটা এখানে এসে উইথড্র করব, কিন্তু করব না। আমি কিছু ভুল বলিনি। আবার বলছি, এটা টেরোরিস্টিক আন্দোলনের থেকেও অন্য রকম লাগছে–যার কোনও হাতা মাথা নেই। এখন আপনাকে নিয়ে আমাদের এ অঞ্চলে আর মাত্র চারজন পার্টি মেমবার জেলের বাইরে, আর বেঁচেও আছি। আপনি, জয়া, ইন্দিরদা আর আমি। পণ্ডিতদাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাকি সব জেলে, তিনজন মারা গেছে।' বলে ও উঠোনের দিকে এগিয়ে যায় :

" 'এ সব কথা বলার মানে?' অহীন ধারালো স্বরে জিজ্ঞেস করে।

"ত্রিদিবেশ বাইরের দিকে যেতে যেতে পিছন ফিরে বলল, 'একটা ছবি আপনার চোখের সামনে তুলে ধরলাম, আর কিছুই না।' ও বেড়ার আড়ালের বাইরে পা বাড়ায়।

" 'বোমা মেরে ঠাণ্ডা করে দেওয়া উচিত।' একটি স্বর শোনা যায়।

"ত্রিদিবেশ থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফেরে। স্বরটা চেনা, নিশীথের। কিন্তু নিশীথ তৎক্ষণাৎ ওর মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়।" (তৃতীয় খণ্ড ॥ ষোলো ॥ পৃ.৮২৯)

পার্টির সঙ্গে পদ্ধতিগত সংকট এবং শিউলীর সঙ্গে আদর্শিক বিচ্ছিন্নতায় বিপন্ন অস্তিত্ব ত্রিদিবেশ। পরের দিন অফিসে এসে নর্থ ব্যারাকপুর আই বি ইনস্পেক্টর সনাতন মুখুটির মুখোমুখি হয়। ইনস্পেক্টর 'দু খণ্ড মার্কসবাদী পত্রিকা' হাতে বর্তমান বিপ্লবী আন্দোলনের ভ্রান্ত নীতি বিষয়ে কথা বলতে চাইলে ত্রিদিবেশ তা

Dhaka University Institutional Repository

ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। তার কাছ থেকেই ত্রিদিবেশ ইন্দ্রনাথের আত্মহত্যার খবর পায়। "উপন্যাসের শেষ দিকে তার আত্মহত্যার চিত্রণ সত্য মাস্টারের মৃত্যু শোককে স্মরণ করায়।"[২০] ত্রিদিবেশ অনুভব করে : ইন্দ্রনাথ আত্মহননের মাধ্যমেই পার্টির প্রতি তার বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য রক্ষার পাশাপাশি, পার্টি-অনুশীলিত ভ্রান্ত বিপ্লববাদী পন্থা থেকে থেকে আত্মমুক্তির সন্ধান করেছেন।

গোপন আস্তানায় এক কোণে পাটের ফেঁসো আর দড়ি জড়ো করা বারুদের গন্ধপূর্ণ ঘরের অন্ধকারে ইন্দ্র ছদ্মনামধারী অহীনের সঙ্গে ত্রিদিবেশের (ছদ্মনাম কমলালেবু) শেষ দেখা। তার চোখে অহীনকে মনে হয় 'গর্তের মধ্যে গোখরো সাপ'। 'দায়িত্বশীল কমরেড' বিবেচনা করে 'ব্যাকুল', 'ব্যস্ত আর ত্রস্ত' ভঙ্গিতে পার্টি নির্দেশের কথা বলে, অহীন একটা চিঠি দিয়ে ত্রিদিবেশকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়। কেন্ডারডাইন লেনের পার্টি অফিসে তার থাকার ব্যবস্থা হয়– যেখানে প্রায়শ পুলিশের তল্লাশি অভিযান চলে। চাকুরে কমরেড প্রিয়তোষ কর্তৃক ত্রিদিবেশকে বেকার বন্ধু রমেশ পরিচয় দেবার মাধ্যমে তাকে আত্মগোপনকারী সাব্যস্ত করায় ত্রিদিবেশের কাছে অহীনের ষড়যন্ত্র স্পষ্ট হয়ে যায়।

পুলিশ অফিসার স্টেটমেন্ট নেয়ার কথা বলে ত্রিদিবেশকে নিয়ে থানায় আসে। মিথ্যে স্টেটমেন্ট দিতে গিয়ে নিজের কমিউনিস্ট পরিচয়কে জোরালো ভাবে অস্বীকার করে সে। কোর্টে নিয়ে যাবার কথা বললেও ত্রিদিবেশকে লালবাজার লকআপে আনা হয় এবং একরাত পরে সেখান থেকে তাকে নেয়া হয় স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসে। সাত দিন পালাক্রমে বিচিত্র জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যদিয়ে তার কাছে ত্রিদিবেশ শুনতে পায় :

> ...ওর গত ন' মাসের প্রতিটি দিনের প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি স্থান পাত্রের কথা যা মর্মান্তিক সত্যি, এমনকী শিউলীর সঙ্গে বিবাদের বিষয়ও বাদ যায় না। তথাপি এর দুটি জবাব, না এবং আমি জানি না–এবং শেষ দিন বিকালে একজন এস বি অফিসার, ধুতি পাঞ্জাবি আর চাদর গায়ে ওর চোয়ালে একটি ঘুষি মেরে যায়। তারপরে সন্ধ্যায় অন্ধকারে একটি ভ্যানে করে নিয়ে যায় প্রেসিডেন্সি জেলে ইওরোপিয়ান ওয়ার্ডে। (তৃতীয় খণ্ড ॥আঠারো ॥ পৃ.৮৩৭)

জেলে এসে কলকাতার পার্টি অফিসে পরিচয় হওয়া ডক ইউনিয়নের সংগঠক দ্বিজেন কর্তৃক অভ্যর্থিত হয়। তখন বন্দি কমরেডদের ওপর নির্যাতন-গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ছাপ্পান্ন দিনের অনশন ধর্মঘট চললেও এ সময় ত্রিদিবেশের কাজ ছিল দ্বিজেন ও পরেশের সঙ্গে মিলে 'বাইরের সঙ্গে পার্টির যোগাযোগ রক্ষা করা'। অনশনপরবর্তী কালে পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে জেলের পার্টি কমিটি তাকে দলবিরোধী কার্যকলাপ, পার্টিনীতির সমালোচনার অপরাধে অভিযুক্ত করে পার্টির বহিষ্কৃত সদস্য হিসেবে ঘোষণা করে। কমিটি ইওরোপিয়ান ওয়ার্ড থেকে সকল কমরেডকে সাত নম্বর সেক্টরে (জেলের পরিভাষায় বলা হয় সাত-খাতা) একত্রিত হয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডে থাকার নির্দেশ দিলেও ত্রিদিবেশকে সেটা দেয় না।

ত্রিদিবেশ বুঝতে পারে পার্টির জেল কমিটিতে অহীনের মতো অ্যাকশন কমিটির প্রধান ও নিশীথের মতো অল্পবয়সী ছাত্রনেতাদের আধিপত্যই বেশি। পুরো জেল কমিটি তাদের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এরই একজন জেল কমিটির সেক্রেটারি নবনী লাহিড়ী আঠারো ওয়ার্ডে এক রাত কাটানো ত্রিদিবেশকে, পার্টি বহিষ্কৃত বন্দির জন্য চিহ্নিত 'পনরো নম্বর ওয়ার্ডে' যাওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু ত্রিদিবেশ তাদের এ অন্যায় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায় : " 'না, পনরো নম্বরে থাকার চেয়ে আমি মুচলেকা দিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে যাব, কিন্তু পনরো নম্বরে কখনও থাকব না। আর এটাই আমার শেষ কথা।' (তৃতীয় খণ্ড ॥ আঠারো ॥ পৃ.৮৩৮-৮৩৯)

পূর্ববর্তী এক বছর ও কারাবাসকালে ত্রিদিবেশ উপলব্ধি করে জেলের অভ্যন্তরেও পার্টি বিভিন্ন মত ও নানা দল-উপদলে বিভক্ত এবং এদের অনেকেই আধিপত্যবাদী ও নেতৃত্বলোভী। অর্জিত এ কারা-অভিজ্ঞতা

Dhaka University Institutional Repository

ত্রিদিবেশকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে পুরোপুরি দূরে সরিয়ে আনে। সপ্তাহখানেক আগে আই বি ইনস্পেকটরের কাছ থেকে খবর পেয়ে দু সন্তানসহ শিউলী দেখা করতে আসে কারাগারে। জানায় : 'আমি মাত্র সাতদিন আগে খবর পেয়েছি' শিউলী কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'ওরা জানত, কিন্তু আমাকে বলেনি (তৃতীয় খণ্ড॥ উনিশ ॥পৃ.৮৩৯)'। শিউলী কথা প্রসঙ্গে জানায় : ত্রিদিবেশের জেলবাসকালে নেতৃস্থানীয় কোনো পার্টি কমরেড দুঃসহ দারিদ্র্যের মাঝে তার সংসারের কোনো খোঁজ নেয়নি। কিন্তু নরসিং মিস্তিরি সাপ্তাহিক রেশন তুলে দেয়াসহ গোরুর দুধ খানিকটা প্রতিদিন তার সন্তানদের জন্য দিয়ে যেতে ভুল করেনি। সমরেশের অনুরূপ নির্মম অভিজ্ঞতা :"এই সময়ে প্রতিবেশী এক চটকলের মিস্তিরি, তাঁকে নারায়ণদা বলে ডাকতাম, তিনি এবং তাঁর স্ত্রী আমার স্ত্রীকে কন্যার মতো স্নেহ করতেন। ...তাঁরা ছিলেন কিছু সম্পন্ন, ঘরে ছিল গরু। নারায়ণদা বললেন, 'রোজ তোমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য এক সের করে দুধ দেবো, আর কিছু মুড়ি। পুরুষ মানুষ চিরকাল তো আর বসে থাকবে না, যখন রোজগার করবে, তখন দুধের দামটা শোধ করে দিও। মুড়ির পয়সা দিতে হবে না। ...তিনি কখনো কমিউনিস্ট ছিলেন না। পার্টির কর্তব্য হিসাবে ওসব করেননি, একান্ত মানবিক কারণে করেছিলেন।"[২১]

ঔপন্যাসিক সমরেশ বসুর শিল্প-প্রকরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের পরিসমাপ্তি সংকেতময় দ্যোতনায় স্পন্দিত হয়; মননের প্রতীকাভাসে, পরাবাস্তবতা কিংবা জাদুবাস্তবতার অনেকান্ত জানালা দিয়ে কালান্তরকে অবলোকন করা যায় :[২২]

"ত্রিদিবেশ শিউলীর চোখের দিকে তাকায়। ওর চোখে একটা কষ্টের গ্লানি। ত্রিদিবেশ বলে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে ফুলি।' শিউলী আবার হাসে, ওর চোখে যেন কী একটা সংকেত।

ত্রিদিবেশের স্তব্ধ কল্পনা, মৃত চেতনা জেগে ওঠে। পরের দিনই এক বৃহৎ কাগজখণ্ড জলে চুবিয়ে নেয়। টেবিলে জল ঢেলে কাগজ লেপটে দেয়, তারপরে রঙের শিশিতে তুলি ডোবায়। প্রধানত লাল কালো আর মেটে রঙের থ্যাবড়া টানে একটি মানুষের মূর্তি ফুটে ওঠে। একটি নগ্ন পুরুষ, শরীরের প্রতিটি পেশিতে একটা আকুতি, কিন্তু মুখ গভীর চিন্তামগ্ন।

"কেউ কেউ চুপচাপ দেখে, কেউ মন্তব্য করে, 'মানুষ বলে চেনা যায় না।' নবনী লাহিড়ীরা বিদ্রূপে হেসে ওঠে, 'এটা আবার কী? ল্যাংটা মানুষ! ভালগার।'

"ত্রিদিবেশ নীচে লেখে, 'অমর মানুষ'

'এটা অমর মানুষ?' নবনীরা হা হা করে হেসে ওঠে।

ত্রিদিবেশ বলে, 'আর চিরদিনের বিদ্রোহী।'

'এই ল্যাংটাটা?' ওরা কয়েকজন চিৎকার করে হেসে ওঠে।

ত্রিদিবেশ বলে, 'আর বিপ্লবী।'

'ছিঁড়ে ফেলা উচিত।' ওরা চিৎকার করে বলে।

ত্রিদিবেশ নীচে লেখে, 'বিদ্রোহ আর বিপ্লব অন্তহীন।'

'ছিঁড়ে ফেলা উচিত।' ওরা চিৎকার করে ওঠে 'প্রতিক্রিয়াশীল। বিপ্লব একটাই।'

ত্রিদিবেশ ওদের মুখোমুখি দাঁড়ায়, বলে, 'আমরা সবাই কখনও একমত হতে পারি না।'

'পারতেই হবে।' ওরা চিৎকার করে ওঠে।

নীরেন ছবিটা টেবিলের ওপর থেকে টেনে মেঝেয় ছুড়ে ফেলে দেয়। নবনী পা দিয়ে মাড়ায়।

ছবিটা বেঁকে যায়, মানুষটা দু টুকরো দেখায়। ...

আদিগঙ্গার আকাশ থেকে এক টুকরো রোদের রেখা কাগজে এসে পড়ে জানালা দিয়ে। ওর চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে ওঠে, কিন্তু তুলিতে রং নিয়ে ভেজা কাগজের বুকে রেখা টানে, আবার একটা মানুষের অবয়ব জেগে উঠতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

hM hM Rx‡qর ত্রিদিবেশ-কেন্দ্রিক মূল প্রবাহে যুক্ত হয়েছে অন্তত তিনটি উপকাহিনি–এক. চন্দ্রনাথ-মালতী; দুই. সাহু-ফুলবাসিয়া-বৈজু; এবং তিন, অজয়-কানন আখ্যান। সমরেশ-গবেষক নিতাই বসুর এতদসংক্রান্ত অভিমত উদ্ধৃত হল :[২৩]

এই তিনটি উপকরণ তিনটি স্বতন্ত্র উপন্যাসে স্থান পেতে পারত। মালতী বিকৃতমস্তিষ্ক স্বামী মৃগেন্দ্রনাথকে হত্যা করে চন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত সেটা অস্পষ্ট থেকেই যায়। ক্রান্তিকার বৈজু ফুলবাসিয়াকে সাহুর কবল থেকে মুক্ত করে এবং কানন অজয়ের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চাইলেও অজয় কাননকে গ্রহণ করতে পারেনি– অন্যের স্ত্রী ও সন্তানের জননী কাননের সঙ্গে সে নিছক একটি সম্পর্কের জোড়াতালি রেখেছে। যৌনতা সম্পর্কে সমরেশ যে বরাবরই সংস্কারমুক্ত এবং দাম্পত্যজীবনের নিরঙ্কুশ বিশ্বস্ততার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র মোহ নেই– এই তিনটি উপকাহিনীর যাথার্থ্য শুধু সেটুকুই নিরূপণ করা। নতুবা, 'যুগ যুগ জীয়ে'র নিটুট অঙ্গে এই উপকাহিনীগুলো সত্যিই প্রক্ষিপ্ত।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন মত পোষণ করেন : "'যুগ যুগ জীয়ে' লেখকের অন্যতম প্রধান উপন্যাস। কেউ কেউ উপন্যাসটিকে শিথিলবদ্ধ মনে করেছেন। আমি তা মনে করি না। এর অত্বর গম্ভীর চাল ধ্রুপদী ঢঙে বাঁধা। নায়ক ত্রিদিবেশকে কেন্দ্রে রেখে বিশেষ কয়েকটি চরিত্র ও ঘটনাকে ধরে একটা বিশিষ্ট কালখণ্ড এই উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে।"[২৪]

সতর্কভাবে পাঠ করলে উপকাহিনি তিনটি যে hM hM Rx‡qর কাঠামোয় জৈবিক ঐক্যে সমন্বিত তা স্পষ্ট হয়; খুঁজে পাওয়া যায় কার্যকারণসূত্র। দুঃসময় ও উত্তেজক কালখণ্ড-তাড়িত রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা, অস্থিরতা, প্রতিক্রিয়া ও বিষাদ– চন্দ্রনাথ-বৈজু-অজয়ের প্রণয়পরিণামকে বিচলিত করেছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে করেছে নিষ্ক্রিয়। সমকালীন রাজনীতিক ঘূর্ণাবর্তে ওরা বিশৃঙ্খল, ভগ্নদশা ও উৎপাটিত-প্রায়। সমাজলাঞ্ছিত-বঞ্চিত মালতীর অচরিতার্থ জীবন; ফুলবাসিয়ার অবদমিত ক্লিষ্ট দিনযাপন এবং কাননের দুর্বলচিত্ত-সামাজিক দ্বৈরথের মনস্তত্ত্ব-উন্মোচনে ও বিশ্লেষণে সমরেশ বসু কেন্দ্রীয় কাহিনির সঙ্গে সমগ্র করেছেন।

hM hM Rx‡qর রাজনৈতিক ও সামাজিক বিসর্পিল অন্তর্প্রবাহের বিচিত্র বলয়িত স্রোত সৃষ্টি করেছে চন্দ্রনাথ, সবিতা পণ্ডিত, দয়াল মিশির, বিপিন চৌধুরী ও অজয় প্রমুখ। তিরিশ-বত্রিশ বছর বয়সী চন্দ্রনাথদের এককালের জমিদারি বৈঠকখানা এখন বকুলতলা ক্লাব। ব্রজেন, রতন, মোহন, শীতল, নরেশ, রঞ্জন, সণ্টু, সুকুমার, অরুণ, শঙ্কর, বিলু, ছোটনের মতো পাড়ার উঠতি বয়সী সব ছেলে ক্লাবে আসে। সেখানে তাস, দাবা, ক্যারাম, লুডো, আড্ডা, রাজনৈতিক তর্কবিতর্ক সব কিছুই চলে।

আগস্ট আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় দেশের রাজনীতিতে সংঘাতময় তিক্ত বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল অকমিউনিস্টরা কমিউনিস্টদের 'ইংরেজের দালাল' এবং কমিউনিস্টরা সোশ্যালিস্ট ও সুভাষ বসুর অনুসারীদের 'পঞ্চম বাহিনী' বলে চিহ্নিত করতে থাকে। তারই প্রমাণ মেলে বকুলতলা ক্লাবে উপস্থিত তরুণদের তর্ক বিতর্কে। মোহন, সণ্টু কমিউনিস্ট। শীতল কংগ্রেসি রাজনীতিতে বিশ্বাসী। ভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী তরুণদের মাঝে রাজনীতি নিয়ে তর্ক হয়। শীতলের সাইকেল নিয়ে মোহন স্টেশন থেকে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা আনতে যাবে শুনে ঠোঁট বেঁকে যায় শীতলের। সে মোহনকে বলে,

"'তুই তো আবার এখন কমিউনিস্ট হয়ে গেছিস, ইংরেজের দালাল।'
সণ্টু রেগে জিজ্ঞেস করে, 'কমিউনিস্টরা কি ইংরেজের দালাল?'
শীতল স্ট্রাইকার বসাতে বসাতে বলে, 'সবাই তো তাই বলে। দেশের লোক যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে, কমিউনিস্টরা তখন ইংরেজদের সাহায্য করছে।'

Dhaka University Institutional Repository

মোহন শীতলকে একটা খিস্তি ছুড়ে দেয়, তারপর বলে, 'চাষামো করিস না। যা বুঝিস না, তা বলিস না। ফ্যাসিজম কাকে বলে, তা জানিস?'
শীতলরা সদগোপ। ও গম্ভীর হয়ে যায়, বলে, 'চাষামো বললি কেন? তোদের পার্টি তো চাষা মজুরের পার্টি।'
মোহনও নাকের পাটা ফোলায়, বলে, 'উজবুকের মতো কথা বললে, ওইরকম শুনবি। চাষা মজুরের পার্টি হতে পারে, তোর মতো কংগ্রেসি চাষার পার্টি ওটা না।' (প্রথম খণ্ড ॥ দুই ॥ পৃ.২৯৩-২৯৪)

শেষ পর্যন্ত রঞ্জনের মধ্যস্থতায় দুজন থামে। শীতলের সাইকেল নিয়েই 'জনযুদ্ধ' আনতে চলে যায় মোহন। রাজনৈতিক তর্ক বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে তারা আবার খেলায় মন দেয়।

১৯৪২-এর ১ এপ্রিল প্রকাশিত হয় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির মুখবন্ধ 'জনযুদ্ধ'। ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট থেকে সারা বাংলায় 'ভারত ছাড়ো' তথা আগস্ট আন্দোলনের প্রবল ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। জাপানি বোমার ভয়ে অনেক মজুর শহর ছেড়ে চলে গেছে। রিকশা টানা লোকের অভাব। সারা বাংলায় বিস্তৃত গণ-আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় গ্রেফতারকৃত হাজার হাজার প্রতিবাদী কংগ্রেসপন্থী তখন কারারুদ্ধ। দয়াল মিশির এমনই এক প্রতিবাদী চরিত্র। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের কর্মী দয়াল মিশির একুশ বছর বয়সেই সবিতাব্রতর চোখে 'ইস্পাতের ফলা' হয়ে উঠেছিল। সে থানার দারোগা শাকুর সাহেব, মুসলিম সোলেমান ও হিন্দু জগ্‌দীশের মতো মস্তান খলিফাদের হাত থেকে গৃহত্যাগিনী পাবতিয়াকে রক্ষা করেছে। মাতৃহীন এ তরুণকে বাবা যাদব মিশির লেখাপড়া কিংবা নিজের ব্যবসায় কাজ করাতে পারেননি অথচ সে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সাহসিকতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সী দয়াল মিশির কলকাতার নিকটবর্তী মিল-কারখানা এলাকায় বিপ্লব শুরু করবার জন্য পার্টি নির্দেশে এ এলাকায় আসে। তার নামে হুলিয়া ছিল। চন্দ্রনাথ তার কাছ থেকেই বিহার, ইউ পি (উত্তর প্রদেশ)-তে বিপ্লব শুরুর কথা জানতে পারে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে মিশির শুধু অসহযোগ নয়, ইংরেজদের ভারত ছাড়া করতে চায় : "ওরা আমাদের গুলি করে মারছে, গ্রেপ্তার করছে। আমরা হরতালের ডাক দিচ্ছি, কাজ কারবার বন্ধ করে দিচ্ছি, রেল লাইন উপড়ে ফেলে, ট্রান্সপোর্ট আটকে দিচ্ছি। সরকার আমাদের পার্টিকে গয়েরকানুনি ডিকলিয়ার করেছে। পার্টি এখন আন্ডার গ্রাউন্ড থেকে লড়াই করছে। আমরা এখানে আন্ডার গ্রাউন্ড পার্টি অর্গানাইজ করব (প্রথম খণ্ড ॥ তিন ॥পৃ.২৯৭)।" গভীর সততা আর বিশ্বাসের সঙ্গে দয়াল বলে :

"...কলকাতা থামবে? কখনও না। চৌদা আগস্ট গুলি চলেছিল, খবরের কাগজ বের করতে দেয়নি। এ মাসের আট তারিখে আবার কাগজ বেরিয়েছে, আন্দোলন বন্ধ হয়নি। মেদিনীপুর লড়ে যাচ্ছে। ... ঝড় বরাবর থামবে না, বৃষ্টি থামবে চন্দরদা। বিপ্লব থামবে না–বর্তনিয়াকে (ব্রিটিশ) ভারত ছাড়তে হবে।" (প্রথম খণ্ড ॥ তিন ॥ পৃ.৩০০)

দয়াল মিশিরের কথা শুনে সবিতাব্রতর মনে পড়ে ১২ই আগস্ট হ্যারি পলিটকে লেখা পি সি যোশীর চিঠির কথা, 'আওয়ার ফেলো পেট্রিয়টস হ্যাভ বিন প্রোভোকড টু দেয়ার প্রেজেন্ট সুইসাইডাল কোর্স বাই দ্য ইম্‌পিরিয়ালিস্ট রুলারস (প্রথম খণ্ড ॥ তিন ॥ পৃ.২৯৭)।" সেই সঙ্গে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে চার্চিলকে লেখা রজনী পাম দত্তের চিঠির কথাও তার মনে পড়ে।

কমিনটার্নের নীতির বদলে জনযুদ্ধের রাজনীতি আসায় সবিতাব্রত ধাক্কা খেয়েছিল। সে সময় পি সি যোশীসহ বাইরের আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টি জনযুদ্ধের ডাক গ্রহণ করেনি। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রভাবে পার্টিনীতির কারণে সবিতাব্রত ভারত ছাড়ো আন্দোলন থেকে দূরে থাকলেও চৌদ্দই আগস্টে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ তার স্মৃতিতে উজ্জ্বল। নিজের চেতনায়ও একটা উত্তাপ অনুভব করেছিল সে। মোটরবাহী পুলিশের নির্মম, নির্লজ্জ আচরণ– ভারতীয়দের প্রতি ফায়ারিং সবকিছু তাকে গভীরভাবে বেদনাহত করে। সে বেদনাবোধ থেকেই মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বকুলতলা ক্লাব থেকে গ্রেফতার করে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে যাওয়ার প্রাক্ মুহূর্তে পালাতে উদ্যত দয়ালকে ধরে একজন কনস্টেবল যখন তার গালে থাপ্পড় কষায় সবিতাব্রত তার প্রতিবাদ জানায়। এস আই মদন সবিতা প্রসঙ্গে কৌতূহলী হলে থানার ওসি গৌরমোহন ব্যানার্জি তাকে জনযুদ্ধওয়ালা সবিতাব্রতকে নিয়ে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই বলে আশ্বস্ত করে। 'জনযুদ্ধওয়ালা' পরিচয়ে তার প্রতি পুলিশের করুণা প্রকাশে সবিতাব্রত নিজের কাছেই ছোট হয়ে যায়। তীব্র ক্রোধে সে পার্টি পত্রিকা 'জনযুদ্ধ' কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে। এ ঘটনা জেনে নিশিকান্ত সবিতাব্রতর প্রতি অভিযোগ আনেন 'তার ভেতরটা আসলে বুর্জোয়া ভাববাদে ঠাসা'।

শুধু দয়াল মিশির নয়, চব্বিশ পরগনা থেকে মেদিনীপুরে গিয়ে নিতাইয়ের মতো তরুণরাও বিপ্লবে অংশ নিচ্ছে। পাঁশকুড়া থেকে এসে নিতাই ত্রিদিবেশকে জানিয়েছিল মেদিনীপুরেই আবার বিদ্যুৎবাহিনী গোপনে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সকলেই দেশের জন্য কিছু না কিছু করতে চাইলেও ত্রিদিবেশ চায় শুধু একটা জীবিকা। কিন্তু কোনো আশা সে দেখতে পায় না। দেশীয় রাজনীতিবিদদের কোনো কর্মকাণ্ড সে বুঝতে পারে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের মাঝে যে অন্তর্কলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হচ্ছে বিপিন চৌধুরী তার ধারক ও বাহক। সবিতাব্রতর সমবয়সী–পার্টির আঞ্চলিক সেক্রেটারি সে। তার বাবা ডাক্তার–শহরের বিত্তশালীদের একজন। বিপিন উগ্রপন্থী নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। পেশিশক্তিতে বলীয়ান দুঃসাহসী বিপিনের বক্তৃতায় অবাঙালি শ্রমিকদের রক্তে জোয়ার আসে। 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা ছেঁড়ার সাক্ষী চন্দ্রনাথ–তাতে কিছু যায় আসে না–তবুও বিষয়টা পার্টিকে জানানো দরকার। –মোহনের মাঝে এ বোধ সেই জাগায়। আঠারো বছর বয়সী মোহনের বুকে 'জনযুদ্ধের আদর্শ আর বিশ্বাস টগবগ করে'। সবিতা মোহনের রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু হলেও পত্রিকা ছিঁড়ে ফেলা মোহনের কাছে পার্টিবিরোধী কাজ বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু সন্টু মোহনকে বিপিনের কথা অনুযায়ী সরাসরি ডিস্ট্রিক্ট কমিটিকে না জানিয়ে, প্রথমে সবিতাব্রতর সঙ্গে কথা বলতে বলে। বিপিন মোহনকে শিখিয়ে দেয় সবিতাব্রতর মতো কমরেডের ব্যাপার বলেই লোকাল কমরেডদের না জানিয়ে জেলা কমিটিকে জানানো হচ্ছে। অথচ চিঠিটা সে নিজে পাঠিয়ে দেবে বলে জানায়। সাময়িক উত্তেজনা কাজ করলেও সবিতাব্রতর ওপর মোহনের কোনো রাগ নেই। সবিতা ও বিপিনের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে অসুবিধা হয় না তার।

উপন্যাসের একটা ব্যাপক অংশ জুড়ে রয়েছে কমিউনিস্ট-অকমিউনিস্টদের তর্ক-বিতর্ক। একই পরিবারের সদস্যদের মাঝেও ছিল মতপার্থক্য। মোহন কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী। মোহনের বাবা মহীতোষ–দেশপ্রেমিক গান্ধীবাদী যোদ্ধা। পুলিশের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দীর্ঘ কারাবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি বর্তমানে গৃহে অন্তরীণ এবং নজরবন্দি। থানার আই বি ইনফর্মার গোলক দাস তাকে চোখে চোখে রাখে। থানার ও সি দেওয়াল থেকে গান্ধীর ছবি সরাতে বললেও তিনি তা মেনে নেননি। মোহনের দাদা রাধারমণ তিরিশের দশকে ভালো চাকরি পেয়ে বর্তমানে বিলাতি কোম্পানির বিভাগীয় প্রধান। তাস খেলা, নাটকের মহড়া দেয়া, পরিমিত মদ্যপান, গৃহজীবন নিয়েই আবর্তিত তার দিনকাল। রাজনীতি থেকে কার্যত বিমুখ। কংগ্রেসের প্রতি তার আস্থা না থাকলেও একটা ক্ষীণ বিশ্বাস ও আশা কাজ করে। কথাবার্তার মাধ্যমে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক উদাসীনতা প্রকাশ করেন। হাইস্কুলের ইংরেজির শিক্ষক রাধারমণ কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির সমর্থক। মাধবের অনামা তরুণ বন্ধু মেদিনীপুরের গুপ্ত আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। সেও এ আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলে। একটি ছোট ইউনিট নিয়ে এ অঞ্চলে তার বৈপ্লবিক আন্দোলন চালায়, একমাত্র দেওয়ালের পোস্টারেই যার প্রমাণ পাওয়া যায়। কমিউনিস্টরা কংগ্রেস ও কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি সম্পর্কে বলত 'বুর্জোয়া সংগঠন, দেশদ্রোহী,

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম বাহিনী'। অন্যদিকে কংগ্রেস ও কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির সদস্যরা বিরোধী কমিউনিস্টদের সম্পর্কে রমণের মতোই বলত :

"কমিউনিস্টরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দোস্ত, গতকালও যারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব করেছিল।"
মোহনের প্রতিবাদ "না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের বন্ধু না। আমাদের বন্ধু সোভিয়েট রাশিয়া, সমাজতন্ত্রের দুর্গ আজ আক্রান্ত–।" (প্রথম খণ্ড ॥ পাঁচ ॥ পৃ.৩১৫-১৬)

রমণ জানায় ভারতভূমি স্বাধীন হিসেবে ইংরেজদের সহযোগিতা করে এ যুদ্ধের মর্যাদাপূর্ণ অংশী হতে চেয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ তা হতে দেয়নি। অন্যদিকে আত্মপক্ষ সমর্থন করে মোহন বলে ফ্যাসিস্ট অব্যবহিত শত্রু, তাদের মোকাবেলার পরই তারা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের সঙ্গে মুখোমুখি বোঝাপড়ায় নামবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সুভাষ বসুর ছদ্মবেশে ভারতত্যাগ কিছু মানুষকে স্বপ্নময় করেছিল। কারও কারও কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ভারতের আরাধ্য স্বাধীনতা আনয়নের নায়ক। আসামে এরই মাঝে জাপানি বোমা পড়েছে। কাজেই বকুলতলা ক্লাবে দয়াল মিশিরদের আগমন সম্পর্কে প্রায় সত্তরস্পর্শী জ্যাঠামশাই দীপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথকে সাবধান করেছেন। নিরাপত্তার জন্যে তিনি কিছুদিনের জন্যে পরিবারের সদস্যদের বকুলতলা এলাকা থেকে দূরে রাখতে চান। দীপেন্দ্রনাথ লিগ মন্ত্রিসভার সংকট, যুদ্ধকালীন দারিদ্র্য, বেকারির সমস্যা অনুধাবন করেন। সুভাষ বসুর সই-করা লিফলেট নাকি জাপানিরা আসামে-চাটগাঁয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে–এসব প্রচারণায় দীপেন্দ্রনাথ ভীত শঙ্কিত। অ্যাক্সিসদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সুভাষ বসু স্বাধীনতা আনতে পারবেন কি না–এ বিষয়ে চন্দ্রনাথ যথেষ্ট সন্দিহান। দীপেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন না অ্যাক্সিস ফ্রন্ট প্রকৃতই কতটা শক্তিশালী। কেন না কলকাতার খবরের কাগজ পড়ে সেটা বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু সবিতাব্রত পণ্ডিত জনযুদ্ধ-নীতির সঙ্গে সহমত পোষণ করে সুভাষ বসুকে বিশ্বাসঘাতক, পঞ্চমবাহিনীর নায়ক বলেই মনে করে। চন্দ্রনাথের বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ নেই। গান্ধীকে শ্রদ্ধা করলেও তিনি গান্ধীবাদী নন। বকুলতলা ক্লাবে সকল মতানুসারী তারুণ্যের আসা-যাওয়া। সকলের জন্যই তার স্নেহ। তবে সবিতাব্রতের প্রতি তার আকর্ষণ আর দশটা সাধারণ ছেলের চেয়ে ভিন্ন। সুভাষ বসু কিংবা কমিউনিস্ট যে কারও দ্বারা স্বাধীনতা এলেই তিনি খুশি। রাজনীতির চেয়ে মানুষের জীবনই তার কাছে সত্য বলে মনে হয়। নিচের অংশটি লক্ষণীয় :

মানুষের জীবনকে কি রাজনীতি পরিচালিত করতে পারে? জীবনের তো একটাই লক্ষ্য হতে পারে না, ভিতরে বাইরে তা বহুদূর বিস্তৃত, ব্যাপক। রাজনীতি ওঁকে কোনও কোনও সময় বিচলিত করে, মনে কোনও গভীর প্রতিক্রিয়া ঘটায় না। কিন্তু আজ জ্যাঠামশাই সুভাষবাবুর কথা বলেন, ভুলে যান, দেয়ালেরও কান আছে। আসলে, ইংরেজ আমেরিকানদের ওপর আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছে।" (প্রথম খণ্ড ॥ ছয় ॥ পৃ.৩৩১-৩৩২)

বিশ্বযুদ্ধ, সুভাষ বসু, হিটলার, স্ট্যালিন, গান্ধী প্রমুখ এবং যুদ্ধের বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিসহ যুদ্ধ নিয়ে তর্ক হয় মজুমদার বাড়ির 'এজমালি বৈঠকখানা'য়। অথচ এটা ছিল নাট্যালয়। এখন সুভাষ বসুকে নিয়ে রীতিমতো বাক্‌যুদ্ধ শুরু হয় সেখানে। কারও কাছে হিটলার, কারও কাছে আবার স্ট্যালিন অধিকতর গ্রহণযোগ্য। তবে দলে ভারী ছিল সুভাষ বসুর সমর্থক। যাদের অধিকাংশই ছিল সাধারণ মানুষ যারা রাজনীতি বোঝে না, বোঝে শুধু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। নিচের অংশটি লক্ষণীয় :

"দলে ভারী হিটলার মুসোলিনি তোজো সুভাষ বসু। স্ট্যালিন চার্চিল সংখ্যালঘিষ্ঠ। আর্য হিটলার পৃথিবীর ত্রাতা। জাপান ভারতবর্ষ দখল করবেই। সুভাষবাবু তাদের সঙ্গে আসছেন। সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সনদ। ...

"...ইংরেজ বিদ্বেষ প্রবল। সুভাষ বসু একটি উত্তেজনাকর স্বপ্নিল আশা ও আকাঙ্ক্ষা, আর্য হিটলারের প্রতি বীরত্বের মহিমাবোধ ও জার্মান যুদ্ধাস্ত্র ও কৌশলের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও বিস্ময়। অন্য দিকে হিটলার পিশাচ, ঘরের পুঁজির বাজি পোড়ানো শেষ হলেই মিত্রশক্তির হাতে খতম, এবং স্ট্যালিন একলাই একশো।"(প্রথম খণ্ড॥ এগারো ॥ পৃ.৩৮১)

Dhaka University Institutional Repository

পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিউনিস্ট আদর্শ ও মতবাদ প্রচার ও কৃষক সমিতি গঠনের প্রয়োজনে স্থানীয় পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী হিসেবে সবিতাব্রত, বিপিন, অজয়, মোহন– বরুতি ও মালতী বিলের ওপারে মৎস্যজীবী এবং বিস্তৃত অঞ্চলের কৃষকদের সংগঠিত করতে এসেছে। এক্ষেত্রে বারো বছর বয়স থেকে মেশিন ঘরের মিস্তিরি হিসেবে কাজ করা তারাপদ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেছে। গ্রামীণ কৃষি-সংস্কার থেকে বেরিয়ে শিল্প শহরের মিস্তিরির বৈশিষ্ট্য সে ধারণ করতে পারেনি বলেই দু-এক বিঘা জমি কিনে ভূমিনির্ভর জীবনের স্বপ্ন দেখে। এক সম্পন্ন কৃষকের বাড়িতে তিরিশ জন কৃষকের উপস্থিতিতে সভা হয়। স্নানাহার ওই কৃষকের বাড়িতে হলেও সংকোচ, ব্যবধান, আড়ষ্টতা এবং কুণ্ঠিত অথচ ব্যগ্র অতিথিপরায়ণতা লক্ষণীয় হলেও কৃষকদের মাঝে ছিল সংশয়, কৌতূহল আর বিস্ময়, কিছুটা অবিশ্বাস।

গ্রাম থেকে ফেরার পথে সবিতাব্রতর দলের হাতে কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা দেখে চতুর্দশবাহিনীর ইংরেজ ফ্রেডরিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তার সঙ্গে সবিতাব্রতর কথোপকথনে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম দিকের ইতিহাস উঠে এসেছে। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সময় সবিতাব্রতর বয়স ছিল চার বছর বয়স। পরে তার দাদার কাছ থেকে বেঞ্জামিন ফ্রান্সিস ব্র্যাডলি ও ফিলিপ স্প্র্যাট-এর নাম শুনেছিল যারা মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় জেল খেটেছেন। 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না' নামে বই লেখার জন্য ফিলিপ স্প্র্যাট মামলার মুখোমুখি হয়েছিলেন কিন্তু কোনো সাজা হয়নি। ফ্রেডরিক সবিতাব্রতর কাছে এ যুদ্ধ সম্পর্কে গ্রামীণ কৃষকদের ভাবনা জানতে চাইলে সে জানায় তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে লোকমুখে শুনে অস্পষ্ট তাৎপর্যহীন একটা ধারণা পেয়েছে কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে এ যুদ্ধ কী এবং কেন।

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, গান্ধী, সুভাষ বোস সম্পর্কে কৃষকদের ভাবনা সম্পর্কে বিপিন জানায় 'সমর্থন' বা 'মোহ' থাকলেও এখন আর নেই। কিন্তু সবিতার কথায় কৃষকদের প্রকৃত ভাবনার প্রকাশ লক্ষণীয়। বিপিন এবং সবিতার কথোপকথনে এটা প্রমাণিত হয় মতের ভিন্নতা থাকলেও একটা রাজনৈতিক শিষ্টাচার তাদের ছিল যা পরবর্তী উত্তরাধিকারদের মাঝে ছিল না : "বিপিন, বোধ হয় এতটা নিশ্চিত করে কথাটা বলা যায় না। তা হলে আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত। কংগ্রেস বা গান্ধী সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট মোহ আছে বলে আমার মনে হয়, কংগ্রেসের লঙ ট্র্যাডিশনের কথা ভুললে চলে না। সুভাষ বোস সম্পর্কেও একই কথা, বিশেষ করে সুভাষ বোসের নাটকীয় ভাবে জাপানে চলে যাওয়া অ্যাডভেঞ্চারিস্টদের কাছে তাকে হিরো করে দিয়েছে। কংগ্রেসকে আমরা বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল পার্টি মনে করি, এত কাল সে ব্রিটিশদের বন্ধুই ছিল, সব রকমের বিপ্লবীদের আর কমিউনিস্টদের ব্রিটিশরা মেরেছে, ফাঁসি দিয়েছে, এখন বেকায়দায় পড়ে কংগ্রেসকে জেলে পুরেছে। ন্যাশনাল ট্র্যাডিশন অনুযায়ী, এই জেলে পোরাটাও অনেকের কাছে তাদের মহৎ করে তুলেছে। তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হচ্ছে, হবে, যাতে তাদের প্রতি সমর্থন আর মোহ ভেঙে দেওয়া যায়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির স্বরূপও এই সঙ্গে আমাদের বোঝাতে হবে। আমরা বোঝাচ্ছিও তাই।" (পৃ.৪৪০) বিপিন তার কথায় পূর্ণ সমর্থন জানাতে পারে না। শক্তমুখে বলে :

"তার মানে পণ্ডিত, তুমি বলতে চাও, ভারতীয় জনগণ বা কৃষকদের বিপ্লবী ট্র্যাডিশনের প্রতি সমর্থন নেই? ক্ষুদিরাম থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীর বিপ্লবীরা তাদের মনে গাঁথা নেই?"

" 'থাকবে না কেন?' সবিতা পণ্ডিত বলে, 'অস্বীকার করছে কে। কিন্তু তুমি যেরকম বলছ, গান্ধী বা সুভাষ বোস সম্পর্কে জনসাধারণের কোনও মোহ নেই, তা ঠিক না।'

মোহন মাঝখান থেকে হঠাৎ বলে ওঠে, 'আপাতত আমরা পিতৃভূমির জন্য লড়ছি, ইংরেজদের জন্য না।" (দ্বিতীয় খণ্ড ॥ এক ॥ পৃ.৪৪০)

Dhaka University Institutional Repository

এন. এন. ভট্টাচার্যের (মানবেন্দ্রনাথ রায় ছদ্মনাম) র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট পার্টি শিল্পাঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিলে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করছিল।

প্রাক্-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বেকারি ও নৈরাশ্যের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত চিত্রায়ণে সমরেশ বসুর hM hM Rx‡q উপন্যাসের অজয়-চরিত্র উল্লেখযোগ্য। কলকাতার একদা প্রতিষ্ঠিত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের অধঃপতিত বংশধর অজয়। আট ভাইবোনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে কোনওরকমে ম্যাট্রিক পাশ করলেও সে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনে নিক্ষিপ্ত। চায়ের দোকানে এক ছুটির দিনের সকালে অজয় মোহনের কাছ থেকে নিয়ে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা পড়েছিল। সেটি ফেরত দিতে বকুলতলা ক্লাবে গিয়ে সবিতাপণ্ডিতের সঙ্গে পরিচয় ঘটে তার। এরপর কমিউনিস্ট রাজনীতিতে দীক্ষা নিয়ে কলকাতার বাইরে এই বিমর্ষ জীবন থেকে অজয়ের প্রথম মুক্তি ঘটে। রাধাকান্তর বোন কানন অজয়কে ভালোবাসলেও সামাজিক অবস্থান ত্যাগ করতে পারে না। তার অন্যত্র বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর পার্টির পক্ষ থেকে দুর্ভিক্ষকালীন সাহায্য বণ্টনসহ পার্টির 'সিমপ্যাথাইজার' হিসেবে সাংগঠনিক কাজেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে। ইতোমধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজনৈতিক পালাবদলও ঘটেছে। দেশবিভাগোত্তর কালে পাল্টে গেছে অজয়ের জীবনও। 'নিজের কারখানার ভেতরে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করতে পারবে না' এ শর্তসাপেক্ষে চটকলে লেবার অফিসের কেরানি হলেও রাজনৈতিক জীবনের প্রতি সমর্পিত প্রাণ অজয় এখনও সে জীবনের মাঝেই স্বচ্ছন্দ। কাননের বিয়ের কয়েক মাস পরেই মোহনদের বাড়ি ছেড়ে চলে আসে অজয়। এখন সে কমিউনেই থাকে। এভাবেই সে নিজের জীবনকে মানিয়ে নিয়েছে কিন্তু দীর্ঘকাল পরে কানন এসে তার সামনে দাঁড়ায় তার অতৃপ্ত জীবনের ব্যাকুলতা নিয়ে। অজয়কে কলকাতার জীবনে আহ্বান করে কানন। কিন্তু অজয় নিজের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের কথা উচ্চারণ করে তাকে জানায় :

" 'না কানন, আমি এখান থেকে যেতে চাই না। পার্টি আমি ছাড়তে পারব না, আর অন্য কোথাও গিয়ে আমি পার্টির কাজ করতে পারব না। আমি এখানেই ঠিক থাকি। আমি এখান থেকেই তোমার কাছে যাব।' " (তৃতীয় খণ্ড ॥ চৌদ্দ ॥ পৃ.৮১০)

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য hM hM Rx‡q উপন্যাসের একটি বহু কৌণিক চরিত্র। এ উপন্যাসে রামচন্দ্র-কাহিনির মধ্যদিয়ে বিশ্বযুদ্ধ এবং মানব-ষড়যন্ত্রসৃষ্ট মন্বন্তরের নিষ্ঠুরতা অঙ্কিত হয়েছে। বকুলতলা বাড়ির জ্যেষ্ঠ উত্তরাধিকারী দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার সঙ্গেই কারবার করেন। জাপানি বোমাতঙ্কে তিনি পরিবারের নারী-শিশুদের বসিরহাটের ধলতিতায় রামচন্দ্রের কুটিবাড়িতে পাঠিয়ে দেন। এ বাড়ির এক অংশে রামচন্দ্রের ছোট একটি অফিস। কুটিবাড়ির সীমার অভ্যন্তরে একটি মস্ত বড় গুদাম ঘর, যার ভাড়াটে এখন একটি বিলাতি কোম্পানি। এ গুদাম ঘরকে কেন্দ্র করে রামচন্দ্র ভট্টাচার্য (রামচরণ ভটচাজ) ও চন্দ্রনাথের কথোপকথনের মধ্যদিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ব্যাপক শস্যহানি, যুদ্ধের জন্য সংগৃহীত বিপুল রসদ, জোতদার-চোরাকারবারিদের নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রে মনুষ্যসৃষ্ট মন্বন্তরের ভয়াবহতা প্রকাশ করেছেন সমরেশ বসু। এই প্রাণ হারানো মানুষের বিপুল অংশ কৃষক এবং ক্ষেতমজুর। সরকারি ব্যবস্থাপনায় বরিশাল, ময়মনসিং আর খুলনা থেকে দু দিনের মধ্যে সংগৃহীত তিরিশ লক্ষ মণ চালের তিন লক্ষ মণই রয়েছে রামচন্দ্রের কুটিবাড়ির গুদাম ঘরে। খাদ্য কমিশনের পক্ষ থেকে নলিনীরঞ্জন সরকার সাড়ে তেরো লক্ষ টন চাল উদ্বৃত্ত থাকার কথা বলে মন্বন্তরপীড়িত মানুষদেরকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখার আশ্বাস দিলেও রামচন্দ্র জানে সেটা কখনোই হবে না–অনাহারী মানুষ এককণা পরিমাণ খাবারও পাবে না। কারণ সেই মজুদ খাদ্য সতর্ক প্রহরায়। গুদামঘরের "বন্ধ লৌহ দরজার সামনে, বেয়নেটের ঝিলিক–রাইফেল হাতে, খাকি পোশাক পরা প্রহরী।" (পৃ.৫৩৯)

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসে অন্নাভাবে বিষ ফল লতাপাতা খেয়ে মারা যাওয়া দুলাল আলি চুনুরির বউয়ের মড়ার গন্ধ চালের গন্ধের সঙ্গে ভেসে আসে। 'মড়াটার চোখে ডেঁয়ো পিঁপড়ে খুবলে খাচ্ছে', 'কুকুর ছিঁড়তে শুরু করেছে' শুনে দ্রুত সেটা নদীতে ফেলে আসার নির্দেশ দেয় রামচন্দ্র। কিন্তু চন্দ্রনাথ মড়ার গন্ধ পায় না, তার নাকে লাগে 'শ্বাসরোধী' চালের ঘ্রাণ। গুদামের গায়ে শেয়ালের তৈরি গর্তের ভেতর শেয়াল কর্তৃক আক্রান্ত হয়েও ক্ষুধার্ত ক্ষীণজীবী মানুষ চালের বস্তা টেনে বের করার নিষ্ফল চেষ্টা করে। গুদাম ঘর প্রহরী রসুল কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হয়ে চালের বস্তার পাশে উপুড় হয়ে পড়ে সেটিকেই আঁকড়ে ধরার প্রাণপণ চেষ্টা করে ক্ষীণজীবী মানুষটি। সে দৃশ্যকে রামচন্দ্র 'ক্লাইভ স্ট্রিটের নাটক' বলে অভিহিত করেন। বালিকা বিক্রি করতে আসে নারীর দালাল। দুর্ভিক্ষের গ্রাস কবলিত ঘটকবাড়ির অনূঢ়া দুই কন্যা, যে কোনো শর্তে বেঁচে থাকার জন্য, পরিবারের সম্মানকে বিসর্জন দিয়ে, এ আর পি ওয়ার্ডের ওয়ার্ডেন বিজয় চক্রবর্তীর অফিস ঘরে আসে। এ সবই মন্বন্তরের ভয়াবহ চিত্র–বিশ্ব ও জাতীয় রাজনীতিজাত ও উপজাত। নৌকো, লঞ্চসহ যুদ্ধজয়ের প্রয়োজনে সবকিছুই ইংরেজ সরকার 'সিজ' করে নিয়েছে। দারিদ্র্যের কারণে গ্রামে-গঞ্জে বেড়েছে ডাকাতি, রাহাজানি। যুদ্ধকালীন বাস্তবতায় কীভাবে মন্বন্তর সৃষ্টি করা হচ্ছিল সে চিত্র সমরেশ বসু অসামান্য শিল্পকুশলতায় প্রকাশ করেছেন নিচের অংশে :

অবশেষে বৃষ্টি নামে, নদীতে বান। ধাবমান সমুদ্র ক্রমে আরও নিকটবর্তী, গ্রাসে গ্রাসে নদীকে লোপাট করে। কালোর ওপরে কালো, তার ওপর নিকষ কালো মেঘ আকাশ ছেড়ে নেমে আসে পৃথিবীতে, অগ্রভাগে লেলিহান জিভে চিকুর হানে। অতি দ্রুতগামী বোমারু বিমানবহর ঝাঁকে ঝাঁকে নিমেষে হারায় মেঘের আড়ালে, লক্ষ্যস্থল পুব সাগরের দ্বীপপুঞ্জ। বঙ্গদেশ, পুবে ও দক্ষিণ পুবে, যুদ্ধের পশ্চাৎ ভিত্তি–প্রতিটি আক্রমণের রণসম্ভার মজুদ, পশ্চাৎ ঘাঁটি, প্রত্যাবর্তন এবং পুনরাক্রমণের আয়োজন ও রসদস্থল। বান আসে অতি দুরন্ত গতিতে, কালীয় ফণায়। ভাটায় যখন নামে, নোনা জলের রং কখনও গৈরিক না। পাহাড়ের ঢল এই নদীতে অনুপস্থিত। বাতাসে নোনা গন্ধ।

নদীতে নৌকা নেই। বাঁধের আড়ালে মাঠে জল থইথই। কৃষকরা অনুপস্থিত, এবং লাঙল বলদরাও। মাঝিরা বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে লক্ষ করে নির্ঘাত ইশারা, নদীর জলের রেখায়। মাছেরা উজানগামী, বাছারা গর্ভে কোটি বিন্দু ডিমের আধারে। এখনও ধ্বংস হয়নি। সরকারি আদেশ বলে, এমন অটুট শত শত নৌকার চাবিকাঠি থানার দারোগাবাবুর হাতে। এখন যুদ্ধের সময়, শত্রুভয়, অতএব সাবধান। নৌকায় শ্যাওলা জমে জলের তলায়। লাঙলে মাকড়সা জাল বোনে, ডিম পাড়ে. জালে ছাতা পড়ে, আর রামচন্দ্রের ভবিষ্যৎবাণীকে অমোঘ প্রমাণ করতে পশ্চাৎ বাহিনী মাছিরা উড়ে যায় আকাশে, শকুনেরা নেমে আসে। কুকুরেরা উধাও কুটিবাড়ির এলাকা থেকে। বিচরণের স্থান গ্রামে, মৃতদেহের সন্ধানে, এবং ক্রমে তাদের প্রেম দ্বন্দ্বযুদ্ধের কাল সমাগত। দিনের বেলা শেয়ালরা ঘোরাফেরা করে। মাঝে মাঝে বন্দুকের গুলির শব্দ হয়। রসুল তৈয়ব শেয়াল হত্যার মৃগয়া করে, আর খলখল হেসে উল্লাস প্রকাশ করে। ক্লাইভ স্ট্রিটের নাটক জমজমাট, যদিচ দিনে দিনে কুসুম প্রস্ফুটিত হয় সম্পন্ন গৃহে, স্বাস্থ্যের ঢল নামে সারা শরীরে, লাবণ্যে টলটল করে, কুমারী ঋতু দর্শন করে, নারীত্ব প্রাপ্ত হয় উপযুক্ত সময়ে। বড় বড় ট্রাক আসে যায়, গুদাম খালাস করে, গুদাম ভরে দিয়ে যায়। রামচন্দ্রকে ক্রমে আরও অস্থির উন্মত্ত দেখায়, কিন্তু তিনি হাসেন, যাতায়াত করেন এবং যে সব বস্তা তাঁর মোটরযানে বহন করেন, তার ভিতর থেকে কারেন্সি নোটের গন্ধ ছড়ায়। অনেক সময় চন্দ্রনাথকেও চিনতে পারেন না, ভ্রূকুটি অবাক জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকেন। কুটিবাড়ির পশ্চিম সীমানায় নতুন টিনের গুদাম ঘর তৈরি হয়, মিত্রবাহিনীর শ্বেতকায় যোদ্ধারা তা পরিদর্শন করে। গুদাম ঘর দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে, এবং খাদ্যসম্ভারে গুদাম ভরে ওঠে। সঙিনধারী নতুন প্রহরীরা সেখানে নিযুক্ত হয়। বাতাসে আঁশটে নোনা গন্ধের সঙ্গে মড়ার গন্ধ ছড়ায়। কিন্তু রামচন্দ্রর নাসারন্ধ্র আর স্ফীত হয় না, এখন আর মড়ার গন্ধ পান না। ক্লাইভ স্ট্রিট নাটকের নেপথ্যে তাঁর বিচরণ, তাঁর দৃষ্টি উইংসের পাশ দিয়ে, জাঁকজমকপূর্ণ মঞ্চের দিকে, যেখানে মৃতের পাহাড়, শেয়াল কুকুর শকুনের ভোজনের উৎসব, এ সকলই যেন অতিবাস্তব পুতুল নাচের ইতিকথা, কারণ সবই যুদ্ধজয়ের প্রয়োজনে। প্রকৃত কুশীলবগণ, যারা নাটক করে তারা কালি ব্রাদার্স, স্টিল ব্রাদার্স, ইউনাইটেড কিংডম কমারশিয়াল কোম্পানির বিশাল ইমারতের আরামদায়ক কক্ষের আড়ালে এবং ইস্পাহানির সেই মির্জা আলি আকবর, মিঃ দত্ত, মিঃ ভট্টাচার্য, মিঃ পোদ্দার আর আহমদ খান–নাটকের অন্যান্য সূত্রধাররা চিরকাল অচেনা থেকে যায়, যেমন রামচন্দ্র। নিমিত্ত যুদ্ধ–এই সকল ব্যক্তিরা মহাযুদ্ধের সত্য ও জয়ের ভাগীদার–কাজে রত। (দ্বিতীয় খণ্ড ॥ তেরো ॥ পৃ.৫৬০-৫৬১)

Dhaka University Institutional Repository

চন্দ্রনাথ পরিবারের অন্য সকলের সঙ্গে একই স্রোতে গা ভাসাতে পারেননি। চারদিকের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেন। বারো বছর বয়সী কিশোরী কুসুমকে দশ টাকা দরে কিনতে চায় গুদামের পাহারাদার রসুল। তাকে দেখে চন্দ্রনাথের কার হাতে যেন আঁকা ছবির কথা মনে পড়ে। কুসুমকে দেখে পত্রিকার পাতায় দেখা চট্টগ্রাম না কি নোয়াখালিতে দেড়-দু টাকায় ছেলে মেয়ে বিক্রির সংবাদের কথা মনে পড়ে যায়। নিজেদের পরিবারে আশ্রয় দিয়ে মেয়েটিকে রক্ষা করে চন্দ্রনাথ। শক্তিহীন, ক্ষুধার্ত, মৃতপ্রায় মেয়েটিকে একঘটি জল ও বস্তা থেকে দেওয়া একমুঠো চাল খাওয়ার সময় তার যে 'সুখানুভূতি' সেটা প্রকাশে লেখক সমরেশের শিল্পীচৈতন্য মানবিকবোধের চূড়াস্পর্শী হয়ে উঠেছে। রামচন্দ্র কুসুমকে কিনতে চায় না। কারণ চাল কেনাই তার কাছে একমাত্র সত্য। নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করে : "দ্যাটস এ পলিসি। স্টক, স্টক অ্যান্ড কিপ ইন দ্য ডার্ক। এদের বাঁচার থেকেও যুদ্ধ অনেক বড়।" পৃ.৫৫৩

রামচন্দ্র ভট্টাচার্যকে অপ্রকৃতিস্থ মনে হলেও তিনি বর্তমান সম্পর্কে সচেতন, যুদ্ধ, রাজনীতি, অর্থনীতি, খাদ্য আর ক্লাইভ স্ট্রিট তার নখদর্পণে। অথচ বারো বছরের মেয়েকে দশ টাকায় বিক্রির কথা শুনে উন্মাত্তের মতো হা হা শব্দে হাসেন। জরুরি অবস্থার সময় কৃষক-মাঝিদের জন্য সহানুভূতি প্রকাশের অপরাধে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতাকে সীমিত করে সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে জন হার্বার্টের মন্ত্রিসভার ফজলুল হককে অবিশ্বাস, মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন, তিরিশ লক্ষ মণ চালের কথা প্রকাশ্য সভায় ফজলুল হক কর্তৃক ফাঁস, শরৎ বসুর গ্রেফতার, ইংরেজদের সঙ্গে মতপার্থক্য হবে বুঝতে পেরে শ্যামাপ্রসাদের পদত্যাগ, সাধারণ মানুষকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে সাড়ে তেরো লক্ষ টন চাল উদ্বৃত্ত থাকার বিষয়ে নলিনীরঞ্জনের অতিকথন প্রতিটি ঘটনা রামচন্দ্র চন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারও নিজেদের মূল্যবোধ হারিয়ে এ নাটকের অংশীদার ভেবে চন্দ্রনাথ নিজে অসহায় বোধ করেন। দীপেন্দ্রনাথ ও রামচন্দ্র একে অপরের সহায়। বিশাল খাদ্যভাণ্ডার ও মজুতের বিষয়ে দীপেন্দ্রনাথ, নীরেন্দ্রনাথ, সকলেই রামচন্দ্রের সহযোগী। আত্মপক্ষ সমর্থন করার ভঙ্গিতে রামচন্দ্রের কথার প্রতিধ্বনি তাদের কণ্ঠে : "মানুষ মরছে, মরবে, কিন্তু কী করা যাবে? এখন এটা দু-একজনের ভাগ্যের ব্যাপার না। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের ব্যাপার। একে বলে মন্বন্তর, কিছু করার নেই, নিজেদের রক্ষা করতে হবে।" (দ্বিতীয় খণ্ড ॥ তেরো ॥ পৃ.৫৬১) 'ইংরাজবিদ্বেষ, স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষা, কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' এবং নানাবিধ 'বিপ্লবী আন্দোলন' তাদের পরিবারে 'আবেগ ও উত্তেজনা' সৃষ্টি করলেও আজ তারা অর্থ উপার্জনে, অর্থ লুণ্ঠনে উন্মত্ত।

আলোচনার প্রারম্ভের বক্তব্যই অবশেষে পুনরাবৃত্তি করা যায়। hM hM R‡qর তিনটি খণ্ডের ঘটনা পরম্পরায় ত্রিদিবেশের, অনেকাংশে সমরেশ বসুর, রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, জাতীয় কংগ্রেস এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট (অখণ্ড) পার্টির মতপার্থক্য ও মুখোমুখি সংঘাত, সুভাষ বসুর ভূমিকা, যুদ্ধের অনিবার্য অভিঘাত, ব্যক্তিক-সামাজিক নীতিচ্যুতি, ধস এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতা সৃষ্ট মন্বন্তর, কালোবাজারি, কলকাতার জনজীবনে জাপানি বোমার ভয়াবহ আতঙ্ক, চিনা-বাঙালি সংঘর্ষ, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মুসলিম লিগের ভিন্ন অবস্থান, দেশভাগ, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের বিদ্রোহ ও আন্দোলন এবং পরবর্তীতে কংগ্রেসের কমিউনিস্ট দমননীতি, পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা, আন্ডারগ্রাউন্ডে অবস্থান, আন্তর্জাতিক পটভূমিতে কমিউনিস্ট পার্টির নতুন নীতি ও কৌশল এবং তার অন্তঃসারশূন্য ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া রূপায়ণের মধ্যদিয়েই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এই অস্থির বিপন্ন সময়-অন্তর্গত মানুষের উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা, পারিবারিক জীবনে ভাঙন, ব্যক্তির অন্তর্গহনের জটিলতার উন্মোচনসূত্রেই hM hM R‡q উপন্যাসকে, মহাকাব্যোপম হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে

আগারিয়া বংশে, ১৯৩৫-এ 'দুই পয়সার লড়াই'য়ের প্রতিবাদী ও নির্যাতিত 'সাইকিলবালা' লোহাকাটা-শ্রমিক আটচল্লিশ বছরের লছমন আগারিয়ার মাসিক দু'আনা ভাড়ার বস্তিতে ১৯২৩ সনে জন্ম-নেওয়া সন্তান, নাওয়াল আগারিয়া। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির 'জনযুদ্ধে'র পর্বে, ছ'আনার রোজের সাধারণ শ্রমিক নাওয়াল, ১৯৪৩-এর 'আট ঘণ্টার লড়াই'য়ে স্বতঃস্ফূর্ত 'লড়াকু মজ্‌দুর' নেতা হয়ে ওঠে। অতঃপর নাওয়াল আগারিয়া কমিউনিস্ট মজদুর নেতা; ১৯৪৯-এ তিন বছরের জন্য কারারুদ্ধ হয়। কমিউনিস্ট নেতাদের আনুকূল্যে আগারিয়া শ্রমিক নেতা হিসেবে সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পায় এবং ১৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে যায় এম পি হিসেবে, একবার নয়—দু দু'বার। এরপর দু'বার নির্বাচনে পরাজিত হয়ে পার্টি-পরিত্যক্ত হয়ে ওঠে নাওয়াল আগারিয়া। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সংসদ সদস্য 'লড়াকু শ্রমিক' নাওয়াল আগারিয়া, শূন্য প্রহরের অন্তর্দাহে আত্মআবিষ্কার ও রাজনীতির জটিল জট উন্মোচনে, রাজনীতির সঠিক পথ সন্ধানে স্মৃতি-বিস্মৃতির দ্বৈরথে শেকড়-উৎসের সন্ধানে অন্তর্যাত্রা করে—বর্তমানতা থেকে অতীতে এবং ভবিষ্যতে; বিপরীত স্রোতে ভেসে চলে নতুন তীরের সন্ধানে।

কমিউনিস্টপন্থী নেতৃত্বের ক্ষমতাকেন্দ্র দখলের রাজনৈতিক চারিত্র ও সাধারণ মানুষের প্রতিবাদী সত্তাকে ব্যবহার করে কীভাবে দলীয় স্বার্থসিদ্ধির কৌশল গৃহীত ও কার্যকর হয়, সমরেশ বসু তার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন একশো বিশ পৃষ্ঠার †kKj †Qov nv‡Zi †Lv‡R[25] উপন্যাসে। 'দুই পয়সার লড়াই', 'হাতের শৃঙ্খল মোচন ছাড়া হারাবার কিছু নেই', 'নিঃস্ব প্রহরের দিনগুলো', 'যাদের লড়াই তারাই নেতা', 'শিকল পরার ছল?' 'কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি', 'পারটি আর দিল্লির গোলঘর, চুষে খাবার যন্ত্র' ও 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে'—আটটি পৃথক পর্বে বিন্যস্ত এ উপন্যাসে– নাওয়াল আগারিয়ার ক্ষমতা-কেন্দ্রে পৌঁছে যাওয়ার ক্রম-উত্থিত ইতিহাস ও আত্ম-সত্তানুসন্ধানের নির্ভীক ও সাহসী শিল্পরূপ নির্মাণে অগ্রসর হয়েছেন ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু। আটটি পর্বে আগারিয়া বংশের তিন পুরুষ—রামদাস, লছমন ও নাওয়ালের জীবনকথার মধ্যদিয়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাওয়া সমরেশ বসু বামপন্থী রাজনীতির অভ্যন্তর দ্বন্দ্বকেন্দ্রিক এক জটিল রাজনৈতিক পর্যালোচনার পাশাপাশি বামপন্থী রাজনীতি কীভাবে সংসদীয় রাজনীতির পচনশীল প্রতিক্রিয়ায় কাছে আত্মসমর্পণ করল তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে অগ্রসর হয়েছেন †kKj †Qov nv‡Zi †Lv‡R উপন্যাসে। সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনের অংশী হিসেবে সমরেশ বসু উপনিবেশিত ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অর্থনৈতিক কাঠামোয় গ্রাম থেকে উন্মূলিত হয়ে কলকাতায় আসা বিচিত্র পেশাজীবী শ্রেণির শ্রমিকশ্রেণিতে গোত্রান্তরের ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছিলেন। †kKj †Qov nv‡Zi †Lv‡R উপন্যাসে অর্জিত এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে সৃষ্টিশক্তির রসায়নে, সমরেশ বসু আগারিয়াদের শ্রমিক হিসেবে সংঘবদ্ধ হওয়ার কাহিনি, তাদের মাঝে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ও ব্যবহৃত হওয়ার ইতিকথা এবং ব্যর্থ হওয়ার ট্রাজেডি অঙ্কন করেছেন। ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের ব্যবহারে ঘটনা- পর্যায় উল্লেখিত, বিশ্লেষিত ও বয়ন সম্পন্ন হয়েছে। সমরেশ বসু মুখ্যত চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দুকে অবলম্বন করে চেতনাপ্রবাহরীতিতে অসংলগ্ন চিন্তা-ভাবনার বুনটে, চরিত্রের মর্মকেন্দ্রের তলে-অতলে প্রবেশ করেছেন। কোথাও, বিশেষত 'শিকল পরার ছল?' পরবর্তী উপ-শিরোনাম পর্বসমূহে ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ও প্রেক্ষণবিন্দুর সঙ্গে অঙ্গীকৃত হয়েছে সংলাপবদ্ধ পরিচর্যা। ফলে †kKj †Qov nv‡Zi †Lv‡Rর চরিত্রের অন্তর্জগৎ, বহির্বাস্তবতা, মহাকাব্যিক পরিপ্রেক্ষিত ও ভবিষ্যতের পরিণতি তীব্রভাবে মস্তিষ্ক ও মনোজগতে প্রগাঢ় তাৎপর্য সঞ্চার করে।

দুই পয়সার লড়াই

Dhaka University Institutional Repository

নাওয়াল আগারিয়ার বিশৃঙ্খল জট পাকানো নানা ঘটনা ও ভাবনার অর্থহীন ভাবাবেগ দিয়ে উপন্যাসের শুরু। একদিকে, লাল পতাকার কাস্তে হাতুড়ির সাদা রং, ভাঁজে ভাঁজে ভাঙাচোরা, ধুলোর ঝড়-আক্রান্ত ঝাপসা। অন্যদিকে, এই ধূলি-পাথর-ঝড়ের বুকে ভেসে-ওঠা ষাট বছরের বাবা লছমন আগারিয়ার অত্যাচারিত রক্তাক্ত মুখ। উক্ত দ্বি-ভাবনার সন্নিকর্ষে, সৃষ্ট হয়ে ওঠে আগারিয়ার দিনকাল, চরিত্রবৈশিষ্ট্য, লোহাকাটা শ্রমিকের ঐতিহ্য এবং ১৯৩০-৩৫ সময় পরিসরের পারিবারিক ও কারখানার যাপিতজীবন।

উপন্যাসে বর্ণিত নাওয়াল আগারিয়ার প্রথম পুরুষ রামদাস আগারিয়ার কাছ থেকেই তাদের পূর্বপুরুষদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়। পুত্র লছমনকে রামদাস আগারিয়া কর্তৃক কথিত নিজ বংশের আদিকথার মধ্যেই সমরেশ বসু ভারতের শ্রমজীবী শ্রেণির সঙ্গে শোষক শ্রেণির দ্বন্দ্বের উৎস প্রত্যক্ষ করেছেন যা মূলত নিহিত ছিল সেই আদি যুগে দেবতা ও দানবের দ্বন্দ্বের মধ্যে :

তোমরা আজকাল বিশ্বকর্মার কথা বল। কে সে? আমরা, আগারিয়ারা 'ময়'-কেই চিনতাম। ময়কে তোমরা দানব বল। বলবেই। তার ক্ষমতা এত বেশি ছিল, তার কাজকর্ম দেখে, মানুষের বিশ্বাসই হতো না, এত বড় বিশাল কাজ কোনো দেওতা করতে পারে। একমাত্র দানবই পারে এমন বিরাট নগর মন্দির রথ কয়েদখানা তৈরি করতে। কিন্তু ময় দানব না। সে দেওতা। আগারিয়াদের দেওতা। আগারিয়াদের গুরু। আমরা তার সহযোগী। আমাদের বহু বহু আগের পূর্বপুরুষদের সে লোহা কাটতে শিখিয়েছে। গলাতে শিখিয়েছে। ঢালাই করতে শিখিয়েছে। লোহাকে আমরা পোষ মানাতে শিখেছিলাম। একজন আগারিয়া আর লোহাতে কোনো ফারাক নেই। আগারিয়া আর লোহা, দু'জনে দু'জনের জন্য। (পৃ.৭)

দিতিপুত্র ময় দানব, তিনি দেবতাদের বিশ্বকর্মার মতো অদ্বিতীয় শিল্পী, ব্রহ্মার বরপ্রাপ্ত ময় হিরণ্ময় অরণ্য ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন। শুক্রাচার্যের সমস্ত শিল্পবিদ্যার অধিশ্বর হন তিনি। ইন্দ্রপ্রস্থের অপূর্ব সভাগৃহ নির্মাণ করেন। 'ময়মত' নামক গৃহনির্মাণ-শিল্পগ্রন্থপ্রণেতা হিসেবে তাঁর প্রসিদ্ধি আছে। হেমা নামের অপ্সরাকে বিয়ে করার অপরাধে, ইন্দ্র ময়দানবকে বজ্রাঘাতে হত্যা করেন।[২৬] পুরাণের শক্তিকে পুনর্নির্মাণ করেছেন সমরেশ বসু, শিল্পী মায়াবী ময় দানব, আর দেবলোকের ক্ষমতাকেন্দ্রের দেবরাজ ইন্দ্রের সংঘাতকে শ্রমিক-মালিকের সংঘর্ষ হিসেবে বিবেচনা করেছেন তিনি, আর তখন থেকেই লাঞ্ছনা-বঞ্চনার শুরু। মহৎ সভ্যতা সৃষ্টি করেছে দানবকথিত শ্রমিক শ্রেণি; ভোগবাদী ক্ষমতালিপ্সু উচ্চবর্গীয় দম্ভী দেবশক্তির পক্ষে যা অসম্ভব।

বাবা লছমন আগারিয়াকে, নাওয়াল সাত বছর থেকে বারো বছর পর্যন্ত দেখেছে, লোহা কাটার কারখানার উদয়াস্ত পরিশ্রমী শ্রমিক হিসেবে। শুঁড়িখানা ফেরত ক্ষ্যাপা মোষের মতো মাতাল লছমন বস্তিতে ফিরত যেন কালান্তক যম, মা বেদামীর জীবনে শারীরিক-মানসিক নির্যাতন ছিল নিত্য ঘটনা :

ক্ষ্যাপা মহিষটা গাঁক গাঁক গর্জন করতে করতে আসছে, অনেক দূর থেকেই টের পাওয়া যেতো। বেদামী আগে ভাগেই তার ছেলে-মেয়েগুলোকে বস্তির আশেপাশের বাঁদাড়ে পাঠিয়ে দিত। ... ছেলে মেয়েদের নেড়ি কুত্তার বাচ্ছার মতো, চুলের ঝুঁটি ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিত। চিৎকার করতো, "হট্ যা ছারপোকার ঝাড়। মাথার উকুন। ...আর সেই সঙ্গেই তাদের জন্মদাত্রীর নামে উচ্চারণের অযোগ্য সব গালাগাল, খিস্তি, খেউড়। ...বিশেষ করে, বাইরে কারো সঙ্গে ঝগড়া করে, মারামারি করে, ক্ষতবিক্ষত হয়ে ফিরলে তো কথাই ছিল না। সে-মূর্তি আরও ভয়ংকর। ...বস্তির উঠান পেরিয়ে, ঘরের সামনে যাকেই পাওয়া যেতো, তার উপরেই সে ঝাঁপিয়ে পড়তো। সেই মত্ততার খোয়ারি ভাঙতে একজনকে থাকতেই হবে। ... অতএব, সেই দুর্দান্ত মারমুখো মাতালের মুখোমুখি হবার জন্য বেদামীকেই দাঁড়াতে হতো। (পৃ.৬)

রামদাস আগারিয়ার কণ্ঠে পূর্বপুরুষদের আনন্দময় কাজের বর্ণনা থেকে জানা যায় :

তারা কাজ করতো। কাজকে ভালবাসত। ... কিন্তু তারা মদ খেতো। আর ঢোলক বাজিয়ে গান করতো, 'লোহা বানায়ে সোন্, আগারিয়া! তেরি লোহা বানায়ে সোন্।' হ্যাঁ, আগারিয়া লোহা দিয়ে সোনা বানাতো। কিন্তু এখন? এই বর্তানিয়া কোম্পানির আমলে, আগারিয়ারা তাদের সেই সাবেকি কাজ ভুলে গিয়েছে। এখন সে রোজ চার আনা, ছ' আনার মজুর। সে এখন কারখানার যন্ত্রে লোহা কাটে। এক ছাঁচে, এক রকম, এক ঘেয়ে। কোনো নতুন নকশা নেই। নিজের হাতের কাজ

Dhaka University Institutional Repository

দেখতে দেখতে চোখ খারাপ হয়ে যায়। হাত বাঁধা পড়ে যায় একটা ছকের মধ্যে। কী সুখ আছে এই কাজে?... তার মনে হতে থাকে সে একটা আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা জানোয়ার। নিজেকে সে মুক্ত করতে চায়। কী করে সে মুক্ত করবে? ঘরের আপন মানুষকে ধরে পেটানো ছাড়া, তাঁর আর কোনো রাস্তা নেই। (পৃ.৭-৮)

নাওয়ালের ঠাকুর্দা, বাবা লছমন আগারিয়ারা 'একটা ছকের' কাজে নিরানন্দ, সৃষ্টিহীন কাজে বিপন্ন; সস্তা দামে সময়-বেচা শ্রমদাস; অন্নাভাবে, দারিদ্র্যের কশাঘাতে নিরস্তিত্বপ্রায়; অগ্নিদগ্ধ। এই অস্বভাবী মনস্তত্ত্বের উৎস মার্কসীয় তত্ত্বকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়।[২৭] "সমরেশের দেখার চোখ সুনীলদের (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) থেকে অনেক মর্মভেদী এবং ব্যাপ্ত। কারণ জীবনের অভিজ্ঞতা। সুনীল যেমন কোন শ্রমিক তার বউকে পিট্‌ছে এ-ঘটনা দেখতে পাবেন, কিন্তু কারণটা বুঝতে পারবেন না। সমরেশ শুধু পারবেন না, পেরেছেনও। কেননা এখানেই আছে alienation-এর প্রশ্ন! লছমন আগারিয়া যখন ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো তার সামনে বউ, ছেলে মেয়ে যাকে পায় তাকে পেটায়, তখন লছমনের বাবা পারে কেন? সে কুলদেবতা ময়দানবকে ডাকে। আগারিয়ার পূর্বপুরুষরা নাকি কুতুব মিনার বানিয়েছিল। এই আগারিয়ারা লোহার কারিগর, আজ এমন মেশিনে কাজ করছে যেখানে সমগ্র সৃষ্টিকে দেখার ক্ষমতা বা উপায় নেই। এই সৃষ্টিহীনতা থেকেই জন্মায় এ্যালিয়েনেশন। তা ঘটে শ্রমিকেরই।"[২৮]

রামদাস আগারিয়ার আমলে অসংগঠিত শ্রমিকশ্রেণি কারখানার ঠিকাদারদের সঙ্গে কোনোরকম বিরোধপূর্ণ সম্পর্কে জড়াতে চায়নি। বরং নিজেদের প্রয়োজনে বাড়তি মজুরির দাবি না করে তারা স্বল্প দামে শ্রম বিক্রি করেছে। এমনকি মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে কখনো কোনো প্রতিবাদও তারা করেনি। মালের বাজার মন্দা, অর্ডার কম ইত্যাদি যুক্তি দেখিয়ে ঠিকাদার হালদারবাবু লোহা-কাটা শ্রমিকদের রোজ দু'পয়সা কাটার কথা জানালে, লাঞ্ছিত-বঞ্চিত, মন্দা-আক্রান্ত শ্রমিকদের একজন লছমন আগারিয়া দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায়, "কাহে, মজুরি কেন কাটবেন বাবু? এক পয়সাও কাটা চলবে না। আধা পয়সাও না। মাল কি কিছু কম বানাই হবে?" (পৃ.১০) হালদারবাবু ক্রোধে রক্তিম চোখ গর্জে উঠেছিল, "সে কৈফিয়ৎ কি তোকে দেবো, শুয়োরের বাচ্ছা? দু'পয়সা কম মজুরিতে তোর না পোষায়, তুই চলে যা।" (পৃ.১০) হালদারবাবুর কুৎসিত গাল দেবার প্রতিবাদ করে লছমন। ঠিকাদারবাবু ছড়ি দিয়ে আঘাত করে লছমনকে; ঠিকাদারবাবুর চারজন গুণ্ডা লছমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে লছমন প্রত্যাঘাতও করেছিল; কিন্তু চারজনের আক্রমণ প্রতিহত করা কঠিন। হালদারবাবুর চার গুণ্ডা লছমনের বুকে-পিঠে-মুখে মারাত্মকভাবে ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত করে কারখানার গেটের বাইরে ফেলে দিয়েছিল। লছমন রাস্তার উপর পড়ে থাকেনি :

উঠে দাঁড়িয়েছিল। কাঁধে ঝোলানো জামাটাই সে তখন খুঁজছিল। তখনও তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তার সহকর্মীরা। তার গোটা মুখটা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। নাকের ছিদ্রে, ঠোঁটের কষে রক্ত ঝরছিল। রক্ত চুইয়ে বেরোচ্ছিল গালপাট্টা দাড়ি ভেদ করে। চোখের কোল আর কপালের জায়গায় জায়গায় ডুমুরের মতো ফুলে উঠেছিল। আর কালসিটে দাগ। (পৃ.১৭)

লছমন নিজের বস্তিতে ফিরে আসে, সহকর্মীদের অনেকেই এসেছিল সঙ্গে, এমনকি মাহমুদ আর সনাতনও। রাস্তার লোকেরাও ভিড় করে এসেছিল। তিন বছর আগে, চটকলে এমন ঘটনা ঘটেছিল; হয়েছিল বড়ো রকমের হাঙ্গামা; ধর্মঘট চলেছিল মাসের পর মাস। অনেকে প্রহৃত হয়েছিল, কেউ কেউ এলাকা ছেড়ে পালিয়েছিল। কিন্তু লোহা কারখানায় এরকম ঘটনা এই প্রথম, ঐ অঞ্চলে লছমন আগারিয়ার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সেই প্রথম। বারো বছর বয়সী নাওয়ালের স্মৃতিতে বাবার সেই রক্তাপ্লুত, নির্যাতন-বিকৃত চেহারাটা, আজ চুয়ান্ন বছর বয়সেও ভাসছে :

Dhaka University Institutional Repository

নাওয়াল দেখছিল, বাবার মুখে ভয় বা কষ্টের একটু ছাপ নেই। সে তার সহকর্মীদের সঙ্গে, শান্ত অথচ শক্ত গলায় কথা বলছিল। আর বারো বছরের এক আগারিয়া ছেলের বুকে একটা ভবিষ্যতের বীজ জন্ম নিচ্ছিল। ও ওর বাবার সহকর্মীদের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। বাবাকে তারা সম্ভ্রমের চোখে দেখছিল। বাবার প্রত্যেকটি কথায় তারা সায় দিচ্ছিল। বাবা যতোবার জিজ্ঞেস করছিল, "কসম?" তারা প্রত্যেকবার এক সঙ্গে গলা মিলিয়ে জবাব দিচ্ছিল, "কসম"। ...(পৃ.১৮)

নাওয়াল বারো বছর বয়সে, দু'পয়সার লড়াইবালা সেই বাবার মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়েছিল। ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মুখ লছমন আগারিয়া। মাতাল না। শান্ত, গম্ভীর এক যোদ্ধা। বারো বছরের বালকের চোখে এক নতুন মানুষ। এই বাবাই যে সেই বাবার মধ্যে ছিল, ওর কল্পনায়ও আসেনি। বাবাকেও সে চিনতে পারেনি। বারো বছর বয়সে সেই দিন নতুন করে চিনেছিল। দূরে অন্ধকার থেকে বাবার মুখের দিকে দেখতে দেখতে, বালক পিতৃগৌরবে, বিস্মিত শ্রদ্ধায় মোহিত হয়েছিল। চিরকালের ছবিটা, একদিনেই কোথায় নিমেষে মুছে গিয়েছিল। সেই মুখ ও সারা জীবনে আর কোনো দিন ভুলতে পারেনি। (পৃ.২২)

সে সময় বালক নাওয়াল উজাগরবাবার কাছে রামায়ণ পাঠ শোনার অভিজ্ঞতার আলোকে বাবাকে নতুন আলোয় দেখেছিল। রাম স্বয়ং ভগবান হয়ে অন্যায় যুদ্ধে, দূর থেকে তীর মেরে বালীকে হত্যা করেছিল। মহাবীর বালীর মৃত্যুতে বালক নাওয়াল দুঃখ পেয়েছিল। বালক বিশ্বাস করে, দেবতার হস্তক্ষেপ না হলে বালীই জয়ী হত। "আজ বাবাকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় দেখে, ওর চোখের সামনে বালীর চেহারা ভেসে উঠেছিল।" এখানেও মিথের পরিসরে সমরেশ বসু, অন্ত্যজ বালী ও দেবস্বার্থে সুগ্রীবকে রামের সমর্থনের মাঝে পরিশ্রমজীবী ও পরশ্রমজীবীর সংঘাতকে, শ্রেণিদ্বন্দ্বের সুপ্রাচীনতাকে প্রত্নকল্পে রূপায়িত করেছেন।

হাতের শৃংখল মোচন ছাড়া হারাবার কিছু নেই

নাওয়াল আগারিয়া, সারা ভারতের চেনা নাম। চুয়ান্ন বছরের নাওয়ালের দৃষ্টি, বাবার মুখ থেকে ফিরে এল বর্তমানতায়। টেবিলের ওপর হুইস্কির পিন্ট মাপের বোতল। অল্প দামের ভারতীয় হুইস্কি। বরফ ভাসা, জল-মেশানো গ্লাস তুলে সুদীর্ঘ চুমুক দেয় সে। স্যান্ডেল জোড়া এলোমেলো, চেয়ারে হেলান দেওয়া চেহারাটা দেখলে মনে হয় সে বিধ্বস্ত। বিপন্ন, হতাশাগ্রস্ত চেতনায় বিশৃঙ্খল জেগে ওঠা স্মৃতি, ভাবনা এবং বর্তমানতার মাঝে অবিরাম দোলাচল।

নাওয়াল হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে থমকে গেল। দেয়ালের এনলার্জ করা ছবিতে ক্রেমলিনের প্রাসাদে ক্রুশ্চেভের পাশে নাওয়াল। দেয়ালের উপরের দিকে লেনিনের রঙিন ছবি; লেনিন আর তার দু'পাশে মার্কস, এঙ্গেল্‌স্-এর ছবি। স্ট্যালিন আর মাও জে-দঙের ছবি পুরোনো পোস্টার-ফেস্টুনের মধ্যে নির্বাসিত। অপ্রকৃতস্থ নাওয়াল আগারিয়ার উল্লম্ফনধর্মী ভাবনাপ্রবাহ এবং ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে চিন্তাস্রোত :

নাওয়ালের তেমন রাজনৈতিক অবস্থার পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা নেই। তাত্ত্বিক ভুল ত্রুটি বিষয়ের বোধও তার তেমন অধিগম্য নয়। মোদ্দা কথাটি সে জানে, স্ট্যালিন নিজের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য, অনেক অন্যায় কাজ করেছিলেন। চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র যাকে বলে, এবং সেই কারণে কমরেড হত্যায়ও নাকি তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। আর মাও ৎসে তুংয়ের সঙ্গে সোভিয়েট পার্টির মতভেদ, এবং চীনের সঙ্গে রাশিয়ার বিচ্ছেদ। অতএব, পার্টির নির্দেশ, ঐ ছবি আর যথাস্থানে রাখা চলবে না। (পৃ.২৪)

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে রাখতে গিয়ে নাওয়ালের চোখ পড়ল বাম পাশের দেয়ালের বাঁধানো ছবিতে—স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু হেসে করমর্দন করছেন তার সঙ্গে :

নাওয়াল ছিল জবাহরলালের বিরোধী একজন পার্লামেন্টের মেম্বর। তবু নিজের মধ্যেও একটা গর্ববোধ ছিল বই কি! যে-ব্যক্তির ধারে কাছে ঘেঁষার কথা সে কোনোদিন কল্পনা করেনি, তাঁর সঙ্গে সহাস্য করমর্দন! যতো বিরোধিতাই থাকুক, ঘটনাটা বিস্ময়কর! হাঁ, নাওয়াল অবিশ্যি সে-যোগ্যতা অর্জন করেছিল নিজের জোরেই। তথা পার্টির জোরেই। (পৃ.২৫)

Dhaka University Institutional Repository

ফটোটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ-রাখা নাওয়ালের ভাবনাপটে, ভেসে ওঠে স্মৃতিময় বাবা লছমন আগারিয়ার মুখ। এ ঘরে যত ছবি আছে, তার মধ্যে নিজের ছবি ছাড়া আর কোনো আগারিয়ার ছবি নেই। লছমন আগারিয়ার সপরিবারের ছবি এ ঘরে জায়গা পায়নি। চেতনাস্রোতে, বিপ্রতীপ উল্লম্ফনে ভেসে আসে উনিশশো পঁয়ত্রিশ সাল, বাবার মুখ; সেই দুই পয়সার লড়াইয়ের কথা :

ধূলি-পাথরের ঝড়ের এই এক তাণ্ডব গর্জন আর ছবির মধ্যে বাবার সেই মুখটা আবার ভেসে উঠল। বারো বছর বয়সে মনে হয়েছিল, যে-মুখ ও কোনো দিন ভুলতে পারবে না। এবং একথা তো সত্যি, তারপরও অনেক বছর বাবার সেই রক্তাক্ত শার্দুলের মুখ ও ভুলতে পারেনি। ... সেই মুখই যে পরবর্তীকালে ওর মতো একজন যোদ্ধা মজুরের চেতনায় এক নতুন বীজ বপন করেছিল, ও নিজেও কোনোদিন তা সচেতন মনে ভেবে দেখেনি। বাইরের জগত থেকে না, ঘর থেকেই ওর ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ রোপিত হয়েছিল। আর সে বীজ রোপণ করেছিল, এক লোহাকাটা আগারিয়া, তার দু'পয়সার লড়াইয়ে। (পৃ.২৬)

গান্ধীভক্ত উজাগরবাবা 'সন্তসাধুর মতো মানুষ'। নিজের সঞ্চিত অর্থে মহল্লার সকলের বিপদে সাহায্য করে। তার কাছ থেকেই গান্ধী টুপি পেয়েছিল 'সাইকিলবালা' লছমন আগারিয়া। আহত লছমনের চিকিৎসার ব্যবস্থাও সে করেছে। লছমনকে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন ঠিকাদারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লছমনের প্রতিবাদের যৌক্তিকতা সম্পর্কে। কারখানার মালিক 'বর্তনিয়া আংরেজ' ও শ্রমিকদের মাঝে থেকে গুণ্ডাবাহিনীসহ মধ্যস্বত্বভোগী ঠিকাদারদের ভূমিকা ও শোষণকৌশল সম্পর্কে উজাগরবাবা তাকে সচেতন করেছে। এও বুঝিয়েছে, সেই সঙ্গে লছমন যদি এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো থেকে পিছু হটে আসে তা হলে ঠিকাদারদের দ্বারা শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদা বারবার ভূলুণ্ঠিত হবে। তার এ কথা লছমনের আত্মবিশ্বাসকে আরও বাড়িয়ে দেয়। কারখানায় তার এ প্রতিবাদের পরিণতিতে লছমনের কর্মহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কায় উদ্‌ভ্রান্ত স্ত্রী বেদামীকে, সন্তানদের জন্য ভবিষ্যৎ সকল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর করার জন্য, নিভে যাওয়া বিড়িটা জ্বালিয়ে নিয়ে লছমন বলে :

গঙ্গার ওপারে চটকলে একটা কাজ খুঁজে পেতে আমার সময় লাগবে। তোর দাদারা চটকলে তাঁত চালায়, কিন্তু আমি একজন মিস্তিরি, হাঁ। চটকলে বাঙালী মিস্তিরি বেশি। সেখানে আমার একটা কাজ জুটে যেতে পারে। ... চটকলের একটা সুবিধা কি, ওখানে ঠিকাদারবাবু নেই। আছে সর্দার। সর্দাররাই পশ্চিমের মুলুক ঢুরে মজুর জুটিয়ে আনে। ...সর্দারকে কিছু দিতে হয়। কিন্তু মিস্তিরিদের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। (পৃ.৩০)

ফারুক, রামু, বেচন, কইসর—ঠিকাদার হালদারবাবুর গুণ্ডা। আহত, রক্তাক্ত বাবাকে দেখে রাতে ঠাকুর্দার সঙ্গে শুয়েও পরের দিন কী ঘটতে যাচ্ছে—এটা জানার উত্তেজনায় সারারাত নাওয়াল ঘুমোতে পারেনি। মাঝে মাঝে হালকা ঘুমের মধ্যেও তার চোখ জুড়ে দুঃস্বপ্ন নেমে এসেছিল। "বাবাকে গুণ্ডারা মারছে। বাবা লড়ছে। বাবা হাসছে। অনেকের সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু আবার গুণ্ডাদের তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে।" (পৃ.৩০)

প্রবল জ্বর আর তীব্র ব্যথার শরীর নিয়ে পরদিন, ছেলে নওরঙকে সঙ্গে নিয়ে ভোরে আর এক যুদ্ধের জন্য লছমন কারখানায় গিয়ে পৌঁছায়; লোহাকাটা কারখানার সবাই তখনও এসে পৌঁছায়নি। মাথায়, মুখে ব্যান্ডেজ-বাঁধা লছমন কারখানায় যাওয়ার পর পরই তার পাশেই সহকর্মী মাহ্‌মুদ, সনাতন, টিণ্ডাল আবদুল, বয়লার মিস্তিরি ইস্‌রাইল এসে দাঁড়ায়। হালদারবাবুকে তারা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় গতকাল লছমনের সঙ্গে প্রতিবাদ না জানিয়ে তারা ভুল করেছে। এ কারণে তার ওপর ঘটে যাওয়া নির্যাতনের জন্য তারাও দায়ী। সম্মিলিত প্রতিবাদের মুখে হালদারবাবু শ্রমিকদের উদ্দেশে বলে : "বেইমান। তোরা সব বেইমানের দল। আমি বলেছি, দু'পয়সা কাটাই হবে, তা কাটাই হবেই। মাল কম বানাই চলবে না। তোরা যদি কাজ না করতে চাস, চলে যা। কাজের লোকের অভাব হবে না।" (পৃ.৩৫) তার এ কথায়

Dhaka University Institutional Repository

পরে সবাই মাটিতে বসে পড়লেও চল্লিশ বছর বয়সী টিণ্ডাল আবদুল দাঁড়িয়ে থেকে শান্তভাবে উচ্চকণ্ঠে জানায় : "চলে আমরা যাবো না বাবু। আমাদের কাজ আমরাই করবো। অন্য লোক এসে কেন করবে?"এরপর ঠিকাদার হালদারবাবু, শ্রমিকদের কারখানা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলে সাহসিকতার সঙ্গে দৃঢ়কণ্ঠে আবদুল জানায় : "না বাবু, আমরা কারখানা থেকে যাবো না। বাইরের লোকদের এসে কাজ করতেও দেবো না।" (পৃ.৩৬)

হালদারবাবুর সহযোগী ঠ্যাঙাড়ে গুণ্ডাবাহিনীও তাদেরকে শাসায়। কিন্তু আবদুলসহ সকলের ধাওয়া খেয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয় তারা। শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদে বিস্মিত লছমনসহ সকলেই পুলিশ আসার শঙ্কায় শঙ্কিত হলেও তাদের আলোচনায় এটা সুস্পষ্ট যে হালদারবাবু যদি মজুরি কমানোর বিষয়ে ভালোভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলত, তবে তারা সেটা ভেবে দেখত। কিন্তু গালিগালাজসহ লছমনের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে যে অন্যায় সে করেছে তা সকলের গায়েই লেগেছে। কাজেই অন্যায়টা তাদের। এ বিষয়ে শ্রমিকদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এ বিষয়ে আবদুলের সঙ্গে একমত হয়ে মাহ্মুদ জানায় :

আমি জানি না, ওরা কী করতে চলেছে। মাহ্মুদ সকলের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "আবদুল বেটা যা বলেছে, কিছু ভুল বলেনি। এখন থেকে সাত সাল আগে চটকলের মজুররা ছাঁটাইয়ের খিলাফ লড়েছিল। এক দিন দু' দিন না, দু-তিন মাস। কোম্পানী চটকল চালাতে পারেনি। ছাটাইও তুলে নেওয়া হয়েছিল। হ্যাঁ, পুলিশ এসেছিল। অনেকে মহল্লা এলাকা ছেড়ে চলে গেছলো। গ্রেপ্তারও হয়েছিল অনেকে। মামলা হয়েছিল অনেকের নামে–মিথ্যা মামলা। আমি বুড়ো মানুষ যদি ভয় না পাই, তোমরা কেন ভয় পাবে? মন ঠিক রাখো, শক্ত থাকো।"...(পৃ.৩৮)

সম্মিলিত প্রতিবাদের পরিণাম ইংরেজ সাহেব খুব ভালো করেই বুঝেছিলেন। কারখানা সচল রাখতে হালদারবাবুকে নমনীয় হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। এ কারণে লছমনদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয় হালদারবাবু। শ্রমিকদের এ বিজয়ে লছমনের শারীরিক কষ্ট দূর হয়ে যায়। নতুন উদ্দীপনা নিয়ে কাজ শুরু করে সে। শমিক থাকাকালীন ঠিকাদারবাবু ও গুণ্ডাবাহিনীর কাছে তার জীবনের অনিশ্চয়তা, অপমান ও ভোগান্তির কোনো শেষ ছিল না। কিন্তু তার ক্ষতি করার কোনো সাহস দেখাতে পারেনি তারা। এখানেই শ্রমিকদের সাফল্য।

লছমনের এ প্রতিবাদ তাকে 'সেই এলাকার এক ইতিহাসের নায়ক' করে তুলেছিল। উজাগরবাবার কাছ থেকে শোনা ঠিকাদারের শোষণ ও মজুর-কোম্পানি দু পক্ষকেই ঠকানোর কৌশল সে শ্রমিকদের বুঝিয়ে বলার সঙ্গে সঙ্গে ঠিকাদারদের যুগ যে শেষ হয়ে আসছে এ ভবিষ্যৎবাণীও করে। ট্রেড ইউনিয়নের মতো কোনো সংগঠন কিংবা প্রশিক্ষিত কোনো নেতৃত্ব না থাকলেও জীবনের প্রয়োজনে শ্রমিক শ্রেণি নিজেরাই সংগঠিত হয়ে শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার মধ্যদিয়ে বিজয় সূচিত করেছিল। এ আন্দোলন থেকেই বেরিয়ে এসেছিল আবদুল, ইস্রাইল, সিপতের মতো 'লড়াকু মজদুর'। কোনো 'মধ্যবিত্ত ইনটেলিজেনসিয়া'র নেতৃত্ব ছিল না। উদ্ধৃতি তাৎপর্যপূর্ণ :

...লছমন আগারিয়া সেই এলাকার এক ইতিহাসের নায়ক হয়ে উঠেছিল। আবদুল, ইস্রাইল, সিপতের মতো লড়াকু মজদুর জন্ম নিয়েছিল একটি মাত্র ঘটনার মধ্যদিয়ে। সেই দু'পয়সার লড়াইয়ে, সেই সময়ে কোনো টোপিওয়ালা স্বদেশীবাবু আসেননি। লণ্ডনবালা কোনো ইংলিশ কেডার ক্রান্তিকার কমরেডবাবু আসেননি। তাঁদের কিছু সলাপরামর্শ দিতে হয়নি। নেতৃত্ব করতে হয়নি। লড়াইয়ের পথ আর কৌশল শেখাতে হয়নি। লোহাকাটা একজন সামান্য গরীব আগারিয়া–সর্বহারা, একান্তই জীবনের তাগিদে, জেনেশুনেই অতি শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অনাহার, মৃত্যু, সমস্ত রকমের ঝুঁকি নিয়ে। (পৃ.৪০)

Dhaka University Institutional Repository

অথচ প্রকৃত সর্বহারা নাওয়াল আগারিয়া বাবা লছমনের প্রতিবাদী সত্তার উত্তরাধিকার হিসেবে শ্রমিক জীবন শুরু করলেও, শেষ পর্যন্ত ক্ষমতালোভী ও আধিপত্য বিস্তারের রাজনীতির পঙ্কে খুব সহজেই নিমজ্জিত হয়। নিজেকে খুঁজে ফেরার, আত্ম-অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে নাওয়ালের মনোজগতে ক্রিয়াশীল বাবার সংগ্রামী চেতনাকে ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। 'হাতের শৃংখল মোচন ছাড়া হারাবার কিছু নেই' অংশের একেবারে শেষ অনুচ্ছেদ দুটো লক্ষ করার মতো :

হাঁ, এইসব কথা বলেছিল লছমন আগারিয়া। একজন সর্বহারা। নাওয়াল আগারিয়ার বাবা। তার বারো বছর বয়সে, বংশ পরম্পরা লোহাশিল্পী বাবা, তার ছেলের মনে বীজ রোপণ করে গিয়েছিল। সেই বীজ থেকে নাওয়াল আগারিয়া নামে যে-গাছটা জন্মেছে, তার ডালপালা ফুল ফল আজ কেমন? এই গাছ কি সেই আগারিয়ার বংশধর সর্বহারা যোদ্ধা আগারিয়া? কোথায় তার চিহ্ন? আছে কি কিছু? (পৃ.৪০)

আত্ম-খননকারী নাওয়াল আগারিয়া হুইস্কির গেলাস তুলে চুমুক দেয়। বাঁ হাতের কবজির ঘড়িতে ঘুরে চলেছে নিরন্তর সময়ের কাঁটা। শূন্য গেলাসটা রাখতে গিয়ে, জানালার ওপর দেওয়ালে, হিন্দিতে লেখা লাল অক্ষরের কথাগুলোর ওপর তার দৃষ্টি আটকে গেল। 'হে সর্বহারা মজুর! হাতের শৃঙ্খল মোচন ছাড়া তোমার আর কিছু হারাবার নেই।' (পৃ.৪০)

নিঃস্ব প্রহরের দিনগুলো

রাত সাড়ে আটটা প্রায়। নাওয়াল হুইস্কির বোতল তুলে গ্লাসে ঢালতে যাচ্ছিল, এমন সময় টেলিফোন বেজে ওঠে। ভাবতে থাকে নাওয়াল আগারিয়া। এ পর্যায়ের ভাবনা– বর্তমান কেন্দ্রিক অর্থাৎ চুয়ান্ন বছরের দলচ্যুত ও পরিত্যক্ত 'লড়াকু মজদুর' নাওয়ালের। রাজনৈতিক আলোচনা-চক্রে এখন আর নাওয়ালের ডাক পড়ে না। প্রতিদিনই সে কলকাতার পার্টির জেলা অফিসে একবার যায়। পার্টি অফিস থেকে ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে। কিন্তু নাওয়াল বুঝতে পারে দলের কাছে তার পূর্বের সে অবস্থান আর নেই। এখন সে স্থান ইউনিস্‌দের মতো সম্ভাবনাময় তরুণ নেতাদের। এ কারণেই মুসলিম ওয়ার্কিং ক্লাস এরিয়ায় অশিক্ষিত শ্রমিক শ্রেণির মুসলিমদের উদ্দেশে বক্তৃতা দেবার জন্য কমরেড প্রফেসর সিদ্দিকি ও নাওয়ালকে বাধ্য হয়ে পাঠানোর কথা থাকলেও বিনোদ সেন ফোন করে গম্ভীর গমগমে কণ্ঠে জানায় যে, "আগামীকাল বিকেলে আপনার যেখানে বক্তৃতা করতে যাবার কথা ছিল, আপনাকে সেখানে যেতে হবে না।" কারণ ইউনিস্ আসবে বলে নিশ্চিত করেছে। এর কারণ নিহিত রয়েছে নাওয়ালের কথার মাঝেই : "ইউনিস নট ওন্‌লি মুসলিম। হি ইজ ইয়ং পার্টি লিডার–।"(পৃ.৪২)

বিনোদ সেনের গমগমে গলায় হাসির ঝংকার, "হ্যাঁ, এককালে আপনি যেমন ছিলেন, লড়াক্কু মজদুর। নাওয়াল আগারিয়ার সেই পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের চেহারা আমার মনে আছে। আনসোফিস্টিকেটেড, ব্রাইট ব্রোনজ কালার লায়ন ফিগার। স্বাধীনতা পত্রিকায় আপনার ফটো দেখেছিলাম তার আগেই। তখন আপনি সবে উঠছেন—মানে কলকাতার পার্টিতে তখন আপনার নাম নেতাদের মুখে মুখে। পার্টির ইংরেজি সাপ্তাহিকেও আপনার ছবি দেখেছি। আপনি বক্তৃতা করছেন। পাশে বসে আছেন কমরেড মুজাফ্‌ফর আহ্‌মেদ, বঙ্কিম মুখার্জি।" (পৃ.৪২)

বিনোদ সেন কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে কমিউনিস্ট রাজনীতিতে আসেন। বর্তমানে দলের সার্বক্ষণিক কর্মী, প্রাদেশিক কমিটির মেম্বার, সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়নের, আন্দোলনের বিষয়সূচি-কমিটির উপদেষ্টা এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট। সংস্কৃতিবান ধনী পরিবারের সন্তান পঞ্চাশ বছর বয়সী স্বল্পভাষী বিনোদ সেন

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি ও বাংলা উভয় প্রকাশনার মাধ্যমে খুব অল্প সময়ের মধ্যে পার্টির নীতি ও কৌশলের তাত্ত্বিক নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। পার্টির সর্বভারতীয় উচ্চপদস্থ নেতারা তার ওপরে আস্থাশীল। ফোনে কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক নাওয়ালের কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে তাকে ড্রাঙ্ক ও ঘুমন্ত মনে করে বিনোদ সেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে রিসিভার নামিয়ে রাখার পর নাওয়াল নিজের অধঃপতিত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিনোদের মতো কমরেডদের দিক-নির্দেশনায় পার্টি বর্তমানে কোন স্তরে পৌঁছে যাচ্ছে সেদিক বিশ্লেষণে মনোযোগী হয়। রিসিভারটি নামিয়ে রাখে। টেলিফোনটার দিকে হাসে নাওয়াল, এবং স্বগতোক্তি করতে থাকে :

না, মাতাল হইনি। ঘুমিয়েও পড়িনি কমরেড বিনোদ সেন। আমি, নাওয়াল আগারিয়া আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি, সেই চেহারাটা দেখছি। কমরেড, আপনি আজ যে-পজিশনে আছেন, আর যা জমানা পড়েছে, মনে হয় জীবনভরই আপনি সেই পজিশনে থাকবেন। কোনো নতুন অদলবদল হবে, তেমন কোনো কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না। তাই, আপনি আমার অবস্থাটা বুঝবেন না। আপনি আর আপনার লোকেরা আমাকে বোঝবার আর চেষ্টাও করবেন না। আর সেটাই তো ঠিক। সংসার আমার জন্য বসে থাকবে না। পার্টি আমার জন্য বসে থাকবে না। কেবল একটা কথাই বুঝতে পারছি না, আমি যদি পড়েই থাকি, থাকবো। কিন্তু আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? (পৃ.৪৩)

গোটা ঘরের দেওয়াল জুড়ে দেশ-বিদেশের বহু নেতা, কূটনীতিক, মন্ত্রী, দো-ভাষী, সাহিত্যিক শিল্পী ক্রীড়াবিদ মহিলা পুরুষদের সঙ্গে নাওয়ালের বিচিত্র ছবি।

সম্ভ্রান্ত মুসলমান অক্সফোর্ড থেকে লেখাপড়া করা প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী ইউনিস্ বিলেত যাবার আগেই কলকাতায় বন্দর শ্রমিকদের আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল। দেশে ফিরে শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনীতিকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিল সে। বর্তমানে একজন এম পি। পার্টি নেতারা তাকে আদর করে 'লড়াক্কু মজদুর' বললেও নাওয়াল জানে লড়াক্কু মজদুরদের সময় এখন আর নেই। সে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছে সেকাল ও একালের মধ্যে কী দুস্তর ব্যবধান! এখন বিনোদ সেনদের মতো মানুষদের যুগ যারা হঠাৎ করে উপরিস্তর থেকে পার্টিতে এসে বুদ্ধিকৌশলে দলীয় নীতি-নির্ধারক বা তাত্ত্বিক নেতায় পরিণত হয়। যাদের সঙ্গে সাধারণ জনজীবনের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে প্রকৃত অর্থে কমিউনিস্ট পার্টির চোখে স্বপ্ন ছিল 'মজুর কিষাণের পার্টি হয়ে ওঠার স্বপ্ন আর সংকল্প'। এ কারণে পার্টি নেতৃত্ব 'মজুর কিষাণ সর্বহারাদের মধ্যে' বাইরে থেকে পার্টিকে মিশিয়ে ফেলার তাগিদ বোধ থেকে তারা সর্বহারা শ্রেণিকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে :

এ পার্টি তোমাদের। এ পার্টির নেতৃত্ব তোমাদের হাতে। তোমরা এগিয়ে এসো। নিজের পতাকা তুলে নাও। শ্রেণী সংগ্রামের পথে এগিয়ে চলো। বিপ্লবের পথে, শ্রেণীশত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, ক্ষমতাকে ছিনিয়ে নাও। সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা হবে তোমাদের নেতৃত্বে। দেশের গরীব মধ্যবিত্তরা তোমাদের সহগামী। কেন না, দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তি পাবার এটাই একমাত্র তাদের পথ। লেখাপড়া জানা বাবু কমরেডরা এই কাজেই জীবন উৎসর্গ করতে এগিয়ে এসেছেন। শ্রমিক কৃষকদের তাত্ত্বিক নেতা তাঁরা। শ্রমিক শ্রেণীর লড়াইয়ের তত্ত্ব, মার্কসবাদ বোঝানো তাঁদের কাজ। কারণ তাঁরা মার্কসবাদ কী, পড়েছেন, জেনেছেন। আর কীভাবে সেই তত্ত্বকে এদেশে এ কাজে লাগানো যাবে, তাঁরা অনুধাবন করেছেন। এবং তাত্ত্বিক হওয়া সত্ত্বেও, তাঁরা জানতেন, শ্রমিক কৃষকদের মাঝখানেই তাঁদের থাকতে হবে। তাঁদের হয়ে লড়তে হবে। নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে। তার অনিবার্য যা ফল, তাও তাঁদের ভোগ করতে হয়েছে। বর্তনিয়া আংরেজের জেলখানায় তাঁদের পচতে হয়েছে বছরের পর বছর। এসব কোনো কথাই মিথ্যা না। কেবল কি বর্তনিয়া আংরেজদের জেলখানায় তাঁরা পচে মরেছেন? আজাদীর পর, বর্তনিয়াদের দোস্ত, ধনীদের বন্ধু কংগ্রেসিবালাদের জেলখানায়ও কি তাঁদের পচতে হয়নি? (পৃ.৪৩-৪৪)

নাওয়াল নিজেও স্বাধীন ভারতে, উনিশশো উনপঞ্চাশ-এ, তিন বছরের বেশি সময় ধরে কারাবন্দি ছিল। জেলে থাকাকালীন শিক্ষিত কমরেডদের কাছে লেখাপড়া শিখেছিল সে। আগারিয়া বংশের ইতিহাস সন্ধান

Dhaka University Institutional Repository

করেছিল তখন। একজন রাজবন্দী হিসেবে অন্যান্য কমরেডের সান্নিধ্যে এসে নাওয়ালের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে 'পেশল শক্ত' অবয়ব পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। জেলজীবনে সে পার্টিকে আরও কাছ থেকে বোঝার সুযোগ পেয়েছিল। চোর, পকেটমারের মতো বন্দি যারা 'ফালতু' নামে পরিচিত, তারা রাজবন্দিদের সেবায় নিয়োজিত ছিল। পার্টির ছোট-বড় নেতাদের কাছে তারা ছিল 'লুমপেন্ট প্রোলেতারিয়েত'। কিছু কিছু ওয়ার্ডার জেলের পার্টির সঙ্গে বাইরের পার্টির যোগাযোগরক্ষী হিসেবে কাজ করত। জেলজীবনেই নাওয়াল আগারিয়া বস্তির জীবনচ্যুত হয়েছিল। এ কারণেই দেড় বছর পর চার ঘণ্টার জন্য প্যারোলে বাড়ি এলে বাবা, স্ত্রী, আট ন' বছরের ছেলে লাল্লু, ছ' বছরের মেয়ে মুনিয়া কেউই চিনতে পারেনি, তাদের কাছে নাওয়াল অপরিচিত। স্ত্রীর চোখে ছিল অবিশ্বাস ও ভয়। বাবা লছমন আগারিয়া অপরিচিত লোক মনে করে প্রশ্ন করেছিল :

"আপ...?" নাওয়াল হেসে উঠেছিল। আর রীতিমতো সহবতের সঙ্গে বাবার দু পায়ে হাত দিয়ে ছুঁয়েছিল। "ক্যায়া, দু' পয়সেকি লড়াইবালা আগারিয়া আপনা বেটাকো পহচনে নাই সক্‌তা?" ...লছমনের হাত থেকে হুঁকো পড়ে গিয়েছিল, "তুই তুই নাওয়াল? আরে আগারিয়ার বেটা! এসব কী পোশাক তুই পরেছিস? এ কী খুশ্‌বো তোর গা থেকে বেরোচ্ছে? আর এ কী চেহারা তুই করেছিস্, আঁ? তুই কে?" বলেও বাবা নাওয়ালকে জড়িয়ে ধরেছিল। তার বৃদ্ধ চোখে জল গলেছিল। "হায় রাম! তুই আমাদের সেই গাধাটা? কে বলবে তুই একজন আগারিয়া। তুই তো একটা নয়া আদমি!" (পৃ.৫২)

এমন অচেনা হওয়ার কারণ, ঊনপঞ্চাশ সালে জেলে যাওয়ার আগে নাওয়াল রাস্তায়, গাছতলায় বসা নাপিতের কাছে সপ্তাহে দুদিন দাড়ি কামাতো। জেলে বদলে গিয়েছিল তার চেহারা। ভদ্রলোকবাবু কমরেডদের মতো সে রং-বেরঙের প্যান্ট শার্ট, কুর্তা পাজামা পরতে শিখেছিল। পায়ে জুতা, শরীরের তামাটে রং ফর্সা হয়ে গিয়েছিল। নিজের হাত-পা দেখে নিজেই বিস্মিত হত নাওয়াল। গায়ে মাখতো রোজ গন্ধ সাবান; মাথায় ফুলেল তেল। নাওয়াল বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল : "নয়া আদমি কেন হবো। আমি তোমার বেটা সেই নাওয়ালই আছি।" (পৃ.৫২)

প্রথমবার ১৯৫৭ সালে লোকসভার এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর অধিবেশনে যোগ দিতে দিল্লি এসে চারশো পনেরো খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত কুতব মিনারের গায়ে হাত রেখে নাওয়াল 'পূর্বপুরুষদেরই যেন স্পর্শ করেছিল'। নিজ বংশের কারো হাতের কাজ এখানে আছে কি না এটা ভেবে শিহরিত হয় সে। মিনারের উঁচু থেকে নেমে এসে স্তম্ভের গোড়ায় সে এমনভাবে হাত বুলিয়েছিল যে তার আবেগঘন তন্ময়তা দেখে কমরেড লোকেশ পাত্র বলেছিল : "ওহে লড়াক্কু মজদুর সাহেব, তুমি কি কুতব মিনারটাকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে যাবার কথা ভাবছো নাকি?" (পৃ.৪৬)

প্রথমবার দিল্লি এসে কুতবমিনার দেখে নাওয়ালের বুকে পূর্বপুরুষদের জন্য গৌরববোধের জন্ম হয়েছিল, অথচ ১৯৫৮ সালে শীতকালীন অধিবেশনের সময় স্ত্রী লছমী চার সন্তানসহ দিল্লি এসে কুতবমিনার দেখতে গেলেও তার সময় হয়ে ওঠে না।

লছমীর স্মৃতি অনুষঙ্গে মনে পড়ে, বিয়ে তো নাওয়ালের ছ' বছর বয়সেই হয়ে গিয়েছিল। লছ্‌মী তখন আট মাসের মেয়ে। গঙ্গার ওপারে এক চটকলের স্পিনারের মেয়ে; উত্তর বিহারের দ্বারভাঙ্গায় যাদের দেশ। ১৯৩৯ সনে, ষোলো বছর বয়সে নাওয়াল বাবার কারখানায় ছ'আনা রোজে মজদুর হিসেবে যোগ দেয়। বাবা সে বছরই কাজ ছাড়ে। বেদামী লছমন কর্তৃক প্রহৃত-লাঞ্ছিত হয়েও, পুত্র বধূদের উপর ছিল নির্দয়। অত্যাচারিত বধূ, ভয়ংকর শাশুড়িতে পরিণত হয়েছিল। বেদামী রোজগারহীন স্বামী লছমনের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করত। ইতোমধ্যে নওরঙ পৃথক সংসার পেতেছে বস্তির পাশেই; বাবা লছমন সেখানে গেলেও মা বেদামী যেত না। নাওয়ালের উনিশ বছর বয়সে প্রথম ছেলে হয়; তার মুখ দেখে মা মারা যায়। লছমী তখন থেকেই ঘরের গিন্নি।

Dhaka University Institutional Repository

যাদের লড়াই তারাই নেতা

পারিবারিক এ সব ঘটনা উপনিবেশিত ভারতবর্ষে শৈশব থেকে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ঘেরাটোপে আবদ্ধ শ্রমিক বস্তিতে বেড়ে ওঠা লছমন আগারিয়ার ছেলে নাওয়াল আগারিয়ার মনোজগতে দূরসঞ্চারী প্রভাব ফেলে। রামদাসের বিশ্বাসের বিপরীতে লছমন যে প্রতিবাদী লড়াইয়ের সূচনা করে তাকে এগিয়ে নিয়ে যায় নাওয়াল আগারিয়া।

শ্রমিক হিসেবে নাওয়াল শ্বেতাঙ্গ বর্তনিয়াদের কোম্পানি মনোনীত প্রতিনিধির অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। পাঁচ বছর কারাবাস শেষে বিয়াল্লিশের গোড়ায় মুক্ত হয়ে আসা লোকেশ পাত্র শ্রমিকদের সাধারণ দাবিপত্রের ভাষা পাল্টে দিয়ে মালিক শ্রেণির সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে যে সংঘাতের সূত্রপাত করে সেই প্রেক্ষাপটে নাওয়ালের ভূমিকা তাকে 'লড়াকু মজদুর' করে তোলে। লোকেশ পাত্রের লেখা ইংরেজি দাবিপত্র নিয়ে নাওয়াল-এর সহকর্মী ইসরাইল কোম্পানির ম্যানেজারের কাছে গিয়েছিল। শ্রমিকদের সেই দাবিপত্রের ভাষ্যে নিচের অংশটি লেখা থাকার কথা :

হুজোর মানিজার সাব, ইঞ্জিনার সাব, অফিস মাষ্টার সাব, আমরা ভুখা মরছি। আমরা আপনাদের পুরানিয়া মজদুর, আপনাদের গোলাম। বাজার বহুত মাহংগি। গোর লাগি, আট ঘণ্টায় রোজ করুন। জায়দা ঘণ্টার জন্য জায়দা পয়সা দিন। আপনারা যাতে আমাদের অবস্থা বুঝতে পারেন, সেই জন্য, আমরা আগামী শুক্রবার কাজ বন্ধ রাখবো। হুজোর! আপনারা এই গরীব মজুরদের দাবী কৃপা করে বিবেচনা করুন। (পৃ.৫৯)

কিন্তু সমরেশ বসু উপন্যাসে দেখাচ্ছেন যে দাবিপত্রে উল্লিখিত লেখার পরিবর্তে নিচের কথা লেখা ছিল :

এটা আমাদের আখেরি হুঁশিয়ারি, কোম্পানী আট ঘণ্টা কাজের দাবী না মেনে নিলে, আমরা তাবত মজুর শ্রমিকরা আগামী শুক্রবার একদিনের জন্য প্রতীক ধর্মঘট করবো। দাবী না মানা হলে, ধর্মঘট লাগাতার চলবে। কোম্পানীর জানা উচিত আমরা ফ্যাসিস্ট দুশমনদের সঙ্গে লড়ছি। কোম্পানী আমাদের দাবী না মেনে নিলে, বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে ; ইত্যাদি। (পৃ.৫৯)

ভিন্নধর্মী দুই ভাষ্য সম্পর্কে সমালোচকের কালিক বিশ্লেষণ বিবেচনার দাবি রাখে : "এই দুই ভাষ্যের মধ্যে যেটুকু দ্বন্দ্ব বা সমান্তরালতা—তখনকার দিনের শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তব আর কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যবর্তী দ্বন্দ্ব বা দূরত্বের ছবিটি তুলে ধরে। ...ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম ও ঐক্যের–যুদ্ধের ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও শ্রমিক সংগ্রামের শর্ত মানা ছিল তখন কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান সমস্যা।"[২৯] এ সমস্যাকে লেখক ইতিহাসে এম.এ. পাশ লোকেশ পালিত চরিত্রের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করেছেন। এ ধরনের পার্টি নেতৃত্বের কারণেই শ্রমিক আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে বারবার। 'সাহেবরা বাবার মতো'—এতোদিন ধরে জেনে আসা এ বিশ্বাস মুহূর্তেই ভেঙে পড়ে নাওয়াল, ইসরাইল, টিণ্ডাল, আবদুল, সিপত আর রঘুয়ার মতো শ্রমিকদের। তাদের সামনেই ইঞ্জিনিয়ার বিল্‌সানের অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয় ইসরাইল। প্রতিবাদ জানায় নাওয়াল।

প্রতিবাদী নাওয়াল পাল্টা আক্রমণের পূর্বমুহূর্তে বিল্‌সানের উদ্দেশে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে তাতেই প্রমাণ হয় সুসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে থেকেই কীভাবে ধীরে ধীরে যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্বের সৃষ্টি হচ্ছে যাদেরকে সামনে রেখে কমিউনিস্ট পার্টি এক সময় ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছে যায়। এবং সম্ভাবনাময় এসব শ্রমিকনেতা শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাকেন্দ্রে পৌঁছে এর উপভোগ্য জীবনে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে, পার্টির নীতিবিচ্যুতি ও কৌশলের শিকার হয়ে নিক্ষিপ্ত হয় অতলান্তিক তমসার শূন্য গহ্বরে।

১৯৩০ সালের সাত বছর বয়সী নাওয়াল ১৯৩৫ সালে প্রত্যক্ষ করেছিল বাবার দুই পয়সার লড়াই। ১৯৩৪ সালে নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪২ সালের ৫ আগস্ট বৈধতা পায়—নাওয়াল এ সময় হয়ে ওঠে

Dhaka University Institutional Repository

লড়াকু মজদুর। সাহেবকে ধরে পেটানোর সংবাদে লছমন তার পিতা রামদাসের মতো করেই নাওয়ালকে বলেছিল : "আরে, খুনী আগারিয়া বংশের কলঙ্ক, তুই কী করতে যাচ্ছিস?" এ সময়ের শ্রমিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সমরেশ বসু নাওয়ালের মতো চরিত্রকে চূড়ান্ত বিশ্বাসযোগ্যতায় উপস্থাপন করেছেন।

আতপুর-জগদ্দলে বাসকালীন সমরেশ বসু ওই এলাকায় শ্রমিক সংগঠনের কাজের সূত্রে কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁর যোগদানের দীক্ষাগুরু সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তের সান্নিধ্যে নৈহাটি-জগদ্দল-টিটাগড়ের শ্রমিক আন্দোলনের উত্তাল সময়ের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিলেন। সে সময়ের অভিজ্ঞতার আলোকেই তিনি †kKj †Qov nv‡Zi †Lv‡R উপন্যাসে শ্রমিক আন্দোলনের এমন বিশ্বাসযোগ্য চিত্র এঁকেছেন। 'অখণ্ড ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমি' শীর্ষক রচনায় ঔপন্যাসিকের সে সময়ের অভিজ্ঞতার বর্ণনা নিচের অংশে :

"এই সময়ে (১৯৪৬–অ.বি.), 'অ্যালায়েন্স জুট মিল'-এ দারোয়ানরা একটি শ্রমিককে পিটিয়ে মেরে ফেললেন। তার পরিণাম হল মারাত্মক। শ্রমিকরা নিজের হাতে নেতৃত্ব নিলেন। তাঁরা লাঠি হাতে মারমুখো হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কারখানায় কারখানায় ভাঙচুর শুরু হল। তাঁত মেশিনগুলো তুলে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হল। ...সেই খ্যাপা ক্রুদ্ধ অনিয়ন্ত্রিত শ্রমিকদের সামনে দাঁড়িয়ে জগদ্দলের অবিসংবাদী নেতা সত্য মাস্টার বোঝাবার চেষ্টা করলেন। আমি সেই প্রথম দেখলুম, শ্রমিকরা সত্য মাস্টারকে বললেন, 'তফাত যাও! আজ জান কা বদলা জান চাই!'...হাজার হাজার শ্রমিক তাঁর চোখের সামনে দিয়ে ছুটে চলেছে কারখানায় কারখানায়। মেসিন ভাঙছে। উপড়ে ফেলে দিচ্ছে গঙ্গায়। পুলিশ গুলি চালাবার আদেশের অপেক্ষায়। কুঠিতে সাহেবরা ভয়ে ভয়ে আছে।"

সমরেশ বসুর এ অভিজ্ঞতা উপন্যাসের নিচের অংশের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ :

হ্যাঁ, গঙ্গার এপার ওপারে, কখনও কখনও দৈবাৎ সেরকম ঘটনা দু-একটা ঘটেছিল। শোনা গিয়েছিল, টিটাগড় কাগজ কলে মজুররা একবার সাহেবকে ধরে মেরেছিল। (পৃ.৬১)

কিন্তু সম্ভাবনাময় এ আন্দোলনের নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণির হাত থেকে ক্রমেই ক্ষমতালোভী স্বার্থপরদের হাতে চলে যাওয়ায় নাওয়ালের মতো সম্ভাবনাময় শ্রমিক নেতাকে শৃঙ্খল ভাঙার সংগ্রামে লিপ্ত হয়েও নতুন শৃঙ্খলে বাঁধা পড়তে হয়। সেখান থেকে সব হারিয়ে শূন্য হয়ে আবার শেকল ছেঁড়া হাতের সন্ধানেই সে বেরিয়ে পড়ে।

ঔপন্যাসিক ব্যথাহত স্মৃতিতাড়িত মদ্যপ নাওয়ালের গৌরবময় সংগ্রামী জীবনকে চেতনাপ্রবাহরীতিতে উপস্থাপন করেছেন। কিশোর নাওয়াল পর পর দু বার শ্রমিক নেতা হিসেবে মনোনয়ন পেয়ে এম.পি. নির্বাচিত হয়। দলের নির্বাচনমুখী সংশোধনবাদ তার গোত্রান্তর ঘটায়। ক্ষমতাধর গোষ্ঠীর একজন হিসেবে উপভোগ্য জীবনের অংশী হয়ে শ্রমিক শ্রেণির নিজস্ব পরিচয় ভুলে যায় সে। হাঙলের মতো আন্তর্জাতিক নেতা (স্বাধীনতার আগেই যার জন্য বরাদ্দ করা হতো লাক্সারি রেল সেলুন, যিনি প্যারিসের নামকরা সাবেকি আর দামী সুগন্ধি ব্যবহার করতেন)-র সঙ্গে রাশিয়া ভ্রমণে গিয়ে সে বুঝেছে বিলাসিতাপূর্ণ জীবনের অর্থ। লোকসভাতে তার বক্তৃতা শুনে সরকার পক্ষকে বিব্রত হতে হয়, নির্বাচনী সভায় তাকে ব্যবহার করা হয় মজুরের 'এ্যাজিটেটিং' বক্তৃতার জন্য। ইন্দিরা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু পার্লামেন্টে তার বক্তৃতার ধরনকে অদ্ভুত কাণ্ড ও চেঁচামেচি বলে মনে করেন। ভাবটা এই—'কমিউনিস্ট পার্টি কী চিজ পার্লামেন্টে আমদানী করেছে।' নিজ দলীয় পার্লামেন্টারিয়ান প্রেমকুমার গর্গও প্রকাশ্যে তার পিঠ চাপড়ে বলছে—'যা একখানা এ্যাল্‌সেশিয়ান আমাদের আছে। একবার লেলিয়ে দিলেই হল!' (পৃ.৭২) সরলপ্রাণ এসব নেতা খুব সহজেই ক্ষমতার ক্লেদ গায়ে মেখে শেষ পর্যন্ত পতিত হয়েছে 'গাড়্‌ঢা'য়। এবারের উপনির্বাচনেও তাকে প্রার্থী করা হয়নি, এটা জেনে নাওয়াল পেছন ফিরে তাকায়। একাকী সঙ্গীহীন জীবনে

Dhaka University Institutional Repository

অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। তখনই সে প্রবৃত্ত হয় আত্মবিশ্লেষণে, অনুভব করে ফেলে আসা জীবন তথা শেকড়ের টান।

পার্টির ক্ষমতালোভী নেতৃত্ব এভাবেই নাওয়ালকে সামনে রেখে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করেছে। দলের সৎ, নিষ্ঠাবান নেতা ভবনাথ দলের এ চরিত্র সম্পর্কে আগে থেকেই তাকে বারবার সাবধান করেছিলেন। তিনি নাওয়ালকে বলেছেন বিপ্লবের স্বপ্নটা মূলত মধ্যবিত্তের। এ স্বপ্ন পূরণের জন্য লড়াইটাও তাদের। তবে এককভাবে মধ্যবিত্ত এ স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে না বলেই সাধারণ জনশ্রেণিকে সংগঠিত করে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়। সেজন্যই প্রয়োজন হয় বিভিন্ন সংগঠন, রাজনৈতিক আদর্শের নির্মাণ ও পুনর্গঠনের। এ সম্পর্কে নাওয়াল হাঙ্গলের সঙ্গে রাশিয়ায় গিয়ে আরও বিস্তারিত জেনেছে। স্মৃতিচারণসূত্রে নাওয়ালের মনে পড়ছে :

তিনি বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, শ্রমিক নেতৃত্ব দেবে না। শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শে, সর্বহারার তাত্ত্বিক নেতা, কমিউনিস্ট ইনটেলেজেনসিয়ারা পার্টির নেতৃত্ব দেবে। যেমন লেনিন। পার্টির ইনটেলেজেনসিয়া থেকেই তিনি এসেছিলেন। (পৃ.৯৮)

ফোনে নাওয়াল জেনে যায় এবারের উপনির্বাচনেও তাকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়নি। দিন দিন তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে। তার বক্তৃতায় দলীয় কোনো কার্যসিদ্ধি হয় না। নিজ দলের লোকেশ পালিতের মতো নেতাদের কাছ থেকেই নাওয়াল সবচেয়ে বেশি অপমানাহত হয়েছে। লোকেশ পাত্রের পরিবর্তে নাওয়ালকে যেতে হবে নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা করতে এটি শুনে মধ্যবিত্তের এলাকায় তার বক্তৃতা গ্রহণযোগ্য হবে কি না এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে উত্তরে সে যা জানায় তাতে বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বের নির্মমতাই প্রকাশিত হয়েছে। "আরে ঐটাই তো আমাদের ভদ্রলোকদের মজা। তারা খুব বুদ্ধিমান লোক, কিন্তু মজুরের নাম শুনলেও তাদের গায়ে এখনও বিপ্লবের কাঁটা দিয়ে ওঠে। ইনটেলেকচুয়াল বক্তৃতার থেকেও, তারা মজুরের এ্যাজিটেটিং বক্তৃতার বেশি তারিফ করে।" (পৃ.৭২)

বর্তমানে নাওয়াল কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। নাওয়াল হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিল। মাছ-মাংস আগের মতো জোটে না। আলু বেগুন কুমড়ো ভাজা পেলেই অনেক পাওয়া। ভেজা ছোলা অল্প তেলে ভেজে চীনা মাটির ফাটা প্লেটে লছমী পাঠিয়েছিল। সে নিজের টাকায় হুইস্কি কেবল মাসে একবার খায়। পেনশনের টাকা যেদিন ব্যাংক থেকে তোলে সেদিনই সে শুধু সস্তা দামের দেশি হুইস্কি কিনে খায় অন্যদিন ইচ্ছে হলে দেশি মদ। অবশ্য নিজের 'ভেতরের বিতৃষ্ণার সঙ্গে জড়ানো মানসিক গ্লানি. ক্ষোভ, দুঃখ ও অপমানবোধ' থেকে ইচ্ছেটা খুব বেশি হয় না। যেদিন হয় খুব তীব্রভাবেই হয়। ১৯৪২ সালে লাল্লুর জন্মের সময় থেকেই পানশালায় যেতে শুরু করেছিল নাওয়াল। তবে বাবার মতো মাতাল সে কখনো হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপট, যুদ্ধের বোমার ভয়ে জমা অর্থের অতিরিক্ত টাকা নিয়ে, ঠিকাদার হালদারবাবুর কোম্পানি থেকে পলায়ন, ইংরেজ মালিক কর্তৃক সরাসরি শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো, কালোবাজারি, মজুতদারির কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র—চাল, ডাল, কাপড়ের দুষ্প্রাপ্যতা এসব নানা কারণে মালিকদের কাছে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি উত্থাপন, মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে নিয়মিত মিটিং-এ পরিস্থিতি সৃষ্টির কিছুদিন আগে থেকেই, রাজনৈতিক মঞ্চে কমিউনিস্ট পার্টির আবির্ভাব ঘটে। উজাগরবাবু যিনি আট বছর আগেই লছমনের কাছে শ্রমিক-মালিকদের মাঝখান থেকে ঠিকাদারবাবুকে সরানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি প্রথমেই শ্রমিকদের দাবি অনুধাবন করে নিজেদের দাবি উত্থাপন করেছিল :

"ঠিকাদার হটাও। কোম্পানী হাত বাড়াও।" ঠিকাদারের টাকা দিয়ে মজুরি বাড়াও। পুরানিয়া মজুরদের নোকরি পাকা কর। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড চালু কর। আট ঘণ্টার বেশি কাজ হলেই, বাড়তি মজুরি দিতে হবে। নয়া মজুরদের জন্য মজুরি বাড়াও।

Dhaka University Institutional Repository

কাজ নেই তো, পয়সা নেই, নয়া মজুরদের জন্য এ ব্যবস্থা ছ' মাসের বেশি চালু থাকবে না। তার নোকরিও পাকা করতে হবে। সস্তা রেশন দিতে হবে। আর সেটা কোনো গায়ের জোরের কথা ছিল না। সরকারি কানুন মোতাবেক সব দাবী করা হয়েছিল। (পৃ.৫৭)

শ্রমিকদের কাছে লাল ঝাণ্ডা পার্টি হিসেবে পরিচিত কমিউনিস্ট পার্টির দাবিতে শ্রমিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হওয়ায় খুব সহজেই তারা এর দলীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। এ সময়েই উনিশ বছর বয়সী নাওয়াল উজাগরবাবুর মাধ্যমে পরিচয় হওয়া বাঙালি কমরেড লোকেশ পালিতের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসে। ১৯৪৩ সালে তাকে পৃথকভাবে না চিনলেও নাওয়ালের লড়াকু রূপ তাকে বিশেষভাবে তার কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বাস্তবতায় বারো ঘণ্টা কাজ করে এক টাকা চার আনা রোজে নাওয়ালের মতো অন্য শ্রমিকদেরও জীবনধারণ করা অসম্ভব হওয়ায় তারা বাধ্য হয়ে মালিকপক্ষের নিকট দাবি পেশ করেছিল। অন্যদিকে এতোদিন ঠিকাদারবাবুর মাধ্যমে শ্রমিকদের কাজ করিয়ে নিত মালিক ইংরেজ সাহেবরা। কাজেই শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। কিন্ত ঠিকাদারবাবুর পলায়নের পর যুদ্ধের বাজারে চারগুণ বেশি ইঞ্জিনিয়ারিং মালের চাহিদা মেটানোর জন্য ইংরেজরা শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানোর শুরুতেই যখন নানা দাবি-দাওয়ার মুখোমুখি হয় তখন তারাও দিশেহারা হয়ে পড়ে।

এ পরিপ্রেক্ষিতেই পুরনো দিনের বয়লার মিস্তিরি ইস্‌রাইলের ন্যায্য দাবিপত্রের প্রতিক্রিয়ায় ইংরেজ বিল্‌সান (উইলশন) তার ওপর নির্মম নির্যাতন চালালে এর প্রতিবাদ জানায় নাওয়াল। মুখে থুতু ছিটিয়ে, ঘুষি মেরেও শান্ত হয়নি বিল্‌সান—জুতো পায়ে তাকে যখন লাথির পর লাথি মেরে ডিপার্টের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তখনও বাধা না দিয়ে হাত জোড় করে রেখেছিল ইস্‌রাইল। তার ওপর চালানো নির্যাতন দেখে সহকর্মী ও সহযাত্রী টিণ্ডাল আবদুল, সিপত, রঘুয়া অফিসের বারান্দা থেকে নিচে নেমে এলেও কিংবা আর কেউ এগিয়ে না এলেও দুই পয়সার লড়াইবালা লছমনপুত্র নাওয়াল এ অন্যায় মেনে নেয়নি। তার ভেতরের প্রতিবাদী সত্তা 'মত্ত মাতঙ্গের' মতো বিল্‌সানের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। নাওয়ালের প্রতিবাদী নির্ভীক উচ্চারণ নিচের অংশে :

বর্তনিয়া, তোমার হাত গোর জুতা তোমার। মগর তুমি ধোবী না। ইস্‌রাইল ভাই তোমার কাচবার কাপড়া না, যে জিস্‌কা ফাটে উস্‌কা ফাটে, ধোবীকা ক্যায় হ্যায়। লুটিস জুতার নিচে পিষতে পারো। মারতে পারো না। মার থামাবে, না তো মার খাবে। (পৃ.৬০)

লছমন কিংবা অন্যান্যরা যারা বয়সের কারণে 'কাজ থেকে ছুটি করেছিল' তারা নাওয়ালের এ প্রতিবাদী আচরণকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। যদিও তাদের স্মরণে ছিল 'দুই পয়সার লড়াই'য়ে ঠিকাদার ও তার গুণ্ডাদের হাতে লছমন অন্যায়ভাবে মার খেয়েছিল বলেই পরবর্তীতে সংগঠিত হয়ে সম্মিলিত প্রতিবাদ জানানোয় শেষ পর্যন্ত তারাই জয়ী হয়েছিল। কিন্তু তার পুত্র নাওয়াল ইসরাইলকে অন্যায়ভাবে মারার প্রতিবাদে ১৯৪২ সালে ইংরেজদের শাসনকালে ইংরেজ সাহেবকে যেভাবে মেরেছিল সেটা সহজভাবে নিতে পারেনি তারা। স্বয়ং লছমন পুত্রের এ আচরণের জন্য তাকে তিরষ্কার করেছে। শুধু তাই নয়, নাওয়াল কর্তৃক ছুঁড়ে ফেলা বিলসানকে "হুজোর, বাবা, আসুন।"—বলে ছাইগাদা থেকে তুলে আনতে গিয়ে শরীরে তার ছিটিয়ে দেয়া থুতু মেখেছে।

পার্টির যুক্তি ও কৌশল না বুঝে আবেগচালিত হয়ে নাওয়াল তার প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু ইংরেজরা তখন ফ্যাসিবিরোধী লড়াইয়ে সামিল হয়েছিল বলে কমিউনিস্ট পার্টির যে বিশ্বাস তাতে সে সময় ধর্মঘট করা কমিউনিস্ট পার্টির নীতিবিরোধী ছিল। এ কারণে সাহেবকে মারার অপরাধে পুলিশি গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য লোকেশ পালিতের পরামর্শ গ্রহণ না করে বলেছে :

Dhaka University Institutional Repository

"আমরা কেউ কোথাও যাবো না। দোষ আমরা কিছু করিনি। করেছে আংরেজ সাহেব। আমাদের চোখের সামনে বিলসান সাহেব ইস্‌রাইল ভাইকে জানে মারতে চেয়েছিল। হাঁ, তুম্ কোমপানীবালা আংরেজ, আমরা হিন্দোস্তানি। ত দরখাস্ পেস্ করতে গেলে, তুমি জুতা লাথ্ চালাবে?" (পৃ.৬২)

বাবা লছমন তাকে অভিযুক্ত করে "তুই গোলামের গোলাম, সাহেবের গায়ে হাত তুলিস্?" বললে বিস্মিত নাওয়াল এক সময়ের দু পয়সার লড়াইবালাকে কালান্তরের পরিবর্তিত সত্য ও শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামী মনোভাব প্রকাশ করে জানিয়েছে :

"হ্যাঁ, দো পয়সাকে লড়াইবালা, তুমি ঠিকাদারবাবুর মার খেয়েছিলে, দু'পয়সা আদায় করেছিলে। তোমরাও কি আট ঘণ্টা মজুরির কথা তোলনি? উজাগরবাবা কি তোমাদের ঠিকাদারবাবু হঠাবার পরামর্শ দেয়নি? তুমি তোমার ব্যাটাকে মারতে চাও, মারো। কিন্তু তুমি মনে রাখবে, জমানা বদলে গেছে। বাবু হও, আর সাহেব হও, মারলে মার খাবে।"... সবাই চিৎকার করে নাওয়ালের জয়ধ্বনি করেছিল।"(পৃ.৬২)

লোকেশ পালিত ত্রিশ বছর বয়সের কাছাকাছি সময়ে আধুনিক ইতিহাসে এম.এ. পাশ করে, কমিউনিস্ট আদর্শ গ্রহণ করেন। পাঁচ বছর কারাবাস শেষে বিয়াল্লিশের গোড়ায় তিনি জেলমুক্ত হন। উপন্যাসে তার ভূমিকা বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে ঔপন্যাসিক প্রকৃত অর্থে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ও 'জনযুদ্ধের' কৌশল ও নীতি বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও দ্বিধা সম্পর্কে নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করেছেন। যা তাদেরকে কংগ্রেস ও সাধারণ জনশ্রেণি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। সাধারণ জনশ্রেণির সামনে তখন ঔপনিবেশিক ইংরেজ ছাড়া অন্য কোনো 'বড়া লুটেরাওয়া' ছিল না। অথচ অভিজাত শিক্ষিত পরিবারের সন্তান হয়েও 'লাল ঝাণ্ডা পার্টি'-র নেতা লোকেশ পালিত সাধারণভাবে শ্রমিকদের সঙ্গে মেলামেশা করেন। তিনি মজুরদের বেতন বৃদ্ধি, ঠিকাদারদের পরিবর্তে মালিক-শ্রমিক সরাসরি যোগাযোগ, কম পয়সায় রেশন চালুর দাবি নিয়ে কথা বললেও ফ্যাসিবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া ইংরেজ শক্তির সঙ্গে মিত্রতার বন্ধনে বাঁধা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হিসেবে লোকেশ পালিত পার্টি নীতি রক্ষার জন্য শ্রমিকদের ধর্মঘট করার পরামর্শ দেন না। এখন ইংরেজরাও 'জনযুদ্ধে সামিল হয়েছে' এটা শ্রমিকদের সামনে বলতে সঙ্কোচ হলেও তিনি তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন "আন্তর্জাতিক ফ্যাসি বিরোধী সংগ্রামে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সাময়িক আপোষের পন্থা নেওয়া হয়েছিল। শ্রমিক-মালিক বিরোধ মিটমাট করে, উৎপাদন ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখাই সেই সময়ের দায়িত্ব।"(পৃ.৬২) নাওয়াল লোকেশের ধর্মঘটবিরোধী মনোভাবে কঠিন মুখে জানতে চায় : "ত, বিনা ফয়সালায় আমরা কাজ করতে যাবো? আমাদের দাবীর কী হবে? কোমপানী কী চায়? দাবী করলে আমাদের পিটবে, আর আমরা তারপরে কাজ করব? আমাদের আংরেজ বিলসান কি আমাদের দুশমন না? আমাদের লড়াইয়ের কী নাতিজা?" (পৃ.৬৩)

পুলিশ এলে সকলের মধ্যে গুঞ্জন উঠলেও 'জান কবুল করা' নাওয়াল বাবার লড়াইয়ের দিনগুলোতে ফিরে গেছে। লড়াইওয়ালাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদী দৃশ্য তার সামনে এসেছে :

"কোনো মজদুর যদি কারখানা ছেড়ে চলে যেতে চায় তো তাকে মানা করবো না। তবে একটা কথা বলবো, আমরা অন্যায় করিনি। আমাদের কোনো ভয় নেই। আমরা আখেরি বিচারের জন্য এখান থেকে নড়বো না।" (পৃ.৬৪)

একই কথার প্রতিধ্বনি আহত ইসরাইলের কণ্ঠে :

"আমাদের একজনকেও যদি পুলিশ গ্রেপ্তার করে, আমরা কেউ ঘরে ফিরবো না। একজনকে ধরলে আমাদের সবাইকে ধরে নিয়ে যেতে হবে। যারা রাজী নও, তারা এখনই চলে যেতে পারো।" (পৃ.৬৪)

Dhaka University Institutional Repository

সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর উপস্থিতিতে থানার বড় অফিসার নাওয়াল সাহেবকে মেরেছে কিনা জানতে চাইলে সে স্পষ্ট জানায় : "মেরেছি।"(পৃ.৬৫) এ অপরাধে তাকে গ্রেপ্তারের কথা বললে ইস্‌রাইল নির্দ্বিধায় জানতে চায় "আর সাহাবকো কৌন গ্রেপ্তার করে গা?---সাহেব আমাকে বেআইনি পিটিয়েছে।" (পৃ.৬৫)

১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার ও পিটিয়ে অভ্যস্ত পুলিশ অফিসার শ্রমিকদের এ সাহসিকতা আগে কখনো দেখেননি। লোকেশ পালিত, কমরেড নাওয়াল আগারিয়া, ইসরাইল ও সিপতজীর দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে তাদেরকে নিজেদের অবস্থানে অটল থাকার পরামর্শ দেন। শেষ পর্যন্ত ডিরেক্টর জেনারেল অব মিউনিশন প্রোডাকশনের অফিসাররা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে উৎপাদন অব্যাহত রাখার অভিপ্রায়ে শ্রমিকদের সঙ্গে দ্রুত মীমাংসার চেষ্টা চালান। বাঙালি অফিসারের সঙ্গে নাওয়াল তাদের সকল দাবি উত্থাপনসহ গভীর আত্মবিশ্বাস ও সাহসিকতার সঙ্গে বিলসানের সঙ্গে তার সংঘাতের কারণ ব্যাখ্যা করে জানায় :

"সার, মারদাঙ্গা তো কসুর জরুর। কিন্তু ইস্‌রাইলকে উনি যেভাবে মারছিলেন, সেটা আরও বড় কসুর।" (পৃ.৬৬)

শেষ পর্যন্ত কোম্পানি সাহেব এবং সরকারি সাহেব, শ্রমিক শ্রেণির দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়– আগামী মাস থেকে আট ঘণ্টা কাজ, বাকি সময় ওভারটাইম পাবে শ্রমিক আর বাবুরা। নাওয়ালের ভেতরে লোকেশ পালিত তার স্বপ্নের নায়ক ম্যাকসিম গোর্কির "মা" উপন্যাসের মজুর নায়ক প্যাভেলকে আবিষ্কার করে। যে তার ঠাকুর্দা রামদাস আগারিয়া, বাবা লছমন আগারিয়ার 'জমানা' বদলে যাওয়ার কথা বলেছিল। শুধু তাই নয়– চাকরিচ্যুতি, পুলিশি গ্রেপ্তারসহ ভবিষ্যতের নানা অনিশ্চয়তার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও কোনো নীতি, কৌশল দ্বারা চালিত না হয়ে অস্তিত্ব রক্ষার অনিবার্য প্রয়োজনে নাওয়াল অধিকার আদায়ের সংগ্রামী নায়কে পরিণত হয়।

'যাদের লড়াই তারাই নেতা' পর্বে এভাবেই নাওয়াল আগারিয়া, কমরেড নাওয়াল আগারিয়া হয়ে ওঠে। কলকাতার পার্টি হেড কোয়ার্টারে এসে লোকেশ পালিত কমরেড মুজাফ্‌ফর আহ্‌মেদকে কারখানার ঘটনা রিপোর্ট করতে গিয়ে নাওয়ালের বীরত্ব, মালিক পক্ষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের রুখে দাঁড়ানোর যে সংগ্রামী মনোভাব ও সাহসিকতার কথা জানান তাতে তিনি ভবিষ্যৎ পার্টি নেতৃত্বের উত্থানের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। লোকেশ পালিতকে নাওয়াল আগারিয়া সম্পর্কে কমরেড মুজাফ্‌ফর আহ্‌মেদ অত্যন্ত খুশি ও উৎসাহের সঙ্গে বলেন :

কমরেডরা মনে রাখবেন, এরকম করেই একজন লড়াকু মজদুরের জন্ম হয়। আমাদের কাজ হল গিয়ে পার্টির তত্ত্ব, আদর্শ আর নীতির দ্বারা এদের শিক্ষিত করে তোলা। নাওয়ালরাই পার্টির ভবিষ্যতের নেতা। ... (পৃ.৬৭)

চূড়ান্ত ব্যর্থ জীবনের উপান্তে এসে নাওয়াল লড়াকু দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বুঝতে পারছে, সে আসলে নিজেকে চিনতে পারেনি কখনো। যদি সেটা পারত তাহলে তার পক্ষে এ মুহূর্তের করণীয় কী সেটাও ঠিক করা সম্ভব হত। কাজেই সে নতুন করে পেছন ফিরে নিজেকেই খোঁজার চেষ্টা করছে।

শিকল পরার ছল?

নাওয়ালের মতো অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামী নায়কদের সম্ভাবনাকে ব্যবহার করে বামপন্থী দল ক্ষমতায় গেলেও শেষ পর্যন্ত দলীয় সুবিধাবাদী কৌশল ও নীতির কারণে কীভাবে তারা শৃঙ্খলিত, আদর্শচ্যুত ও

Dhaka University Institutional Repository

গোত্রান্তরিত হয় সে আখ্যান রয়েছে স্মৃতিকথনের 'শিকল পরার ছল' অংশে। দৃশ্যকল্প, শব্দকল্প ও শ্রাব্যকল্পের সমন্বয়ে ঔপন্যাসিক হুইস্কি পানরত বিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল, বিপর্যস্ত নাওয়ালের আত্ম-অনুসন্ধানসূত্রে পার্টি চরিত্র উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট হয়েছেন। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন ও পরিস্থিতি নির্মাণের উপকরণ নির্বাচন প্রতীকী, তাৎপর্যপূর্ণ :

মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। একটা চড়ুই যেন চিক্ চিক্ করে ডেকেই চলেছে। টেবিলের নিচে কোথায় একটা ছেঁড়া পোস্টার পড়ে আছে। সেটা মাঝে মাঝেই মাটিতে ঝাপটা খাচ্ছে। টিকটিকির মুখে আরশোলার পাখা ঝাপটাবার মতো শব্দ। নাওয়াল এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে মুখ উঁচু করলো। মাথার ওপরে পাখা ঘোরা সত্ত্বেও গলায় ঘাড়ে ঘাম জমছে। সে সার্টের কলার সরিয়ে ডানদিকে ঘাড় ফেরালো। দেওয়ালে লাল অক্ষরের লেখাগুলো চোখে পড়লো। "সমস্ত রকম কুসংস্কার ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীকে শিক্ষিত সচেতন করে তুলতে হবে।" (পৃ.৬৭-৬৮)

এরপরই বেজে ওঠা টেলিফোনের শব্দে নাওয়াল স্মৃতিময় হয়ে ওঠে। লোকেশ পালিতের কণ্ঠ শুনে জেলা কমিটি থেকে প্রাদেশিক কমিটিতে দ্রুত নাম ওঠা লড়াকু শ্রমিক নেতা নাওয়ালকে কেন্দ্র করে পার্টির অন্তর্কলহ, ক্ষমতার প্রতি তার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ তৈরির পটভূমিতে পার্টির ভূমিকা কোথায়– এসব অতীত সামনে আসে তার।

এক সময় যারা নাওয়ালের বিরোধী শক্তি ছিল তাদের সঙ্গে লড়াই করে লোকেশ পালিত নাওয়ালের পক্ষাবলম্বন করত। অথচ আজ সে বিশ্বাস করে শ্রমিকের স্থান 'লড়াইয়ের ময়দান', পার্লামেন্ট নয়। পার্লামেন্টে শ্রমিক কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না। এতে করে শুধু যে শ্রমিকের প্রকৃত চরিত্র নষ্ট হবে শুধু তাই নয়, বরং দলীয় ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা। এভাবে পার্টি জনসাধারণের কাছে 'হাস্যাস্পদ' হয়ে উঠবে বলেও তার অভিমত। তিনবার এমপি হিসেবে নির্বাচিত লোকেশ পালিত "নাওয়াল আগারিয়া তাঁর আবিষ্কার। তাঁর হাতে গড়া শ্রমিক ক্যাডার," (পৃ.৬৮) এমন কথা বলতে গৌরব বোধ করলেও সেই কমরেডই লোকসভা নির্বাচনে নাওয়ালকে প্রার্থী করার বিরোধিতা করেছে, তিরস্কার করেছে তাকে। "নাওয়াল জানতো নানারকম ছোটখাটো মতভেদ থাকলেও সমস্ত পার্টি একটি এক-মন, এক-প্রাণ, একান্নবর্তী সংসার। তেমন সংসারেও ছোটখাটো বিবাদ-বিসম্বাদ থাকতেই পারে।" (পৃ.৬৯)

সারা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বড় তাত্ত্বিক নেতা জগৎ সেন ও পরবর্তীকালে পাল্টে যাওয়া কমরেড লোকেশ পালিত—প্রাদেশিক কমিটির শীর্ষ পর্যায়ের নেতা ভবনাথ গুপ্ত-চরিত্রের মধ্যদিয়ে দলীয় অন্তর্কোন্দল ও ষড়যন্ত্র-তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে নাওয়াল। ক্ষমতালোভী কমরেডদের আক্রমণাত্মক ভঙ্গি সম্পর্কে কোনো পূর্বধারণা না-থাকায় নাওয়াল বিস্মিত হয়েছে বারংবার। নির্বাচনে পার্টির টিকেট পাওয়া নাওয়াল, তার প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতা লোকেশ পাত্রের বিরোধিতার কথা বিশ্বাস করতে চায়নি। স্বভাবজাত সরলতায় লোকেশের কাছে এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে 'উগ্র রুক্ষ মেজাজে দাঁত খিঁচিয়ে' তার যে প্রতিক্রিয়া তাতে নাওয়াল শুধু বিস্মিতই হয়নি, বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণায় হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত। নিচের অংশটি লক্ষণীয় :

করেছি বইকি। নিশ্চয়ই করেছি। তুমি জানতে না ঐ এলাকা থেকে পার্লামেন্টের জন্য গগন পালের নাম আমরা দিয়েছিলাম? তুমি ভবনাথদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভেতরে ভেতরে আমাদের কবর খুঁড়ছিলে। খবরটা আগে জানলে তোমার ঐ কবর খোঁড়ার হাত আমি ভেঙে দিতাম। সে ক্ষমতা আমার ছিল। (পৃ.৬৯)

বিরাগভাজন হতে চায়নি বলেই কমরেড ভবনাথকে বলে নির্বাচন থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেবে—সরলপ্রাণ নাওয়ালের এমন কথার মাঝেও লোকেশ কূটকৌশল আবিষ্কার করেছে যার সঙ্গে প্রকৃত

Dhaka University Institutional Repository

অর্থেই তার কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না। নাওয়ালের উদ্দেশে লোকেশ পালিতের নিচের উক্তি পার্টি নেতৃত্বের অসংস্কৃত ও অশালীন রূপের পরিচয়বাহী :

শোন নাওয়াল, আমার সঙ্গে ছেনালি আর খচড়ামি করো না। পার্টির সিদ্ধান্ত হয়ে যাবার পরে, এখন তুমি নাম তুলে নেবে, তার মানে পার্টির মধ্যে আমার পজিশন ঢিলে করার মতলব করেছো। ওসব চালাকি আমি বুঝতে পারি। এখন না, পরে তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হবে। (পৃ.৭০)

জগৎ সেন নাওয়ালকে নিয়ে "চিরকালের বিপর্যস্ত দরিদ্র মজুরটা নেতৃত্বের উঁচু শিখরে ওঠার নেশায়" মত্ত বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। প্রথম থেকেই তিনি তাকে অপছন্দ করতেন, নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। নাওয়ালের উদ্দেশে জগৎ সেনের ব্যক্ত কথায় প্রকৃত অর্থে নিজের অবস্থান হারানোর শঙ্কাই প্রকাশ পেয়েছে উদ্ধৃত অংশে :

দেখ নাওয়াল আগারিয়া, তুমি অনেককে ডিঙিয়ে যেতে পারো, কিন্তু জগৎ সেনকে কোনোদিনই পারবে না। এমন কি কমরেড ডাঙে তোমাকে মদত দিলেও না। এটা মনে রেখো। (পৃ.৬৯)

লোকেশের মতো ব্যক্তির কাছ থেকেই নাওয়াল শিখেছিল পার্টির নীতি ও কৌশল সংসারের 'আর দশটা অতি সাধারণ ঘটনার' মতোই। কাজেই পার্টি অন্তপ্রাণ সদস্য হিসেবে তাকে কেন্দ্র করে ক্ষমতালোভী দলীয় নেতৃবৃন্দের অন্তর্কলহ ও লোভকাতরতা তাকে বিস্মিত করেছে। আজ একাকী, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ নাওয়াল আগারিয়া উপলব্ধি করে, লড়াকু শ্রমিক নেতা হিসেবে জেলা কমিটি থেকে প্রাদেশিক কো-অপট্ কমিটিতে তার নাম ওঠা পর্যন্ত যে অর্জন, সেটাই তার ক্ষমতার প্রতি মোহ সৃষ্টির পেছনে উৎসশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এক্ষেত্রে লোকেশের মতো নেতাদের প্রধান ভূমিকা ছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পুরো ইতিহাস নাওয়াল জানত না। কারাবাসকালে ট্রটস্কি, প্লেখানভসহ বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতাদের গল্প লোকেশের কাছ থেকে শুনেছে সে। বিরোধী সমালোচকদের সম্পর্কে প্লেখানভের বিখ্যাত উক্তি "আমি যখন মার্কসবাদ নিয়ে সমীক্ষা করছিলাম, ওরা তখন টেবিলের নিচে খেলা করতো।" (পৃ.৭০) লোকেশ পালিত নাওয়ালের চোখে প্লেখানভ হয়ে উঠেছিল। অথচ আজ সে নিজেও বিরোধী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে নাওয়ালকে ছুঁড়ে ফেলতে চাইছে। বারবার বুঝিয়ে দিতে চাইছে পার্টির কোনো কাজে না লাগায় তার আর কোথাও কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। পেছন ফিরে দেখা নাওয়ালের স্বীকারোক্তি ও আত্মধিক্কার লক্ষণীয় :

নির্বাচনের আগেই, নাওয়াল পার্টির একজন লড়াকু শ্রমিক নেতাই কেবল না, জেলা কমিটি থেকে প্রাদেশিক কো-অপট্ কমিটিতে পর্যন্ত তার নাম উঠেছিল! কী নেশা, না? আর কী উত্তেজনা! কে জানতো নেতৃত্বের নেশা কী তীব্র। যতো ওঠা যায় ততোই বুঁদ হয়ে থাকা যায়। হাঁ, আজ এই নিঃস্ব প্রহরে নিজের কাছে এ কথাটা স্বীকার করতে হবে না? লড়াকু মজদুর! শালে লাথ্খোর! স্বীকার কর নেতৃত্বের কী দুরন্ত নেশায় তোকে পেয়ে বসেছিল। আর তার জন্য লড়াই নিজেদের মধ্যে। কিন্তু তোমার মধ্যে কোথায় এই বিষাক্ত বীজ রোপণ করা ছিল, নেতৃত্ব চাই। সাফল্যের উচ্চ সোপানে উঠতে চাই, আর তার সব ফলগুলো—সেই সুখ চাই! হাঁ, এসবই ঠিক। কিন্তু চার পুরুষের মজুর হাতে শিকল পরা লোকটার প্রাণে সে নেশা কারা জাগিয়েছিল? (পৃ.৬৮)

পার্টির সদস্য হয়ে নাওয়াল ক্রমে অখণ্ড ও খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়া পার্টির সমকালীন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। পার্টির নীতি-কৌশল শ্লোগান সে আয়ত্ত করেছে। পার্টির নির্দেশনা সে বিনা প্রশ্নে মেনে চলেছে। কালক্রমে পার্টির অন্তর্কলহে জড়িয়ে পড়েছে নাওয়াল। পরে জগৎ সেনের সঙ্গে মতবিরোধ হলে ভবনাথ গুপ্তর সঙ্গে লোকেশের বিরোধ দূর হওয়ায় তিনি নাওয়ালকে আবার নিজের কাছের লোক বলে মনে করেছেন। পার্টি সদস্যদের এমন গোত্রান্তরের কার্য-কারণগুলো নাওয়ালের কাছে দুর্বোধ্য মনে হত :

Dhaka University Institutional Repository

নাওয়াল এখন নতজানু হয়ে নিজের কাছে স্বীকার করতে পারে, সে পরাজিত। নিঃস্ব। কিন্তু পার্টির বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমানুষই তার সামনে এই প্রহরের বন্ধু। এটা যে একটা পশ্চাদগতি প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা, একথা সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। (পৃ.৭১)

উপনির্বাচনের সভায় যাওয়া বাতিল করে, বাঙালি মধ্যবিত্ত এলাকায় নাওয়ালকে পাঠানোর কথা জানানো হয়। কিন্তু সেখানে তাকে এখনও 'মজুর নেতা'ই ভাবা হয় কাজেই তার কথা তারা কীভাবে নেবে– নাওয়াল এমন প্রশ্ন উত্থাপন করলে, লোকেশ যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে পার্টি তার মতো সম্ভাবনাময় শ্রমিক নেতাকে কীভাবে ব্যবহার করেছে। শুধু তাই নয়, অবজ্ঞামিশ্রিত ভাষায় তার প্রকাশও ঘটিয়েছে নিচের অংশে :

আরে, ঐটাই তো আমাদের ভদ্রলোকদের মজা। তারা খুব বুদ্ধিমান লোক, কিন্তু মজুরের নাম শুনলে তাদের গায়ে এখনও বিপ্লবের কাঁটা দিয়ে ওঠে। ইনটেকচুয়েল বক্তৃতার থেকেও, তারা একজন মজুরের এ্যাজিটেটিং বক্তৃতার বেশি তারিফ করে। আর তুমি এ্যাজিটেশনটা ভালোই জানো। পার্লামেন্টে তুমি উঠে দাঁড়ালে, মিসেস গান্ধী পর্যন্ত ডিসটার্বড ফীল করতেন। স্পীকার হাতুড়ি ঠুকতে আরম্ভ করতেন...। (পৃ.৭২)

লোকেশের এ কথায় নাওয়ালের মনে জেগে-ওঠা পূর্বস্মৃতিতে, ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু দেখিয়েছেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নাওয়ালের মতো পার্টি-অন্তপ্রাণ নেতাদের কীভাবে ব্যবহার করা হতো। পার্লামেন্ট অধিবেশনে কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো। 'ভাঙাচোরা ভুলভাল ইংরেজিতে' পার্লামেন্টে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে স্পিকার তাকে বসিয়ে না-দেয়া পর্যন্ত পার্টির সপক্ষে কাজ হাসিল হয়ে যেত। নাওয়াল আজ বুঝতে পারে সে কতোটা ভীতি ও হাসির পাত্র ছিল। কমরেড এম.পি. প্রেমকুমার গর্গ নাওয়ালের পিঠ চাপড়ে আদর করেই বলতেন, "যা একখানা এ্যাল্‌সেশিয়ান আমাদের আছে। একবার লেলিয়ে দিলেই হল! ... মনে আছে, একবার জহরলাল গালে হাত দিয়ে, থ হয়ে দাঁড়িয়ে নাওয়ালের দিকে অবাক চোখে তাকিয়েছিলেন! নাওয়ালের হাঁকডাক শুনে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রায় মিনিট খানেক একটা কথাও বলতে পারেননি। কী রকম চোখে হাউসের দিকে তাকিয়েছিলেন, তারপরে স্পীকারের দিকে। যেন ভাবতেই পারেননি, কমিউনিস্ট পার্টি কী চিজ্ পার্লামেন্টে আমদানী করেছে!" (পৃ.৭২)

যে জিপ নিয়ে মধ্যবিত্ত-অধ্যুষিত এলাকায় লোকেশের যাবার কথা ছিল সেটা নাওয়ালকে দেওয়া হয় না; ভাড়া খাটানো ট্যাকসি ও ট্রেনেই তাকে যাওয়ার পরামর্শ দেয় লোকেশ পালিত। তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে সে জানায় স্কুল-কলেজ-মাস্টারমশাই, উকিল, ব্যারিস্টার তথা বিনোদ সেনদের মতো নীতিনির্ধারকদের কাছে লোকেশের কথা গ্রহণযোগ্য নয় বলেই উপনির্বাচনে নাওয়ালকে বাদ দিয়ে সুলতান মণ্ডলের মতো ব্যক্তিকে পার্টি নির্বাচনী মনোনয়ন দিয়েছে।

নাওয়াল দলীয় আদর্শ মনেপ্রাণে নিজ জীবনে ধারণ ও পালন করেছে। হিন্দি ভাষায় লাল অক্ষরের দেয়াল লিখন "আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িকতা আর জাতপাতের বিচার একটা অভিশাপ। এই অভিশাপের বিরুদ্ধে আমাদের সব সময় লড়াই চালিয়ে যেতে হবে" (পৃ.৭৩)-এর দিকে তাকিয়ে সে আবার স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ে। পার্টি আদর্শে প্রাণিত হয়েই নিজ জীবনে 'সেক্যুলারিজাম' প্রতিষ্ঠা করার জন্যই পার্টির উঁচু তলা থেকে যখন কলকাতা জেলা কমিটির মুসলিম মেম্বার সৈয়দ রশীদ আলির সঙ্গে কন্যা সুরতিয়ার বিয়ের প্রস্তাব আসে তখন কোনো ধর্মীয় প্রথায় নয়, বরং নেতাদের সামনে রেজিস্ট্রি করে সে কন্যার বিয়ে দেয়। সুরতিয়া মিসেস জেস্‌মিন হয়ে বর্তমানে মস্কো প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে স্বামীর সঙ্গে কর্মরত। কিন্তু নাওয়ালের কাছে অতীতের সেই দেয়াল লিখনের অসারতা প্রমাণিত হয়। সে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেছে কমিউনিস্ট পার্টির কাছে নির্বাচনে জয়লাভের কৌশল হিসেবে কংগ্রেসী আদর্শই গ্রহণীয়

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। এ কারণে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মুসলিম সুলতান মণ্ডলকেই মনোনয়ন দিতে হয়—বক্তৃতা দিতে ইউনিসকেই পাঠানো হয়। দক্ষিণপন্থীরা মুখেই শুধু সেক্যুলারিজমের কথা বলে, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি তা মনেপ্রাণে মানে বলেই নাওয়াল বিশ্বাস করত। দক্ষিণপন্থীদের কাছে বাইরে ও পার্টির মধ্যে গণতন্ত্রের অন্য নাম 'বেনামী ফাঁস', 'বন্দুক', 'শিকলি', 'মুখ সিলাই। (পৃ.৭৪) কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিতে সকলেরই গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃত বলেই পার্টি মনে করে। কিন্তু নাওয়াল পার্টি কমরেডদের বর্তমান আচরণে তার প্রকাশ দেখতে পায় না। তা না হলে কমরেড জগৎ সেন নাওয়ালকে এভাবে বলতে পারতেন না যে–

মনে রেখো, পাকা বেল কাকদের জন্য নয়। তুমি সব কমিটিতে ঢুকবে, সে সুযোগ আমি তোমাকে দেবো না। তোমার জন্য যারা লড়ছে, তাদের বুঝিয়ে দিও, পার্টির মধ্যে ওভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার কায়েম করা যায় না। (পৃ.৭৫)

'পার্টির হোল টাইম ওয়ার্কার' হিসেবে পার্টি নির্ধারিত বেতনে যখন সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল তখন লোকেশ পালিত, ভবনাথ দত্ত তাকে অর্থসাহায্য করেছেন। পরবর্তীকালে হাঙলের মতো নেতার সঙ্গে সেলুন কারে চড়ে 'পৃথিবীর অনেক সুন্দর স্বাস্থ্যকর জায়গায়' নাওয়াল থাকলেও সেই 'মত্ততার দিন' পেরিয়ে আজ সে "আগারিয়া বংশের বিচ্ছিন্ন বিস্মৃত এক অন্য মানুষ।"(পৃ.৭৬)

'সেক্যুলারিজম্ আর পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র নিয়ে বিচার বিদ্রূপ' করতে গিয়ে নাওয়ালের মনে হয়েছে সে অধিকার তার আর নেই। কারণ সে নিজেও পার্টির 'মিথ্যা, ছলনা, কুটিলতা আর ফেরেববাজী'তে (পৃ.৭৬) 'অনায়াস আর অভ্যস্ত' হয়েই আজকের নাওয়াল আগারিয়া হয়ে উঠেছে। পরপর দুবার এম পি নির্বাচিত হলেও গত দশ বছরে সে আর নির্বাচনে জয়ী হতে পারেনি। ১৯৫৬ সালের নির্বাচনে শত্রুদলের প্রতিদ্বন্দ্বী ও পার্টির ভেতরে নিজের বিরোধিতাকারী শক্তির বাধাকে অতিক্রম করে নাওয়াল ষাট হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতেছিল। সত্যিকারের শ্রমিক শ্রেণির জয়মাল্য পেয়েছিল সে। দিনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রমিক নাওয়াল আগুনঝরা বক্তৃতা দিয়ে ঘরে ফিরত। শ্রমিকদের শতকরা আশিভাগ ভোট ও মধ্যবিত্তদের ভোটই তাকে এ বিজয় এনে দিয়েছিল। কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ তাকে দুহাতে আলিঙ্গন করেছিলেন। কমরেড কাকাবাবু তাকে দেখতে চেয়েছিলেন। কলকাতা পার্টি হেড কোয়ার্টারে গিয়ে প্রাদেশিক আর জেলা কমিটির নেতাদের দ্বারা সংবর্ধিত নাওয়ালের জীবনের এ মোড় ফেরাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন কমরেড ভবনাথ দত্ত। লোকেশ পালিত, জগৎ সেনের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি নাওয়ালকে প্রার্থী করে তার পক্ষে লড়াই করেন। শেষ পর্যন্ত 'লড়াকু মজদুর'কে বিজয়ী দেখে আনন্দে কেঁদে ফেলেন তিনি। জীবনের গোত্রান্তর পর্বে একমাত্র ভবনাথ গুপ্তই তাঁকে সঠিক পথে চালিত করতে চেয়েছিলেন, যদিও তার সে কথার অর্থ নাওয়াল তখন বুঝতে পারেনি। কিন্তু 'সব দিক থেকে নিঃস্ব, ভগ্ন, পরাজিত' হয়ে সে আজ তাকে বলা ভবনাথের সকল কথার অর্থ বোঝে। নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর আনন্দিত অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি নাওয়ালকে বলেছিলেন :

নাওয়াল, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কর। কিন্তু জেনে রেখো, এটা তোমার পথ নয়। এর থেকেই তুমি শিক্ষা নেবে, সংসদীয় রাজনীতির পচা নর্দমায় তোমার যাত্রা শুরু হলো। নর্দমা ঘেঁটে এসো, তারপরে শুদ্ধ হয়ে, তোমার নিজের শ্রেণীকে নেতৃত্ব দেবে। নিজের জায়গা ভুলে যেও না। ছেড়ে যেও না। ভেসে যেও না। তোমার একটাই মাত্র শিকল হারাবার কথা। পরিবর্তে, নতুন শিকল হাতে উঠলো। মনে রেখো, এ শিকল, শিকল পরার ছল। ঠুনকো, মেকি। (পৃ.৭৭)

দ্বিতীয় নির্বাচনেও নাওয়াল আগারিয়া জিতেছিল। তার জীবনের মোড় ঘুরতে শুরু করেছিল কারাবাস সময়-পরিসর থেকে, ভিন্নতর জীবনের আস্বাদন থেকে। কারাবন্দি দলীয় কমরেডদের সে 'পাতিহাঁস' রূপে পেয়েছিল। যারা তার পুরো জীবনকে গ্রাস করবার নেপথ্য ভূমিকা পালন করেছিল। আজ

Dhaka University Institutional Repository

আত্মবিশ্লেষণ করতে গিয়ে অন্ধকারে ছিটকে-যাওয়া নাওয়ালের কাছে তাদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়। ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু নাওয়ালের প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহার করে নাওয়ালের জীবনে কমিউনিস্ট নেতাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন নিচের অংশে :

ইতিমধ্যে, গত পাঁচ বছরে দক্ষ ওয়েল্ডার নাওয়াল আগারিয়ার গোটা জীবনটাই বদলে গিয়েছিল। বদলাতে শুরু করেছিল অনেক আগেই। জেলে রাজবন্দী থাকাকালীনই পাতিহাঁসদের সঙ্গে সুখের সরোবরে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করেছিল। পাতিহাঁসদের একটা শক্তি আছে। জলের যতো নিচেই তাকে ডুবিয়ে দাও, সে আবার ঠিক ভেসে উঠবে। পাখা ঝাপটা দিয়ে গায়ের জল ঝেড়ে ফেলে, শ্যাওলা পাঁকে লম্বা ঠোঁট গুঁজে পেট ভরাবে। কিন্তু একজন লড়াকু মজদুরের পাতিহাঁসের সেই শক্তি নেই। তার শক্তির স্বরূপ ভিন্ন। সেই ভিন্ন শক্তির স্বরূপ দর্শন তোমার হয়নি। পাতিহাঁসদের শক্তিকেই সে বড় মনে করেছিল। আর পাতিহাঁসরা, শ্যাওলা আর পাঁকের মতো তোমাকে খেতে আরম্ভ করেছিল। তোমাকে ওরা হজম করছিল। ভবনাথদার সেই কথাটার অর্থ তুমি কোনো দিন অনুভব করতে পারোনি, "সময় বিশেষে ইতিহাসও উল্টো কলে চলে। কিন্তু মার্কসের ঐতিহাসিক তত্ত্বে যদি কোনো সত্যি থেকে থাকে, ইতিহাসের প্রতিশোধের চেহারাটা হবে সেই দিন ভয়ংকর। (পৃ.৭৭)

'জাতে পাঁতিহাস' হলেও ভবনাথ গুপ্ত কখনো পার্টির কাছ থেকে নগদ কিছু প্রত্যাশা করেননি। এ কারণে পার্টি আদর্শের সঙ্গে মিলতে না পারায় পার্টি তাকে ত্যাগ করায় নিঃশব্দেই তিনি সরে যান। পার্টি বিভক্তির পরে ডেকেও তাকে আর দলে আনা যায়নি। সুশৃঙ্খল পারিবারিক জীবন, কলেজে শিক্ষকতা ও ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস লেখার মধ্যদিয়ে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন তিনি। অবশ্য সেটা নিয়েও পার্টিতে সমালোচিত হতে হয় তাকে। এক সময়ের লড়াকু মজদুর নাওয়াল যাকে নিয়ে তার সীমাহীন স্বপ্ন ছিল, আদর্শচ্যুতির মাধ্যমে সে স্বপ্নের অপমৃত্যু দেখে ভবনাথ গুপ্ত তার কাছ থেকে দূরবর্তী অবস্থানে চলে গেলেও নিঃসঙ্গ জীবনে আবার কাছাকাছি এসে তাকে আত্মসত্তানুসন্ধানী করেছেন। নিচের অংশটি লক্ষণীয় :

ইদানীং ভবনাথদা আবার নাওয়ালের কাছে আসতে আরম্ভ করেছেন। আর, সুখের বিষয়, পার্টির নেতারা সবাই তাঁকে ত্যাগ করেনি। কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। মোটা ময়লা জামা-কাপড় পরা, প্রৌঢ়ত্বের সীমানা পেরিয়ে এখন প্রায় বৃদ্ধ। অথচ সাবলীল তাঁর চলাফেরা। স্পষ্ট কথাবার্তা। অমায়িক আর প্রসন্ন ব্যক্তি। উপদেশ দেন না। মাঝে মধ্যে জিজ্ঞেস করেন, "কী নাওয়াল, খুঁজেপেতে দেখলে?"..."কী খুঁজে দেখবো?"..."শেকড়----ইংরেজিতে যাকে বলে রুট।" নাওয়ালের কাছে অর্থহীন প্রশ্ন মনে হয়। "হাঁ, কিন্তু কিসের শেকড়ের কথা বলছেন আপনি?" ..."কিসের আবার? গাছের? একটা গাছ মরবে কি বাঁচবে, সেটা তো শেকড় খুঁড়ে না দেখলে বোঝা যাবে না।" নাওয়াল এক একসময় বিরক্ত বোধ করে, "আপনার কথা আমি বুঝতে পারি না ভবনাথদা।"..."এর থেকে বেশি আর বোঝাতে পারবো না নাওয়াল। যখন বোঝবার হবে, তুমিই নিজে বুঝে নেবে। একদিন ঠিক তোমার মনে হবে, তখন শেকড়ের খোঁজে যাবে। যেতে হবেই।" ...অর্থহীন রহস্যময় সব কথা। লেখাপড়া করে, মানুষটার মাথা ঠিক আছে কি না কে জানে। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি নিজের সঙ্গে কখনও লড়াই করেছো?" ..."নিজের সঙ্গে? সেটা আবার কী? আমি বাইরে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়ছি। পার্টির ভেতরেও লড়াই চালাতে হচ্ছে। কিন্তু নিজের সঙ্গে লড়াইটা আবার কিসের?" ..."ঐ তো মুশকিল নাওয়াল, আমি বোঝাতে পারি না। নিজের সঙ্গেই যে লড়ে না, সে বাইরের শত্রুদের সঙ্গেই বা কী করে লড়বে? পার্টির মধ্যেই বা কী করে লড়বে? (পৃ.৭৮)

হতাশা ও নৈরাশ্যের মেঘাচ্ছন্নতার মাঝে ভবনাথের কথা নাওয়ালের মস্তিষ্কে বিদ্যুৎচমক সৃষ্টি করে। সে পেছন ফিরে শেকড়সন্ধানী হয়। নাওয়াল আগারিয়া মার্কস-লেনিনের জটিল ও দুর্বোধ্য তত্ত্ব বোঝেনি। পার্টির সংস্পর্শে এসে সে জেনেছিল ধনী বুর্জোয়াদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যই বৈপ্লবিক আন্দোলন সংগঠিত করা প্রয়োজন। সশস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শ্রমিক শ্রেণিকেও সশস্ত্র হয়েই নেতৃত্ব দিতে হবে। বৈপ্লবিক আন্দোলনে তাদের সহযোগী হিসেবে থাকবে ভূমিহীন কৃষক ও দরিদ্র মধ্যবিত্ত। আদর্শিক এ স্বপ্নের অংশী হয়েই নাওয়াল দিনের শুরু থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের 'এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা' ও 'লক্ষ লক্ষ হত-দরিদ্র শ্রমিকদের বস্তির নরকে নরকে ঘুরেছে' (পৃ.৮১)। কিন্তু কারামুক্ত হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

নাওয়াল সংসদীয় নির্বাচনমুখী আন্তর্জাতিক পার্টি নীতিতে সে অমোঘ বিশ্বাসের কোনো প্রতিফলন দেখতে পায়নি। আজ সে বুঝতে পারে মজদুরের পার্টি হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি দশ বছর আগেই তার চারিত্র বিসর্জন দিয়েছে। পার্টির সর্বস্তরে মজদুরের স্থান দখল করে নিয়েছে 'বেকার আর ছাত্র আর এক শ্রেণীর মধ্যবিত্ত, সরকারি কর্মচারি, স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা'(পৃ.৭৯)। দেশবিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের একটা বড়ো অংশ এদেশে বেড়ে উঠেছিল যারা পরবর্তীকালে বেকারির শিকার হয়ে চটকলে শ্রমিক হিসেবে যোগ দেয়। যাদের প্রত্যেককেই 'প্রায় মিলিটান্ট, কড়া মেজাজের ছেলে' বলে মনে হয়েছে নাওয়ালের কাছে। এরা পার্টিতে এসে কালক্রমে লোকাল কমিটিতে স্থান করে নেয়। মার্কস-লেনিনের আদর্শ ও তাত্ত্বিক শিক্ষার চাইতে অ্যাকশনেই এরা সুদক্ষ ছিল। প্রাদেশিক কমিটি শুধু নয়, আন্তর্জাতিক বিশ্ব ফেডারেশনের (মেটাল) সদস্য হয়ে নাওয়াল সারা পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করেছে। অথচ সে বুঝতেই পারেনি ভবিষ্যত নির্বাচনে পার্টি তার অবস্থান ঠিক রাখতে গিয়ে শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত শক্তিকে বিস্তৃত করেছিল। নির্বাচনসূত্রে গ্রামে গিয়ে সে নিজেও দেখেছে গ্রামকেন্দ্রিক পার্টির নতুন নীতি আর কৌশলের পরিণতিতে 'জেলা শহরের কলেজের শিক্ষক, কোর্টের উকিল-মোক্তার, স্কুল মাস্টার, পার্টির প্রতি অনুগত সম্পন্ন কৃষক—যাদের জোতদারও বলা যায়, আর ক্ষয়িষ্ণু, ক্রম বিলীয়মান মধ্যস্বত্বভোগী পরিবারগুলোর বেকার ছেলে'দের (পৃ.৮০) হাতেই পার্টির সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। এ কারণেই 'দিল্লির সেই ঠাণ্ডা গোল ঘরে' নাওয়াল দু বার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হয়ে গেলেও প্রথমবারের তুলনায় দ্বিতীয়বার পরাজিত প্রতিনিধির সঙ্গে ভোটের ব্যবধান ছিল অর্ধেকেরও কম। তৃতীয় দফায় নিজ দলীয় ব্যক্তিরাই নাওয়ালকে নির্বাচিত করেনি—কংগ্রেসের প্রতিনিধির কাছে সে প্রায় কুড়ি হাজার ভোটের ব্যবধানে হেরে গিয়েছিল। চতুর্থ বারও তারা লড়াকু মজদুর নাওয়ালের পরিবর্তে সুরকি কলের মালিকের ছেলে কংগ্রেসের সদস্য রামদাসের ছেলে শিউপূজনকে পার্টির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে নির্বাচিত করে। শিউপূজন কে ছিল? কী ছিল?—

> শিউপূজনকে নাওয়াল জানতো, ওদের মহল্লার নওজোয়ান মস্তান। মোটরবাইকে চেপে ঘুরে বেড়াতো। সঙ্গে থাকতো সব সময়েই অনেক বন্ধুবান্ধব। ওয়াগন ব্রেকার বা ডাকাতি ছিনতাইবাজ দুর্নাম তার ছিল না। কিন্তু মারকুটে ছিল। ক্লাব, দুর্গাপূজা, কালীপূজা এসব নিয়ে দলাদলি করতো। দাঙ্গা হাঙ্গামাও অনেক করেছে। বোমাবাজীতে হাত পোক্ত। সবাই বলতো, ও পকেটে রিভলবার নিয়ে ঘোরে। ওর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটা ফৌজদারি কেস্ ছিল। একটা খুনের মামলাও ছিল। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে, শিউপূজন হাসি খুশী দিলদরিয়া নওজোয়ান। নাওয়ালকে বরাবর সম্মান দেখিয়ে এসেছে। তারপরে কবে থেকে যে ও লোকাল কমিটির কমরেডদের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করেছিল, নাওয়াল খেয়ালই করেনি। করবার কথা মনেও আসেনি। শিউপূজন আর যাই হোক, রাজনীতি করার ছেলে ছিল না। (পৃ.৭৯)

ভোগবাদী জীবনের অংশী হিসেবে নাওয়াল 'রাশিয়ার কৃষ্ণসাগরের সোনালী বালু সৈকতে, দোভাষী আনার সঙ্গে শুয়ে গল্প করতে করতে' (পৃ.৭৯) পার্টির পরিবর্তিত নীতি-কৌশল ও নেতৃত্বের রূপান্তর অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। সে বুঝতেই পারেনি মজদুরের পার্টিতে শিউপূজনের মতো ছেলেরা সদস্যপদ পাবে কিংবা তারা রাজনীতি করবে। শুধু সদস্যপদই নয়, কালক্রমে জেলা কমিটি ও প্রাদেশিক কমিটির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল। ক্রমব্যর্থতায় নাওয়ালের যখন চোখ খুলল ততদিনে মজুরদের মাঝে শিউপূজন একজন প্রতিষ্ঠিত নেতা যার অসাধারণ বাগ্মিতায় সে নিজেও বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিল। আনন্দিত প্রতিক্রিয়ার অংশ হিসেবে শিউপূজনকে জড়িয়ে ধরেছিল নাওয়াল।

আত্মবিশ্লেষণ করতে গিয়ে নাওয়াল উপলব্ধি করে পার্টি তার সঙ্গে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, বরং ব্যর্থতার পরেও তাকে এ্যাসেম্বলি নির্বাচনে প্রার্থী করেছিল। শিউপূজনের মতো ব্যক্তিদের মধ্যদিয়ে এটা প্রমাণ হয়ে যায় যে পার্টিতে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার নীতি আসলে মিথ্যা ভেক মাত্র। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

অধঃপতিত অবস্থান থেকে নাওয়ালের সে কথা বলার অধিকার নেই। সাধারণ মানুষও বুঝে গেছে কংগ্রেস কিংবা কমিউনিস্ট পার্টি কেউই আর স্বতন্ত্রভাবে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইয়ে নামবে না, বরং তারা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যই এটা করবে। কাজেই নাওয়ালকে নিয়েও সাধারণ মানুষ ভাবে না। বরং নাওয়াল সম্পর্কে এখন তাদের মনোভঙ্গি ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে অনাবিষ্কৃত থাকেনি :

তুমি না থাকলেও, তাদের পাওয়ানা-গণ্ডা আটকে থাকবে না। তারা জানে, সব পার্টি তাদের পাওয়ানা-গণ্ডার জন্য লড়বে। কারণ, তারা বুঝতে শিখছে, তাদের পাওয়ানা-গণ্ডার জন্য, পার্টিগুলো নিজেদের মধ্যে লড়বে। কেন লড়বে, সে-সব খুঁটিয়ে বিচার করতে তারা শেখেনি। শিখতে চায়ও না। কেননা, সেটা তাদের দায়িত্ব না। তাদের কোনো দায়িত্বই নেই। তারা কেবল একটা বিষয় জানে, যে পার্টি তাদের বেশি পাইয়ে দেবে, সেই পার্টিকে তারা পাঁচ বছর অন্তর ভোট দেবে। তার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের কী দরকার? ওসব তারা বোঝে না। কারণ তারা জানে না, তাদের কোনো নেতৃত্ব থাকতে পারে। তারা জানে, তারা মূর্খ, অসহায়, গরীব। তাদের জীবনে কোনো পরিবর্তন আসবে না। যারা তাদের জন্য লড়ে, আর নিজেদের মধ্যে মারামারি করে, তাদের প্রতিও কোনো সহানুভূতি নেই। কোমপানী আর লড়াইওয়ালারা নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ করে। আর তারা লক্ষ রাখে, কারা তাদের পাওয়ানাটা মিলিয়ে দেয়। তারা আর একটা বিষয়ও জানে না, কেন তারা পার্টিগুলো থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে করে। কেন তাদের বুকে রাগ আর ঘৃণা তুষের মতো জ্বলে। কেন তারা নেশা করে, জুয়া খেলে, সিনেমা দেখে, আর নিজেদের মধ্যে মারামারি করে, খিস্তি-খেউড় করে। (পৃ.৮২)

কাজেই পার্টির সকল স্তরেই সুবিধাবাদী, আপসকামী নেতৃত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নাওয়ালের মনে হয় জগৎ সেনের কথাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে :

সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব মানে এই নয়, শ্রমিক শ্রেণীকেই এই নেতৃত্ব বহন করতে হবে। যারা তাত্ত্বিক, বুদ্ধিমান, পার্টির নীতি আর কৌশল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত আছে, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের দায় তাদেরই বহন করতে হবে। তবে, এটাও ঠিক, অশিক্ষিত, পশ্চাৎপদ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন শ্রমিকদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে আমাদেরই। কিন্তু কবে তারা নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসবে, তার জন্যে পার্টি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। এটা ঠিক, আমরা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস করি। তার জন্যে প্রস্তুতি আর সময় দরকার। তা যতো দিন পর্যন্ত না সম্ভব হচ্ছে, ততো দিন সংসদীয় সংগ্রামের পথে আমরা নির্বাচনের মারফৎ ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালিয়ে যাবো। (পৃ.৮২)

কিন্তু নাওয়াল আগারিয়া ভেবে পায় না কেমন করে, কবে শ্রমিকদের শিক্ষিত করে তোলা হবে। সে তো শ্রমিকদের শিক্ষিত করে তোলার পদ্ধতি তার নিজের জীবনেই প্রতিফলিত হতে দেখেছে। যা শেষ পর্যন্ত পচনশীল পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছয়। সমরেশ বসু কমিউনিস্ট রাজনীতির ভেতর থেকে এর তাত্ত্বিক-আদর্শগত ও প্রায়োগিক দিকের বৈপরীত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই নাওয়ালের অন্তর্যন্ত্রণার স্বরূপ উপলব্ধি করা তাঁর জন্য সহজতর হয়েছিল। অনেক লেখকই বামপন্থী রাজনীতির অবক্ষয়িত রূপ চিত্রায়ণ করতে গিয়ে চরিত্রের শূন্যতার দিকটিকেই অধিকতর গুরুত্ব দেন। কিন্তু সমরেশ বসুর অভিনবত্ব ও স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে তিনি শুধু চরিত্রের শেষ হয়ে যাওয়া প্রত্যক্ষ করেন না—বরং পেছন ফিরে দেখানোর চেষ্টা করেন, চরিত্রের নিজেকে খোঁজার আখ্যান। নিজেকে খুঁজতে যাওয়ার প্রাক্‌মুহূর্তে নাওয়ালের রক্তক্ষরণ ও লেনিনের ছবির দিকে তাকিয়ে তাঁর স্বগতোক্তি অসামান্য শিল্পকুশলতায়, প্রতীকী ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক :

নাওয়ালের ঘাড় এক দিকে বেঁকে গিয়েছিল। টেবিলের ওপর কোনো কিছু পাবার জন্য যেন বড় শক্ত দু'হাতে খামচাচ্ছিল। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, ভিতর থেকে উথ্‌লে ওঠা একটা আর্তনাদকে আটকে রাখছিল গলার কাছে, আর গলার পেশীগুলো মোটা দড়ির মতো ফুলে উঠেছিল। তার চোখের সামনে সব ঝাপসা। টলটলে জলের আড়ালে ঘর, দেওয়াল, ছবি, পতাকা, সব যেন কাঁপছে। এবং সে আরক্ত ভেজা চোখে, সেই ছবিটা দেখতে চাইলো। শাদা জামা, লাল টাই, কালো কোট। ছুঁচলো দাড়ি, মোটা গোঁফ। মাথায় টাক। ভ্রূকুটি-উজ্জ্বল দীপ্ত চোখে কি একটি সূক্ষ্ম প্রীতির হাসি প্রচ্ছন্ন রয়েছে? নাওয়াল মাথা নাড়লো, আর ফিসফিস করে বললো, "কমরেড, আমার আজকের এই অবস্থার জন্য আমি কারোকে দোষ দেবো না। আমি

Dhaka University Institutional Repository

আর সাচ্চা নেই। কিন্তু আমি বুজ্‌দিল, এটা মানতে হবে। এক সময়ের লড়াকু মজদুরটার হাতে এত শিকল কোন্ কয়েদখানার প্রহরীরা বেঁধে দিল, আমি তাদের একবার চোখ ফিরিয়ে দেখতে চাই।"...

ঘুরন্ত পাখার কিচ্‌কিচ্ শব্দের মধ্যেও, মৃদু পায়ের শব্দে নাওয়াল ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। লছমী। (পৃ.৮৩)

কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি

আটচল্লিশ বছর বয়সী লছমীর তুলনায়, রাশিয়ার আবহাওয়ায় বসবাসকারী মেয়ে সুরতিয়ার অকাল বার্ধক্যতাড়িত রূপের বর্ণনায় নাওয়ালের প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহার করেছেন সমরেশ বসু। 'ফর্সা রঙ, রাশিয়ার মতো শীতের দেশে থেকে শুয়োরের মাংসের মতো লাল হয়ে উঠেছে' (পৃ.৮৩)। বাবার বাড়িতে এসে বেশিদিন থাকে না, সন্তানদের সুস্থতার কথা চিন্তা করে বন্ধুদের বাড়িতেই কাটিয়ে যায়। নাওয়াল বুঝতে পারে বন্ধুত্বের জন্য নয়, আধুনিক ফ্ল্যাটে থাকার সুযোগ-সুবিধার কথা চিন্তা করেই মেয়ের এই বন্ধুদের বাড়িতে সময় কাটানো। ছেলে লাল্লু মাঝে মাঝে মাছ-মাংস কিনে নিয়ে এলেও রুটি-ভাজিই তাদের প্রধান খাবার। জেল থেকে গোঁফ কামিয়ে ও ভদ্রলোকদের জীবনাচরণে অভ্যস্ত হয়ে এলে বাবা লছমন তার 'হাতে ছোঁয়া জল' না খাবার কথা ঘোষণা করেছে। বাবাকে সে বোঝাতে পারেনি যে সে সাধারণ 'চোরচোট্টা কয়েদী' ছিল না, 'কমিউনিস্ট' হিসেবে সে ছিল একজন 'রাজবন্দী'। 'বর্তনিয়া আংরেজদের জেলখানায় বড় বড় কংগ্রেসী নেতারা যেমন থাকতো' (পৃ.৮৭) নাওয়ালও সেরকম থাকত।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জীবনাভিজ্ঞতার সঙ্গে কিছু লেখাপড়াও শিখেছিল লছমী। বসতিসংলগ্ন মিশিরজির স্কুল-পাঠ শেষ-করা নাওয়ালকে তিন বছর চার মাস কারাবাসকালে– লোকেশপালিত, ভবনাথ লেখাপড়া শিখিয়েছে। হিন্দি নাওয়াল নিজেই জানত। ইংরেজি শেখানোর জন্য বাইরে থেকে বই আনা হয়েছিল। শরীরচর্চা করত। রাজনীতি নিয়ে আলোচনাসূত্রেই সে বুঝতে পেরেছিল লোকেশদা যা বলতেন ভবনাথদা সেটা মানতেন না। অর্থাৎ পার্টি সদস্যদের মাঝে মতভেদ ছিল। স্বাধীনতা নিয়ে তারা কোনো বিচার করার চেয়ে, লোকেশদারা বলতেন যে সশস্ত্র বিপ্লবের পথই আদর্শ পথ। এ উদ্দেশে নাওয়ালের মতো ব্যক্তিরা আশায় বুক বাঁধত যে বাইরে থেকে সশস্ত্র কমরেডরা জেল আক্রমণ করে বন্দিদের মুক্ত করে নিয়ে যাবে। সে উদ্দেশ্যে তারা কারাভ্যন্তরে সশস্ত্র প্রহরীদের সঙ্গে লড়াই করে জেল ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য আন্দোলন সংগঠিত করবার যে নীতি গ্রহণ করেছিল তার পরিণতি হয়েছিল ভয়াবহ। বাইরে কিছুক্ষণ শ্লোগান ও বোমার শব্দ পাওয়ার পরেই সেটা শান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় বন্দিদের ওপর গুলিবর্ষণসহ নেমে এসেছে নির্যাতন। পরিণতিতে যে অনশন ধর্মঘট পার্টির কাছে ছিল 'দক্ষিণপন্থী গান্ধীবাদীদের একটা ঠুনকো লড়াই'(পৃ.৮৮) সে পথেই ধাবিত হয় পার্টি। পার্টি নীতি ও আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত একজন কমরেড হিসেবে নাওয়াল ভেবেছিল সত্যিই কারামুক্ত হওয়ার জন্যই তারা লড়ছে। এ কারণে প্রহরীদের সঙ্গে লড়াইটাও সে সর্বশক্তি দিয়ে করেছিল। পরিণামে তাকে নির্যাতনের ফলে এমন রক্তাক্ত হতে হয়েছিল যে বাঁচার সম্ভাবনা ছিল ক্ষীণ।

নাওয়ালের মনে পড়ে পার্টি বেআইনি ঘোষিত হওয়ার পরের ঘটনাপ্রবাহ। অনেকে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেলেও পার্টির নির্দেশে নাওয়ালকে বাইরে থেকে কাজ করতে হয়। লড়াইয়ের পদ্ধতি সংক্রান্ত গোপনীয় মিটিং থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সে দেখেছে শ্রমিক ধর্মঘট করানোর জন্য অ্যাকশন কমিটির কমরেডদের অনুসৃত পদ্ধতির কারণে পার্টি কীভাবে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর পুলিশের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য কমরেডদের ছোড়া বোমার আঘাতে পুলিশ কিংবা কংগ্রেসীদের চাইতে শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটা না বুঝে পার্টির নতুন নেতৃত্ব

Dhaka University Institutional Repository

বরং নাওয়ালের মতো কমরেডদের সততা নিয়ে প্রশ্ন তুলত। পার্টিনেতৃত্বের এ সশস্ত্রপন্থায় বিশ্বাসী মাঝারি ও ছোটো নেতাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ভবনাথ গুপ্ত। স্পষ্ট ভাষায় তিনি পার্টি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন :

পার্টি ঠিক লাইন নেয়নি। আর, আপনারা ওভাবে ধমকে, চোখ পাকিয়ে কথা বলবেন না। ভাববেন না, এতে কোনো কাজ হবে। কমরেডদের চাকরবাকর মনে করবেন না, তাদের কথাও শুনুন, আর ওপরে জানান। এভাবে অনুগত কমরেডদের পুলিশের গুলির মুখে ঠেলে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। (পৃ.৮৯-৯০)

কিন্তু অচেনা আন্ডারগ্রাউন্ড নেতাদের কাছে ভবনাথের এ কথাগুলো পার্টিবিরোধী বলে মনে হত। এ অপরাধে তাকে শাস্তির ভয় দেখাত। কিন্তু তিনি নির্বিকার ভঙ্গিতে বলতেন :

সে দেখা যাবে। আপনি হুকুম দিয়ে খালাস। এমন কথা পর্যন্ত বলছেন, কমরেডরা মৃত্যু বরণ করুক, তাতে শ্রমিকদের জোশ্ আরও বেড়ে যাবে। কিছু কিছু কমরেড তো মৃত্যুবরণ করছেই। কিন্তু শ্রমিকদের জোশ্ পয়দা হচ্ছে কোথায়? একি পেট ভরে খাইয়ে দেওয়া নাকি? আর তারপরেই সবাই পাইখানায় পেট খালাস করে আসবে? এটা বোঝা দরকার, আমরা জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি, আর স্বীকার করা উচিত, আমরা টেরোরিস্ট আন্দোলনের পথে চলছি। (পৃ.৯০)

শ্রমিকদের মাঝে লাল ঝাণ্ডা পার্টির আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া যে শুভ হয়নি সেটা নাওয়াল নিজেও উপলব্ধি করেছে। এ কারণে ভবনাথদার প্রতিটি কথাকে সে সমর্থন করত। এভাবেই কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সাধারণ মানুষের অনাস্থা বৃদ্ধি পায়। এর সুযোগ গ্রহণ করে কংগ্রেস।

কারাবন্দি নাওয়ালকে সার্কেল ইন্সপেক্টর গালাগাল ও শারীরিক নির্যাতন করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে। বিলসান সাহেবকে মারার সময় সে ছিল থানার বড়ো দারোগা। শৃঙ্খলিত নাওয়াল রক্তাক্ত হয়েও তার চোখে চোখ রেখে তাকিয়েছিল। এমনভাবে নির্যাতিত নাওয়াল কলকাতার জেলে অন্যান্য কমরেডদের সান্নিধ্যে এসে ভিন্ন পথের অভিযাত্রী হয়ে ওঠে। আগারিয়া বংশের সন্তান নাওয়ালের কারাগারে অনশন ধর্মঘটের কথা শুনে লছমন গর্বের সঙ্গে গান্ধীর অনশন ধর্মঘটের কথা উচ্চারণ করেছে। পুলিশি নির্যাতনের কথা শুনে তার প্রতিক্রিয়া ছিল এরকম :

লছমন ছেলের গায়ে মাথায় হাত দিয়ে মারের শুকিয়ে যাওয়া ক্ষত চিহ্নগুলো দেখেছিল, আর রাগে দুঃখে জ্বলে উঠেছিল, "এ আজাদী হিন্দোস্থানি সরকার তোকে এমন পিটিয়েছে? ত আংরেজ কি দোষ করেছিল? (পৃ.৯৩)

নাওয়াল কারামুক্ত হয়ে দারিদ্র্যপূর্ণ সংসারজীবনে দ্বিধা ও সংশয়পূর্ণ রাজনীতির মধ্যদিয়েও পার্টির অভ্যন্তরীণ নির্বাচনে লোকাল কমিটির সদস্য হিসেবে এঞ্জিনিয়ারিং, রেলের কারখানায় শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার পাশাপাশি পার্টি-ইউনিয়ন বাড়ানোর কাজে মনোযোগী হয়। চুয়ান্ন সালে জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর নাওয়াল হাঙলের মতো বড় বড় ভারতীয় নেতার সুদৃষ্টিতে পড়ে যায়। কমরেডরা তার বাড়িতেও যাওয়া-আসা করে। লছমীও পার্টির একজন 'সিমপ্যাথাইজার' হয়ে ওঠে। এমনকি নাওয়ালের অনুপস্থিতিতে তার সঙ্গেই নারী কমরেডদের কথা হতো। বস্তির মেয়েদের নিয়ে মহিলা সংগঠনের কাজ শুরু করে সে। লছমন আগারিয়া হুঁকো হাতে তাদের কর্মকাণ্ড অবাক বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখত ও প্রসন্ন মনে বলত :

কোনো আগারিয়ার পরিবারে এমনটা ঘটেনি। জমানাটা সত্যি বদলে যাচ্ছে। ব্যাটার বউ সব লেখাপড়া জানা বড় ঘরের বিবিদের সঙ্গে, অওরতদের এককাট্টা করছে। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাচ্ছে। কী তাজ্জব! কোনো লোহাকাটা আগারিয়ার ঘরে এরকম ঘটনা কেউ দেখেছে? (পৃ.৯৪)

বিহারের জামালপুরে রেল কারখানায় ধর্মঘট করাতে গিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো কারাবন্দি নাওয়াল দেড় মাসের কারাজীবনে রাজবন্দির স্বাচ্ছন্দ্য পায়নি, বরং সাধারণ কয়েদির মতো আন্ডারট্রায়াল সেলে থাকতে হয় তাকে।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মঘট সফল হওয়ার কারণে হাঙ্‌ল ও সেন্ট্রাল কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড পদ্মনাভন নাওয়ালকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে অভিনন্দন জানান। খুনের অভিযোগ ছাড়া রাষ্ট্র ও জনস্বার্থবিরোধী সব অভিযোগেই তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। আট ঘণ্টা রোজ কাজের দাবিতে আন্দোলনকালীন নাওয়াল ও ইস্‌রাইলের ছবি এর আগেই জনযুদ্ধ কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। কাজেই তার গ্রেপ্তারে সারা দেশে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। পার্লামেন্টে প্রশ্ন তোলাসহ প্রধানমন্ত্রী জবাহরলালের কাছে টেলিগ্রাম গিয়েছিল। পার্টির কমরেড ব্যারিস্টার-উকিল সকলেই নাওয়ালের জামিন আর মামলা লড়তে চলে এসেছিল।

উন্মুলিতপ্রায় ক্ষরিত রক্তাপ্লুত মদালস নাওয়াল, একা; নিশ্চুপ, কারও সঙ্গে কোনো কথা বলে না। শুধু অতীতে সংঘটিত প্রবাহ-বলয় বিশ্লেষণ করে, ভবনাথ গুপ্ত-র কথার অর্থ অনুধাবন করতে চেষ্টা করে। স্ত্রী লছমীও নাওয়ালের এ পরিবর্তিত রূপ কিছুদিন ধরেই লক্ষ করেছে। এ সম্পর্কে জানতে চাইলে সে নিজের ভেতরের ক্ষরণ প্রকাশ না করে পারেনি। লছমীর কাছে নাওয়াল যে কথাগুলো বলেছে তাতে ভবনাথ গুপ্তর কথার অর্থ-উপলব্ধির একটা সুস্পষ্ট সম্ভাবনাও তার মস্তিষ্কে উঁকি দিয়েছে। নিজের অবস্থান আজ স্পষ্ট হয়েছে নাওয়ালের কাছে। নিচের অংশটি লক্ষণীয় :

লছমী, ভবনাথদা প্রায়ই আমাকে অদ্ভুত সব কথা জিজ্ঞেস করেন। নাওয়ালের দৃষ্টি সামনের দিকে। দেওয়ালের ছবি দেখছে না। ভবনাথদার মুখ দেখতে পাচ্ছে। কানে তাঁর সেই অদ্ভুত সব প্রশ্ন বাজছে। ... "তিনি হামেশাই আজকাল আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি গাছের শেকড়টা খুঁজে দেখেছো? কী গাছ, কোন্ গাছ, তার আবার শেকড় খোঁজাটাই বা কী? ভবনাথদা তাজ্জব! বলেন, যে-মানুষ নিজের সঙ্গে লড়েনি, সে বাইরের শত্রুদের সঙ্গে লড়বে কেমন করে? পার্টির ভেতরেই বা লড়বে কী করে? আমি ওঁর কথার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝি না। কিন্তু মনে হয়, ওঁর কথার মধ্যে কালো মেঘে বিজলি চমক আছে। মনে হয়, সেই বিজলি চমকে আমি একটা জিনিস দেখতে পেয়েছি।

"...নাওয়ালের গলার স্বর যেন সেই সুদূর অন্ধকার থেকে ভেসে আসা ভৌতিক স্বরের মতোই শোনাচ্ছিল। লছমী জিজ্ঞেস করলো, "কী দেখতে পেয়েছো?"

"আমি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি।"

"কোথায়?"

"গাডঢায়।"

"গাডঢায়?" লছমীর চোখে, গলার স্বরে বিস্ময়।

"নাওয়ালের সেই সুদূর অন্ধকারের ভৌতিক স্বর যেন ভেসে এলো এক কূপ থেকে, "হ্যাঁ, যেখানে মানুষ অন্ধকারে মাথা ঠোকে। হাতড়ে পথ খুঁজে পায় না। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। আর হাঁসফাঁস করতে থাকে। সারা গায়ে নোংরা গাডঢার কাদা-ময়লায় মাখামাখি, যেন একটা শুয়োরের মতো।" (পৃ.৯৬)

নাওয়ালের এই যে উপলব্ধি এখানেই তাঁর নিঃসঙ্গতার উৎস নিহিত রয়েছে। এ কারণে লছমী তাকে নিজ সন্তান, মেয়েজামাই, পুত্রবধূর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও নাওয়াল নিজের নিঃসঙ্গতাকেই একমাত্র সত্য বলে জানিয়েছে :

আমি এখন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, সেখানে ওরা কেউ নেই। এটা বুঝতে আমার অনেক দেরি হয়ে গেল। যখন গাডঢায় এসে পড়লাম, তখন বুঝলাম, ওরা আছে। কিন্তু আমার সঙ্গে নেই। আমিও ওদের সঙ্গে নেই। ওদের কোথায় যাবার কথা, তা আর আমার ভাবনার এক্তিয়ারে নেই। আমার কোথায় যাবার কথা, সেটাই শুধু আমার ভাববার। তা, আমি দেখছি, আমি একটা গাডঢায় এসে পড়েছি। বড়ি আন্ধার। রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না। (পৃ.৯৬-৯৭)

এ গাডঢায় পড়ার সকল দায় নাওয়ালের নিজের। কাজেই এখানে সে কাউকে অংশী বলে ভাবে না। স্ত্রী লছমী, পার্টি কাউকে না। কিন্তু সে বুঝতে পারে সে একা শুধু নয়, পার্টিও একই গাডঢায় পড়ে আছে যেটা তারা বুঝতে পারছে না। নাওয়ালের এ উপলব্ধি নিচের অংশে :

Dhaka University Institutional Repository

না, তারাও আমার এই গাডঢায় পড়ার দায়ে নেই। যদি বলি, তাদের দায় আছে, তারা কাদা-মাটি মাখা শুয়োরটার দিকে তাকিয়ে হাসবে। চাই কি, ঢিল ছুঁড়ে মারবে। টিটকারি দেবে, অপমান করবে। বলবে, শুয়োরটা গাডঢায় পড়ে, এখন আমাদের দোষ দিতে চাইছে। তবে কি জানিস লছমী, যখন বুঝতে পারলাম, আমি একটা অন্ধকার গাডঢায় এসে পড়েছি, তখন দেখতে পেয়েছি, ওরাও বিরাট গাডঢায় পড়ে আছে। ওদের গায়েও কাদা-মাটি মাখা, শুয়োরের দল। কিন্তু ওরা ভাবছে, ওরা খুব সুখে আছে। আমাকে ভাগিয়ে দিয়েছে। আর ভেগে পড়তে হয়েছে বলেই, আমি দলছুট শুয়োরের মতো একলা। আর একলা বলেই, আমি বুঝতে পারছি, আমি গাডঢায় পড়েছি। তাই আমি একলা পথ হাতড়ে মরছি। (পৃ.৯৭)

লছমীও নাওয়ালের নিঃসঙ্গতার স্বরূপ অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। নাওয়াল জানে পার্টির প্রতি সে অনুগতপ্রাণ বলেই পার্টি থেকে তাকে বের করে না দিলেও বার বার নির্বাচনে ব্যর্থ-হওয়া নাওয়ালের কাছ থেকে তারা আর কিছু প্রত্যাশা করে না। কিন্তু সে মনে করে বহিরস্থিত হিসেবে পার্টিতে এলেও পার্টি তাকে কখনো নিজের লোক বলে ভাবেনি। তার নিজের এই প্রকৃত অবস্থান উপলব্ধির কথা পার্টি এখনও জানে না। কিন্তু নাওয়াল জানে কোথায় এসে সে দাঁড়িয়েছে, এখানেই পার্টির সঙ্গে তার পার্থক্য :

আমি নিজে খুঁজে পেয়েছি, আমি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। এইখানে ওদের সঙ্গে আমার ফারাক। আমি ওদের থেকে আলাদা কিছু ছিলাম না। যতদিন সেটা বুঝিনি, ততদিন আমি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি, বুঝতে পারিনি। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি, আমি কোনো কালেই ওদের মানুষ ছিলাম না। অথচ ওদেরই ঘরে নিজের বাসা বেঁধেছিলাম। আজ তাকিয়ে দেখি, পার্টি ওদের। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের জমানা নেই। এখন ওদের জমানা। কমরেড হাঙলের একটা কথা মনে পড়ছে। তখন আমি তাঁর সঙ্গে রাশিয়ার বৈকাল-হ্রদের ধারে একটা সুন্দর বাড়িতে ছিলাম। উনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, নাওয়াল, একটা কথা মনে রাখবে। মার্কসের তত্ত্বটা লেনিন কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, শ্রমিক নেতৃত্ব দেবে না। শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শে, সর্বহারার তাত্ত্বিক নেতা, কমিউনিস্ট ইনটেলেজেনসিয়ারা পার্টির নেতৃত্ব দেবে। যেমন লেনিন। পার্টির ইনটেলেজেনসিয়া থেকেই তিনি এসেছিলেন। আমি কোনো কালেই এসব কথার মানে বুঝিনি। খালি এটাই বুঝেছিলাম, কমরেড হাঙল নিজেকে লেনিনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। কারণ, কমিউনিস্ট ইনটেলেজেনসিয়া যাদের বলে, তাদের কোনো শ্রেণী নেই। তারাও শ্রেণীহীন সর্বহারা। (পৃ.৯৮)

কিন্তু হাঙলের মাঝে নাওয়াল শ্রেণিহীন সর্বহারার কোনো রূপ প্রত্যক্ষ করেনি। টপ্ বাবু হিসেবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মদ, সৌন্দর্যময়ী নারীর সান্নিধ্য ছাড়া তিনি চলতে পারেন না। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তার সঙ্গে গিয়ে নাওয়াল জেনেছে সুখ আর ভোগের জীবনের স্বরূপ কী। নাওয়ালের মতো একজন শ্রমিক নেতা সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য হলে 'পার্টির ইমেজ' বদলে যায়– জগৎ সেন এমন ধারণা পোষণ করলেও, আপত্তি থাকলেও, জগৎ সেনের আপত্তির প্রশ্নে হাঙল প্রত্যক্ষ কোনো বিরোধিতা না করে বরং নিজেদের মধ্যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপস করেই চলে। নাওয়াল কীভাবে অধঃপতিত জীবনের পঙ্কে নিমজ্জিত হয় স্ত্রী লছমীর সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যদিয়ে সেটা প্রকাশ করেছে। আজ তার বিলেতি মদ কেনার পয়সা নেই বলে শিউপূজনের দেয়া হুইস্কির বোতল শেষ হলে দেশি মদেই তার তৃষ্ণা মেটাতে হয়। অথচ এক সময় তার ভোগবিলাসের উপকরণ তারাই যোগাত তাকে দিয়ে যারা নিজেদের কাজ করিয়ে নিত। সে সম্পর্কে আজ নাওয়ালের উপলব্ধি নির্দ্বিধায় সে স্ত্রী লছমীর কাছে প্রকাশ করেছে :

আগে অনেকে খাওয়াতো। এমনি এমনি খাওয়াতো না। তাদের অনেক কাজ করে দিয়েছি। তারা বড় বড় হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছে। ক্যাবারে নাংগা লেড়কির নাচ দেখতে দেখতে ফুর্তি করেছি।... আমিও নেচেছি। কলকাতায় নেচেছি, দিল্লি, বোমবাই, বিলাতের কোনো কোনো মুল্লুকেও নেচেছি। ফুর্তি করবার দুনিয়া ছড়িয়ে আছে, শুধু তাকে কবজা করার তাকত থাকা চাই। তা কেবল টাকার তাকত তো সব থেকে বড় না। লিডার হলে, তার তাকত অনেক বেশি। টাকাওয়ালারাই তাকে ফুর্তি যোগায়। ...

"... হাঁ লছমী, সুখের কবুতর বনতে সময় লাগে না। আর এসব সুখ কি রকম তুই জানিস। কুত্তার বিষ্ঠা খাওয়ার মতো। একবার ধরলে, ছাড়া যায় না। এক সময়ে যাদের সঙ্গে এসব করেছি, তারা সবাই বড় নেতা। আমার কৃপা চেয়েছে, এমন

Dhaka University Institutional Repository

সব লোকদের সঙ্গেও করেছি। আর ঠোক্করটা তো এলো সেখান থেকেই। আমি বার বার ভোটে হারতে লাগলাম। প্রথমবারের এ্যাসেম্বলি ইলেকশনে জিততে পারলে, আমি মিনিস্টারও হতে পারতাম। হয়তো পারতাম। অন্তত রাষ্ট্রমন্ত্রীও হয়তো হতে পারতাম। কিন্তু জিততে পারিনি। পর পর হেরেছি। লোকেরাও আমাকে ভুলতে আরম্ভ করেছে। আমার দাম ফুরিয়েছে, আমি ভোটের রাজনীতিতে হেরেছি। ভোটে জিতেই তো আমি উঠেছিলাম, আমার দাম ছিল। কিন্তু সেই দামের বদলে, তোকে যে আমি কষ্ট দিয়েছি। তখন তাও বুঝতে পারতাম না। গু খাওয়া কুকুরের সুখ! লছমী, আমি আজ যে-গাড্ডায় পড়েছি, তোর কষ্টও তার জন্য দায়ী, তুই নয়। পাপ কখনো চাপা থাকে না। একদিন তাকে মোকাবিলা করতেই হয়। আমি এখন সেই মোকাবিলা করছি। লছমী, তোর লাল্লুর বাবাকে আজ তুই মাপ করলেও, তার দোষ যাবে না। (পৃ.৯৯-১০০)

অনেক বিদেশি নারীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে মদ্যপ নাওয়াল আপত্তিকর অনেক আচরণ করলেও বিদেশের পার্টি কিংবা ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা থেকে কোনো অভিযোগ ও শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়নি। এক্ষেত্রে প্রাগের নারী কৃস্ট্যাল তার জীবনে ব্যতিক্রমী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। নাওয়ালের চোখে মুগ্ধতা আবিষ্কার করে 'ঘোরের মধ্যে' তার প্রতি প্রণয় ও আত্মনিবেদন করেছে। কিন্তু কলকাতায় এসে লছমীকে দেখে তাকে বঞ্চিত করার অপরাধবোধের পীড়ন থেকে সে খুব সহজেই নাওয়ালের সঙ্গে মেয়ে-বন্ধুর সম্পর্ক ছিন্ন করে আজীবন শুধু বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি ও দাবি প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ নারীর কণ্ঠেও পরোক্ষভাবে নাওয়ালকে 'শেকড়ের সন্ধানে' যাত্রা করবার জন্য ভবনাথ গুপ্তর বলা কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছে নাওয়াল। বর্তমানের নাওয়ালকে নয়, অতীতের একজন লড়াকু শ্রমিক নেতা নাওয়ালকে নিয়ে নিজ ভাষায় গ্রন্থ লেখার ইচ্ছা কৃস্ট্যালের। নিচের অংশটি লক্ষণীয় :

"...নাভাল, তোমার পিছনের জীবনটার সঙ্গে এখনকার জীবনটা মেলে না। আমি জানি, তুমি একজন বহু পুরুষের লোহার শ্রমিক। ভারতের ইতিহাসে তোমার মতো একজন শ্রমিক পার্লামেন্টের মেমবার হয়েছে, এটা খুব বড় কথা। কিন্তু পার্লামেন্ট শেষ কথা না। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভবিষ্যৎ কী, আমি জানি না। কিন্তু আমার মনে হয়, তোমার আসল নেতৃত্বের সময় এখনও আসেনি। সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তোমার সম্পর্কে আমি লিখে যেতে পারবো কিনা জানি না। তোমার দেশকে আর দেশের মানুষকে আরও ভাল করে তোমাকে জানতে হবে, সেটা একজন এম.পি. হিসাবে জানা যায় না। আর সেটা যখন তুমি জানবে, তখন তুমি আর-এক মানুষ হবে। সেই মানুষটাকে নিয়েই আমি লিখতে চাই....। (পৃ.১০২)

আজ নাওয়াল বুঝতে পারে ভবনাথ গুপ্ত ও কৃস্ট্যাল নির্দেশিত পথেই সে ধাবিত হতে চলেছে। সে উপলব্ধি করছে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এটুকুতেই নাওয়াল তৃপ্ত হতে চায় না—জানতে চায় কোথা থেকে, কোন পথপরিক্রমায় তার আজকের এই পরিণতি। আত্মসন্ধানী নাওয়াল ফিরে গেছে পূর্বপুরুষের সংগ্রামশীল লৌহজীবনের শ্রমইতিহাসনির্ভর গৌরবময় অতীতে। ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিজয়ী এমপি হিসেবে দিল্লি গিয়ে কুতুব মিনারকে জড়িয়ে ধরে গন্ধ নেবার মধ্যদিয়ে পূর্বপুরুষের স্পর্শ অনুভব করেছিল। তার মনে হয়েছিল কয়েক 'শ' পুরুষ আগের বংশের মানুষদের গায়ের গন্ধ' ও 'মেহনতের গন্ধ' (পৃ.১০২) পাচ্ছে সে। সেই সঙ্গে নাওয়ালের গর্ব হয়েছিল এটা ভেবে যে আগারিয়ারাই 'লোহা পিটিয়ে গলিয়ে' (পৃ.১০২) ঐ মিনার বানিয়েছিল। অথচ ১৯৫৮ সালের বর্ষার সময় ছেলেমেয়েসহ লছমী কলকাতায় গিয়ে নাওয়ালের সঙ্গে কুতুব মিনার দেখতে যেতে চাইলে সে সময়ের অভাবের কথা জানিয়ে টাঙায় করে সন্তানদের নিয়ে তাকে একাই যাওয়ার কথা জানিয়েছিল। পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে তখন ক্ষমতার বিভ্রমে চালিত ছিল বলেই আজ অনুতাপবিদ্ধ নাওয়ালের স্বীকারোক্তি :

কেন? না, আমি দিল্লির ঐ ঠাণ্ডা গোল ঘর ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারতাম না। সেই ঠাণ্ডা গোল ঘর—পার্লামেন্ট জিসকো কহ্তে হ্যায়। দুনিয়ার যে-কোনো দামী সরাব, আর যত খুবসুরত জেনানা হোক–ঐ ঘরের থেকে কোনো বড় নেশা নেই। আমি তখন ঐ ঘরের নেশায় মাতাল—আর পার্টি...। (পৃ.১০২-১০৩)

Dhaka University Institutional Repository

৫৪ বছর বয়সী নাওয়াল; আট ঘণ্টার লড়াইয়ের 'নায়ক', 'লড়াকু মজ্‌দুর', প্রাক্তন এম. পি. কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য কমরেড নাওয়াল, আজ সকল আবরণ উন্মোচন করে অনুসন্ধান করছে, সে এই 'গাডঢায়' গহ্বরে কোথা থেকে, কেমন করে এসেছে। সেই সূত্রে উন্মোচিত হয়েছে ক্রমশ ভারতীয় কমিউনিস্ট রাজনীতির 'গাডঢা'র রোমশ অন্ধকার।

পারটি আর দিল্লির গোল ঘর, চুষে খাবার যন্ত্র

এ অংশে বর্ণিত হয়েছে নাওয়ালের উত্থানের ইতিহাস। একজন 'মূর্খ, অশিক্ষিত মজুর'কে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য জগৎ সেন, লোকেশ পালিতের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে 'নির্বাচনী এলাকার ম্যাপ এঁকে, কোথায় কোন্ শ্রেণীর লোক কতো আছে' প্রাদেশিক কমিটিকে তার হিসাব দেখিয়ে নির্বাচনে নাওয়ালের অংশগ্রহণের জন্য জোর তদ্বির করেছিলেন ভবনাথ গুপ্ত। কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত পূর্ববর্তী এম.পি.-কে পরাজিত করে বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়ে নাওয়াল বিজয়ী হয়। 'লড়াকু মজদুর' হিসেবে নাওয়ালের এ অভূতপূর্ব বিজয় তাকে পার্টি নেতৃত্বের খুব কাছাকাছি নিয়ে আসে। কমরেডরা তাকে নিয়ে কলকাতা এলে কাকাবাবু মুজাফ্‌ফর আহ্‌মেদ হাস্যোজ্জ্বল মুখে জড়িয়ে ধরেছিলেন। সে ছবি আজও নাওয়ালের ঘরের দেয়ালে টাঙানো আছে। কাকাবাবু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির শ্রেণিসচেতন চরিত্র বেশ ভালোভাবেই ধরতে পেরেছিলেন। এ কারণেই বড়লোক মধ্যবিত্ত বাড়ির শিক্ষিতা মেয়ে যখন নিম্ন মধ্যবিত্ত জাতে ছোট চাষি পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করতে চায় তখন দূরদর্শিতা থেকেই তিনি আপত্তি করেছিলেন। বড় ঘরের শিক্ষিত ছেলে কমরেড অনিল মজুমদারের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে ঠিক করা হয়। কলকাতায় গিয়ে লোকসভার আসনবিজয়ী কমরেড জয়ন্ত রায়ের বাড়িতে গিয়ে কমরেড স্নেহাংশু আচার্য, জ্যোতিবাবুর মতো ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করেছিল নাওয়াল। বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করা, লন্ডন থেকে পার্টির সদস্যপ্রাপ্ত জয়ন্ত রায় নাওয়ালকে দেখে দু-হাত তুলে সালাম জানানোর সঙ্গে জড়িয়ে ধরেছিলেন। কলকাতার বিখ্যাত বড় বড় অফিসার, সেক্রেটারি, পুলিশের বড় কর্তাদের মাঝে অভিনন্দিত ও সংবর্ধিত নাওয়াল সেই মুহূর্তে তাদের সঙ্গে নিজের কোনো প্রভেদ খুঁজে পায়নি। সেই প্রথম বিচিত্র স্বাদ ও ঘ্রাণযুক্ত খাবারের সঙ্গে বিলেতি মদের স্বাদ পেয়েছিল সে। নাওয়ালের জামিনদার ব্যারিস্টার কমরেড স্নেহাংশু, জ্যোতিবাবু তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছিলেন। ভবনাথ গুপ্ত নাওয়ালের বিজয়ে আনন্দে এমন আত্মহারা ও মাতাল হয়েছিলেন যে এক কথা বার বার বলছিলেন :

"... কে, কারা বলেছিল নাওয়াল হেরে যাবে? ও একটা মজুর, মূর্খ, কেউ ওকে ভোট দেবে না। কারা বলেছিল? কে নাওয়ালের থেকে বেশি ভোটে জিতেছে?" (পৃ.১০৬)

আজ নাওয়াল নিজেকে বেইমান বলে ধিক্কার দিচ্ছে। কারণ জয়ন্ত তাকে বার বার সাবধান করেছিল যারা তাকে নির্বাচনে বিজয়ী করেছিল সেই শ্রমিক শ্রেণি হতে বিচ্ছিন্ন না হতে। মনে পড়ছে কলকাতায় উৎসবমুখর সে রাতের কথা :

আজ ফুর্তির দিন। তবে কান খাড়া রাখবে। সকলের কথা শুনবে, কে কী বলছে, হ্যাঁ? মনে রাখবে, আজ থেকে তুমি একজন এম.পি.। প্রত্যেকের কথা মন দিয়ে শুনবে। তোমার পক্ষেই বলুক, আর বিপক্ষেই বলুক, সব কথায় কান রাখবে। জগৎ সেনকে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। সে যা বলবে, সকলের সামনেই সাফ কথা বলবে। কিন্তু তোমার সামনে যারা চাটুকারি করবে, তোয়াজ আর খোশামোদ করবে, তাদের সম্পর্কে সাবধান। আর একটা কথা মনে রাখবে, তোমাকে যারা ভোটে জিতিয়েছে, তাদের কথা কখনো ভুলবে না।"...নাওয়ালের গলার স্বর আবার ডুবে গেল। গেলাস তুলে চুমুক দিতে গেল। পারলো না। ওর গলা থেকে যেন কিছু উথ্‌লে বেরিয়ে আসছিল। গেলাসটা রেখে ও রুদ্ধস্বরে বলে উঠলো, "বেইমান! বেইমান।"...ওর মাথাটা টেবিলে ঠুকে গেল। (পৃ.১০৬)

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু ক্ষমতার পঙ্ক নাওয়ালকে বিস্মৃত করিয়েছিল সেসব জনগণকে, যারা তাকে ভোটে জিতিয়ে দিয়েছিল। আজ সে বুঝতে পারে সেই থেকে তার 'গাডঢা খোঁড়া' হচ্ছিল। এরপর ক্রমশই ক্ষমতার মোহ তাকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে। নিজ দলীয় মন্ত্রীরা পর্যন্ত তাকে 'ইনজিনিয়ারিং ফ্যাকটরীর রিপোর্ট' দীর্ঘ না করার, ট্রেনের পরিবর্তে প্লেনে যাওয়ার টাকার ব্যবস্থাও তারা করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। দিল্লিতে একশো টাকার বিনিময়ে দুহাজার টাকা ভাড়ার সরকারি কোয়ারটারে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার হুইস্কি ব্র্যান্ডিকেন্দ্রিক বিলাসিতাপূর্ণ জীবনের মাঝে অনেকবার দিল্লি গেলেও কুতুব মিনারের কাছে যাওয়ার সময় তার কখনো হয়নি। লছমীর কাছে সে সত্য উন্মোচন করেছে নাওয়াল :

লছমী, আমি কতবার দিল্লি গেছি, কিন্তু আর একদিনও কুতবের কাছে যাইনি। আমার বহুত পুরুষ আগের লোকদের গায়ের গন্ধ শুঁকতে যাইনি। আমি মজদুর ইনটেলেজেনসিয়া হতে পারিনি। আমি ময়ূরের পাখা পরেছি, আসলে আমি একটা কাক। কিন্তু কেন এমন হলো? (পৃ.১০৭)

পেছনে ফিরে নাওয়াল তার গাডঢা খোঁড়ার পটভূমি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সে দিনগুলোকে প্রত্যক্ষ করে। নির্বাচনী অফিসার, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সকলেই 'মূর্খ লোহাকাটা মজদুর'কে নির্বাচনে বিজয়ীর সনদ দেয়নি, সেটাও ভবনাথ গুপ্ত এসডি-ওর কোর্ট থেকে এনে দিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি থেকে এই প্রথম একজন শ্রমিক প্রতিনিধি সংসদে যাচ্ছে যাকে 'এখন একজন বিপ্লবীর থেকে বেশি সংসদীয় রাজনীতিজ্ঞ হতে হবে'—এমন কথাও তার সম্পর্কে খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। স্মৃতিপরিক্রমায় আজ নাওয়ালের কাছে স্পষ্ট হয় সংসদীয় রাজনীতির কাছে কমিউনিস্ট পার্টির এ আত্মসমর্পণের মধ্যেই সম্ভাবনাময় শ্রমিক বিপ্লবের ব্যর্থতার বীজ উপ্ত হয়েছিল।[৩০] যা বর্তমানে ব্যর্থতার চরম পর্যায়কে অতিক্রমণ করছে। শুধু তাই নয়, সে আজ বুঝতে পারে সংসদের একজন না হয়ে তার উচিত ছিল সঠিকভাবে মার্কসবাদের অনুশীলন ও অনুধ্যান। পার্টি নেতৃত্ব সেদিকে ততটা গুরুত্ব দেয়নি বলেও নাওয়ালের বিশ্বাস। জয়ন্ত ও ভবনাথের মতো নিষ্ঠাবান কিছু ব্যক্তি ছাড়া পার্টি নেতৃত্বে যারা ছিল তারা মুখেই শুধু শ্রমিক বিপ্লবের কথা বলেছে কিন্তু অনুশীলিত বিপ্লব সাধনের জন্য শ্রমিক শ্রেণিকে যোগ্য করে তোলবার জন্য কার্যকর কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেনি। এ কারণে যোগ্য শ্রমিক নেতৃত্ব পেয়েও তারা সঠিক পথ-নির্দেশনার অভাবে নাওয়ালের মতো পরিণতি বরণ করেছে। ভগবানে অবিশ্বাসী পার্টির ইনটেলিজেনসিয়ারাও জ্যোতিষীর শরণ নিয়ে মাদুলি ও আংটি ধারণ করছে। গণ-সংযোগের নামে পার্টি ক্যাডাররা সর্বত্র 'দুর্গাপুজো-কালীপুজো করছে', 'নেতা আর মন্ত্রীরা ঠাকুরের আবরণ খুলতে যাচ্ছে।' পার্টির এমন পরিণতি নাওয়াল মেনে নিতে পারেনি। পার্টির এই অধঃপতিত রূপের জন্য সে নিজেকেও দায়ী করে, মনে করে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস সে রাখতে পারেনি–নিজেকে বেইমান মনে হয় তার। সারাদিন পার্টি অফিসে কাটিয়ে সন্ধ্যা থেকে মদ্যপান করে 'কাঁদে-হাসে, নিজের মনে কথা বলে'। ভবনাথের কাছে বহু প্রতীক্ষিত ছিল নাওয়ালের এ আত্মোপলব্ধি ও আত্ম-আবিষ্কার। লছমীর কাছে নাওয়ালের বর্তমান অবস্থা শুনে তিনি যে কথাগুলো উচ্চারণ করেছেন তাতে কমিউনিস্ট পার্টির সে সময়ের প্রকৃত চারিত্র উন্মোচিত হয়েছে। নিচের অংশটি লক্ষণীয় :

বলতে দাও বউমা, বলতে দাও। এখন ওর নিজের সঙ্গে কথা বলার সময় এসেছে। এটা হলো নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া, এটা ওকে করতেই হবে। নাওয়ালরা যদি নিজেদের সঙ্গে বোঝাপড়া না করে, তা হলে অন্যের সঙ্গে বোঝাপড়া কী করে করবে? শত্রু তো কেবল বাইরে না। এখন প্রবল শত্রু পার্টির মধ্যে, যারা ক্ষমতার লোভে লড়ছে, আর সুখের খোঁজে আছে। খুনোখুনি করছে, যার থেকে কোনো ফায়দাই উঠবে না, কেবল গদি আঁকড়ে থাকার জন্য সবরকম নোংরামি চালিয়ে যাচ্ছে। ওরা কংগ্রেসের কাছ থেকেই এসব শিখেছে, আর এখন কংগ্রেসীদেরও ছাড়িয়ে যাবার তাল করছে। তোমাকে আমি আর কী বোঝাবো বউমা, কমিউনিস্ট পার্টির থেকে সারা দুনিয়ার গরীবের আর বড় পার্টি নেই। কিন্তু আজ আমরা কী

Dhaka University Institutional Repository

দেখছি। মজদুরের নেতৃত্ব কোথায়? মজদুরদের ওরা বেশ ভালো ভাবেই হটিয়েছে। এখন লেগেছে গ্রামের গরীবদের চরিত্র নষ্ট করতে। এ কথা বলতে গেলে, ওরা তোমার মুখে জুতো ছুঁড়ে মারবে। গদি, টাকা, সুখ, বড় আরামের জিনিস। শুয়োরের পচা খাবার খাওয়া আর নর্দমার নোংরা জলে পাঁকে শুয়ে থাকা সুখের মতো। একটা না, কয়েকটা জেনারেশানকে ধ্বংস করে দেবার মতো শক্তি ওরা হাতে পেয়ে গেছে। (পৃ.১০৮-১০৯)

নাওয়ালের বাবা লছমন আগারিয়া আজও সেই পুরানিয়া লোহাকাটা রয়ে গেছে। নাওয়াল সহ পুরো পার্টির কথায় তিনিও সাধারণ মানুষের মুক্তির স্বপ্ন লালন করেছিলেন। কিন্তু জনবিচ্ছিন্ন নাওয়াল প্রত্যেকের স্বপ্নভঙ্গের কারণ হয়েছিল। নাওয়ালের বাবা হিসেবে তার রোজগারে খেতে লজ্জা বোধ করত, লছ্মীকে নাওয়ালের বউ বলার চেয়ে 'স্পিনারকে বেটি, লোহাকাটা আগারিয়া ঘরের বহু' বলতেই তিনি গর্ব বোধ করতেন। তৃতীয় দফায় নিজের ভাই নওরঙ সিপত, ইস্রাইল, ইব্রাহিম তাকে ভোট দেয়নি। ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে কোম্পানির কর্তাদের যে বখরা আছে সনাতন মিস্তিরির মতো প্রাচীন লড়িয়ে শ্রমিকরা আজ সেটা বুঝতে পারে। উপলব্ধি করতে পারে নাওয়ালের মতো নেতা ও শত্রুরা এখন একই কাতারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভবনাথ গুপ্ত নাওয়ালকে এসব কথা বলতে আসে যখন নিজের সঙ্গে তার বোঝাপড়া শুরু হয়ে গেছে। পার্টির স্বার্থান্বেষী অধঃপতিত রূপ যা সাধারণ মানুষের কাছে সুস্পষ্ট তার স্বরূপ ভবনাথের কণ্ঠে :

তোমরা যদি ভেবে থাকো, ওরা সবাই বুদ্ধু, কিছুই জানে না, বোঝে না, তা হলে ভুল করেছো। আজ যে পার্টি কাদের পয়সায় ফুটানি করছে, পার্টি ভাবে, লোকে কিছু বোঝে না। কার পয়সায় পার্টির হালচাল ঝলমল করছে, তারা সব বোঝে। কিন্তু তারা জানে, তাদের কিছু করার নেই। তাদের চোখে, তোমরা আর তোমাদের শত্রুরা এক হয়ে গেছ। কোথাও কোনো ফারাক নেই। এখন তুমি যখন দেখছো, পার্টি তোমার কাঁধে ধাক্কা মারছে, তখন নিজের সঙ্গে কথা শুরু করেছো। কর, কর, দেখ, কোথায় নিজেকে খুঁজে পাও। তবে একটা কথা বলি, জানি না, বুঝবে কি না। জয়ন্ত রায় তোমাকে ভালবাসে। কিন্তু তার আজ আর কিছু করার নেই। পার্টি ইচ্ছা করলে তোমাকে ভারতের যে-কোনো জায়গা থেকে আবার ভোটে জিতিয়ে আনতে পারে। কিন্তু আনবে না। কারণ, তোমাদের জমানা খতম হয়েছে। তোমাদের ওরা শেষ করে এখন নিজেরা লুটতে বসেছে। ওরা এখন দুনিয়ার পার্টিগুলোর সঙ্গে নিজেদের হিসাব নিকাশ করছে, কোথায় কী সুবিধা পেলে, ভারতে নিজেরা আরও বেশি ক্ষমতায় আসতে পারবে। ওসবের মধ্যেও কোনো আদর্শ নেই, আছে স্বার্থের চালবাজী। শেষ কথাটা জানবে। এটা আমার বিশ্বাস, পার্টি আর দিল্লির ঐ ঠাণ্ডা গোল ঘরটার যন্ত্র তোমাদের চুষে খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। (পৃ.১১০)

ভবনাথের কণ্ঠে নাওয়াল নিজেদের নিঃশেষিত হওয়ার কথা শুনেও মেনে নিতে পারেনি। শিশুর ব্যাকুল সারল্যে সে প্রশ্ন করেছে "একদম শেষ?" (পৃ.১১১) আলোর আভাস দিয়ে ভবনাথ গুপ্ত পার্টির পুরোটাই ভেঙে নতুন করে বদলানোর কথা বলেন। বয়সটাকে অগ্রাহ্য করে নাওয়ালকে প্রাণের শক্তির কথা বলেন, যে শক্তিতে সে এখনও লড়াই করতে সক্ষম—'বাইরে, ঘরে, পার্টিতে' (পৃ.১১১)। এসব কথায় নাওয়াল নকশালবাদীদের আদর্শের প্রতিফলন দেখতে পেয়েছে। কিন্তু নকশালবাদী হতে চাইলেও ভবনাথ গুপ্ত শেষ পর্যন্ত তাতে আস্থা রাখতে পারেননি। কারণ নকশালবাদীদের রাজনৈতিক আদর্শ ছিল জনবিচ্ছিন্ন।[২৯] এ কারণেই তাদের হাতগুলোকে তিনি মনে করেছিলেন 'শেকল ছেঁড়া ভূতের হাত'। নিচের অংশটি লক্ষণীয় :

আমি দেখেছিলাম, নকশালদের হাতগুলো আসলে শেকল ছেঁড়া ভূতের হাত। ওদের কোনো জমিন আর গোড়া ছিল না। ভূতের যেমন ছায়া পড়ে না লোকে বলে, ওদেরও কোনো ছায়া ছিল না। থাকলে আজ এ অবস্থা হতো না। তবে হাঁ, আমি বিশ্বাস করি, ওদের মধ্যেই কেউ কেউ এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই চেষ্টায় কিছু হবে না। আমি তোমাকে এসব কথা কোনো দিন খোলাখুলি বলিনি। আজ তোমার কথা শুনে মনে হলো, তুমি নিজের সঙ্গে লড়ছো। তোমার শেকড় খুঁজছো। খোঁজো, সেখানেই জবাব আছে। ...ক্ষমতার কথা ভোল। নতুন কথা ভাবো। ...খোঁজো, নাওয়াল খোঁজো, আর এটাও জানবে অনেকেই খুঁজছে। খুঁজতে আরম্ভ করলে, তাদের সঙ্গেও তোমার যোগাযোগ ঘটে যাবে। ...(পৃ.১১১)

Dhaka University Institutional Repository

উপায় নির্দেশ না করলেও ভবনাথ গুপ্ত এটুকু স্পষ্ট করেই বলেছেন দুনিয়াটাকে 'সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বদলাতে হবে।'
রাত বেশ হয়েছে। লছমীর উচিত নাওয়ালের সঙ্গ দেওয়া, কথা বলা– এ কথা বলে ভবনাথ গুপ্ত অন্ধকারে বেরিয়ে গেলেন।

শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে

নির্জন ঘর। লছমী চলে গিয়েছে; লোড শেডিং, অন্ধকার। নাওয়াল প্রস্তুত ছিল, মোমবাতি জ্বালিয়ে জানালার কাছে রাখে। এ পর্বের শুরুতেই সমরেশ বসু নির্মাণ করলেন প্রতিরূপকী পরিস্থিতি, এ উপন্যাসের এমন শৈল্পিক মনস্তত্ত্ব
প্রাক্-পর্বের শুরুতেও প্রত্যক্ষ করা যায়। †kKj †Qov nv‡Zi †Lv‡R উপন্যাস আকৃতিতে ১২০ পৃষ্ঠার স্বল্পায়তনিক হওয়ার অন্যতম কারণ, অনেক ন্যারেটিভ বা বর্ণন দীর্ঘ না করে, প্রতীকে, সংকেতে, চিত্রকল্পে দ্যোতনাময় ও দূরসঞ্চার করা। উদ্ধৃতি অনুসরণীয় :

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে মোমবাতি ধরালো। আর প্রথমেই ওর নিজের বিশাল কিম্ভূত ছায়াটা ঘরের মেঝে আর দেওয়াল জুড়ে কেঁপে উঠলো। ও টেবিলের কাছে এসে, কয়েক ফোঁটা গলিত মোমের ওপর বাতিটা দাঁড় করালো। আর ঠিক সেই সময়, ভবনাথ আবার এলেন। নাওয়াল অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকালো। (পৃ.১১২)

ভবনাথ গান্ধীজী প্রসঙ্গ মনে পড়ায় ফিরে এসেছেন। বললেন, গান্ধীজী বলতেন একমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই নিজেদের অবস্থা ফেরাবার জন্য লড়ে। তার মানে কী? একমাত্র মধ্যবিত্তরাই নিজের অবস্থাকে ফিরিয়ে বড়লোক হতে চায়। এমনটা যদি সব গরীবরা চাইতো, তা হলে ঠিক হত। কিন্তু জানবে, ওটা একজন কমিউনিস্টের কাছে প্রতিক্রিয়াশীল কথা। তিনি মধ্যবিত্তদের তারিফ করেছেন, আর এখন আমাদের পার্টির নেতারা, ক্যাডাররা গান্ধীজীর সেই লাইনটাই নিয়ে চলছে। কথাগুলো নাওয়ালকে জানিয়েই ভবনাথ গুপ্ত অন্ধকারে বেরিয়ে গেলেন। নাওয়াল সে ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। ওর বিশাল ছায়াটা দেওয়ালে আর মেঝেতে কাঁপছে। নাওয়াল অন্তর্ভুবনে পুনরায় নিজেকে খুঁজতে শুরু করে, যেন অতল এ অভিযাত্রা।

ভবনাথের কথায় নাওয়াল নতুন করে শক্তি ফিরে পায়। কাজেই সে শিউপূজনের মতো ব্যক্তির সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করা ভালো বাড়ি থেকে আসা 'লুমপেন প্রোলেতারিয়েত' ওয়াগন ব্রেকার বুলেটের মতো ছেলেদের নেতৃত্ব দিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধির পরিকল্পনা বাদ দিয়ে নতুন পথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। নিজের ছেলে লাল্লু বি.এ. পাশ করে ট্যাকসির ব্যবসার পাশাপাশি রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। তার এ অধঃপতনের জন্য নিজেকে অভিযুক্ত করে নাওয়াল। তাকে নিয়ে নয়, বরং ভাতিজাদের নিয়ে সে নতুন পথে চলার স্বপ্ন দেখে। নকশালপন্থী তিমিরের মতো ছেলেদের (যারা একদিন এ পথের বিভ্রম উপলব্ধি করবে) নিয়েই স্বপ্ন দেখতে চায় নাওয়াল। 'লুটতে আসা' বুলেটের মতো ছেলেরা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে না এটাও জানায় নাওয়াল। সশস্ত্র বুলেটের সঙ্গে কথায় কথায় নাওয়াল নিজের বিশ্বাসের কথা, আশ্বাসের কথা জানায় :

আমি নিজেকে খুঁজে দেখছি, আমার সেই শিকড়টাকে। ... আমরা কী বলি? সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র গঠন, তাই না? এখন শুনছি, ওটার দায়িত্ব মধ্যবিত্ত ইনটেলিজেনসিয়ার হাতে, ওরাই নাকি নেতৃত্ব দেবে। আমি এটা মানিনে। এরা নিজেদের ক্ষুদে লেনিন ভাবছে। ভাবুক। আমি এখন একলা ভাবছি, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্য থেকেই ইনটেলিজেনসিয়ার ক্যাডার বেরিয়ে আসবে। আমার বাবা কেন দু'পয়সার লড়াইয়ে নেমেছিল, আমি কেন আট ঘণ্টার কাজের রোজের আন্দোলনে নেমেছিলাম, সেটা আমাকে খতিয়ে দেখতে হবে। মধ্যবিত্ত ক্যাডারদের ওপর আমার আস্থা

Dhaka University Institutional Repository

নেই। ওরা, আর ওদের ওপরের নেতারা পার্টিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে, আর ইন্টারন্যাশনাল পার্টিগুলো কী করে এসব মানছে, আমি জানি না। আমি ভালো করে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি কোনো কালেই বুঝতে পারি না। ধরো, আমি যদি বিশ্বাস করি, ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়া একটা কূটনৈতিক চাল চালছে, আসলে তারা চায়, এ দেশে শ্রমিক কৃষক বিপ্লব হবে, আমি থম্‌কে যাই। মেনে নিতে পারি না। আমি বুঝেছি, আমার রাস্তা বদলাবার সময় এসেছে। (পৃ.১১৫)

এক কালের 'লড়াকু মজ্‌দুর' নাওয়াল চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য এই যে, সত্য স্বীকারের সাহস তার আছে। নাওয়ালের এ উপলব্ধির কারণ যে নির্বাচনে ব্যর্থতাজনিত হতাশা, বুলেট সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলে, নাওয়াল তা স্বীকার করে নিয়েছে :

একেবারে মিথ্যা বলোনি। কিন্তু আমি যে একজন লাথখোর, সেটা আমি বুঝেছি। আমি যে গাডঢায় পড়া একটা কাদামাখা শুয়োর, সেটাও দেখতে পাচ্ছি, আর তাতেই আমার রাগ ঝাল সব চলে গেছে। আমি শেকড় খুঁজছি, আমাকে মানুষের মতো তৈরি করতে চাইছি। আমি বুঝেছি, কয়েক কদম পিছন ফিরলে, ক্ষতি নেই। পিছন ফিরলে, আমি নয়া ক্যাডারদেরও দেখা পেতে পারি। আমার বিশ্বাস, তখন আমি আর একলা থাকবো না। আমি আরও বিশ্বাস করি, এরকমটা আমি একলা ভাবছি না। আমার মতো অনেকে ভাবছে। কয়েক কদম পিছোলে, আমরা আরও বেশি কিছু কদম এগিয়ে যেতে পারবো। আমি জানি না, তখন তুমি, তোমার মতো বুলেটরা আমাদের ওপর বুলেট চালাবে কি না। এখন আংরেজ বর্তনিয়াদের জমানা নেই, বহুত বদলে গেছে। পরিস্থিতি অনেক ঘোরালো। এ সবের জন্য তৈরি হয়েই আমাদের নামতে হবে। (পৃ.১১৫)

সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র গঠনে আস্থাশীল নাওয়াল বিশ্বাস করে শ্রমিক শ্রেণির মধ্য থেকেই সে 'ইনটেলিজেনসিয়ার নেতৃত্ব' বেরিয়ে আসবে। এ পরিস্থিতির বর্ণন এবং বুনট, সমরেশ বসুর প্রতীকাশ্রয়ী পরিচর্যায় চমৎকারী দ্যোতক হয়ে ওঠে :

বুলেট চুপ করে রইলো। আর মোমবাতির আলোয় ওর ছায়াটাও নাওয়ালের ছায়ার সঙ্গে মিলে, অন্ধকারকে বাড়িয়ে তুলেছে। ওর হাতের রিভলবারটা চকচক করছে। (পৃ.১১৬)

বিশ্বাসের গুরুভার, দায়িত্ববোধ থেকে পলায়নের শেষ চেষ্টা হিসেবে, নকশালপন্থী তরুণ আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকা তিমিরকে গভীর রাতে ডেকে পাঠিয়েছিল নাওয়াল আগারিয়া। কিন্তু সত্যসন্ধানী শেকড়সন্ধানী নাওয়ালের বিবেচনাবোধ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে—বুলেট এবং তিমির কেউই তার পথ নয়। নাওয়ালের স্বীকারোক্তি অনুধাবনীয় :

"তিমির, বুলেটকে আমিই ডেকেছিলাম। আর তোমাদের দুজনকেই বলছি, তোমাদের ডাকাটা আমার ভুল হয়েছে। ওটাও ছিল আমার পালাবার একটা ফন্দি। কিন্তু আমি আর পালাতে পারবো না। এখন আমি পিছনে যাচ্ছি, নিজেকে খুঁজে আনতে। নিজেকে খুঁজে পেলে, তারপরে আমি কাদের কাছে যাবো, সেটা বুঝতে পারবো। তিমির, আমি নকশালের পথে নেই। ... তোমরা কিছু ছেলে এখনও আছো যাদের ভুল ভাঙলে, একদিন তাদের কাছেই আমাকে যেতে হবে। ... কানু বাবু, অসীমরা কী করছে? তুমি এখনও সি.এম-লাইন নিয়ে চলেছো। আমি ও পথে বিশ্বাস করি না। তোমাকে ডাকাও আমার ভুল হয়েছে। তোমরা দুজনেই এখান যেতে পারো।" (পৃ.১১৬-১৭)

পরবর্তী অনুচ্ছেদ রূপায়ণে সমরেশ বসু চিত্রাত্মক পরিচর্যায় কিছু বস্তুর অনুঘটকে কথাহীন কক্ষটিকে রাজনীতিক ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে বাগ্ময় করেছেন। বর্ণনাংশ লক্ষণীয় :

নাওয়াল দেখলো। মোমবাতির আলো কাঁপছে। নাওয়াল সারা ঘরটার দিকে ঘুরে ফিরে দেখলো। ঘরের এক কোণে গিয়ে, মোটা লাঠির মুণ্ডুতে জড়ানো ঝাণ্ডাটা হাতে নিল। কাস্তে হাতুড়ি তারা হলুদ রঙে লাল পতাকার বুকে। ও ঝাণ্ডাটা লাঠির মতো ঘুরিয়ে দেওয়ালের ছবিগুলোকে আঘাত করতে উদ্যত হলো। আবার মুহূর্তেই থেমে গেল। থাক্, এই সব ফটো–কলঙ্কিত ইতিহাসের চিহ্ন এত সহজে মুছে ফেলা ঠিক হবে না। তা ছাড়া, দেওয়ালে লেনিনের ছবি রয়েছে। কার্ল মার্ক্স, এঙ্গেল্‌স্-এর ছবি রয়েছে। মাওয়ের ছবিও রয়েছে। ... নাওয়াল ঝাণ্ডাটা ঘরের কোণে রেখে দিল। ঘরের বাইরে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ওর বসতবাটি রাস্তার ওপারে। (পৃ.১১৭)

Dhaka University Institutional Repository

বাবা লছমনের কাছে আজকাল নাওয়াল অন্য মানুষ, অপরিচিত, অচেনা, আগন্তুক বলে বিবেচিত হয়। দীর্ঘকাল সে লছমনকে বাবুজী বলে ডাকেনি, তার সামনে এসে বসেনি। পরে সন্তান হিসেবে ফিরে এলেও নাওয়ালকে বিশ্বাস করতে পারেনি লছমন আগারিয়া, বরং নাওয়াল নিজেকে আগারিয়া বললে লছমন ক্ষেপে উঠেছে। নাওয়াল তার বুকে হাত রেখে উচ্চারণ করেছে "আমি বেইমান নই। বাবুজী, আমি নিজেকে খুঁজে ফিরছি।" (পৃ.১১৮)

ক্ষমতার নেশায় নাওয়াল স্নেহ ভালবাসার গণ্ডি অতিক্রম করলেও সন্তান ঘরে না ফেরা পর্যন্ত লছমন নিশ্চিন্ত হয়ে কখনো শুতে যাননি। আজ সন্তানকে পেয়ে দুপয়সার লড়াইয়ের কথা মনে আছে কিনা জানতে চান। নাওয়াল অকপটে ভুলে যাওয়ার কথা স্বীকার করে নতুন করে সব মনে পড়বার কথা জানায়। যাদের সঙ্গে নিয়ে তার লড়াকু জীবনের সূত্রপাত সেই– সিপত্, ইস্রাইল, ইব্রাহিম, সনাতনসহ সকল পুরানিয়া সহকর্মীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

†kKj †Qov nv‡Zi †Lv‡Rর শেষাংশ (পৃ.১১৯-২০) গীতময় বর্ণনায়– জোলো বাতাস, নতুন আকাশ, জোনাকির অন্ধকারভেদী আঁকা ছবি, বহতা গঙ্গার নতুন স্রোত–সব মিলিয়ে এমনভাবে অন্ধকারছিন্ন আলোকবলয় সৃষ্টি করেছে, যার স্পর্শে পাঠক সীমাহীন এক আবেগে-বোধে, দর্শনে পৌঁছে যায়। সমরেশ বসুর সংকেতময় সংবেদ ও বোধের সঞ্চার-সামর্থ্য অতুলনীয়। এখানে বাঙ্ময় হয়েছেন কথাকোবিদ নান্দনিক সমরেশ বসু :

বাইরের নিবিড় অন্ধকারে একটা জোলো বাতাস বইছে। বৃষ্টি হতে পারে। আকাশে গাঢ় কালো মেঘ। জোনাকিরা আকাশের নিচে যেন একটা নতুন আকাশ তৈরি করেছে। এত জোনাকি, অন্ধকার আকাশে তারার মতো। কিন্তু জোনাকিরা স্থির নয়। অস্থির হয়ে উড়ছে, আর বিচিত্র ছবি এঁকে দিচ্ছে।

নাওয়াল পুরানিয়াদের দিকে কদম বাড়ালো। সামনে কদম সরে আসছে।

গঙ্গার ধারটা অন্ধকার। রাস্তার বাতিগুলো কোনো দিনই জ্বলে না। কেন, কে জানে। ভবনাথদার একটা কথা আবার মনে পড়লো। এই গঙ্গাকে দেখিয়ে একদিন বলেছিলেন, "আমাদের বিশ্বাস, এই গঙ্গা এমনিই চিরদিন বইবে। না, হয়তো বইবে না। এ গঙ্গাটা হয়ে যাবে একটা মরা খাত্ বালিয়াড়ি মরুভূমি। আর নতুন একটা গঙ্গা পুবের তল্লাট ভাসিয়ে, আজকের কলকাতাটাকে ফালা ফালা করে দিয়ে বইবে। সেদিন অবাক হবার কিছু থাকবে না। বস্তুবাদীই একমাত্র জানে, জড়পদার্থে চেতনা কাজ করছে। ইতিহাস এ ভাবেই বদলায়।"

না, নাওয়াল সব কথার মানে বোঝেনি। তবে একটা গঙ্গা মরুভূমি হতে পারে। আর একটা সৃষ্টি হয়ে, প্রবল বহতায় নতুন স্রোত আনতে পারে। চলো পুরানিয়া, পিছে কদম চলো। সামনে কদম আসছে।"

খণ্ডিতা

ষাটের দশকের স্বপ্নভঙ্গ, সত্তরের দশকের নকশাল-আন্দোলন ও শ্রেণিশত্রু খতমের রাজনীতির রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা, আত্মমুক্তির পন্থা হিসেবে আশির দশকে মিথজগৎ পরিক্রমণ শেষে একজন প্রতিশ্রুতিশীল দায়বদ্ধ লেখক হিসেবে তিনি সাহিত্যজীবনের অন্তিম পর্বে এসে আবার প্রত্যাবর্তন করেছেন মানবতার গভীর সংকটকালীন সেই 'আদাব' পর্বে—অবিভক্ত ভারতবর্ষের জনজীবন যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সংকট ও দেশবিভাগের অস্থিরতায় অনিশ্চয়তায় বিপন্ন। সাহিত্যজীবনের অন্ত্য পর্বে সমরেশের শিল্পীসত্তার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল বৃহত্তর সমাজমানসের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিমানুষকে দেখা। LwbZv[৩১] উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের সেই প্রয়াস সুস্পষ্ট। সমরেশ বসু এ উপন্যাসে দেশবিভাগজনিত জটিল সংঘাতদীর্ণ উদ্বেল সময়কে ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালের চৌদ্দই আগস্ট বিকেল থেকে বিশ আগস্ট রাত বারোটা পর্যন্ত বিস্তৃত সময়পরিসরে, এ আখ্যানে বিন্যস্ত হয়েছে দেশবিভাগ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিয়ে বিভিন্ন চরিত্রের মত-অমত, অভিমত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং সীমানা কমিশনের বণ্টনব্যবস্থা নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, হিন্দু-মুসলমানের জীবনে ঘনিয়ে আসা অস্তিত্ব সংকটজনিত দুশ্চিন্তা ও বিপন্নতা, সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-সংঘাত। নিজস্ব ভাবনার প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্রের আলোচনাসূত্রেই সমরেশ বসু 'জাতীয় জীবনের একটি জটিল ও দুর্যোগপূর্ণ সময়কে ধরতে চেয়েছেন'।[৩২] উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য—খণ্ডিত দেশমাতৃকার জন্য সতুর সুগভীর বেদনাবোধ ও তার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার দীপ্র ব্যাকুলতা স্বল্পপরিসর উপন্যাসে সমরেশ বসু মূলত বিশ্লেষণাত্মক ও সংলাপধর্মী পরিচর্যায়, অনেক ক্ষেত্রে গীতময় প্রতীকী বহুস্তরী ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

LwbZv সমরেশ বসুর অন্ত্য পর্যায়ের আকস্মিক রচনা নয়। উপন্যাসের অন্তর্প্রেরণা ঔপন্যাসিক অনেক আগে থেকেই মেধায় ও আবেগে লালন করছিলেন, তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে।। উপন্যাসের ঘটনাংশ ও বোধ, সমরেশ বসুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও মানববাদী প্রগতিপন্থা উৎসারিত; LwbZv তাঁর 'জীবনার্থের রূপান্বিত রূপক'। এ ক্ষেত্রে দুটি উদ্ধৃতি, অনুসরণীয় :

১ "দুশো বছরের বিদেশী পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তির অনিবার্য শর্ত, দেশ বিভাগের ক্ষত নিয়েই, স্বাধীনতার সেই প্রথম রাত্রে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানে যাত্রা। কেন যে গিয়েছিলুম, তার যথার্থ কোনো ব্যাখ্যা আজ আর দিতে পারিনে। আমার সঙ্গে যে দু'জন বন্ধু গিয়েছিলেন, তাদের নাম গৌর ঘোষ (সাংবাদিক-সাহিত্যিক নন), আর একজনের নাম সুবল ঘোষ। আমি আর গৌর তখন কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। সুবল একজন একনিষ্ঠ পার্টির সদস্য। পার্টি দেশ বিভাগ মেনে নেওয়া সত্ত্বেও, আমরা কেন পারিনি? আমি পূর্ববঙ্গের সন্তান ছিলুম। গৌর-সুবল একান্তভাবেই পশ্চিমবঙ্গের সন্তান। দেশবিভাগকে সমর্থন করতে পারিনি বলেই আমাদের বা আমার মনে বিশেষ করে গান্ধীজীই ছিলেন সর্বাপেক্ষা বড় আশ্রয়।"[৩৩]

২ "...আমার আনেক দিনের ইচ্ছা, একটি উপন্যাস লেখার। ঘটনাটি বাস্তব। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট সন্ধ্যা বেলা North Bengal Express-এ আমি ও দু'জন, পশ্চিমবঙ্গ-নৈহাটি থেকে পূর্ব পাকিস্তান দর্শনে গিয়েছিলাম। আনন্দের মধ্যেও বড় বিষাদময় সেই অভিজ্ঞতা। আমরা রংপুর থেকে সৈয়দপুর এক অবাঙালী বিহারী দম্পতির অতিথি হতে বাধ্য হয়েছিলাম। বিহারী ভদ্রলোক সৈয়দপুর রেল কারখানায় চাকরি করতো—নতুন ভারতে নতুন চাকরিতে যোগ দেবার উদ্যোগ পর্ব চলছিল। সেখানে দেখা পাই এক উদ্ধত যৌবনা নষ্ট নারীর—যার বাঁ হাতটি মণিবন্ধ থেকে কাটা। তাকে নিয়ে হিন্দু মুসলমান সকলেরই দুরন্ত লোভ। মেয়েটি নট সেটল্‌মেন্টে থাকে—তার বাইরে আসার অনুমতি ছিল।

সেই অতীতের যাত্রা আজ কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে ২৩ বছরের সেই দিনের তরুণকে?[৩৪]

উল্লেখিত উদ্ধৃতি অনুসারে স্বয়ং সমরেশ বসু, গৌর ঘোষ ও সুবল ঘোষ LwbZvয় যথাক্রমে সতু, বিজু ও গোরায় গোত্রান্তরিত হয়েছেন। সেখানে কাজ করেছে ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতাকে দর্শনে, বোধে-আবেগে, রূপবন্ধে রূপান্তরের সংযমচর্চিত শিল্পিত দক্ষতা।

সমরেশ বসুর ঔপন্যাসিক দৃষ্টিবোধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল– চরিত্রের ব্যক্তিত্ব, মনোভাব, দৃষ্টিকোণ, জীবনদর্শন তথা সংবেদের কার্যকারণ হিসেবে ঐতিহ্য, পারিবারিক প্রতিবেশ, শিক্ষা, বিবেচনাবোধের অভিমুখকে স্পষ্ট করা। এ কারণেই সাহিত্য-শিল্প-রাজনীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে– সতু, বিজু ও গোরার স্বাতন্ত্র্য, শিক্ষা, অভিরুচি, ইতিহাস-ধারণাকে চিহ্নিত করেছেন, তাদের স্বতন্ত্র পারিবারিক ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষণীতে উপস্থাপন করে।

বিজুর ভালো নাম সৌরীন্দ্রনাথ মিত্র। বিদ্বান মেধাবী ছেলে, নীহাররঞ্জন রায়ের ছাত্র, প্রাচীন ইতিহাসে এম-এ ফার্স্ট্ ক্লাস পাওয়া। উচ্চতর গবেষণার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ধনী পিতা শচীন্দ্রনাথ মিত্রের জ্যেষ্ঠ সন্তান সে, তবে শালীন ও নিরহংকারী। বাবাকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু বাবার সব নির্দেশ মেনে চলতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

শচীন্দ্রনাথ মিত্র অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিকতা-আক্রান্ত মানুষ। পুত্র বিজুর সঙ্গেও প্রতিদিন কথা হয় না। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না থাকলেও বিজুর কমিউনিস্ট পার্টির দিকে ঝোঁক আছে। সতু এবং গোরার সঙ্গে তিনি কখনও কথা বলেন না। বিজুর মা নিজেও রক্ষণশীল। তবে মায়ের ব্যক্তিত্বের কাছে পিতা শচীন্দ্রনাথের 'ফিউডাল মেজাজ' মাথা তুলতে পারে না। বিজুর বিরুদ্ধে শচীন্দ্রনাথ কোনো আপত্তি বা অভিযোগ আনলে বিজুর মা সেসব প্রশ্রয় দেন না। মায়ের স্নেহ-মমতার আশ্রয়-প্রশ্রয়েই বিজুর বন্ধু সতু ও গোরা তাদের গৃহে প্রবেশ করতে পারে। বিজুর পরে ওর এক বোন ও ভাই আছে। দক্ষিণের বাদা অঞ্চলের জমিদারিতে বিজুর কাকা-জ্যাঠারও ভাগ আছে। পাশাপাশি মিত্তিরদের বড়ো বড়ো বাড়ি নিয়ে বিরাট একটা অংশ ছড়িয়ে আছে।

গোরার বাবা হরেন্দ্রনাথ ঘোষ চটকলের 'নাম-করা মিস্তিরি ছিলেন'। 'গোরার বাবা এক সময়ে ভালো আয় করেছেন। জাত ব্যবসা বলতে যা বোঝায়, সেটা তিন-চার পুরুষ আগেই শেষ হয়েছিল। চটকলই সম্ভবত তার মূলে।' সমস্ত কারখানার যাবতীয় বিগড়ে যাওয়া মেশিনকে সারিয়ে তোলা ছিল তাঁরই কাজ। "অন্যান্য চটকল কোম্পানির কারখানার কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে হরেন্দ্রনাথ ঘোষকে ধার চাইতেন। সকলেই অবাক আর মুগ্ধ হত।"(পৃ.৬২৯-৩০) গোরার দাদাও প্রথমে স্কুলে পড়া আরম্ভ করলেও, শেষ পর্যন্ত চটকলে 'মিস্তিরি বয়' হয়ে কাজে লেগেছিল। অল্প বয়সেই গুরুদাসের কাজের পদ্ধতি দেখে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ তাকে ডান্ডিতে নিজেদের কারখানায় কাজ শিখতে পাঠিয়েছিল। গোরার দাদা গুরুদাস ঘোষ এ শহরের প্রথম বিলাত ফেরত। গোরার দাদা গুরুদাস স্কটল্যান্ডের ডান্ডি ঘুরে এসেছেন। এখন তিনি কারখানার চিফ মেকানিকাল অফিসার। 'গোরার ঠাকুর্দাই প্রথম সামান্য বাস্তুভিটার চালাঘরের পরিবর্তে, একটা পাকা ঘর তুলেছিলেন। গোরার বাবা তাঁর আমলেই, একটি পাকা ঘরকে কেন্দ্র করে দোতলা ছোট বাড়ি করেছিলেন। গোরার দাদা বাড়ির সামনেই, এক গরীব ব্রাহ্মণ পরিবারের মস্ত বাগান আর জমিসহ বাড়ির অর্ধেক কিনে রেখেছেন।'

'গোরাদের পরিবারে, ও প্রথম বংশধর, যে চটকলে যায়নি। বাংলায় এম এ পাশ করেছে। ভাল ফল করতে পারেনি বলে, আবার ইংরেজিতে এম এ করার কথা ভাবছে। আপাতত তিনটে টুইশানি ওর ভরসা। ...নেশার মধ্যে বিড়ি। কখনও কখনও সিগারেট। চায়ে দোকানে আড্ডায় চা।' (পৃ.৬৩০)

'বিশেষ কোনও রাজনৈতিক আদর্শের ওপর ওর তেমন আকর্ষণ বা আগ্রহ দেখা যায় না। তবে গত বছরের শুরুতে, কমিউনিস্টদের ঠ্যাঙানো দলেই ছিল। পরে সেটা কেটে গিয়েছে। সেই মনোভাব আর নেই। তবে নেতাজি সম্পর্কে এখনও দুর্বল। গান্ধীর ওপর আগে যতটা বিরূপ ছিল, এখন ততটা নেই। শরত বসুর প্রতি আকর্ষণ আছে। তাঁর দলে ও নেই।' (পৃ.৬৩০)

সত্যেশ চট্টোপাধ্যায় সতু এই শহরেরই এক পড়ন্ত চাটুয্যে পরিবারের ছেলে। "পড়ন্ত–এই কারণে, একদা এ পরিবারকে লোকে জমিদার বলে জানত। গঙ্গার ধারে, চাটুয্যে পাড়ায়, পুরনো ধ্বংসপ্রাপ্ত চাটুয্যেদের বিরাট গৃহের স্তূপ আর পোড়ো ভূমি দেখলেই বোঝা যায়। ...একদা যে পরিবারের নানা স্থানে ছিল বিস্তর ভূসম্পত্তি, প্রভূত আয়, সম্পদ ও শ্রী, এখন তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে, এখনও মাথা গোঁজবার মতো যে-টুকু আস্ত আছে, সেখানে কেউ আস্তানা নিয়েছে।"(পৃ.৬৩১)

'সতু এমনই এক পরিবারের সন্তান। বাবা মারা গিয়েছেন অনেক আগেই। ওর চার দাদা এক দিদি, এক বোন। দাদারা সকলেই চাকুরিজীবী। সকলেই বিবাহিত এবং আলাদা। ...সতু কোনোকালেই দাদাদের বাধ্য ছিল না। বরাবরই কিছুটা বাঁধন-ছাড়া গোছের। কোনো রকমে, এড়িয়ে গড়িয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। ...ওর স্বাধীনচেতা আচরণকে মনে করা হতো স্বেচ্ছাচারিতা। অতএব, উপেক্ষা অনাদর ছিল অনিবার্য। সংসারে মায়ের উদ্বিগ্ন স্নেহ ভালবাসা ওকে আগলে রাখার চেষ্টা করেছে। সতু মাকে বুঝতো।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু মায়ের অবশিষ্ট জীবনকে নিশ্চিত নিরাপত্তার মধ্যে রেখেই, ও ওর পথে এগিয়ে গিয়েছে। ওর মধ্যে কোনোরকম বেপরোয়া ঔদ্ধত্য নেই। ও হলো, বৈষ্ণব কাব্যের 'নওলকিশোর'। বাল্যেই যার প্রেমের স্ফুরণ ঘটেছে। স্কুলের বিদ্যাটাকে বরাবরই নীরস মনে হয়েছে। অথচ আর একদিকে– কাব্য-সাহিত্যের গ্রন্থকীট সৃষ্টির প্রেরণা ওর অন্তরে। এবং ধ্যানধারণায় রোমান্টিক। পরিশ্রমী। ...এ শহরেরই এক কায়স্থ পরিবারের মেয়ে প্রতিমা ছিল ওর প্রেমিকা। ঘটনাটি তিন বছরের আগে, এ শহরে দুঃসাহসিক। কারণ, সতু প্রতিমাকে বিয়ে করেছিল। প্রতিমার বাড়ির সমর্থন ছিল না। বিরোধিতা থানা অবধি গড়িয়েছিল। প্রতিমা তখন ষোল অতিক্রান্ত। অতএব, পুলিশ আইন, কোনো কিছুই বাধা দিতে পারেনি। এখন সতু এক সন্তানের জনক। আমেরিকানদের তৈরি, যুদ্ধের সময় এক কারখানা এখন আধা-এন্‌জিনিয়ারিং টুলস ফ্যাক্টরি, সেখানে সামান্য কেরানির চাকরি করে। সতু কমিউনিস্ট-নীতির সমর্থক; পার্টির পক্ষে নিজের কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করা সতু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হলেও একজন 'সিমপ্যাথাইজার'।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত না হয়েও স্বশিক্ষায় সুশিক্ষিত সত্যেশ চট্টোপাধ্যায়, তেইশ বছর বয়সী এ তরুণ। ডজনখানেক কবিতা প্রকাশের অব্যবহিত পরেই সমকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ তরুণ কবি, জাত কবি হিসেবে বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসুর মতো কবিদের প্রশংসা পেয়েছে। বুদ্ধদেব বসু এ তরুণ কবির মাঝে "বিরাট সম্ভাবনা আর প্রতিশ্রুতি" দেখতে পেয়েছিলেন।

ঔপন্যাসিক প্রতিপাদ্যের প্রমাণে এসে মন্তব্য করেছেন, "তিন বন্ধুর মধ্যে, আপাতদৃষ্টিতে, পারিবারিক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদির মধ্যে অমিল অনেক। তথাপি, তিনজনের মধ্যে বন্ধুত্বে, সেই অমিলগুলো কোনও বিরোধ সৃষ্টি করতে পারেনি।" (পৃ.৬৩১-৩২)

LwÐZv উপন্যাসের শুরু উনিশশো সাতচল্লিশ খ্রিষ্টাব্দের চোদ্দই আগস্টের বিকেলে। কলকাতা থেকে কুড়ি মাইল দূরে উত্তর চব্বিশ-পরগনার শিল্পাঞ্চল। একদিকে গঙ্গা, আর একদিকে রেললাইন, প্রায় সমান্তরাল। মাঝখানের ভূমিখণ্ডের শিল্পাঞ্চল ঘিরে সমগ্র ভারতের শ্রমিক আর গরিবদের বিশাল মহল্লার বস্তি। এমনি পারিপার্শ্বিক পটভূমিকায় বিজুদের বাড়ির দোতলা বাড়ির ছাদে বিজু আর সতু পশ্চিমের আলসেয় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পশ্চিমাকাশের ন্যারেটিভ চিত্ররূপময় ও দূরসঞ্চারক্ষম :

> সূর্য এখন জামরুল গাছের আড়ালে। ঝাড়ালো জামরুল গাছের ফাঁকে ফাঁকে, মাঝে মাঝে রোদ উঁকি দিচ্ছে। আকাশে মেঘ। মেঘলাভাঙা আকাশের রোদ বলতে যা বোঝায়, সে রকম না। বড় বড় চাংড়ার মেঘ। মাঝে মাঝে সেই চাংড়ার বুকে ফাটল ধরছে। সেই ফাটলের ফাঁকে সূর্যকে দেখা যাচ্ছে। আর চাংড়া মেঘের ফাটলের ধারে ধারে লাল রঙের ছটা লেগে আছে। মেঘের রং যেখানে হালকা, সেখানেও লাল ছোপ লাগছে। (পৃ.৬১৯)

সমকালীন জটিল-কুটিল রাজনীতিতত্ত্ব ও দেশভাগের বিষাদময় বিপর্যয় সম্পর্কিত, বিজু-সতু এবং গোরার বহুকৌণিক ও তির্যক আলোচনা ও বেদনার সমান্তরালে উপরিধৃত নিসর্গচিত্রের পরিবর্তন, ঘনায়মান অন্ধকারের ইঙ্গিত প্রণিধানযোগ্য :

> পশ্চিমের আকাশটার চাংড়া মেঘের বিরাট ফাটলে সূর্য উঁকি দিচ্ছে। এখন সূর্য আরও খানিকটা নীচের ঢালুতে গড়িয়ে গিয়েছে। আর সারা আকাশে যেন ফাটলের ভিতর থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। (পৃ.৬২১)

ওদের আলোচনায়, সাম্প্রদায়িকতার নির্মম পরিণতি হিসেবে দেশভাগ সম্পর্কে যখন বল্লভ ভাই প্যাটেল, এম. কে. গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, নাজিমুদ্দিন, এ. কে. ফজলুল হকের অবস্থান বিশ্লেষিত হচ্ছিল (পৃ.২২-২৩) তখনকার বর্ণন প্রতীকাশ্রয়ী হয়ে ওঠে :

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম আকাশে মেঘের চাংড়াগুলো ক্রমেই ফাটলে ফাটলে ছিন্নভিন্ন হচ্ছিল। সূর্য আরও খানিকটা পশ্চিমে ঢলেছে। মেঘের ঘনত্ব কেটে যাচ্ছিল। আকাশ ক্রমাগত যেন আগুনের আভায় লাল হয়ে উঠছিল। পাহাড়ের ঢল নামা গঙ্গার গাঢ় গেরুয়া জলে রক্তের বান ডেকেছে। গঙ্গার বুকে, নৌকোর পাল, মাঝিদের গায়েও পড়েছে লাল রেখা। সামনের জামরুলের পাতায় রক্তাভা, ফাঁকে ফাঁকে লাল রোদ, সতু আর বিজুর মুখেও। (পৃ.৬২৪)

দেশব্যবচ্ছেদ, ভাগ বাটোয়ারা, কোন এলাকা কোথায় যুক্ত হবে, কোন অঙ্গ কর্তিত হবে, সতু-বিজু-গোরাদের বিচলিত-বেদনার পরিপ্রেক্ষিতে, বিজুর ছোটবোন কাঞ্চনা মণি, খুলনা পাকিস্তানে চলে যাবার সংবাদে বিষণ্ন। তার মামার বাড়ি খুলনায়। সব বিষণ্নতা ঝেড়ে ফেলে স্বদেশভূমির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে মণিসহ তাদের প্রত্যেকের কণ্ঠে বেজে ওঠে গান :

ধনধান্যে পুষ্পে ভরা,
আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক
সকল দেশের সেরা... (পৃ.৬৩৮)

তখন সমরেশ বসু পশ্চিমাকাশের স্কেচ আঁকেন সমান্তরাল শব্দচিত্রে :

পশ্চিম আকাশের গাঢ় বর্ণের গাছপালার মাথায়, সূর্যের শেষ রশ্মি শেষ বারের মতো যেন সব কালিমা পুড়িয়ে দিয়েছে। অতি উজ্জ্বল লাল সূর্য পরিপূর্ণ হয়ে ধীরে ডুবছে। গঙ্গার গৈরিক জলে যেন রক্তের স্রোত। রক্তাভা ছাদের সকলের মুখে। (পৃ.৬৩৮)

খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা-সূর্যের উদয়, অন্যদিকে প্রকৃতির সূর্যাস্ত, পরস্পরিত সন্নিকর্ষের বুনট– সমগ্র উপন্যাসের বোধ এবং সংবেদ এখানে অভিব্যঞ্জিত ও সংকেতিত হয়েছে।

দীর্ঘ দুশো বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পর ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে চলেছে। খণ্ডিত ভারতের এই ‘অমূল্য স্বাধীনতা’-র আনন্দ-উৎসবের প্রস্তুতি সর্বত্রই প্রায় সম্পন্ন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট বিকেলে কলকাতা থেকে বিশ মাইল দূরে উত্তর চব্বিশ-পরগনার শিল্পাঞ্চলের বাঙালি পল্লির তিন তরুণ বন্ধু– সতু, বিজু, গোরা এ উৎসবের অংশী হতে পারেনি। ভারত বিভাগের অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় বাংলা তথা দেশ ভাগের ফলে তাদের যে বিচ্ছিন্নতা ও বেদনাবোধ তা থেকেই খণ্ডিত দেশমাতৃকার অপর অংশ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনোভাবকে ও প্রতিক্রিয়া জানতে পরের দিন ১৫ আগস্ট রাতে ট্রেনযোগে তারা যাত্রা করেছে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বিভক্ত নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তানকে যারা পৃথক দেশ হিসেবে ভাবতে চায়নি এ তিন তরুণ তাদেরই প্রতিনিধি।

সমরেশ বসু তিন তরুণের ভাবনা, সংলাপ ও পরস্পর কথোপকথনের মধ্যদিয়ে দেশবিভাগের রাজনৈতিক পটভূমি অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়েছেন। ১৪ আগস্ট বিকেলবেলা পর্যন্তও তাদের কাছে স্পষ্ট ছিল না পাকিস্তান ও ভারতের অংশে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা কীভাবে বিভক্ত হচ্ছে। মুষ্টিমেয় কিছু সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী দেশভাগ চাইলেও বেশির ভাগ সাধারণ বাঙালির এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না, সে বিষয়টি এ উপন্যাসে ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

সুদীর্ঘ পরাধীনতার অবসানে প্রাপ্ত স্বাধীনতার আনন্দে উদ্বেলিত সবাই। স্বাধীনতার আগমনবার্তায় উচ্ছ্বসিত স্বাধীনতাকামী মানুষের চারদিকে ১৪ আগস্টের অপরাহ্ণ থেকে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের আনন্দ আয়োজনের প্রস্তুতির বিবরণ দিয়ে সর্বজ্ঞদৃষ্টির ঔপন্যাসিক L‡Ly‡i ন্যারেটিভের সূত্রপাত করেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

দুশো বছরের পরাধীনতার পর, এই অমূল্য স্বাধীনতা। অনেক ত্যাগ, দুঃখ, কষ্ট, অপমান, হত্যা, আর রক্তের বিনিময়ে, ভারত আগামীকাল স্বাধীন হবে। আগামীকাল ভারতের ঐতিহাসিক দিন। কেবল আনন্দের দিন না। অতীতের কথা মনে করেই যে কেবল অনেকে কোলাকুলি করে চোখের জলে ভাসছে, তাও পুরোটা ঠিক না। আসলে আনন্দের উচ্ছ্বাসেই অনেকে চোখের জল সামলাতে পারছে না। স্বাধীনতা। আজাদী। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান। মাঝে মাঝেই, রাজনৈতিক দলগুলো, মাইকে আগামীকালের ভোরবেলা থেকে শুরু অনুষ্ঠান পর্বের ঘোষণার সঙ্গে, ঐ সব কথাগুলোও বলছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যকে এখনও ধিক্কার দেওয়া হচ্ছে। দেশের নেতাদের দীর্ঘ কারাবাসের কথা বলছে। অগণিত মানুষের ত্যাগ, হত্যা, রক্তপাতের কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছে। ফাঁসিকাঠে প্রাণ দেওয়া শহীদদের নাম উচ্চারিত হচ্ছে। তবু, দেশ স্বাধীন হচ্ছে আগামীকাল। সেই আনন্দ আর উল্লাস চাপা থাকছে না। বরং একটা পাগলা খুশির উচ্ছ্বাসই বেশি। আর সেই সঙ্গে নানান প্রস্তুতি। ঘরে বাইরে। দোকানে বাজারে হাটে। কারখানা এলাকার বস্তিতে বস্তিতে, কোম্পানির লাইনে। বাঙালী মধ্যবিত্তদের বাড়িতে বাড়িতে। (পৃ.৬১৮)

স্বাধীনতা প্রাপ্তির এ আনন্দ আয়োজনের প্রস্তুতি বিজুদের বাড়ির ছাদ থেকে দেখছিল সতু ও বিজু। ওদের কথোপকথন থেকেই জানা যায়, দেশভাগ নিয়ে জনমনে কতটা অস্বচ্ছতা ছিল। দার্জিলিংয়ে গভর্নর ক্যাসির সঙ্গে সুরাবর্দীর সাক্ষাৎ, চব্বিশ পরগনার বারাকপুর বারাসত ভাঙড় বসিরহাট পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে রাখার পক্ষে ক্যাসির আশ্বাসের কথা স্থানীয় কমিউনিস্ট নেতা তারক ভট্টাচার্যের কাছ থেকেই জানতে পায় গোরা। কিন্তু সংবাদপত্রে ভিন্নভাবে আসে ক্যাসির কথা, যেখানে কলকাতা ও দার্জিলিংকে দু বাংলার 'কমন সিটি' হিসেবে ঘোষণার কথা জানানো হয়। শুধু 'ইত্তেহাদ' পত্রিকা বিশ্বস্ত সূত্রের বরাত দিয়ে সুরাবর্দীকে দেয়া ক্যাসির আশ্বাসের কথা প্রকাশ করে, যা পড়ে গোরা তার কান্না থামাতে পারেনি। ছেচল্লিশের দাঙ্গা, ডাইরেক্ট অ্যাক্শন বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ডাক, মুসলিম লিগের 'কীপ ক্যালকাটা' আন্দোলন, গভর্নর ক্যাসি, হার্বার্ট, সিরিল র‍্যাডক্লিফের মতো ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিভেদনীতি। তৎকালীন কংগ্রেস নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শরৎ বসু, মুসলিম লিগ নেতা জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব, সুরাবর্দী, ফজলুল হক, নাজিমুদ্দিনের কূটনৈতিক কার্যকলাপ, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, শরত-সুরাবর্দীর 'সভারেন বেঙ্গল'-এর প্রতি সমর্থন, এটি 'ইংরেজদের মাথা থেকে গজানো একটা চাল' বলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সন্দেহ, ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ ঐক্যের পরেই জওহরলাল নেহরুর ভিন্ন কথা; এবং সার্বভৌমের বিপরীতে জিন্নার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ডাক, ক্যাবিনেট মিশন, বড়লাট ও ইংরেজ সরকারের ভূমিকা, 'আজাদ', 'স্টার অব ইন্ডিয়া', 'মর্নিং নিউজ', 'ইত্তেহাদ'সহ সব মুসলিম লিগ পত্রিকার সংবাদসমূহ নিরাসক্ত ও নির্মোহ দৃষ্টি দিয়ে তিন বন্ধু বিচার-বিশ্লেষণ করে।

ফজলুল হকের মতো নন-কমিউনাল 'বিজ্ঞ বাঙালী নেতা'-র প্রতি সতুর আকর্ষণ ছিল। কাজেই 'কলকাতার মুসলমানদের কাছে নিজের ইমেজ বজায়' রাখার জন্য সুরাবর্দী দাবি জানালেও যেখানে 'মেজরিটি মাইনরিটির ভিত্তিতে দেশভাগ করার কথা হচ্ছিল সেখানে' ফজলুল হকের হিন্দুপ্রধান কলকাতার দাবি সতু মানতে পারেনি। অন্যদিকে বিজু সুরাবর্দীকে সমর্থন জানিয়ে বাঙালিদের প্রতি কথাবার্তায় অধিক আবেগময়তার কারণে শেরে-ই-বঙ্গাল ফজলুল হকের সমালোচনা করেছে। কারণ মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় থেকেও তিনি বিয়াল্লিশের বন্দিমুক্তির বিষয়ে কোনো কথা বলেননি। কিন্তু সতু রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দিয়ে সুগভীর পর্যবেক্ষণে মুক্তমনে ফজলুল হকের এ সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েও তার নেতৃত্বের গুণাবলিকে অস্বীকার করেনি। বিজুর সঙ্গে এ প্রসঙ্গে তার কথোপকথন নিচের অংশে প্রকাশিত হয়েছে :

"দ্যাখ বিজু, মনের মধ্যে অবিশ্বাস নিয়ে তর্ক চলে না।" সতু মুখ ফিরিয়ে তাকালো গঙ্গার দিকে, "একটা লোককে ছোট করার জন্য, তাঁর অনেক খুঁত খুঁজে খুঁজে বের করা চলে। যাঁর কথাবার্তায় প্রাণের দরদ থাকে, তাঁকে নাটুকে মনে হয়। তাঁর কথাবার্তায় মেলোড্রামার সুর। আমি এর মধ্যেই একটা ব্যাপার বুঝে গেছি। সেটা হলো ক্ষমতা। তা তিনি বাড়ির কর্তাই হোন, সমাজপতিই হোন, আর রাষ্ট্রের কর্ণধারই হোন, ক্ষমতা জিনিসটার মধ্যে একটা কড়া নেশা অছে। ফজলুল হক সেই

Dhaka University Institutional Repository

নেশা থেকে একেবারে মুক্ত ছিলেন, তা বলছিনে। কিন্তু সাঁইত্রিশ-আটত্রিশে বন্দীমুক্তির জন্য যখন গান্ধী চেষ্টা করছিলেন, হকসাহেব বিধানসভায় অকপটে বন্দীদের মুক্তি দেবার কথা অ্যানাউন্স করেন নি?" (পৃ.৬২২)

ফজলুল হকের এ গুণাবলির জন্যই সর্ব সাধারণের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি ছিল। এটাকে কাজে লাগানোর জন্য হার্বার্ট সুরাবর্দী ও নাজিমুদ্দিনের পরিবর্তে তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রী করেছিলেন। পরে জাপানি বাহিনী ভারতের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে হার্বার্ট ইংরেজবিদ্বেষ দূর করার অভিপ্রায়ে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির জন্য ফজলুল হককে সরিয়ে 'চিফ অ্যান্ড হোম মিনিস্টার'-এর দায়িত্ব দিলেন নাজিমুদ্দিনকে। বন্দিমুক্তির বিষয়টি নাকচ করার কৌশল হিসেবে নাজিমুদ্দিন ছুটিতে গেলে ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজয়প্রসাদের উদাসীনতার সুযোগে পোর্টার নামে এক ইংরেজ অফিসার হার্বার্টকে দিয়ে সফলভাবে এটি করিয়ে নেয়।

এরপর হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ১৯৪৬ সালে মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দীর হস্তক্ষেপে বন্দিমুক্তি অনেকটাই সম্পন্ন হয় যাতে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বন্দিরাও মুক্তি পায়। এ সম্পর্কসূত্রেই কমিউনিস্টদের সঙ্গে সুরাবর্দীর সুসম্পর্ক তৈরি হয়।

সতুর বিশ্লেষণে সুরাবর্দীর ভ্রান্তি অন্যত্র। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের দাবিতে জিন্নার শান্তিপূর্ণ 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'-এর বিপরীতে কলকাতার মুসলমানদের উদ্দেশে নাজিমুদ্দিন ঘোষণা দেয় : "আমাদের জেহাদ সরকারের বিরুদ্ধে নয়। হিন্দুদের বিরুদ্ধে।" (পৃ.৬২৩) ঠিক সে মুহূর্তে ব্রিটিশ কূটনীতির ফাঁদে পা দিয়ে সুরাবর্দী সরকারি কর্মচারীদের নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে সমস্ত সরকারি অফিস বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়ে হিন্দুদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিয়ে গেলেন। ওই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় প্রমাণ হয়ে যায় হিন্দু-মুসলমান আলাদা হয়ে যাওয়ার অনিবার্যতা।

পরে অবশ্য সুরাবর্দী নিজের ভুল বুঝতে পেরে হিন্দু-মুসলিম সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য নাজিমুদ্দিনকে কেন্দ্র করে প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন। নিজের অনুতাপবিদ্ধ হৃদয়ের শান্তি প্রার্থনা ও কলকাতায় মুসলমানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য গান্ধীজীকে কলকাতায় রাখার জন্য বিভিন্ন দলের নেতাদের কাছে পর্যন্ত গিয়েছেন। এমনকি তাঁর সঙ্গে অনশনে যোগ দিতেও চেয়েছেন। কিন্তু এ দু জনের অনশনের কারণ ভিন্ন ছিল। আবেগজড়িত কণ্ঠে বিজুর উদ্দেশে সতুর উচ্চারণ :

'...মাত্র গতকালের কাগজে প্রথম আমরা বাউণ্ডারি কমিশনের ঘোষণা জেনেছি, কলকাতা, চব্বিশ পরগণা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি জেলা পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়েছে। অথচ এখনো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে মালদা, নদীয়া, দিনাজপুরকে। এখনো আমরা মুর্শিদাবাদ সম্পর্কে কিছুই জানি নে। সুরাবর্দী এখন কোন্ ম্যাজিকে বুঝতে পারছেন, কীপ ক্যালকাটা একটা ধাপ্পা? অথচ বুঝতে ওঁকে হচ্ছেই। আজো কলকাতার অবস্থা কী? বিহারের মুসলমানদের কলকাতা থেকে বিহারে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। তারা সুরাবর্দী সাহেবকে আশীর্বাদ করছে? ক্যানাল ওয়েস্ট রোড থেকে যে শত শত আতুর মুসলমানদের স্পেশাল ট্রেনে পূর্ববঙ্গে পাঠানো হচ্ছে, তাদের চোয়াল কি নরম হচ্ছে? কলকাতায় আজো সান্ধ্য আইন। সকলেই ভেবেছিল, আগামীকাল তা তুলে নেওয়া হবেই। হয়নি। বরং সান্ধ্য আইনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। আর আগামীকাল ভারত স্বাধীন হচ্ছে! আজ সুরাবর্দী সাহেবের গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। গান্ধীজীকে কলকাতায় রাখবার জন্য, কমিউনিস্ট থেকে শুরু করে সব দলের নেতাদের কাছে ছুটছেন। নিজে দৌড়চ্ছেন কেন? ভাবা যায়, তিন দিন আগেও এণ্টালিতে তিনজন হিন্দু খুন হয়েছে? ভাবা যায়, দক্ষিণে ট্রেন থেকে নামিয়ে মুসলমানদের খুন করা হচ্ছে? আজ আপনার সদ্‌বুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে। মহান্ নেতা! আজ আপনি ঘোষণা করছেন, আগামীকাল গান্ধীজির সঙ্গে অনশন করবেন। কিন্তু আপনার অনশন আর গান্ধীজীর অনশনের কারণ কি এক? আপনি পাকিস্তান চেয়েছিলেন, পেয়েছেন। গান্ধীজি ভারত বিভাগ চান নি, তাই ভারতের এই দিনটি তাঁর কাছে চোখের জলের করুণ হাসি। অনশন দিয়ে, স্বাধীনতা দিবসকে গ্রহণ করছেন।' (পৃ.৬২৫)

Dhaka University Institutional Repository

এখানেই গান্ধীজীর সঙ্গে সতুর প্রাণের যোগ। এ কারণে সে মানসিক শান্তির জন্য একবার কলকাতার বেলেঘাটায় গিয়ে তাঁর পায়ে 'মাথা ছুঁইয়ে' আসতে চায়। 'কমিউনিস্ট পার্টির সিমপ্যাথাইজার, নীতির সমর্থক, পার্টির হয়ে নিজের কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করা' সতুর মুখে এ ধরনের কথা শুনে বিস্মিত বিজু বুঝতে পারে সতুর রক্তক্ষরণের প্রকৃত উৎস কোথায়। নীতি কিংবা আদর্শের চাইতে মানবতাকেই সে ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিল। এ কারণেই প্রাত্যহিক জীবনবাস্তবতার অংশী হয়ে সমস্ত কর্তব্য পালনের মধ্যেও সতু হিন্দু-মুসলিম বিরোধ কিংবা দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারছে না বলেই তার বেদনাবোধের তীব্রতা এতো বেশি। একমাত্র বিজুর কাছেই এ মুহূর্তে সেটা প্রকাশ করতে পেরেছে সতু :

ঠিক, আমি কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক। কিন্তু নিজের কাছে, তোর কাছে, গোরার কাছে আমি মিথ্যে বলতে পারবো না। হিন্দুস্থান পাকিস্তান তত্ত্বকে মানতে হয়েছে। অথচ আমার বুকের ভেতরটা ফেটে যাচ্ছে। স্বাধীনতার সমস্ত আনন্দের মধ্যে, ঐ এক জায়গায় অন্ধকার দলা পাকিয়ে রয়েছে। সেটা হিন্দু মুসলমান, দুইয়েরই পরাজয়। ওরা আমাদের খণ্ড করে, ভাগ না করে, এ দেশ ছাড়লো না। এখানে গান্ধীজী ছাড়া আমার আর কে আছেন? আমি জানি, তোদের কাছে এটা আজ অবাস্তব। কিন্তু বিজু, আমি নিরুপায়। বাড়িতে প্রতিমা তিন রঙের কাপড় কিনে এনে, ফ্ল্যাগ সেলাই করছে। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার প্রথম কাজ, ঝাণ্ডা খাটানো। তুই আর গোরা যাবি। ঝাণ্ডা খাটিয়েই আমাকে মাংসের বাজারে লাইন দিতে যেতে হবে। যে-যতো কথাই বলুক, কাল প্রথম স্বাধীনতা দিবস। সবাই ভালো মন্দ খাবে। আমি বলছি নে, আমার আনন্দ হচ্ছে না। কিন্তু যে-লোকটা ভেতরে ভেতরে অসুখে ভোগে, তার কি আনন্দ হয় না? আমারো সেইরকমই হচ্ছে। (পৃ.৬২৬)

বিজুর মনেও একই বিষাদ। সতুর কথা শুনে নিজের অনুভূতিও ব্যক্ত করে তাঁর কাছে :

'সতু, কোন্ কথা থেকে কোথায় চলে এলি। এইখানে তোর কাছে আমাদের হার। সুরাবর্দী তোর আসল কথা নয়। আসল কথাটা তোর আলাদা। সেখানে তোর সঙ্গে আমার কোনো তফাত নেই। দ্বিজাতিতত্ত্ব এতোকাল পরে আমাদের মেনে নিতে হলো, অঙ্গহানিটাও তাই অপরিহার্য করে তোলা হলো। তুই কি ভাবছিস, আমার কষ্ট নেই? ইত্তেহাদে পড়েছিলাম, মুসলমানদিগের যাহাতে সুখ, হিন্দুদিগের তাহাতেই অসুখ। এমন কি যে বামপন্থী বন্ধুরা এতদিন দিনরাত গান্ধী-জিন্না মিলনের শ্লোগান দিয়া আকাশ-বাতাস মুখরিত করিতেছিলেন, তাঁহাদের মুখেও বিষাদের কালো ছায়া পড়িল। কথাটা উঠেছিল, গত মে মাসের ষোল তারিখে, ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান নিয়ে। কংগ্রেস লীগ, দু'দলই প্ল্যান অ্যাকসেপ্ট করেছিল। তারকদার মনে আজ কী আছে, সুরেনবাবুই বা কী ভাবছেন, জানি নে। একমাত্র শরত বসু ছাড়া, কোনো হিন্দুকেই ইত্তেহাদ এখনো বোধহয় বিশ্বাস করছে না। কিন্তু দেশ বিভাগ আমিই কি মেনে নিতে পারছি। আমি ইতিহাসের ছাত্র। আমি তোর কথা শুনে ভয় পাচ্ছি, সতু। আগামীকালের দিনটা যেন ভবিষ্যতের জন্য অশুভ না হয়।' (পৃ.৬২৬)

সতু-বিজু এ বিরোধ-সংঘাতপূর্ণ সময়ে আসন্ন অশুভ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই উদ্বিগ্ন হয়েছে। এভাবেই ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। একদিকে উগ্র সাম্প্রদায়িক চরিত্র যেমন তিনি এনেছেন অন্যদিকে অসাম্প্রদায়িক মুক্তমনা চরিত্রও এ উপন্যাসে ঘুরেফিরেই এসেছে।

কলকাতা জেলা মুসলিম লিগ নেতা মনসুর মল্লিক এমনই এক অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি। যাঁর বংশপরম্পরার মধ্যদিয়ে সমরেশ বসু হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন করেছেন। একজন সর্দার হিসেবে উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা তাঁর পিতামহ মোহাম্মদ রসুল মল্লিক প্রথমে কলকাতার বন্দরে আসেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় তিনি নিজের শ্রমিক দলকে নিয়ে চটকলে কাজ নেন। শ্রমিকদের সঙ্গে তার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ছিল এবং বাঙালিদের কাছেও তিনি অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। কোম্পানির ইংরেজ সাহেবরাও তাকে সমীহ করত। এলাকার হিন্দুদের কাছেও তার এতোটাই গ্রহণযোগ্যতা ছিল যে বাঙালি পল্লির বাঙালি হিন্দু এলাকায় যখন তিনি বসতবাড়ি নির্মাণ করেন, বেশির ভাগ হিন্দু বাঙালি কোনো প্রতিবাদ জানায়নি। রসুল মল্লিক নিজপুত্র মোহাম্মদ গোলাম রসুল মল্লিককে বি এ পাশ করিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষিত মুসলমান তৈরি করেছিলেন। তাঁর ছেলে মনসুর মল্লিক বাবার অপূর্ণ ইচ্ছা পূর্ণ করতে বি এ পাশ করে কলকাতায় আইন পড়েছিলেন। এরপর মুসলিম লিগের সদস্য হিসেবে যোগ দেন যখন ফজলুল হক ওই দলের সভ্য ছিলেন।

১৯৪৬ সাল থেকে গত এক বছর ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করে তারা দেখেছে জিন্নার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকালীন উত্তপ্ত বাস্তবতায়ও তাদের অঞ্চলে শান্তি বজায় ছিল শুধু মনসুর মল্লিকের মতো ব্যক্তির জন্য। তার কর্মস্থল কলকাতার আলিপুর হলেও প্রতিদিনই পিতামহের বাস্তুভিটা থেকেই তিনি যাতায়াত করেন। বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ্য জনসভায় শান্তি রক্ষার আহ্বান জানিয়ে মুসলিমদের উদ্দেশে তিনি বলেন :

'নাজিমুদ্দিন সাহেব সত্যি কথা বলেন নি। আপনারা ভুলে যাবেন না, কংগ্রেসের নয়া প্রেসিডেন্টের একটা কথাকে কায়েদে আজম জিন্না সাহেব মেনে নিতে পারেননি। আমি মনে করি, কংগ্রেসের নয়া প্রেসিডেন্ট জওহরলালজিও উচিত কথা বলেননি। কংগ্রেস ক্যাবিনেট প্ল্যান মেনে নিয়েছে, তারপরেও উনি বললেন, তা বলে সার্বভৌম গণপরিষদ কংগ্রেসের মত মেনে চলতে বাধ্য নন। অথচ ষোলোই মে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানে, এক সপ্তাহের মধ্যে কংগ্রেস আর মুসলিম লিগ এক মত হওয়াতে আমাদের সকলের মন আনন্দে নেচে উঠেছিল। আর দশই জুলাই, জওহরলালজি এরকম একটা কথা বললেন। জিন্না সাহেব গেলেন রেগে। কারণ, তিনিই জানতেন, এতে ক্যাবিনেট মিশন, বড়লাট আর ইংরাজ সরকার তামাশা দেখে মনে মনে হাসছে। জিন্না সাহেব ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন। কিন্তু নাজিমুদ্দিন সাহেব কী বলছেন? তিনি মিথ্যা কথা বলছেন যে, কায়েদে আজমের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ভারত সরকারের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দুদের বিরুদ্ধে। আমি আপনাদের সামনে, একজন মুসলমান হয়ে বলতে লজ্জা পাচ্ছি, নাজিমুদ্দিন সাহেব ডাহা মিথ্যা কথা বলেছেন। তার ওপরে শহিদ সুরাবর্দি সাহেব পরশু ছুটির দিন ঘোষণা করেছেন। তাঁরা আগুন নিয়ে খেলা করতে যাচ্ছেন। আপনাদের আমি বলছি, পরশু এ অঞ্চলের সমস্ত হিন্দু-মুসলমান গুণ্ডাদের আপনারা কিছুতেই এমন সুযোগ দেবেন না, যাতে কেয়ামত নেমে আসতে পারে। আপনারা মুসলমানরা, যাঁরা কাল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে, কারখানায় যেতে না চান, যাবেন না। কিন্তু হিন্দুদের বাধা দেবেন না। আমরা জান দেবো, তবু হিন্দু-মুসলমান কাজিয়া মারামারি করবো না।'...(পৃ.৬৩৫)

তর্ক-বিতর্ক-বিশ্লেষণ ও বিবেচনা থেকে LwÐZvর আখ্যানাংশ মূলত গোরার সুধাবউদির বাসায় পারিবারিক-সামাজিক পরিস্থিতিতে স্থানান্তরিত হয়। এখানে পারিবারিক জীবন-সমস্যার সঙ্গে সমকালীন রাজনীতির অন্তর্বয়নের ফলে ঘটনাংশ প্রাণিত ও স্পন্দিত হয়েছে, পরিসরও হয়েছে প্রসারিত।

উপন্যাসের এ পরিসরে, সুধাবউদির বাসায়, গান্ধীপ্রসঙ্গ ঘুরেফিরেই এসেছে। মুর্শিদাবাদ, খুলনা নিয়ে আলোচনার সূত্রে এসেছে দেশবিভাগকালীন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ও আপসকামী নেতাদের মধ্যে মুসলিম ব্যবসায়ী ও হিন্দু জমিদার কর্তৃক অর্থ হস্তান্তরের বিষয়। মনসুর মল্লিকের কাছ থেকেই গোরা জেনেছে, দেশবিভাগের চব্বিশ ঘণ্টাও বাকি নেই অথচ প্রেসিডেন্সি বিভাগ থেকে যেখানে একমাত্র খুলনাকেই পূর্ব পাকিস্তানে দেবার কথা ঘোষিত হয়েছিল সেখানে ভারতে খুলনাকে রাখার জন্য হিন্দু বড়লোক জমিদাররা কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। সতু জানে খুলনার হিন্দু জমিদারদেরই শুধু টাকা আছে তা নয়, ইস্পাহানির মতো কলকাতার অবাঙালি মুসলমান ব্যবসায়ীদের হাতেও কম টাকা নেই। কাজেই মনসুর মল্লিক ও সতু দুজনই এর পরিণাম কী হতে পারে এটা ভেবে বিশেষ করে 'কমিউনাল অশান্তি' নিয়ে উদ্বিগ্ন। কাজেই তাদের দুজনের কাছেই কলকাতায় গান্ধীর অবস্থানই একমাত্র আশা-ভরসার উৎস। এমনকি যে সুধাবউদি বিকৃতমস্তিষ্ক স্বামী প্রকাশ মুখুজ্জের অর্থলোভী কুৎসা রটনাকারী আত্মীয়দের সঙ্গে লড়াই করে বুদ্ধিকৌশলে একমাত্র সন্তান মানিককে নিয়ে সংসারজীবন যাপন করছেন তিনিও গান্ধীর দর্শনলাভের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তিন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে স্বাধীনতার আনন্দ ভাগ করে নিতে চান সুধাবউদি। লেখাপড়ায় বেশিদূর অগ্রসর না হয়েও কিংবা রাজনীতি না বুঝলেও ছোটো বউদির দাদা সুহৃদ

Dhaka University Institutional Repository

চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তক্‌লিতে সুতো পাকাতে আর চরকা কাটতে শিখেছিলেন সুধাবউদি। পঞ্চাশ বছর বয়সী অবিবাহিত সুহৃদ চট্টোপাধ্যায় গান্ধী অন্তপ্রাণ। তার কাছ থেকেই সুধাবউদি যে কথা শুনেছিলেন তা তিনি এখনও বলেন : "...পৃথিবীতে বুদ্ধ যীশু দুজন করে জন্মান না। তেমনি গান্ধীও একজনই এই পৃথিবীতে জন্মেছেন।" (পৃ.৬৪১) শোনা ঘটনাটি সুধাবউদি বলেন : যুবতী বউ চান করে এক প্রস্থ কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করতে অপারগ হলে নিজের গায়ের কাপড় স্রোতের জলে ভাসিয়ে দিয়ে তার লজ্জা রক্ষা করেন গান্ধী—সুহৃদদার কাছে শোনা এ গল্প শোনাতে গিয়ে সুধাবউদির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে :

'আমি তো সামান্য একটা মেয়ে। সেই মেয়েটার অবস্থা বুঝি। অথচ আমরা কিছুই করি না। সুহৃদদার কাছে ঘটনাটা যখন শুনেছিলাম, তখন মনে হয়েছিল, তিনি অন্য রকম। পৃথিবীর যে-সব বড় বড় নেতাদের কথা শুনি—লোকদের, তিনি তাঁদের থেকে আলাদা সেই থেকে তাঁকে অনেকবার দেখতে ইচ্ছে হয়েছে। কাগজে পড়ছি, সোদপুর থেকে গতকাল বেলেঘাটায় যাবার পরেই তাঁকে দর্শন করবার জন্য সবাই ভিড় করছে। কলকাতায় দাঙ্গা থেমে গেছে ....আশ্চর্য! কে এমন আছেন? আর কে?' (পৃ.৬৪২)

গান্ধীকে দেখতে যাওয়া, তাঁর কথা শোনাও স্বাধীনতার আনন্দের মধ্যেই পড়ে বলে সুধাবউদি মনে করেন। সতুর বিশ্বাসও তাই : "কেউ নেই। আর একমাত্র লোক এই দেশে, যিনি দেশ-বিভাগ চান না। আমি আজই এক বার যাবো—তাঁকে দেখব।" (পৃ.৬৪২)

অতঃপর কাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে ট্রেনের কামরায়। নৈহাটি লোকাল ট্রেনে উঠতে গিয়ে ভুলক্রমে লালগোলা প্যাসেঞ্জারে উঠে পড়ে সতু, বিজু ও গোরা। সংলাপধর্মী পরিচর্যা-প্রকরণে ট্রেনের কামরার বাস্তবতা রূপান্বিত হয়েছে, আলোচনায় এসেছে দেশভাগ, রাজনীতি ও রাজনীতিকদের প্রসঙ্গ। আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কে কম্পার্টমেন্টের চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী খাকি হাফ প্যান্ট ও শাদা হাফ শার্ট পরিহিত সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক চরিত্র যেমন আছে, তেমনি আছে মধ্যবয়স্ক ধুতি পাঞ্জাবি পরা নদীয়া জেলা কংগ্রেসের নেতা অশ্বিনী হালদার। দেশভাগকে মন থেকে মানতে পারেননি বলে সপ্তাহখানেক আগে সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। দেশবিভাগের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বলতে গিয়ে তিনি জওহরলাল ও প্যাটেলকে 'মাউন্টব্যাটেনের দ্বারা দুটি সম্মোহিত আত্মা' (পৃ.৬৪৬) বলেও অভিযুক্ত করেন। তিনিও মানসিক শান্তির জন্য বেলেঘাটায় গান্ধীর কাছে যেতে চান। ট্রেনে বসে অশ্বিনী হালদারের কাছ থেকেই ওরা গান্ধী ও হায়দারি ম্যানসন সম্পর্কে জানতে পেরেছে : সুরাবর্দী গান্ধীকে সোদপুর থেকে বেলেঘাটায় হায়দারি ম্যানসনে নিয়ে গেলে সাম্প্রদায়িক হিন্দু তরুণ দল হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের নির্যাতনের জন্য গান্ধীকে অভিযুক্ত করে "গো ব্যাক গান্ধীজি" শ্লোগান দিলেও তিনি তাদেরকে অহিংসার বাণী দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন। বিশেষ করে সতেরো আঠারো বছরের একটা ছেলে যখন বলে—"ইতিহাসে প্রমাণ করতে পারে নি, দুই ভিন্ন কমিউনিটি কোনোকালে বন্ধুত্ব করে পাশাপাশি বাস করেছে। আমি ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, হিন্দু মুসলমান বরাবর লড়ে আসছে। ..."(পৃ.৬৪৫) এর উত্তরে গান্ধী তাকে বলেন,

'...তুমি আমার থেকে বয়স্ক নও। তুমি শোনোনি, হিন্দু ছেলে মুসলমানকে চাচা বলে ডাকছে। তুমি দেখোনি, হিন্দু মুসলমানরা তাদের উৎসব অনুষ্ঠান এক সঙ্গে পালন করেছে—সামাজিক ভাবে। সে যাক গে, তোমরা চাও আমি এখান থেকে চলে যাই। কিন্তু এরকম কোনো শক্তির কাছে আমি নত হতে শিখিনি। তোমরা আমাকে বন্দি করতে পারো, হত্যা করতে পারো, আমি মিলিটারি ডাকব না, কোনো সাহায্য চাইব না। তোমরা বলছ, আমি হিন্দুর শত্রু। কিন্তু আমার অন্তরের সত্য তাতে নষ্ট হয় না। কেমন করে আমি মানব, আমি হিন্দুর শত্রু? তোমরা আমাকে বোঝাতে পারলে, আমি এখান থেকে চলে যাব।

Dhaka University Institutional Repository

...তোমরা কেন বুঝতে পারছ না, একজন হিন্দু হয়ে, আমি নিজ সম্প্রদায়ের শত্রু হতে পারিনে। তোমরা মনের সংকীর্ণতায় ভুগছ।' (পৃ.৬৪৬-৪৭)

শেয়ালদা স্টেশনে ভিড় নেই। ওরা তিনজন অতি দ্রুত বেগে দৌড়িয়ে হায়দারি ম্যানসনের সন্নিকটে পৌঁছায়। ওরা ভিতরে ছুটে যেতেই, কয়েকজন বাধা দেয়। সুরাবর্দি স্টিয়ারিং ধরে গাড়ি চালিয়ে গান্ধীজীকে লেকের ধারে নিয়ে যাচ্ছেন বিশ্রামের জন্য। সকলেই গান্ধীর জয়ধ্বনি দিচ্ছেন। পেছনে ক্লান্ত, স্মিত মুখে বুকের কাছে দু হাত জোড় করে বসেছিলেন গান্ধী। তাঁর এ মূর্তি দেখে সতুর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে :

সতুর দুহাত ওর বুকের কাছে উঠে এল। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, ও ভাববাদী না। ঈশ্বরে ওর বিশ্বাস নেই। জাতপাত তো মানেই না। গলার পৈতা কবে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। শ্রেণী বিপ্লবের প্রতি ওর বিশ্বাস। তবু এই মানুষটাকে দেখে, ওর চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে কেন? ওকি আত্মবিস্মৃত? অচেতন? নিজেকে চেনে না? (পৃ.৬৪৭)

আশেপাশে তখন শোনা যাচ্ছে, পাঁচ হাজার হিন্দু, পাঁচ হাজার মুসলমানের মিলিত মিছিল নিয়ে আসছেন অরুণা আসফ আলি আর রামমনোহর লোহিয়া। বিজু গোরা বাসায় না-জানিয়েই চলে এসেছিল। সতু প্রতিমাকে রাতে ফিরে আসার কথা বলেছিল। তিন মূর্তিই সিগারেট খাচ্ছিল। গোরা হাঁটতে হাঁটতে বক্র মন্তব্য করে, "...জ্বালিয়ে দিয়ে ধরায় আগুন পালিয়ে গেছে চতুর ফাগুন। লাস্ট ইয়ারের ষোলোই আগস্টের দাঙ্গা ছিল, পাকিস্তানের দাবিকে অনিবার্য করে তোলা। পেছনে কারসাজি যাদেরই থাকুক, তারা আজ সাকসেসফুল। তারাই আজ সব থেকে খুশি।" (পৃ.৬৪৭)
রাত পৌনে দশটা পর্যন্ত কলকাতার পথে পথে গান্ধীজির জমায়েত দেখে, হায়দারি ম্যানসনে প্রবেশের ব্যর্থতা নিয়ে তিন বন্ধু ফিরে এসেছে শিয়ালদহ স্টেশনে। তাদের মন ছিল নিরানন্দ, ক্লিষ্ট। ওদের মনে পড়ছে– স্বাধীনতার দিনে গান্ধীর উপবাস যাপন, শক্তির ঊর্ধ্বে উঠে নব্য শাসকদের প্রতি 'বিশ্বস্ত, অহিংস, শান্ত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন' হওয়ার এবং জনসাধারণকে ঐক্যচেতনায় উদ্বোধিত হয়ে 'গরল' ভুলে 'অমৃত' পানে উৎসাহিত করার জন্য গান্ধীর উদাত্ত আহ্বান।

শিয়ালদহ স্টেশনে এসে, সতু-বিজু-গোরা তাড়াহুড়ায় রানাঘাট লোকাল ট্রেনে উঠে পড়ে। ওদের কম্পার্টমেন্টে, থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেতা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী নৈহাটির বিধু গাঙ্গুলির দেখা পায়। বিধু গাঙ্গুলি কেবল মদ্যপ নয়, মদ বিতরণেও উদার। ত্রিমূর্তিকেও মদ্য পানের জন্য আন্তরিক অনুরোধ করে। ওরা অপারগতা জ্ঞাপন করে। বিধু গাঙ্গুলি নতুন শাসকদের উদ্দেশে দুঃখ করে বলেন :

'...একদিন-দুদিনের পরেই স্বাধীনতা তো নয়। দুশো বছরের পরাধীনতার পরে স্বাধীনতা। রাত পোহালেই। আর আপনারা নতুন শাসনকর্তা, দেশের লোক! এমন দিনেই মদের দোকান বন্ধ করার হুকুম দিলেন? আপনারাই বা খাবেন কী করে?'

পাশের একজন মাথা নাড়ল, 'ওঁরা এসব খান না।'

'আপনাকে এসে কানে কানে বলে গেছেন, না?' বিধুবাবু ধমকে উঠলেন, 'আমি কি গান্ধীজীর কথা বলেছি? প্রফুল্লবাবুর কথা বলেছি? কেউ কেউ খান না, কেউ কেউ খান। দুশো বছরের পরাধীনতা কাটিয়ে, এমন দিনে মদ বন্ধ? ছি ছি ছি। খুব খারাপ। এর পরে হয়তো হুকুম জারি হবে, দেশে মদ খাওয়াই প্রহিবিটেড করে দেবে। তাতে কী হবে? লোকে চুরি করে খাবে।' (পৃ.৬৪৯)

আপাতদৃষ্টিতে, মদ্যপ অভিনেতা বিধুবাবু দেশভাগের যন্ত্রণায় কষ্টকাতর। পারিবারিক জীবনের পূর্ণতাও তার এ শূন্যতা ঘোচাতে পারেনি। সতু, বিজু ও গোরার কাছে বিধু গাঙ্গুলির এ সম্পর্কিত অসহায় স্বীকারোক্তি :

Dhaka University Institutional Repository

'ভালবাসার থেকে বড় কিছু নেই। দুগ্গাদা—মানে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ফরটিফাইভে ঢাকায় নাটক করতে গেছলাম। কী খাতির, কত ভালবাসা। কিন্তু কী হল? ভালবাসাবাসি থাকলে দেশ ভাগ হত? আর কোনও দিন ঢাকায় যাওয়া হবে না। আমি তো ওসব বুঝিনে– ওই যে সব রাজনীতিটিতি—ওখানে ভালবাসাবাসি নেই...নো, নো রেসপেক্ট। আমাকে একটু ভালবেসো...'(পৃ.৬৪৯)

রাজনৈতিক জীবন রূপায়ণের ক্ষেত্রে LwbZvয় মানুষের প্রেম-প্রীতি-মমতাময় পারিবারিক জীবনের ছবিও সমান গুরুত্ব পেয়েছে। তিন বন্ধু যখন পনেরোই আগস্টে স্বাধীনতা দিবসের আনন্দ উদ্‌যাপনের জন্য পূর্ব-পাকিস্তান যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে তখন তাকে নিয়ে তার স্ত্রী প্রতিমা ডাকনাম কুসির উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার শেষ নেই। পূর্ব-পাকিস্তানের অজানা পরিস্থিতি সম্পর্কে তার উদ্বেগ, সতু কর্তৃক সান্ত্বনা ও নির্ভয়তার আশ্বাস, সংসারখরচের অর্থ প্রতিমার হাতে গুঁজে দিয়ে, ঘুমন্ত সন্তানের মুখ দেখে, তিন রাত পরে বাড়ি ফেরার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সতু।

কলকাতার পথে বেরিয়ে বিস্মিত সতু দেখেছে দেশবিভাগের নিরানন্দের মাঝে কোনো আলোকসজ্জা হবে না– সরকারের এমন প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি কোথাও। বরং আলোর ঔজ্জ্বল্য দেখে মনেও হয়নি দেশকে টুকরো করা হয়েছে। মেইন স্টেশনে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে উদ্বাস্তু মুসলমান বিষণ্ন যাত্রীবাহী পূর্ব পাকিস্তানগামী স্পেশাল ট্রেন দেখে তারা প্রকৃত সত্যের মুখোমুখি হয়। সর্বজ্ঞ ঔপন্যাসিক তিন বন্ধুর দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে তাদের মানস প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন নিচের অংশে :

তিন বন্ধু পরস্পরের দিকে তাকাল। আবার দেখল গাড়িটা। তার মানে, এ গাড়ির যাত্রীরা সব কলকাতার আতুর নিরাশ্রয় মুসলমান। অনেকেই ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তির নিরাশ্রয় বাসিন্দা। এও কি সেই ক্যানাল ওয়েস্ট রোডের আশ্রিত আতুরদের স্পেশাল ট্রেন? এখন এদের চোখে-মুখে ভয় সন্দেহ। এরা কি জানে না, কলকাতায় আজ হিন্দু-মুসলমান হাতে হাত মিলিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই স্লোগানে কলকাতার আকাশ বাতাস মুখরিত। অবিশ্যি এখানে তা ভেসে আসছে না। কিন্তু ওরা যখন পূর্ব পাকিস্তানে পৌঁছুবে, তখন এরা কী রূপ ধারণ করবে? সতু গতকালই বলেছিল, "এদের চোয়াল কি নরম থাকবে? (পৃ.৬৫৩)

বিভিন্ন স্থানে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা ও গোলমালের কথা শুনে গোরা পূর্ব পাকিস্তান যেতে ভয় পেলেও তারুণ্যের সাহসিকতায় সব তুচ্ছ করে নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসে তারা যাত্রা করেছে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্দেশে। গতিশীল ট্রেনে বিচিত্র মানুষের সঙ্গে তিন বন্ধুর কথোপকথনের মাধ্যমেই দেশবিভাগকালীন হিন্দু-মুসলমানের প্রতিক্রিয়া, তাদের বিচিত্র ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক। সৈয়দপুর রেলওয়ে ফ্যাক্টরির ফোরম্যান প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সী মিঃ জর্জ মিলার তিন তরুণের স্বদেশে স্বাধীনতার উৎসব উদ্‌যাপনের পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তান দেখার কৌতূহলে বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু ওরা তাকে জানিয়েছে : "...বিভক্ত নতুন দেশটা দেখাই হবে আমাদের স্বাধীনতার উৎসব।" (পৃ.৬৫৬)

এমনকি স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগের অংশ হিসেবে তারা ট্রেনে বিনা টিকেটে ভ্রমণ করেছে। মিঃ জি মিলার তাদেরকে নতুন দেশ পুনর্গঠনের জন্য জাতীয় সরকারের আমলে তাদেরকে আরও বেশি দায়িত্বশীল হতে পরামর্শ দিয়েছেন। নিচের অংশটি দ্রষ্টব্য :

'টিকেট না কাটার জন্য স্বাধীনতার স্বাদ!' ভদ্রলোক আবার সকৌতুকে হেসে উঠলেন, 'খুবই বিপজ্জনক উপভোগ। একটাই আশার কথা, কেবল এই কয়েকদিন, প্রথম আর শেষ তোমাদের বিনা ভাড়ায় রেল ভ্রমণ। অবিশ্যি, আমার ধারণা, আজ বা আরও কয়েকদিন, কেউ তোমাদের কাছে টিকেট চাইবে না। সবাই বোধহয় তোমাদের মতোই স্বাধীনতার উৎসবে মেতে আছে। তা ছাড়া, আমরা তো একটা কথা বলেই থাকি....'ভদ্রলোক থেমে হিন্দিতে বললেন, 'সরকার কি মাল, দরিয়া মে

Dhaka University Institutional Repository

ঢাল' এটা সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে খুব বেশি করে আছে। কিন্তু আজ থেকে তো এসব চিন্তা-ভাবনা আমাদের অনেকটা বদলাতে হবে। এখন তো আর বিদেশি সরকার নেই। জাতীয় সরকার। আমরা স্বাধীন।' (পৃ.৬৫৬)

অ্যাংলোইন্ডিয়ান মিলারের কাছ থেকেই তিন বন্ধু জেনেছে নানা গুজব প্রচলিত থাকলেও এমনকি মুসলমানরা পুরো দিনাজপুর জেলা দাবি করলেও সীমানা কমিশন পুরো জেলাকে যে কোনো একটা দেশের ভাগে দেবে না কারণ বালুরঘাট রায়গঞ্জ হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল। দিনাজপুর নিয়ে মিঃ র‍্যাডক্লিফের সংশয়ই সেখানকার গোলমালের মূল কারণ। দিনাজপুরের কিছু হিন্দু বড়লোক টাকা দিয়ে পশ্চিমের একটা অংশ ভারতের সঙ্গে রাখার চেষ্টা করছে। এ টাকা কে নেবে এ প্রশ্ন সতুর। মিঃ র‍্যাডক্লিফ বা সীমানা কমিশনের অবিচারের কথা লোকে জানলেও ঘুষের টাকা কারা নেবে সেটা জর্জ মিলারও জানে না। গোরার মনে হয় মনসুর মল্লিক সাহেবের কাছ থেকে শোনা হিন্দু বড়লোক জমিদারদের কথা যারা তিন কোটি টাকা তুলে খুলনাকে ভারতের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। গোরার বিশ্বাস তাকে না বললেও ও টাকা কাদের হাতে যাবে মনসুর মল্লিক সাহেব তা ভালো করেই জানেন।

মিলারের মধ্যদিয়েও অনিশ্চিত জীবনের কথা প্রকাশ করেছেন সমরেশ বসু। সৈয়দপুর রেলফ্যাক্টরির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি আছেন। যেখানে হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান সব ধর্মাবলম্বীর বাস। তার ছেলে ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে ব্যারেল সেকশনে নতুন সুপারভাইজার হিসেবে কর্মরত, দু মেয়ের বয়স ষোল থেকে আঠারোর মধ্যে। দেশবিভাগের ফলে ভারতে তিনি কবে আসতে পারবেন, কিংবা কোথায় তাকে পাঠাতে পারে এসব নিয়ে উদ্বিগ্ন তিনি। এ বিষয়ে খোঁজ নেবার জন্যই কলকাতায় এসেছিলেন কিন্তু দু সপ্তাহের ছুটি থাকলেও ওয়ার্কস ম্যানেজারের টেলিগ্রাম পেয়ে তাকে সৈয়দপুর ফিরতে হচ্ছে। তার কাছ থেকেই তারা জানতে পারে অন্যান্য স্থানের মতো একটা চাপা উত্তেজনা থাকলেও সাম্প্রদায়িক গোলমাল সৈয়দপুরে নেই। মিঃ মিলারের মতো অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের নিয়ে হিন্দু-মুসলমাদের মধ্যে কোনো ভাবনা নেই। ভারত সংবিধানে তাদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে বলে তিনি কলকাতায় থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। পাকিস্তানের সংবিধানে তাদের অধিকারকে স্বীকৃতি দিলেও ভালো হবে। অবশ্য অল্পবয়সী অ্যাংলোইন্ডিয়ান তরুণরা ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে আগ্রহী। কিন্তু মিলারের কাছে ভারতই তার নিজের দেশ। পূর্ব পাকিস্তানে এসে তিন বন্ধুর কোনো বিপদ নাও হতে পারে বলেই মিঃ মিলার মনে করেন :

'...আমার মনে হয় না, সেরকম কিছু বিপদে তোমরা পড়তে পারো।' তোমাদের মতো, এখন সবাই নতুন স্বাধীনতার আনন্দে মশগুল। অবিশ্যি তাদের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের আমি যুক্ত করব কি না, বুঝতে পারি না। রংপুর বা সৈয়দপুরের মতো জায়গায় গোলমাল না থাকলেও, হিন্দুদের মনে শান্তি নেই। কলকাতার মুসলমানদের মনে শান্তি আর ভরসা ফিরে আসছে। বিহারের মুসলমানদের মনে কি শান্তি আছে?...' তিনি চুরুটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে হাসলেন, 'দেশ বহুকাল বাদে স্বাধীন হল, এটা খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু খুব আনন্দের সঙ্গে কি তা হল?" (পৃ.৬৫৯)

ট্রেন নৈহাটি জংশন পৌঁছালে, ভিন্ন কমপার্টমেন্টের সন্ধানে, সতু-বিজু-গোরা শুভরাত্রি জানিয়ে উঠে দাঁড়ায়। মিলারও দাঁড়িয়ে প্রত্যুত্তরে শুভরাত্রি জানিয়ে ওদেরকে বিদায় জানান।

ওরা তিন জন নৈহাটি স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফরমে পৌঁছায়। দোকানে দোকানে আলো জ্বলছে, কিন্তু যাত্রীর ভিড় নেই। অথচ এ গাড়ি হল নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস। খাবারের সন্ধানে কিছুদূর এগিয়ে গেলে তাদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ময়লা ধুতি শার্ট পরা কালো লম্বা উগ্র সাম্প্রদায়িক, সুযোগসন্ধানী ব্যক্তির দেখা হয়। দেশবিভাগের কয়েক বছর আগেই সে নৈহাটিতে এসেছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে আসা হিন্দুদের বাসা ভাড়া করে দেওয়া, জমি কিনে দেওয়ার ব্যবস্থা করে যে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করে।

Dhaka University Institutional Repository

ভীত, শঙ্কিত গোরাকে সতু বলেছে : 'আর সত্যি কথা বলতে কী, আমরা কেবল আনন্দ করতেই যাচ্ছি? মজা করতে যাচ্ছি আমরা? আমি মনে করি, আমরাও তীর্থযাত্রী।'(পৃ.৬৬১) সতুর কথা শুনে অনামা লোকটি বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলে ওঠে :

'তীর্থযাত্রী? কোন্ তীর্থের ভাই? নতুন পূর্ব পাকিস্তান তীর্থ?'(পৃ.৬৬১)

তার প্রকৃত পরিচয় না জেনেই সতু নিজের আবেগ ও বিশ্বাসকে প্রকাশ করে ফেলে : 'না, নতুন পাকিস্তান তীর্থ নয়।' সতুর স্বরে তেজ ও ঝাঁজ, 'আমাদের দেশকেই টুকরো করা হয়েছে, আমাদের মানুষকেই, আমাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। এ তত্ত্ব যারা মানে, তারা মানে। আমরা মানিনে বলেই, ওই বিদেশিদের ভাগ করা দেশের অংশ আমাদের কাছে তীর্থ। সারা দেশই আমাদের কাছে তীর্থ। গান্ধীজি তো বলেছেন, সমগ্র দেশ আমার।' (পৃ.৬৬১) কিন্তু সতুর এ কথাকে 'ফাইজলামি মারা' বলে অভিহিত করে, লোকটি গান্ধীকে 'পাগল' আখ্যা দেওয়ায় সতু তাকে 'ছাগল' বলার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে : '...অত্যন্ত জঘন্য লোক মশাই আপনি। কমিউনাল মাইন্ডেড। সারা দেশে যখন হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই করছে, আপনি তখন লোককে ভয় দেখাচ্ছেন। সাম্প্রদায়িকতা ছড়াচ্ছেন। আপনাকে তো পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া উচিত।'(পৃ.৬৬১) প্রত্যুত্তরে সাম্প্রদায়িক লোকটি তাদেরকে হত্যার হুমকি দিয়ে বলে :

'তার আগে, আপনাদের তিনটারে ধইরা এই নৈহাটি ইস্টিশনেই গুম্ কইরা দিতে পারি। তারপরে হাড় মাংস বেলেঘাটায় পাঠাইয়া দিমু। বেশি কথা কইবেন না। হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই? হালায় কইছে পুঙ্গির ভাই, আনন্দের আর সীমা নাই। যান–যান গিয়া। আর যদি চউখ থাকে, দেইখ্যা আইসেন, আপনাদের জাতভাইয়েরা কী অবস্থায় আছে।' (পৃ.৬৬১) তারা কমিউনিস্ট কি না লোকটি জানতে চাইলে তার সাম্প্রদায়িক কথা শুনে ক্রুদ্ধ গোরা ব্যঙ্গভরে জানিয়েছে : "না, আমরা হিন্দুমহাসভা করি।"

ট্রেনের হুইসল্ বেজে উঠতেই ওরা এক কুঁজো জল নিয়ে প্রথম শ্রেণির কামরায় উঠে পড়ে। টিমটিমে আলো। ওরা নিচের আসনে বসে। বিজু পশ্চিমের দুটো জানালাই বন্ধ করে দেয়। ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু দীর্ঘসময় পর বহির্জাগতিক স্থান ও আকাশদৃশ্য উপস্থাপন করেন, যার মাঝে দ্যোতক উপাদান সক্রিয় থাকে :

পুবের জানালা দিয়ে, বাইরে দৃশ্য আবছা দেখা যাচ্ছে। আকাশে চাঁদ আছে। পূর্ণিমার বেশি বাকি নেই। আজ দ্বাদশী না ত্রয়োদশী?
আকাশ পাতলা সরের মতো মেঘে ঢাকা। জ্যোৎস্না ফুটে বেরোতে পারছে না। (পৃ.৬৬২)

কামরায় স্থির হয়ে বসে সতু সিগারেট ধরিয়ে বলে : "কেল্‌টে বদমাইস লোকটাকে আমার মারতে ইচ্ছে করছিল। গান্ধীজীকে বলে পাগল। সাংঘাতিক কমিউনাল। এই সব হিন্দুরাই দাঙ্গা বাধায়।"(পৃ.৬৬২)
এ পরিস্থিতিতে, কথোপকথন ও ভাবনা প্রসঙ্গে, মিঃ মিলারের সংলাপ মনে পড়ে। গান্ধীকে নিয়ে মিঃ মিলারের উপলব্ধি ও স্বীকারোক্তি :

মিঃ মিলার তো শেষ কথা বলেই গেলেন। আর আমি মনে করি, মিলার সাহেব ভদ্রলোকের বুদ্ধি আছে। উনি তো বললেনই, সবখানেই একটা উত্তেজনা অস্থিরতা রয়েছে, কিন্তু বিপদের ভয় নেই। আমি বলছি না, আমরা তিনজন এক-একটি মহাত্মা গান্ধী। আমরা তাঁর মতো ভয়ংকর দাঙ্গার সময় নোয়াখালি যেতে পারি নে। মিঃ মিলারের কথাটা খুব ভালো লেগেছে আমার। গ্রেট পিলগ্রিম। আমরা কোথায় যাচ্ছি? আমাদেরই দেশের ভাগ করা অংশে। সেখানে যাওয়াটাই আমাদের স্বাধীনতা দিবস পালন করা। ওই বাজে কমিউনাল লোকটাকে আমি কী করে বোঝাব, গান্ধীজির 'সমগ্র দেশ আমার' বলার আসল মানেটা কী? উনি তো শুধু ওই কথাই বলেননি। বলেছেন, 'আমি পাকিস্তানেও গিয়ে থাকতে চাই।'

Dhaka University Institutional Repository

তার মানে কী? দেশের একটা অংশ পাকিস্তান হয়েছে। হোক। তবু তিনি সেখানে গিয়ে থাকতে চান। তিনি সম্পর্ক ত্যাগ করতে চান না। তা সে হিন্দুস্তান-পাকিস্তান, যে-নামেই এদেশকে বলা হোক।' (পৃ.৬৬২-৬৩)

সতু-বিজু-গোরা ট্রেনের যে কামরায় বসে পরস্পর আলাপ করছিল, সেখানেই রংপুরনিবাসী ধর্মপ্রাণ মুসলমান, রুপোলি গোঁফ-দাড়ি ভরা ফরসা মুখ সৈয়দ বদরুদ্দিন ইসলামের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়। সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক সাধকের মতো। ইতোমধ্যে ভোরের রোদ এসে পড়ছে, ছুটন্ত কামরায়। বিজু ঘুম থেকে উঠে সবগুলো জানালা খুলে দেয়। ওদের তীর্থভূমি পূর্ব পাকিস্তানের চলমান ভূদৃশ্য, ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু স্কেচধর্মী চিত্রাত্মক পরিচর্যায় রূপান্বিত করেছেন :

বর্ষা ভেজা, অথচ মেঘহীন আকাশের রোদ চড়া না। এখনও নরম, আর অনুজ্জ্বল। ...বাইরে দিগন্তব্যাপী শস্যের মাঠ। ধান আর পাট ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। শেষ শ্রাবণে এখন আমন ধান। পাটগাছগুলো কী লম্বা। যেন অরণ্যের মতো আকাশের দিকে উঠে গিয়েছে। মাঝে মাঝেই, আয়নার মতো এক-একটা নানা আকারের জলাশয় দেখা যাচ্ছে। কোথাও পাট পচানো হচ্ছে। কিন্তু লোকজন প্রায়ই দেখা যাচ্ছে না। একটি বড় গাছের মাথায় প্রথম, পূর্ব পাকিস্তানের পতাকা চোখে পড়ল। গাছের মাথা ছাড়িয়ে না উঠলে, সবুজ রং চেনাই যেত না। সবুজ পতাকার এক চতুর্থাংশ সাদা। অবশ্যি পতাকাটি দেখে কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। রাত্রে বোধ হয় বৃষ্টি হয়েছিল। সরু কঞ্চিতে টাঙানো পতাকা স্থির হয়ে ঝুলছে। বাইরে বাতাসও নেই। (পৃ.৬৬৫-৬৬)

সৈয়দ বদরুদ্দিন ইসলাম, মোক্তারি করার পাশাপাশি তামাক চাষ ও ব্যবসা করেন। তার দুই ছেলে ঢাকা ও রাজশাহীতে কলেজে অধ্যাপনা করে। দুজনেই মুসলিম লিগের সঙ্গে যুক্ত। কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন এ তিন তরুণের আলোচনায় তিনি মুগ্ধ হন। নিজের মনের রাজনীতি-চিন্তার প্রতিধ্বনি শুনতে পান তাদের কণ্ঠে। শুধু তাই নয়, তাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রমাণ পেয়ে ও পূর্ববঙ্গে আগমনের কারণ শুনে এবং এদিকে কোনো আত্মীয়স্বজন নেই জেনে সৈয়দ বদরুদ্দিন ইসলাম, তাদেরকে রংপুরে নিজগৃহে ঈদের দিন কাটানোসহ তিনদিনের 'মেহ্মান' হওয়ার উদার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এমনকি মুসলমান হিসেবে তাঁর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণে আপত্তি থাকলে হিন্দু বন্ধুর বাড়িতে ব্যবস্থা করে দেবেন বলেও জানান তিনি। মনেপ্রাণে একজন মুসলমান হয়েও মুসলিম লিগের রাজনীতিতে আস্থা নেই তার। এটি তার কাছে 'হিন্দু-মোছলমানের' রাজনীতি বলে বিবেচিত হয়। বরং গান্ধীর ধর্মনিরপেক্ষ উদার অসাম্প্রদায়িক মানববাদ বদরুদ্দিন ইসলামের আরাধ্য। এ কারণেই স্বাধীনতা দিবসে রংপুরে থাকার পরিবর্তে সৈয়দ বদরুদ্দিন গান্ধীকে দেখতে কলকাতায় এসেছিলেন। সুভাষ বসুর সঙ্গে গান্ধীর বিরোধ ও কংগ্রেস ত্যাগের কারণে তাঁর হিন্দু বন্ধুরা গান্ধীকে অভিযুক্ত করে। এজন্য তাঁর গান্ধীভক্তি দেখে রাগ করলেও তিনি বিশ্বাস করেন ছেচল্লিশ সালের ষোলই আগস্ট কিংবা পরবর্তীকালে সৃষ্ট দাঙ্গায় গান্ধীই মুসলমানদের রক্ষা করেছিলেন। এছাড়া সুভাষ বসুর সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব যে কংগ্রেসকে সুরক্ষিত রাখবার জন্য, এটাও মনে করেন সৈয়দ বদরুদ্দিন। তিনি শহীদ সুরাবর্দীরও সমালোচনা করেন। তারপরও রাজনীতিসচেতন বদরুদ্দিন উনিশশো ছেচল্লিশ সালে ভেবেছিলেন ইংরেজ জিতলেও বিভক্ত দেশে হিন্দু-মুসলমান হয়তো সুখেই বাস করবে। কারণ তিনি দেখেছেন কংগ্রেস হিন্দুর ও মুসলিম লিগ মুসলিম স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়েছে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টে এসেও তিনি সে সুখ কিংবা শান্তির কোনো সম্ভাবনা দেখতে পান না, বরং ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ পরবর্তী প্রতিক্রিয়া হিসেবে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বহ্নিশিখা কতটা বিস্তৃত হতে পারে তা সহজেই অনুমান করতে পারেন। তার এ উৎকণ্ঠা-আশঙ্কা তিন বন্ধুর কাছে প্রকাশ করলে সতু 'দেশের অবস্থা কি আপনার খারাপ মনে হয়?' এ প্রশ্ন উত্থাপন করলে, বিষণ্ন বদরুদ্দিন মহাভারতের প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করে ভয়ার্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন :

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা পড়িছ, মনে করতে পারবে। যে-দিন দুর্যোধন জন্মিল, সেই দিন বেদব্যাস তাঁর মা সত্যবতীরে কহিছিলেন, মা সামনে বড় দুর্দিন। মিথ্যা কহেন নাই। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ—সবদিকে অন্ধ। ভাই ভাতিজার রাজ্য লইয়া যুদ্ধ, আর সবংশে নির্বংশ। ভাগাভাগি হইছিল, ভাই ভাইরা নিজের রাজ্য লইয়া সুখে ক্যান থাকতে পারল না? হিংসা। বাবারা, কহিতে ডরাই। আমার মনে লয়, সামনে দুর্দিন। গতকাল মহাত্মা উপাস দিলেন, কিন্তু মনেরে কি দিয়া বুঝান? জিন্না কহিলেন, তাঁরে মুসলমানরা ডাকুক, তিনি ভারত থেকে পাকিস্তানের বড়লাট হইয়া শাসন করতে যাইবেন। এত বড় মানুষটার এইটা কী মতি? লাহোরে আগুন জ্বলতেছে। পাঞ্জাবে আগুন জ্বলতেছে। বাংলায় কি ক্যাবল ম্যাঘনা শীতলক্ষার ঠাণ্ডা পানির সোঁত বহিছে? একজন বেলেঘাটায় একটা পচা মোকামে বইসা হাসতেছেন, কাঁদতেছেন। আর মাউন্টব্যাটেন সাহেব কংগ্রেসেরে যেমন খেলাইতেছেন, কংগ্রেস তেমন খেলতেছে। লিগের ত কথাই নাই। বাবারা, এই বুড়ারে মাপ কর। আমার ঘাড়ে শয়তান ভর করছে নাকি কে জানে? আমার বড় ডর, সামনে দুর্দিন। তোমরা ট্যার পাও না, পায়ের নিচে জমিন কাঁপতেছে। পরশু রাত্রে সুদিন শ্যাষ হইয়া গেছে... (পৃ.৬৬৭)

ইতিহাসের ছাত্র বিজুর সঙ্গে বদরুদ্দিনের কথোপকথন থেকে সমরেশ বসু দেশবিভাগের নেপথ্য নায়কদের ভূমিকা দেখিয়েছেন। এ দুর্দিন দেশ বিভাগের আগে সেই ১৯৪৫-৪৬ সালের আই এন এস-এর বন্দিমুক্তি আন্দোলনের সময় থেকেই শুরু। রশীদ আলি দিবস আর নৌবাহিনীর বিদ্রোহের সময়ই এট্‌লি ভারতের স্বাধীনতা দেবার কথা ঘোষণা করলেও তার মন্ত্রণাদাতাদের কারণে সেটা না হলে শুরু হয় দেশবিভাগের নতুন নাটক। যা লেখেন মাউন্টব্যাটেন। গান্ধীকে সেই বলেছিল 'কংগ্রেস আর আপনার লগে নাই, কংগ্রেস আমার লগে।' মাউন্টব্যাটেনের মিথ্যাচারিতা 'আমি আর মহাত্মাজি, এই দুইজন মাত্র দেশ বিভাগ চাই নাই।'(পৃ.৬৭১) মাউন্টব্যাটেনের এ নাটকে মুসলিম লিগ ও কংগ্রেস নেতারা অভিনয় করেছিল মাত্র। প্রসঙ্গক্রমে গান্ধী-জিন্না, জহরলাল-প্যাটেল-লিয়াকৎ, সুরাবর্দি-নাজিমুদ্দিন, ওয়াসিম্ উকিল-হামিদুল হকের ভূমিকার কথা এসেছে। কোনো রাজনৈতিক দলে না থাকলেও বদরুদ্দিন ইসলামের রাজনৈতিক সচেতনতা তিন বন্ধুর সঙ্গে কথোপকথনে প্রকাশিত হয়েছে। এ দুর্দিন ধীরে ধীরে এসেছে এ পর্যবেক্ষণ তাঁর। নিজ জীবন দিয়ে হলেও তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বজায় রাখতে চেয়েছেন। দেশ বিভাগের চেয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দশ বছর সংগ্রাম করা ভালো বলে অভিমত দেন। এমনকি ঐক্য বা অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য দরকার হলে জিন্নাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী করারও প্রস্তাব করেন তিনি, এ কারণে বল্লভভাই প্যাটেল তাঁর মুখ দেখতেও চাননি। অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির বিকল্প নেতৃত্ব তৈরি করলে ইংরেজদের দেশভাগের নীতি ধ্বংস হতো—এ খেদোক্তি তাঁর আজীবন ছিল। দেশবিভাগ চাননি বলে তাকে হত্যা করাও হতে পারে সুগভীর দূরদৃষ্টি দিয়ে এটাও বুঝেছিলেন তিনি, যা পরবর্তীকালে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। (দ্র. ৬৭০-৭১)

সৈয়দ বদরুদ্দিন ইসলাম তিন বন্ধুকে তিন রাত্রি রংপুরে তাঁর মেহমান করে রেখেছিলেন। স্টেশনের কাছেই, লালবাগ এলাকায় তাঁর দোতলা বাড়ি। তিন বন্ধুর চোখে রংপুর শহরকে অনেকটা লাল শহর বলে মনে হয়েছে। অন্যদিকে তিন হিন্দু মেহ্মানকে নিয়ে সৈয়দ বদরুদ্দিন শহরে একটা হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। ওদেরকে দেখতে এসেছিলেন অনেকেই। এদের মধ্যে ছিলেন জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান মৌলানা মহাম্মদ আমিন, মুসলিম লিগের প্রেসিডেন্ট বদরুদ্দিন আহ্মেদ, কংগ্রেস নেতা বিশিষ্ট হিন্দু ধনী অতুলকৃষ্ণ রায়, সাহিগঞ্জের বালধর সিংহ, সুশীলচন্দ্র দেবের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তি। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হলেও হিন্দুদের মনের ভীতি তাদের অজানা থাকেনি। এ কারণেই কোনো হিন্দুর বাড়িতেই তারা নিমন্ত্রিত হয়নি। বিমলচন্দ্র রায় নামে এক হিন্দু ভদ্রলোক নিজে রংপুরে থেকে গেলেও তার ছোট ভাই এখানে থাকার সাহস পাননি। রংপুরে শান্তি বজায় থাকলেও গ্রামাঞ্চলের অবস্থা যে ভালো নয়, সেটা বদরুদ্দিন সাহেবের কথাতেই তারা বুঝতে পারে। সৈয়দ বদরুদ্দিন সাহেবের বাড়িতে এলেও, হিন্দু-মুসলমান উভয়েই তিন বন্ধুকে সন্দেহের চোখে দেখেছে।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ আগস্ট, তিন বন্ধু রংপুর থেকে সৈয়দপুরে এসে পৌঁছায়। সতু, বিজু ও গোরা তাদের বন্ধু মধুসূদন প্রসাদের দাদা সৈয়দপুরের রেলওয়ে ফ্যাক্টরিতে কর্মরত বিহারি কায়স্থ হরিসূদন প্রসাদের বাড়িতে আসে। দু বছর আগে বিহারের জামালপুরে কাজ করার পরে এখানে বদলি করা হয় তাকে। কিন্তু তখন সে জানত না যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশ বিভাগ নামক 'একখানি বাঁশ'ও তাদের জীবনে আসবে। তার সঙ্গে কথোপকথনেই উঠে আসে সেখানকার দেশবিভাগ পরবর্তী পরিস্থিতি। রেলওয়ে ফ্যাক্টরির হিন্দু-মুসলমান ওয়ার্কারদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় থাকলেও স্থানীয় হিন্দু, বাঙালি, বিহারি, ওড়িয়া, মাদ্রাজি হিন্দুদের মনে স্বস্তি নেই। এর কারণ সুযোগসন্ধানী প্রমোশনপ্রত্যাশী কিছু মুসলমান নিজেদের লাভের কথা বিবেচনা করে হাসিমুখে প্রকাশ্যেই হিন্দুদের স্বদেশভূমি ভারতে ফিরে যাবার প্রস্তাব করে। এছাড়া সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন কিছু অশিক্ষিত মুসলমান তখন সমাজবিরোধীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল যারা নানা রকম গুজব সৃষ্টির মধ্যদিয়ে হিন্দুদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। অবশ্য এর বিপরীতে ভালো, শিক্ষিত ভদ্রলোক মুসলমানও ছিল যারা হিন্দুদের সঙ্গে প্রাণখুলে কথাবার্তা বলেন। তাদের মধ্যে এমন অনেকেও আছেন যারা দেশ ভাগ চাননি। আবার তাদেরই কেউ কেউ হিন্দুদেরকে 'জিম্মি' বলে মনে করেন। কেউ কেউ আবার কলকাতার খবরের কাগজের ওপর এতোটাই ক্ষিপ্ত ছিল যে হরিদার জন্য আসা 'আনন্দবাজার' পত্রিকা ছিনিয়ে নিত। তবে শ্রমজীবী কৃষক শ্রেণি ছাড়া সকলেই স্বাধীনতা উদ্‌যাপনের আনন্দে মত্ত থাকায় কিছুটা উদ্বেগ থাকলেও হরিদা খুব একটা খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়েননি বলে জানিয়েছে। সেখানে মুসলমানদের মধ্যে গান্ধীকে নিয়ে তেমন আগ্রহ না থাকলেও শরৎ বসুর কংগ্রেস সমালোচনায় তারা সন্তুষ্ট।

পরের দিন, ২০ আগস্ট, সকালবেলা আলু-পেঁয়াজ ভাজা আর চা দিয়ে প্রাতরাশ হল ওদের। হরিসূদন ওদেরকে নিয়ে বাজার ঘুরতে গেল। বাজার করে ফেরার পথে, একটা বড়ো দোকানের সামনে দাঁড়াল। দেখছিল আশেপাশে :

জায়গাটা দুটো রাস্তার মোড়ের কাছে। সৈয়দপুর এখনো তার গ্রাম্য চেহারাটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কাঁচড়াপাড়ার যে আধা-শহর আধা-গ্রাম আধখেঁচড়া চেহারা, সেরকমও হয়ে ওঠেনি। কিন্তু রেলওয়ে ফ্যাক্টরির কাছাকাছি, রেলের বাংলো আর তখনও কিছু কোয়ার্টার যেখানে আছে, সেখানটা পরিচ্ছন্ন আর সুন্দর। মোটর রাস্তা আছে, দিনাজপুর আর রংপুর যাবার জন্য। (পৃ.৬৭৬)

সেখানে ওরা পরিচিত হয়, কারমাইকেল কলেজের বাংলার লেকচারার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ, এবং জমিদারপুত্র জাব্বরের সঙ্গে কথা বলে তিন বন্ধু উচ্চশিক্ষিত অথচ গোঁড়া মুসলমানদের দেশভাগ সম্পর্কিত ক্ষোভের কথা বুঝতে পেরেছে। বিভক্ত বাংলার 'নতুন রূপ' দেখতে স্বাধীনতা দিবসেই তারা এখানে এসেছে শুনে বিস্মিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রংপুরের সৈয়দ বদরুদ্দিন ইসলামের মতো অসাম্প্রদায়িক গান্ধীভক্ত মানুষকে 'পাগলা বুড়া', কিংবা 'পীর ফকির' বলে বিদ্রূপ করতেও সঙ্কোচ বোধ হয়নি জাব্বরের। ওরাও আর কোনো মন্তব্য করল না। এমন সময় হৈহৈ পড়ে গেল। একজন কেউ চিলের ডাকের মতো শিস্ দেয়। কেউ নোংরা খিস্তি করে। ইতিমধ্যে তিন বন্ধু হরিসূদনের চোখের ইশারায় রাস্তার সামনের দিকে তাকাল :

দেখলো, বিবর্ণ রং উঠে-যাওয়া লাল ঘাগরা পরা একটি মেয়ে এদিকেই আসছে। গায়ে তার ঘাগরার মতোই পুরনো একদা বেগুনি রং ধুয়ে যাওয়া জামা। মলমলের গোলাপি রঙের ফিনফিনে, মাড়বিহীন ওড়নাটা তেমন পুরনো না। সে যত এগিয়ে আসতে লাগল, চেহারা তত স্পষ্ট হল। বোধহয় গায়ের রং তার ফরসাই। কিন্তু এখন দেখাচ্ছে অনেকটা মাজা-ঘষা পুরনো তামার মতো। উন্নতনাসা, প্রতিমার মতোই আকর্ণবিস্তৃত আয়ত চোখ। চোখের তারা দুটো কালো না। ঈষৎ পিঙ্গল। মাথার চুল খোলা, উসকো-খুস্‌কো। একরাশ কালো কেউটের মতো জড়াজড়ি পাকানো। অথচ একটি বেণী পিঠে ঝুলছে। তার

Dhaka University Institutional Repository

শরীরের উদ্ধত যৌবনে একটা অশ্লীলতা যেন ফুটে উঠেছে। সুগঠিত সুন্দর স্বাস্থ্য, অথচ তাকে দেখাচ্ছে অগ্নিশিখার মতো। তার চলার ছন্দে একটা নাচের ভঙ্গি, যে-কারণে উদ্ধত বুকেও নাচের ছন্দ। প্রশস্ত সুঠাম নিতম্বে নাচেরই তাল। বয়স কত? আঠারো না আটাশ? বোধহয় এই শরীর ও অগ্নিশিখা রূপ দেখে, দেবতাদেরও হিসাব মিলবে না। সে কি সুন্দরী? তাও যেন বলা যায় না। তাকে দেখে চোখ ঝলসে যায়। পুরুষের রক্তে মুহূর্তেই আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। এবং বোধহয় পুড়িয়েও মারতে পারে। এ যেন এক মূর্তিমতী রতি, যাকে পেয়েও কোনও কালে কোনও পুরুষ তৃপ্ত হবে না। শান্তি পাবে না। ঔদ্ধত্য তার চোখে মুখে। বেপরোয়া ভঙ্গি। কারোর দিকে ফিরেও দেখছে না। অথচ তার উদ্দেশে নানা ইতর অশ্লীল মন্তব্যগুলোকে যেন সে ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে। অথবা প্রশ্রয়ই দিচ্ছে। বাঁ হাত তার ওড়নায় ঢাকা। ডান হাতের দু পিঠেই মেহেদি মাখা, আর গাঢ় নীল রঙের এক রাশ কাচের চুড়ি। (পৃ.৬৭৮)

সমরেশ বসুর উল্লিখিত চিত্রময় শব্দ-বুনটে যৌন উপাদান আছে, কিন্তু উত্তেজনা নেই। একটি সংযত শান্ততা, বিহ্বলতা ও প্রতীকী আকাঙ্ক্ষা এবং সূক্ষ্ম রহস্যময়তা ন্যারেটিভকে শিল্পমার্জিত করেছে। 'উন্নতনাসা, প্রতিমার মতোই আকর্ণবিস্তৃত আয়ত চোখ' উপমানচিত্রে এখানে ভিন্ন তাৎপর্য সংযোজন করে।। স্মরণ রাখতে হবে, 'এই প্রতিমার মতোই আকর্ণবিস্তৃত আয়ত চোখ' নারীপ্রতিমাকে অবলম্বন করেই LwbZvর সকল রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা স্রোত, ঘটনা-ধারা উপন্যাসের অন্তিমে, তীব্র বলয় সৃষ্টি করে প্রতীকে তরঙ্গিত হয়েছে।

হরিসূদন চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলে, 'ও হল এখানকার নট্ সেটেলমেন্টের মেয়ে, নাম মোতি।' (পৃ.৬৭৯) জাব্বর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জানায় : সেটেলমেন্ট হল এক ধরনের কলোনি। আসলে জেলখানাই বলা যায়। নট হল যাযাবর শ্রেণি, এরা সার্কাসের খেলা, ম্যাজিক দেখায়। জড়ি বুটি মাদুলি কবচ ওষুধ দেয়। চুরি ডাকাতি করা ওদের পেশা। সে জন্যই ব্রিটিশ সরকার ওদের সেটেলমেন্টের জেলখানায় আটকে রাখে। সেটেলমেন্টের সুপারিনটেনডেন্ট, অফিসার, সেপাই সবই আছে। প্রাচীর ঘেরা সেটেলমেন্টে পাহারাও আছে। প্রচারিত আছে সেটেলমেন্টের সুপারের অফিসারের সুনজর থাকায়, মোতি বাইরে আসার অনুমতি পায়। মোতির কব্জির কাছ থেকে ওর বাঁ হাতটা নেই, চুরি করতে গিয়ে গ্রামের লোকেরা কাটারি দিয়ে কেটে দিয়েছিল। অথচ মোতি বলে, "ওর তখন পাঁচ বছর বয়স ছিল। ওদেরই একজন চুরি করে পালিয়ে গেছলো, আর ওকে ধরে, গ্রামের লোকেরা হাত কেটে দিয়েছে।"(পৃ.৬৭৯)

জাব্বর প্রসঙ্গান্তরে যায়, আবার প্রশ্ন করে দেশভাগ, রাজনীতিকদের নানা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে, ভবিষ্যৎ ভাবনা বিষয়ে।

১৫ আগস্টের পরেও 'খণ্ডিত বাংলা আবার এক হইবে।'—কংগ্রেস নেতা প্রফুল্লবাবুর এ কথা কিংবা কৃপালনীর 'কংগ্রেস ও জাতি অখণ্ড ভারতের দাবি পরিত্যাগ করে নাই' এবং 'ঐতিহাসিক আর রাজনৈতিক কারণেই নাকি, উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে একতার সৃষ্টি' হবে পত্রিকায় প্রকাশিত এসব সংবাদ পড়ে যেসব মুসলমান নিজেদেরকে অস্তিত্বহীন ভাবতে শুরু করেছিল তাদেরই একজন জাব্বর। গান্ধীর প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করে বঞ্চিত মুসলমানদের ক্ষোভ উচ্চারিত হয়েছে জাব্বরের কণ্ঠে। এর মধ্যদিয়ে সতু সৈয়দ বদরুদ্দিন সাহেবের বলা সেই দুর্দিনের আভাস পেয়েছে। নিচের অংশে তারই প্রকাশ ঘটেছে :

'তিনি বুদ্ধ যিশু, যা খুশি হইতে পারেন, তাতে কী? ...তিনি দ্যাশ বিভাগ চান নাই। কিন্তু দ্যাশ তো বিভাগ হইছে। অবশ্য অত্যন্ত অন্যায়ভাবে ভাগ হইছে। বাঙালি মুসলমানদের ভালই অর্ধচন্দ্র দেখান হইছে। খুলনা আর মুর্শিদাবাদ লইয়া খেলা ভালই জমছিল। শ্যাষে খুলনা গেল পূর্ব পাকিস্তানে, মুর্শিদাবাদ গেল ভারতে। র‍্যাডক্লিফ সাহেবের কী সুবিচার! মুর্শিদাবাদ যে কী কইরা ভারতে যায়, আমরা কোনোদিনই তা বুঝতে পারুম না। তা সে যাই হউক, দ্যাশ ভাগ ত হইছে। তবে আর এখন এইসব কথা কওনের অর্থ কী? পাকিস্তান থাকব না। এইটাই কি তাঁরা বিশ্বাস করেন নাকি?' (পৃ.৬৮০)

Dhaka University Institutional Repository

জাব্বর হরিসূদনকে জানায় চা-পানির নিমন্ত্রণ, মেহ্মানদের নিয়ে সন্ধ্যায় তার মোকামে যেতে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় যাবার অঙ্গীকার করে ওরা উঠে দাঁড়ায়। ওরা চারজন বাড়ির দিকে অগ্রসর হয়।

পথ চলতে চলতে, রাজনীতিক প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে সতু নট সেটেলমেন্ট সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। আলোচনাক্রমে সতু জানতে চায় সেটেলমেন্টের ভেতরে যেতে দেয় কি না। হরিসূদন জানায়, বললে যেতে দেয়। সুপার একজন বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোক। মি. জে. কে. মুখার্জি। অফিসার-ইন-চার্জ হরিসূদনের জেলার লোক, বিহারি মুসলমান আরিফ হোসেন। ওরা চারজন বাসায় পৌঁছে, বাড়ির উঠানে ঝম্ঝম্ মল বেজে উঠল, দুলিয়া ভাবি।

বেলা প্রায় সাড়ে তিনটার সময়, তিন বন্ধু হরিদার সঙ্গে সৈয়দপুর শহরের এক প্রান্তে এল। অফিসার-ইন-চার্জ আরিফ হোসেনের অনুরোধে, ওরা সেটেলমেন্ট দেখার অনুমতি পায়। পথপ্রদর্শক সত্যেন নাহা, বাড়ি ফরিদপুরে, মাদারিপুর। তিন বন্ধু কলকাতা থেকে এসেছে জেনে, বিস্মিত সত্যেনের প্রশ্ন, "কইলকাতা ছাইড়া এই নরকে? ক্যান?" (পৃ.৬৮২) সতুর প্রশ্ন, "নরক কেন?" সত্যেন নাহার জবাবে, তিন বন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের আর এক বাস্তবতা জানতে পারে। সত্যেন নাহা অসহায়ভাবে বলে :

... জানেন, চোদ্দোই আগস্ট নারায়ণগঞ্জ থেইক্যা তিনটা স্পেশ্যাল স্টিমার কেন রোজ গোয়ালন্দ যাইতেছে? হিন্দুরা পলাইতেছে। একমাত্র বড়লোক আর কংগ্রেসের নেতারা অ্যারোপ্লেনে কইরা দিনে চাইরবার ঢাকা-কলকাতা খ্যাপ মারতেছে। এইসব তো খবরের কাগজের ছাপা খবর। ফরিদপুর থেইক্যা আমার দাদারা বউদিরা, পোলা-মাইয়া লইয়া পলাইয়া গেছে। বুড়া বাবা-মা রইছে। মুন্সিগঞ্জে হিন্দুদের পাইকারি হারে খুন করছে কয়দিন আগে। মাইয়া বউদের লইয়া গেছে, ধর্ষণ আর পাশবিক অত্যাচার চলতাছে। কুষ্টিয়ায় কইলকাতার পথে রেলগাড়ি থামাইয়া রোজই লুট হইতেছে। কী হইতেছে না, কন তো? (পৃ.৬৮৩-৮৪)

ঢাকা শহরের যে দুশো আশিটা বাড়ি পাকিস্তানি সরকার সরকারি কাজের জন্য নিয়েছে তার বেশিরভাগ বাড়িই হিন্দু মালিকানাধীন ছিল। নট সেটেলমেন্টের সুপার হিন্দু বাঙালি মিঃ জে. কে. মুখার্জির পৈতৃক বাড়িও তার মধ্যে পড়েছিল। সত্যেন বিশ্বাস করে চারদিকের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে। স্বাধীনতা এলে শান্তিও আসবে এমন মনে করলেও সে এখন শুধু দেখতে পাচ্ছে, চিতার বহ্যুৎসব।

সতুর স্বর গম্ভীর, বলে, 'কলকাতায় গান্ধীজি না থাকলে, সেখানেও এখন মুসলমান খুন চলতে থাকত। সেখানেও খুন, ধর্ষণ, লুটপাট সবই চলছিল। এখনো চোরাগোপ্তা চলছে।'(পৃ.৬৮৪) সত্যেন সেন অনর্গল বলে চলে :

'দ্যাশ বিভাগ কে চাইছেন কন?' সত্যেনের অসহায় জিজ্ঞাসা, 'আমি চাই নাই। আমার মতন হাজার হাজার মানুষ চাই নাই। আমরা জানিই না, ক্যান, কীসের দ্যাশভাগ। এখন মুসলমানরা কইতেছে, পূর্ববঙ্গ কীসের? সমস্ত বঙ্গদেশই পূর্বপাকিস্তান হইব।' (পৃ.৬৮৪)

জানা গেল কথাটা কেবল গুজব নয়, ও রকম পোস্টার সৈয়দপুরেও পড়েছে, হরিসূদনও তা স্বীকার করে। ঢাকা শহরের যে দুশো আশিটা বাড়ি পাকিস্তানি সরকার সরকারি কাজের জন্য নিয়েছে তার বেশিরভাগ বাড়িই হিন্দু মালিকানাধীন ছিল। নট সেটেলমেন্টের সুপার হিন্দু বাঙালি মিঃ জে. কে. মুখার্জির পৈতৃক বাড়িও তার মধ্যে পড়েছিল। সত্যেন নাহা বিশ্বাস করে চারদিকের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে। স্বাধীনতা এলে শান্তিও আসবে এমন মনে করলেও সে এখন শুধু দেখতে পাচ্ছে "চারদিকে শ্মশানের চিতার কাঠ জমা হইতেছে।" (পৃ.৬৮৪) হরিসূদন সত্যেনবাবুকে জানায়, থাক ওসব কথা, ওদেরকে সেটেলমেন্টটা ঘুরিয়ে দেখান।

Dhaka University Institutional Repository

সত্যেন নাহা, ওদের চারজনকে নিয়ে, হলুদ প্রাচীর ঘেরা ঘরবাড়ি জঙ্গলাবৃত বিশাল 'নট সেটেলমেন্টে'র খয়েরি রঙের গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। ওরা দেখে ভেতরের জগৎ বিচিত্র– ডুপকির শব্দ, প্রেমজুরির ঝুনঝুন, নারী কণ্ঠের নিচু স্বরের দুর্বোধ্য গান, একটি ছেলে শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে দাঁড়ালো। একটি বারো বছরের মেয়ে, কোমর দুলিয়ে, হাতের ভঙ্গি করে নাচছে। গাছের ছায়ায় বসে এক লোলচর্ম বৃদ্ধা চরকা কাটছে। আরও এগিয়ে গেলে, ডান দিকে সারি সারি দুর্গন্ধভরা খুপরি ঘর। কিছু বিপজ্জনক নারী-পুরুষকে সন্ধ্যার পর লোহার গারদের মধ্যে তালাবদ্ধ করা হয়। এ ছাড়াও বিশাল শেডের লোহার গারদের মধ্যে নারী-পুরুষ-শিশু একত্রে থাকে। দরজা রাত্রে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কয়েকজন খোলা ঘরে থাকে, সেটেলমেন্টের বাইরেও তাদের যেতে দেওয়া হয়। সত্যেন নাহা সবাইকে নিয়ে একটা শেডের মধ্যে প্রবেশ করে। খটখট তাত চলছে; বেশির ভাগ তাঁত পুরুষরাই চালাচ্ছে। সেখান থেকে বেরিয়ে, ওরা লোহার জালে ঘেরা বিরাট ঘেরাওয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। ওরা দেখতে পায়—নারকেল আর পাটের দড়ি পাকানো থেকে, পাটি মাদুর ধামা চুপড়ি সবই বোনা হচ্ছে। তরুণীদের চোখে ঝিলিক, আর ঠোঁটে হাসি লেগেই আছে। কিন্তু সকলের চোখেই যেন খাঁচার পাখির একটা সন্দিগ্ধ অস্থিরতা।

সতু খাঁচার বাইরে বেরিয়ে, একটা গাছের তলায় এগিয়ে গেল। আদ্যিকালের তামাটে রং নগ্নপ্রায় এক বৃদ্ধ সতুকে স্থানীয় বাংলায় জিজ্ঞেস করে, "মোতিরে দ্যাখবা? খোঁজে আইছ?"... বৃদ্ধ ডান হাত তুলে পশ্চিমে দেখালো, 'ওই যে হিজল গাছ আর শ্যাওড়ার জঙ্গল–ওই কানে যাও। মোতির ঘর ওইখানে।" (পৃ.৬৮৬) সতু হিজল আর শ্যাওড়ার কৃষ্ণ সবুজে হারিয়ে গেল। মোতির অশালীন পোশাক-আচরণ-চৌর্যবৃত্তির কিছু প্রমাণ পাবার পর, সতু জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কে?' উত্তরে মোতি জানায় :

'আমি মোতি নট। বাইদ্যা, বাইদ্যা বোঝ? ইংরেজিতে কয় নোমাঙ্কি।' অনাবৃত অধরা কম্পিত বুকে জামা টেনে দিল।
মোতির মুখে ইংরাজি? অবাক সতুর জিজ্ঞাসা, 'তোমরা হিন্দু না মুসলমান?'
'আমরা না-মোছলমান, না-হিন্দু।' রক্তে আগুন ধরানো হাসি মোতির বাঁশির স্বরে বেজে উঠল, 'মা কালী ভজি, পিরেরেও ভজি। রুদ্রাক্ষ পরি, তসবিও পরি। গোরু খাই, শুয়োর খাই। আমারে হিন্দুও খায়, মোছলমানেও খায়। আমি জমিন। জমিন সবাই চায়। সবাই চষে। জমিন লইয়া খুনোখুনি করে।' হাসিতে মোতির আগুনের শিখা শরীর লেলিহান হয়ে কেঁপে উঠল। (পৃ.৬৮৭)

কলকাতার নতুন যুগের প্রতিশ্রুতিমান কবি সত্যেশ চট্টোপাধ্যায় সতুর বুক কেঁপে ওঠে। মোতির কথাগুলো তার বুক বিদীর্ণ করছে, ছিন্নভিন্ন করছে। তার কথায় বাংলার বাউলতত্ত্ব প্রতিধ্বনিত হয়। "আমারে হিন্দুও খায়, মোছলমানেও খায়। আমি জমিন। জমিন সবাই চায়। সবাই চষে। জমিন লইয়া খুনোখুনি করে।"– এ অতলস্পর্শী প্রসারিত সংলাপের মধ্যদিয়ে, সমরেশ বসু মোতিকে স্বদেশ-রূপকের সংকেত দিয়েছেন; তাকে বিনির্মাণ করতে চান, তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এসময় পরস্পরিতভাবে, সতুর সন্নিকর্ষ চিন্তা : স্বাধীন ভারতীয় গান্ধীজী স্বাধীনতার দিন অনশন দিয়ে তা বরণ করছেন, আত্মশুদ্ধির জন্য। কলকাতার মুসলমানদের বাঁচাচ্ছেন। আর স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগের জন্য ভারতের তিনজন তীর্থযাত্রী নতুন বিভক্ত দেশে এসেছে। তাদের একজন এক যাযাবরীর সামনে দাঁড়িয়ে, অজস্রবার কথিত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি শুনছে। ভয় পাচ্ছে। অতঃপর মোতির জিজ্ঞাসা,

'তুমি আমারে ছাইড়া পলাও ক্যান?' মোতির শরীর সতুর শরীর স্পর্শ করল, 'ঘিন্না কর?'

সতু মাথা নাড়ল, 'না। তুমি আমার চোখে পবিত্র।'...প্রায় এক মিনিট পরে পিছন থেকে বাঁ হাত এনে তুলে ধরল, 'দ্যাখ, আমার হাত কাইটা দিছে। পাঁচ বছর যখন আমার বয়স।'

সতু কাটা হাতটি দেখল। আস্তে, সাবধানে, সন্তর্পণে সেই ছিন্ন শেষাংশ স্পর্শ করল। ওখানটা একটু লাল। নরম।

Dhaka University Institutional Repository

'কারা কেটেছে?'

'জানি না। হিন্দু হইতে পারে। মোছলমান হইতে পারে।'...

সতুর স্বর ফিসফিস শোনালো, 'তুমি জমিন।'

'তুমি পলাও ক্যান?' মোতির শরীর সতুর শরীরের আরও ঘন সান্নিধ্যে এল। সতু কোনও জবাব দিতে পারল না। ওর চোখের কোণ এখনও ভেজা। ...

'রাত্রে বাড়ির ভিতরে ঢোকার দরজা খোলা রাইখো।' ডান হাতের মেহেদি মাখানো তর্জনী দিয়ে সতুর বুকে স্পর্শ করল, 'কাছেপিঠে সজাগ থাইকো। তোমার কাছে যামু।' মোতি হিজল আর শ্যাওড়ার কৃষ্ণ-সবুজ জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। (পৃ.৬৮৭-৮৮)

বাংলার হিজল আর শ্যাওড়ার কৃষ্ণ-সবুজ জঙ্গলের আলো-আঁধারে সৃষ্ট এক কুহক-বাস্তবতার স্থান-কাল ছিন্ন পরিস্থিতিতে, সমরেশ বসু সতু আর মোতিকে, ভিন্ন কাঠামোয় প্রতীকী-অভিমুখে রূপকল্পময় করেছেন। পারিপার্শ্বিকতার বিহ্বলতা নির্মাণে ঔপন্যাসিক এখানে অতুলনীয় শিল্পনৈপুণের পরিচয় দিয়েছেন।

সতুর সেটেলমেন্টে হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কে বিজু-গোরার জেরার পর, বিষয়টা রহস্যময় ব্যাপার হিসেবে পরিত্যক্ত হয়। ওয়ার্ডার সত্যেন নাহাও সন্দিগ্ধ চোখে সতুকে দেখছিল। সতু মোতি প্রসঙ্গে কিছুই স্বীকার করেনি। জাব্বরের বাড়ি হরিসূদনের বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। জাব্বর সকলকে অভ্যর্থনা জানায়, টেবিলের পরে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। উপস্থিত ছিলেন বিক্রমপুরের রমেশ ভৌমিক, বাজারের সব থেকে বড়ো কাপড়ের দোকানের মালিক অরিন্দম সাহা এবং দিনাজপুর জেলার মুসলিম লিগের বিশিষ্ট নেতা সৈয়দ মনিরুজ্জমান।

প্রথম পরিচয়ে 'পোকায় কাটা পাকিস্তান' কথাটা বারবার শোনার মধ্যেই জাব্বরের ক্ষোভের উৎস নিহিত ছিল। এ কারণে কলকাতা থেকে বিভক্ত নতুন দেশ দেখতে আসা তরুণদের কাছে নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করলেও পরে অনুতপ্ত হয়ে সন্ধ্যায় নিজ বাড়িতে আসার নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। সেখানে এসে সতু দেশভাগের অনিবার্যতা সম্পর্কে নিজের মনে উত্থাপিত কিছু প্রশ্ন জাব্বরের কাছ থেকে জানতে চেয়ে মূলত মুসলমানদের ভাবনা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করে। জাব্বর জানতে চায় : 'আপনার রাজনৈতিক কোনো আদর্শ বা মতামত আছে?'

এর উত্তরে সতু জানায় : 'আদর্শ আছে কিনা বলতে পারি না। তবে কমিউনিস্ট পার্টির দিকে আমার একটা সমর্থন আছে। সেটাকে দারিদ্র্য মোচনের কারণে বলতে পারেন। নিজেকে একজন খাঁটি কমিউনিস্ট আমি বলতে পারি না। পার্টি সমর্থক সিমপ্যাথাইজার...'(পৃ.৬৯০)

সৈয়দ মনিরুজ্জমানের অভিমত, কমরেড মানবেন্দ্র রায় ছাড়া ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তানের দাবিকে ন্যাশনাল মাইনরিটির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বলে মেনে নিয়েছিল। এ নিয়ে পি.সি. যোশী লিখেছেন ও বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় বিবৃতিও দিয়েছেন। তারপরও দেশবিভাগ ছাড়া কি এটা সম্ভব ছিল না? সতুর এমন প্রশ্নের উত্তরে জাব্বর জানায় : 'পাকিস্তানের দাবি শুধু মাইনরিটি মোছলমানের কমিউনাল দাবি না, সমস্ত ভারতের কালচারাল মাইনরিটির জাতীয় দাবি।'(পৃ.৬৯০) কিন্তু ইতিহাসের ছাত্র বিজুর কাছে এটা 'বিপজ্জনক দাবি' বলে মনে হয়। কারণ বিচিত্র ধর্মের মানুষের আবাসভূমি ভারতে এমন দাবি ভবিষ্যতে শিখসহ আরও অনেক সম্প্রদায়ই করতে পারে যা কোনো শুভ পরিণতি আনবে না। দিনাজপুর জেলার মুসলিম লিগের খ্যাতনামা নেতা সৈয়দ মনিরুজ্জমানের কণ্ঠেও বঞ্চিতের বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। তার বিশ্বাস :

Dhaka University Institutional Repository

...ইংরাজের একটা অপরাধ ছাড়া, কোনো অন্যায় কাজ তারা করে নাই। তারা যদি পাকিস্তান না কইরা দিয়া যাইত, তাহলে আমরা চিরকাল দশ কোটি মানুষ, তিরিশ কোটির গোলাম হইয়া থাকতাম। আপনাদের প্রত্যেকটা বিষয়ে দেখাইয়া দিতে পারি, হিন্দুদের কাছে আমরা ছোট, নীচ, নোকর। আমরা ভারতের মোছলমানরা হিন্দুর থেইক্যা আলাদা জাত। এমুন কি পশ্চিমা মোছলমানদের থেইক্যাও আমরা আলাদা। আপনারা আগুনের মতন দ্বিজাতিতত্ত্বের কথাটা বোধহয় মানতে পারেন নাই। তাতে হিন্দুদের সুবিধা হইতে পারত, আমাদের হইত না। তবে হ, ইংরাজরা কংগ্রেসের সঙ্গে বেশি দোস্তি করছে। আমাদের বাঙালি মোছলমানদের ঠকাইছে। খুলনা পাকিস্তানে আসার জন্য কইলকাতার হিন্দুরা প্রতিবাদ সভা করতেছে। মুসলমান-প্রধান জিলা খুলনার জন্য, এই প্রতিবাদের কারণ কী? আমরা কি মুসলমান-প্রধান মুর্শিদাবাদ ছাইড়া আনন্দে আছি? না কি থাকতে পারি? (পৃ.৬৯০)

তাঁর কণ্ঠে মুসলিম লিগ নেতৃবৃন্দ ও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিভেদনীতি ও কূটকৌশলের যে কর্মপরিকল্পনার বর্ণনা পাওয়া যায় তাতেই উন্মোচিত হয়েছে আসন্ন দুর্দিনের সংকেত :

আমরা মোছলমানরা তো আছি বাংলায় আর পাঞ্জাবে। তবু ভাগাভাগি ছাড়া পুরা কিছু পাইলাম না। কইলকাতা আমাদের হাতছাড়া হইল। অথচ সাহেবরাই আমাদের নাচাইছে। তারপরে পশ্চিমা লিগের নেতারা, কায়েদে আজমও কইলকাতা ছাড়তে রাজি হইলেন। অথচ এই কায়েদে আজম একদিন কইছিলেন, কইলকাতা যদি পূর্ব পাকিস্তানরে না দেওয়া হয়, তা হইলে কোন্ অষ্টরম্ভাটা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু লাহোরের বদলে, আমাদের কইলকাতা জবাই করতে হইল। তবু নাজিমুদ্দিন সাহেব একটা মুড়ির মোয়া আমাদের হাতে দিলেন। শুনলাম, কইলকাতা ছাড়লে, সমস্ত দায় শোধ কইরাও আমরা নগদ তেত্রিশ কোটি টাকা পামু। তেত্রিশ কোটি টাকা দিয়া, আমাদের ঢাকা শহরেরে নাকি নিউইয়র্ক বানান হইব। 'আজাদ' 'মর্নিংনিউজ', 'স্টার অব ইন্ডিয়া' সব কাগজগুলো চুপ মাইরা গেল। আরে, পূর্বপাকিস্তানে ঢাকা ময়মনসিংহ কুমিল্লাতে তো হিন্দু মেজরিটি। সেই জিলাগুলাও তা হইলে হিন্দুস্তানে দিলা না ক্যান? যাউক, ছাড়েন এই কথা। কইলকাতা লাহোর লইয়া মার্কেট ভ্যালু আর বুক ভ্যালুর হিসাবেও যাইতে চাই না। তবে, আপনাদের কইতেছি, এই তেত্রিশ কোটি টাকা একটা ধাপ্পা। খুব শিগগিরই প্রমাণ হইব, আমরা কোনোদিনই তেত্রিশ কোটি পামু না। (পৃ.৬৯০-৯১)

এসব কথা শুনে বিমর্ষ হলেও বিভক্ত দেশমাতৃকার প্রতি নিজের আবেগ প্রকাশ করে সতু সকলের উদ্দেশে বলেছে : 'দেখুন, আমি রাজনীতিক না। আমি গান্ধীজির সমর্থক। দেশ ভাগ হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে তার কোনো সীমারেখা নেই। আমি আজ যেমন স্বাধীনতার আনন্দে এখানে এসেছি, আবার আসব। চিরদিন আসব। আমাকে কি আপনারা তাড়িয়ে দেবেন?' (পৃ.৬৯১) প্রশ্নোত্তরে মুসলিম লিগ নেতা সৈয়দ মনিরুজ্জামান স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে :

প্রয়োজন হইলে, দিমু। ...আপনি যদি রবীন্দ্রনাথের মতন, 'আর্য অনার্য শক হুন'দের লইয়া, 'মহাভারতের সাগরতীরে, ' আমাদের লীন করার কথা কইতে আসতে চান, আপনাকে বিদায় দিমু। আত্মপ্রতিষ্ঠার বাধায় অহিংসা মানি না। কংগ্রেস আর হিন্দুমহাসভার থেইক্যাও রবীন্দ্রনাথ আরো বড় হিন্দু। তাঁরও কোনো বাস্তববোধ ছিল না। গান্ধী দ্বিজাতিত্ব মানেন না। আসবেন, জনাব সত্যেশবাবু, ইউ আর ওয়েলকাম হিয়ার। কিন্তু গান্ধী রবীন্দ্রনাথের ঐ সব ধ্যান-ধারণা রাইখা আসবেন। মনে রাখবেন, আমাদের প্রাণে এখনো বঞ্চনার ঘা রইছে। (পৃ.৬৯১)

সতুর মনে হলো, মনিরুজ্জমানের সাহেবের কথায়, রংপুরের সৈয়দ বদরুদ্দিন ইসলাম ও নট সেটেলমেন্টের ওয়ার্ডার সত্যেন নাহান স্বর যেন শুনতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে দুর্যোধনের জন্মমুহূর্তে, বেদব্যাসের উক্তি "দুর্দিন...দুর্দিন...সামনে বড় দুর্দিন।"(পৃ.৬৯১)

গভীর রাত। হরিসূদনের ছেঁচাবেড়ার দরজা ধরে দাঁড়িয়ে সতু। বিজু গোরা ঘুমোচ্ছে। হরিদা ও বউদি ঘুমোচ্ছে তাদের ঘরে। সতুর দৃষ্টিকোণ থেকে একাধিক ইন্দ্রিয়ের মিশ্রণে, চিত্ররূপময় গীতময় রহস্যস্পন্দিত অপার্থিব পরিবেশ এঁকেছেন সমরেশ বসু। উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও (পৃ.৬৯২), এখানে পরিণামী রসনিষ্পত্তির প্রশ্নে তা অনিবার্য :

Dhaka University Institutional Repository

একটু আগেই, কোথা থেকে রাত্রি বারোটার ঘণ্টার শব্দ ভেসে এসেছে। বাইরে জ্যোৎস্না যেন স্বপ্নের মায়া ছড়িয়ে দিয়েছে। আজ কি পূর্ণিমা? নিবিড় গাছপালাগুলো জ্যোৎস্নায়, আলোয় আলোয় এক অলৌকিক রূপ ধরেছে। বাইরে ঝিঁঝির ডাক। রাত-জাগা পাখি ডাকে না। বাতাস নেই। জ্যোৎস্নাময়ী প্রকৃতি নির্বাক। ...

সতু দেখলো, জ্যোৎস্নার আলোয় এক অলৌকিক দেবীমূর্তি সহসা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আবার পরমুহূর্তেই যেন আরও কাছের জ্যোৎস্নায় ভেসে উঠল। মুহূর্তেই আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তারপরেই সতুর শরীরে গায়ে কাঁটা দেওয়া স্পর্শ। মূর্তি সতুকে জড়িয়ে ধরল। সতু মূর্তিকে নিয়ে উঠোন পেরিয়ে ঘরে ঢুকল।

...সেই অলৌকিক দেবীমূর্তি নিজেকে সম্পূর্ণ অনাবৃত করল, বাঁশির মৃদুস্বর বেজে উঠল, 'আমার হাত কাটা, তাই তোমার ভালো লাগে না?'

'তুমি আমার সত্য, সুন্দর।' সতু মোতির কাটা হাতটা তুলে নিল, 'তুমি জমিন। তোমার ভাগ সকলে চায়।'

'তুমি তো চাও না বন্ধু?' মোতি সতুর পাজামা পরা, খালি গায়ের সঙ্গে নিজেকে লীন করতে চাইল। ...সতু মুখ তুলল, '...এই জমিনে আমার সালাম।' ও মোতির পায়ের কাছে নত হয়ে পড়ল।

মোতি তৎক্ষণাৎ নিঃশব্দে সতুর সামনে বসল। ওর চোখে জল, '...ইচ্ছা করে, তোমার লগে চিরকাল থাকি– দেখি তুমি কে।'...

সতু মোতির কাটা হাতটি আবার ঠোঁটের কাছে টেনে নিল। মোতি উঠে দাঁড়াল। নগ্ন সুবর্ণ দেবীমূর্তি, চিরযৌবনা। বিশ্বের চিরকালের আকাঙ্ক্ষা ওর অপলক দীর্ঘ আয়ত চোখের পিঙ্গল তারা দুটি সতুর দুই চোখে নিবদ্ধ, 'বন্ধু, এই কাটা জমিনে তুমি সালাম কর। একটু ভালবাসবা না?'

সতু মোতির দুই ভুরুর মাঝখানে ঠোঁট ছোঁয়াল, 'তুমি আমার চিরদিনের ভালবাসা। তুমিই সেই মূর্তি। তুমিই সত্যি বলেছ। তোমার জাত নেই, তুমি জমিন। এই কাটা জমিনই আমার ভালবাসা।'

সতু নিজের হাতে মোতিকে ঘাগরা পরিয়ে দিল। জামা পরিয়ে দিল গায়ে। মোতি মাথার চুল থেকে দশ টাকার ভাঁজ করা নোটটা বের করে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপরে সতুকে গাঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটের ওপর আগ্রাসী চুম্বনে, যেন সকল কিছু গ্রহণ ও দান করতে চাইল। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে, দরজার দিকে এগিয়ে গেল,

'বন্ধু, নটের মাইয়া কান্দে না। নিজের বুকে ছুরি মারে। আর কি কোনো দিন এই কাটা জমিনে আসবা?' ও দরজার কাছে দাঁড়ালো।
'আসব, চিরকাল আসব।' সতু মোতির কাছে এগিয়ে গেল, 'এই জমিনেই যেন আমি চিরকাল জন্মাই।'

অলৌকিক সুবর্ণমূর্তি ঘরের বাইরে চলে গেল। সতুও গেল। জ্যোৎস্নায়, ছায়ায়, ভেসে, ডুবে সেই মূর্তি কিছুতেই যেন অদৃশ্য হয় না। সে আলোয় ভেসে, ছায়ায় ডুবে চলতেই থাকে। বিজু আর গোরা সতুর দুপাশে এসে দাঁড়ায়। নির্বাক বিস্ময়ে সতুকে দেখছে। সতু দেখছে দূরে, দূরে—অনেক দূরে।

L̶DZ̶র উপসংহার অংশের বুনট (texure) ও বর্ণন (narrative) সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিভক্ত ভারতের তরুণ প্রজন্মের দৃষ্টিকোণ থেকে শরীরী আকর্ষণের দুর্নিবার উৎস মোতিকে সকলের আকাঙ্ক্ষার বস্তু হিসেবে কামনাময়ী, 'তার চলার ছন্দে একটা নাচের ভঙ্গি, যে-কারণে উদ্ধত বুকেও নাচের ছন্দ। প্রশস্ত সুঠাম নিতম্বে নাচেরই তাল।'—বর্ণিত হলেও শরীরী-চিত্রকে সমরেশ বসু ভেঙে দিয়েছেন, 'অগ্নিশিখার মতো', 'প্রতিমার মতো আকর্ণবিস্তৃত আয়ত চোখ', 'আমি জমিন, ' 'অলৌকিক দেবীমূর্তি', 'জমিনে আমার সালাম', 'তুমি পবিত্র', 'নগ্ন সুবর্ণ দেবীমূর্তি' প্রভৃতি বাক্যাংশ ও উপমান চিত্রের উদ্ভাবনায় ও ব্যবহারে। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে ও দেবীকল্পনায়, সামূহিক নির্জ্ঞানে নগ্নতা নিষ্কাম নান্দনিকতায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংস্কৃতি ভারতীয় ঐতিহ্যে সুলভই বলা চলে।

Dhaka University Institutional Repository

সমরেশ বসু উপন্যাস শেষের বর্ণনা-বুনটে স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যকার ভেদরেখা অবলুপ্ত করেছেন। সমগ্র আবহটা এমনি এক রহস্যময়তায়, কুহকে ভরা যে, জ্যোৎস্নাময় রাত্রি, মোতি-সতু এবং আলো-আঁধারের পরস্পর সঞ্চরণশীলতাকে মনে হয় বুঝি-বা স্বপ্নই, সম্মোহনই, অন্যদিকে তারা আবার বাস্তবই, বাস্তবেরই ভিন্ন রূপ।

মণিবন্ধ থেকে হাত-কাটা মোতি, যাকে হিন্দু-মুসলমান সকলেই চাষ করতে চায়, যে জমিন– পাঁচ বছর বয়সে তার হাত কেটেছে মিথ্যে ক্রোধে, তারা হিন্দু না মুসলমান তাও সে জানে না। খণ্ডিতা দেশের প্রতীকে কর্তিত বাংলা, তার লাঞ্ছনাকে বয়ে বেড়াবে কত কাল? তাদের দৃষ্টি 'দূরে, দূরে—অনেক দূরে' বর্ণনায় প্রতীকটি সম্প্রসারিত হয়েছে প্রতীক্ষিত আর এক বিনির্মিত প্রতীকে। ভারতের রাজনৈতিক বিপর্যয়-দুর্যোগ, আত্মত্যাগ ও ষড়যন্ত্রতত্ত্ব, বিভক্ত ভারত তথা ছিন্ন বাংলার বেদনা-বিষণ্ণতা ও ভবিষ্যৎ স্বপ্ন, LwÐZvর অন্তিমে এসে যেন অনুচ্চারিত পার্থিব আকাঙ্ক্ষার প্রতীকী দ্যোতনায় অনুরণিত হয়।

তথ্যনির্দেশ

১ hM hM Rx‡q উপন্যাস ১৯৭৩ সালের ১৪ই জুলাই থেকে ১৯৭৬ সালের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড থেকে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৯৮১ সালে। প্রথম স্ত্রী প্রয়াত গৌরী বসুর উদ্দেশে উপন্যাসটি উৎসর্গিত। আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড : কলকাতা প্রকাশিত, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত mg‡ik em iPbvejx ৬ খণ্ডে hM hM Rx‡q (জানুয়ারি ২০০২ সালে) সন্নিবেশিত হয়।

২ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মন : মৃত্তিকা : মানুষ', সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত mg‡ik em iPbvejx 6, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড : কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৬

৩ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মন : মৃত্তিকা : মানুষ', প্রাগুক্ত।

৪ Joseph Blotner, *The Political Novel*, Doubleday Inc. : New York, 1955, p. 1-12

৫ Irving Howe, *Politics and the Novel*, Horizon Press : NewYork, 1957, p. 17

৬ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মন : মৃত্তিকা : মানুষ', প্রাগুক্ত।

৭ অমলেশ ত্রিপাঠী, ¯vaxbZv msMv‡g fvi‡Zi RvZxq Ks‡Mm (1885-1947), আনন্দ : কলকাতা, দশম মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪২০, পৃ.৩১২-১৩

৮ "পার্টির কাগজ জনযুদ্ধ পড়েছেন কখনো? এই নিন, আমি দিচ্ছি। পড়ে দেখবেন। ...আর আপনার যদি কিছু জানবার ইচ্ছে হয়, আমাকে বলবেন। বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করব। ..."শুনেছি সর্বক্ষণের পার্টিকর্মী হবে। অবিশ্যি আতপুরের জমিদার বাড়ির ছেলেদের পড়ায়। সেখানেই থাকে। ..." সমরেশ বসু, "প্রসঙ্গ ভারতীয় কমিউনিস্ট (অখণ্ড) পার্টি ও আমি, " 'দেশ', ২২ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ.৬৬

৯ নিতাই বসু, Kvj KU mg‡ik, জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৩৯৪, পৃ.১০৯

১০ "আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নিয়ন্তা কমিনটার্ন (তৃতীয় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল, প্রতিষ্ঠা ১৯১৯ খৃ.) মূল নীতি নির্ণয় করে দিত। পরাধীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নীতি কমিনটার্নের নির্দেশে বারবার বদলেছে। বাইরের নির্দেশ মেনে চলতে গিয়ে ভারতের কমিউনিস্টদের মুশকিল হয়েছে বরাবর। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে পার্টির বিকাশ ব্যাহত হয়েছে।" সত্যজিৎ চৌধুরী, mg‡ik em Avgv‡'i ev¯Íe, একুশ শতক : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ.৯০

Dhaka University Institutional Repository

১১ KvjKU mg‡ik, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭

১২ "...ওঁদের এক বন্ধুর বোন স্কুলে যাবার পথে একটা বদমাইশ ছেলের দ্বারা টিজ্‌ড্‌ হয়েছিল। ঘটনাটি সমরেশের কানে যেতেই সমরেশ এবং সেই মেয়েটির ভাই সংশ্লিষ্ট মস্তান ছেলেটিকে ওভারব্রীজের তলায় একটা চাবুক দিয়ে যে-সাজা দিয়েছিলেন, সেই দৃশ্য সরোজ দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন, ..." KvjKU mg‡ik, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭

১৩ সমরেশ বসু, "প্রসঙ্গ ভারতীয় কমিউনিস্ট (অখণ্ড) পার্টি ও আমি, " 'দেশ', ২২ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ.৭০

১৪ সমরেশ বসুর যাপিতজীবনের অনেক অভিজ্ঞতাই– মার্কিং বয়ের চাকরি, মেম সাহেবদের প্রতিকৃতি আঁকা, তাদের শূন্যতা, ট্রেড ইউনিয়নের ফ্রন্টে কাজ করা ইত্যাদি hM hM Rx‡q উপন্যাসে ত্রিদিবেশের জীবন-উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্রষ্টব্য : ড. নিতাই বসু (অনুলেখক), mg‡ik emi GKvšÍ mvÿvrKvi, মৌসুমী প্রকাশনী : কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ.৮, ১১

১৫ KvjKU mg‡ik, প্রাগুক্ত, পৃ.৫০

১৬ KvjKU mg‡ik, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৩

১৭ একান্ত সাক্ষাৎকারে সমরেশ জানিয়েছিলেন :"সুন্দরী বিদুষী এবং বয়সের বিচারে এগিয়ে-থাকা মধুদির সঙ্গে সমরেশের দৈহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার চমকপ্রদ প্রসঙ্গের বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম সমরেশের কাছে। উনি অকপটে বলতে থাকলেন, মধুদির ব্যাপারটা আমার নিজের কাছেও খুব বিস্ময়। মধুদিকে আমি ভীষণ সম্মানের চোখেই দেখতাম। অবশ্য আমি তাঁর থেকে বয়সে ছোট হলেও তাঁর রূপের প্রতি আমার একটি আকর্ষণ জন্মায়। ... তাঁর সঙ্গে আমার জীবনে যে ঘটনা ঘটেছে, সেটা অভাবনীয়। ...এটা কি শুধুই যৌনতা, না, অন্য কিছু? এর কোনো ব্যাখ্যা আজও পাইনি।" mg‡ik emi GKvšÍ mvÿvrKvi, প্রাগুক্ত, পৃ.৯১

১৮ KvjKU mg‡ik, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯-৫০

১৯ "সমরেশের সঙ্গে ক্রমশ পার্টির মধ্যে একটা বিরোধ দানা বেঁধে উঠতে লাগল, ক্রমাগত সংঘাত তৈরি হতে লাগল। ...তখন সমরেশ পার্টির মধ্যে অকপটে অভিজ্ঞতালব্ধ অভিমত ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন সন্ত্রাসের পথ নেওয়া সঠিক হয় নি। ...সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ওঁর স্ত্রী গৌরী বসুও তখন পার্টির মধ্যে ওঁর বিরুদ্ধে চলে গেলেন। গৌরী মনে করলেন, সমরেশ ভয় পেয়েছেন। ভয় পেয়ে উনি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছেন। গৌরী মনে করতেন সন্ত্রাসের পথটাই সঠিক রাস্তা।" KvjKU mg‡ik, প্রাগুক্ত, পৃ.৭১

২০ ঝুমা রায়চৌধুরী, K_vmww‡n‡Z¨ mg‡ik em : mvgwMK gj¨vqb (প্রথম খণ্ড), পূর্বাশা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ.৪২৩

২১ সমরেশ বসু, "নিজেকে জানার জন্যে", 'দেশ', সমরেশ বসু স্মরণে, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড : কলকাতা, ১৪ মে ১৯৮৮, পৃ.২৬-২৭

২২ সমরেশ বসুর পঞ্চম অধ্যায়ের 'অন্ত্য পর্যায়ে'র †kKj †Qov nv‡Zi †Lv‡R এবং LwÐZvর অন্তিম পর্যায়ের পরিচর্যারীতি লক্ষণীয়।

২৩ KvjKU mg‡ik, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৪

২৪ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মন : মৃত্তিকা : মানুষ', প্রাগুক্ত।

২৫ সমরেশ বসু, †kKj †Qov nv‡Zi †Lv‡R, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড: কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, পঞ্চম মুদ্রণ জুন ২০১১

২৬ সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত, পৌরাণিক অভিধান, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা : সপ্তম মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪০৬, পৃ.৪১৪

২৭ P M John, *Marx on Alienation,* Minerva Associates Pvt. Ltd., India : First Published, September 1976, p. 164-173

২৮ "সমরেশ বসুর রাজনৈতিক উপন্যাস", অনিল আচার্য, 'অপরাজিত' ৮বর্ষ ১-৩ সংখ্যা, জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, কলকাতা, পৃ.৮৯-৯০

Dhaka University Institutional Repository

২৯ অচিন্ত্য বিশ্বাস, "দেবাসুরের মন্থন : বিষণ্ন-নিষ্ক্রান্ত এক নায়কের কথা," স্বপন দাসাধিকারী সম্পাদিত mg‡ik em : gvb‡li K_vKvi, "এবং জলার্ক", কলকাতা : প্রথম প্রকাশ ১১ ডিসেম্বর ২০০০, পৃ.৩১১

৩০ প্রদীপ বসু, bKkvjevoxi ceÿY, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা : পুনর্মুদ্রণ জুন, ২০১২, পৃ.২৬২-৬৩

৩১ গ্রন্থাকারে LwÐZvর প্রথম প্রকাশ : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা থেকে ১৯৮৭। LwÐZv সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা থেকে ২০০৯ সনে mg‡ik iPbvejx ১৩ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩২ অশোক সরকার, "খণ্ডিতা", স্বপন দাসাধিকারী (সম্পাদিত), mg‡ik em : gvb‡li K_vKvi, এবং 'জলার্ক': পরিবেশক পুস্তক বিপণি, ১১ই ডিসেম্বর ২০০০, পৃ.২২৩

৩৩ সমরেশ বসু, "কেন গান্ধী", 'দেশ', সমরেশ বসু স্মরণে, ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ পৃ.৩৫

৩৪ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, "জীবন ও শিল্পের যুগলবন্দী", 'দেশ', সমরেশ বসু স্মরণে, ১৪ মে ১৯৮৮, পৃ.৪০

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

সৃষ্টিশীল প্রতিভা নিরবলম্ব বা স্বয়ম্ভূ নয়—ঐতিহ্য, পরিবারবৃত্ত এবং উত্তরাধিকার ও সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক পরিস্থিতির মৃত্তিকা-গভীরে শেকড় সঞ্চার করেই তার উৎসারণ। কোনো শিল্পী-ব্যক্তিত্ব, এসব কারণেই, অন্তর্গহনে কখনো হয়ে ওঠে বিপন্ন, বিচূর্ণ, অস্থির; কিংবা বসবাস করে ধূসর আদর্শে অথবা সুস্থির থাকে অবিচলিত উজ্জ্বল জীবনবোধে। উপনিবেশিত ভারতের রাজনীতিক-আর্থনীতিক পরিপ্রেক্ষিতে, প্রতিবাদ-প্রতিরোধে দীপ্র, কিংবা বিভ্রান্ত-বিচ্ছিন্ন ও ক্লিষ্ট মানব-অস্তিত্বই সমরেশ বসুর উপন্যাসের বিষয়বস্তু। অথচ সমগ্র সময় ও আত্ম-সন্ধানী মানব সৃষ্টিতেই তাঁর শিল্পসিদ্ধি।

সমরেশ বসুর মতো একজন সংবেদনশীল জীবনপরিস্রুত সৃষ্টিশীল প্রতিভার পক্ষে পারিবারিক উত্তরাধিকার, জাতীয় ঐতিহ্য, সমকাল, সমাজ ও রাজনীতি থেকে কোনোভাবেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখা সম্ভব হয়নি। উপন্যাস সৃষ্টিতে সমরেশ বসুর উত্তরাধিকার তথা—মায়ের বলা সম্মোহক ব্রতকথা-কথকতা, চিত্রকর বাবা ও পরিবারজনের সংগীতসাধনা ও চিত্রাঙ্কনচর্চা; সমকালীন জীবনে তার শিকড়ায়ন এবং ব্যক্তিগত জীবনযাপন-স্তর ও স্তরান্তর, নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনে সৃষ্টিশীল ভূমিকা পালন করেছে। কেন না, এ সবের রসায়নে, পরিশীলনে ও চর্চায় গড়ে উঠেছে সমরেশ বসুর শিল্পিতস্বভাব—কথাশিল্পীর জীবনসংক্রান্ত দর্শন, মানবীয় পরিস্থিতিবীক্ষণ এবং বর্ণন-উদ্ভাবন কৌশল ও শব্দ-দ্যোতনা সৃজন। তাঁর চিত্রশিল্প চর্চা ও সংগীতানুরাগ ন্যারেটিভকে রূপান্তর করেছে চিত্ররূময়তায়, চিত্ররূপকে গোত্রান্তরিত করেছে রূপক-প্রতীকী তাৎপর্যে। উপন্যাসে পরিবেশের নানা মুড অঙ্কনে বর্ণ-গভীরতার তারতম্যের মাধ্যমে বৈচিত্র্যসাধন ও চরিত্রের প্রতিকৃতি অঙ্কনে সমরেশের আগ্রহ, নিহিত ছিল বাল্যকালের দেখার চোখের গভীরে। সমরেশের মধ্যশ্রেণির ও প্রান্তজনের বিচিত্র জীবনের মিথস্ক্রিয়া-সূত্রেই তাঁর উপন্যাসে কথা বলে বহু স্বর।

সমরেশ বসুকে সময়ের দাবি মেনে, প্রতিক্রিয়া অথবা প্রগতির যে-কোনো একটি পন্থা নির্বাচন করতে হয়েছিল। সমরেশ বসু কৈশোর থেকেই খুঁজে নিয়েছিলেন সমসাময়িক প্রগতির দ্বন্দ্বজটিল রাজনৈতিক চলার পথ এবং সে পথেই ছিল তাঁর যাপিতজীবন, মননচর্চা ও শিল্পসাধনা। অভাবপীড়িত বস্তিবাসী সমরেশ মুরগি, ডিম, আনাজের সাপ্লাইবাবু থেকে, মার্কস্-পন্থায় বিশ্বাসী কারখানা-শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নের সংগঠক হয়ে ওঠেন। এ সময় পার্টি অন্তর্বিরোধে ক্লিষ্ট হওয়ায়, বিপন্ন সমরেশ খুঁজতে চেয়েছেন মানবমুক্তির নির্ভুল পথ।

কংগ্রেসের ভাঙাগড়ার উত্তাল বলয়েও সমরেশ বসু ছিলেন ক্ষুব্ধ, প্রশ্নবিদ্ধ। কংগ্রেসি রাজনীতির ত্রিদলীয় কর্মযজ্ঞ ও অন্তর্সংঘাত; মার্কস্পন্থী তথা কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন, দ্বিধা, সংকট, ধস ও নানামুখী পতন; এবং এরই অনিবার্যতায় উদ্ভব ঘটে নকশালবাড়ি আন্দোলনের। ফলে রাজনৈতিক প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণাবর্তে ভেঙে-পড়ল সংস্কৃতি, ব্যক্তি-অস্তিত্ব, মানবতাবাদ—'শ্রেণিশত্রু খতম' থেকে জন্ম নিল মাও জে দঙ-পন্থী চৈনিক বিপ্লবীদের লোকবিচ্ছিন্নতা। সমরেশ বসুর কাছে শেষ সত্য হিসেবে প্রতিভাত হল মানুষ, মনুষ্যত্ব, মানবসম্প্রীতি ও মানববাদ। এসবই সমরেশ বসুর উপন্যাসের অন্তর্বাস্তব ও বহির্বাস্তবের উপকরণ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সংকট, কংগ্রেস-বিভক্তি, মার্কসবাদী দলের অন্তর্কলহ ও বিভাজন, নকশাল আন্দোলন, কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন প্রভৃতি ঘটনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সমরেশ বসু মানবীয় অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষ করেছেন, নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করেছেন; এবং তা প্রসারিত করেছেন তাঁর উপন্যাসে। মানব-অস্তিত্বের সঙ্গে বিশ্বসভ্যতার অন্তর্বন্ধনের ও ক্রমবিকাশের সারকথা অবহিত হওয়া, একবিংশ শতাব্দীর করপোরেট পুঁজি-চালিত বিশ্বে অধিকতর জরুরি। সময়ের প্রতাপে ও বিপ্রতীপে, সংঘর্ষ-সমন্বয়ের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যদিয়ে ব্যক্তি ও জনসমাজ-অস্তিত্ব কীভাবে ইতিহাসের গভীরে শিকড় সঞ্চার করে জীবনের সদর্থ খোঁজে, বারংবার খোঁজে—তার দীক্ষা ও শিক্ষা মেলে সমরেশ বসুর উপন্যাসে। স্বীকার করতেই হবে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভালো-মন্দয় মিলিয়ে তিনি ছিলেন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহের প্রতীক পুরুষ। এ জন্যেই সমরেশ বসু বাঙালি সাহিত্যিক সমাজে বোধ করি সর্বাধিক নন্দিত এবং নিন্দিত।

সমরেশ বসু তাঁর প্রারম্ভ bqbc‡ii gwU উপন্যাসে রাজনৈতিক জনজীবন চিত্রায়ণের জন্য কোনো তত্ত্ব দ্বারা চালিত হননি, বরং এক্ষেত্রে বহির্বাস্তবতার জটিলতা ও অন্তঃসংঘাত রূপায়ণের পাশাপাশি মানবচরিত্রের মনোময় অন্তর্জীবনকেও অন্তরঙ্গভাবে দেখেছেন। মহিমের দীক্ষাগুরু মৃৎশিল্পী অর্জুন পাল, ভরত-মহিমের বাবা দশরথ মোড়ল, 'উদাসী ধার্মিক বাউল' থেকে কৃষকে রূপান্তরিত গোবিন্দ, বনলতা, তার বাবা নসিরাম, প্রণয়প্রার্থী নরহরি, প্রৌঢ়া সেবাদাসী হরিমতী, সর্বশেষ সেবাদাসী সরযূ, বনলতার বোন রাধা, কুঁজো কানাই, তার প্রার্থিত নারী কালু মালার সুন্দরী মেয়ে, জমিদারের পুত্রবধূ উমা প্রতিটি চরিত্র উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে অনিবার্য সংবেদে, জীবনবীক্ষণের স্বাতন্ত্র্যে।

সমরেশ বসু ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ট্র্যাজেডির নায়ক লখাই-হীরালালের মধ্য দিয়ে অতীত-বর্তমানতার সংমিশ্রণে যে প্রতিবাদের আখ্যান রচনা করেছেন তাতেই DËi½ উপন্যাস রাজনৈতিক উপন্যাসের যথার্থ পরিসরে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাঁর উপন্যাসের কুশীলবরা যেহেতু অধিকাংশই নিম্নবর্গের মানুষ সেহেতু তাদের অর্থনৈতিক তথা সামাজিক সর্বনাশের থিমটিই বড় হয়ে উঠেছে। সিপাহি বিদ্রোহের এক যোদ্ধার এই পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত বিদ্রোহের সাক্ষী হওয়া এবং আত্মসমর্পণের যন্ত্রণায় দগ্ধ-হওয়া ঐতিহাসিক মানব-চিত্র 'উত্তরঙ্গে'র বিষয়। শুধু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় নয়, সুগভীর জীবনবীক্ষায় সমীকৃত হয়েছে DËi½ উপন্যাসের আর্থ-রাজনীতিক-সামাজিক বাস্তবতা। ঔপন্যাসিকের কেন্দ্রীয় মনোযোগ লখাইয়ের প্রতি থাকলেও এসেছে লখাই-কাঞ্চন-নারান, লখাই-কাঞ্চন-সারদা, নারান-কাতু-মদন, গণি মিঞা-লতিফা-শরাফত, তারা-পবন, শ্রীনাথ কাঠুরে-তার দুই স্ত্রী, আকালী-ক্ষেমী-নগিন, লখাই-মনোহর বেদে সহ বিচিত্র উপকাহিনি এবং ভাঙা-চোরা যন্ত্রদাসদের জীবনের কথকতা। এসেছে চটকল সাহেব হিসেবে পরিচিত কোম্পানির কর্মচারীদের মজুর শাসনের পাশবিক, ঘৃণ্য আচরণের কথা। তবে সব কিছুকে অতিক্রম করে লখাই-হীরালালের প্রতিবাদী সত্তাই অধিকতর তাৎপর্য পেয়েছে যা পরবর্তীতে বৃহত্তর প্রতিরোধ, দ্রোহ ও বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়েছে, এবং হচ্ছে; ইতিহাস তার সাক্ষী।

আতপুরের আবদুল মিস্তিরির বস্তি-বাসের অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করে আতপুর-জগদ্দলের শ্রমিক অঞ্চলের প্রাত্যহিক বাস্তবতাকে সমরেশ বসু শিল্পরূপ দিয়েছেন we wU †iv‡Wi av‡i উপন্যাসে। DËi½ উপন্যাসে পাটকল প্রতিষ্ঠার যে বৃত্তান্ত পাওয়া যায় we wU †iv‡Wi av‡i উপন্যাসে সে শিল্পাঞ্চলের পরবর্তী জীবনবাস্তবতা নির্মিত হয়েছে। মুখ থুবড়ে-পড়া বস্তি-গুহাবাসী প্রাণীর মতো টিকে-থাকা ক্লিষ্ট জন্তুগুলোর কদর্য ও সুন্দর দ্বৈরথ ভাবনা, ভালোবাসা ও ঘৃণা, স্বপ্ন ও প্রতিবাদের মিথস্ক্রিয়ায়, ঔপন্যাসিক তাদের মানবীয় মর্যাদায় উত্তীর্ণ করেছেন। দশ বছর আগের কারখানার শ্রমিক গোবিন্দ, গণেশ-দুলারী, কালো-ফুলকির মনোময় জীবনের মাঝে ঔপন্যাসিক অপরাজেয় মানব-অস্তিত্বকেই সন্ধান করেছেন। গোবিন্দের

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভীক প্রাণ ও বিদ্রোহী সত্তা প্রতিপক্ষের আঘাতে মৃত্যুর মাঝে পরাভূত হলেও সর্বকালীন বঞ্চিত মানুষের উত্তরাধিকার হিসেবে তার রেখে যাওয়া দ্রোহচেতনার মাঝেই we wU †iv‡Wi av‡i উপন্যাসের বিশেষত্ব। উপন্যাসের কাহিনি বিশেষ স্থানিক পটে বিবৃত হলেও ঔপন্যাসিকের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যে তা নির্বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছে।

নৈহাটির 'শ্রীমতী কাফে' নামক রেস্তোরাঁ ও তার মালিক শ্রীভজনানন্দ হালদারকে কেন্দ্র করে, সর্বভারতীয় রাজনীতির ১৯২০-৪৮ সময়-পরিসরকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, বিপ্লববাদীদের অন্তর্কলহ, শ্রমিক শ্রেণির উত্তেজিত দিক্‌চিহ্নহীন প্রতিবাদ, বিচিত্র পেশার মানুষের প্রবল জিজ্ঞাসা ও হতাশা-বঞ্চনাকে প্রান্তিক মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে সমরেশ বসু শিল্পরূপ দিয়েছেন kxgZx Kv‡d উপন্যাসে।

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের উত্থান-পতন, পক্ষাঘাতগ্রস্ত বিশৃঙ্খল আকস্মিক সিদ্ধান্ত ও তা থেকে বহির্গমন—সারা ভারত বিস্ময়, ভীতি ও হতাশা নিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। পার্টিতন্ত্রের কর্তৃত্ব ও আধিপত্যবাদী বৈকল্য ধস নামিয়েছে স্বরাজস্বপ্নে। উনিশশো বাইশের আত্মত্যাগী স্বরাজমুক্তির রাজনীতিকরা হারিয়ে গেল বিসুভিয়সের উদ্‌গিরণের ভস্মতলে। প্রিয়নাথ আত্মগোপনে, নারায়ণ গ্রেফতার হয়ে কারাগারে; কানু, বাঙালি, মনোহর, ভাগন শ্রমিকরা জেলে। কৃপাল-শঙ্কর ঘোষ-হীরেন কলকাতাতেই থাকে; নবীন গাঙ্গুলি কংগ্রেসের এমএলএ। তিনি একদিন মোটর থেকে নেমে kxgZx Kv‡dতে এক কাপ চা খেয়ে ম্যানেজার যতীশবাবুকে বলেছিলেন,"চায়ের স্বাদটাও দেখি লাল হয়ে গিয়েছে। আপনি বুঝি প্রিয়নাথের দলের লোক।" পার্টিতন্ত্র, অন্তর্কলহ, অসহ্য মতান্তর—এমনি ভীতিকর ফাটল ধরিয়েছিল উপনিবেশিত ও উত্তর-উপনিবেশিত ভারত তথা বাংলার রাজনীতিতে।

ষাটের দশকের নকশাল আন্দোলনের স্বপ্ন-মুগ্ধ বিপুল বেকার যুবক, শেষার্ধের ছাত্রসমাজের বিপ্লবী রক্ত-পটভূমির বিরুদ্ধ স্রোতে দাঁড়িয়ে সমরেশ বসু রচনা করেন রাইফেল নয়, gvbl kw³i Drm। ওই সময়-পরিসরের রাজনীতিক সশস্ত্র সম্মোহিত শ্লোগানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া ছিল বিপজ্জনক। কেবল নিষ্ক্রিয় দেখার বিষয় নয় জীবন—মানবপ্রবাহে রাজনীতিক বাস্তবতা নতুন রূপে সত্য হয়ে ওঠে অভিজ্ঞতার সাহসী উচ্চারণে। মানুষই ইতিহাসের রচয়িতা, সভ্যতার মহানায়ক। কাজেই সেই মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে, তাদের সংগ্রামী ঐক্যের পরিবর্তে রাইফেল কখনো শক্তির উৎস হতে পারে না। এ বিশ্বাস সমরেশ বসু তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার আলোকে অর্জন করেছিলেন। কাজেই কমিউনিস্ট পার্টিতে সক্রিয় সদস্য থাকা অবস্থায় পার্টির যে নীতিহীন আই.পি.এস—'ইনার পার্টি স্ট্রাগল', অভ্যন্তর যান্ত্রিক শৃঙ্খলা, গণতন্ত্র-চর্চার অভাব তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তাই প্রকাশ করেছেন সজলের ভাবনার মধ্য দিয়ে।

gnvKv‡ji i‡_i †Nvov উপন্যাসের অন্তর্বয়নে ঔপন্যাসিক নকশাল আন্দোলনের 'বিশ্বস্ত যোদ্ধা' কারাবন্দি রুহিতন কুরমির জীবন-পরিক্রমায় বিপ্লব-মুক্তির স্বপ্ন-জীবন-পরিবার ও প্রকৃতির এক অসাধারণ সমন্বয় ঘটিয়েছেন। জেল থেকে জেলান্তরে গাড়িতে নেওয়ার পথে, রুহিতন কুরমির উল্লম্ফনধর্মী স্মৃতি ও সামূহিক নির্জ্ঞানস্রোত এবং আনুভূমিক বিচিত্র কোলাজে সৃষ্টি হয়েছে এ উপন্যাসের কাহিনি ও প্রকরণ। gnvKv‡ji i‡_i †Nvovর ঘটনা ভঙ্গুর, চরিত্র-চিত্ত দ্বিধাজীর্ণ ও ভগ্নপ্রত্যাশায় সক্রিয়। পুলিশ-নির্যাতিত, কুষ্ঠপীড়িত বন্দি রুহিতন কুরমির স্মৃতিজালে আটকে-পড়া শব্দ-বাক্য-পরিচ্ছেদের ভাবনাস্রোতে রূপ লাভ করেছে নকশাল আন্দোলনের নির্মম ব্যর্থতার কারণ ও তার বিশ্লেষণ। ছেঁড়া-খোড়া, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন স্মৃতিস্রোত হাতড়ে পাঠককে গড়ে নিতে হয় কাহিনি-পারম্পর্য।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক ও পারিবারিক উভয় জীবনে আপসহীন চরিত্র রুহিতন সম্পর্কে সমালোচকের এ কথাই যথার্থ মনে হয়—রুহিতনের মতো ব্যক্তি নকশাল আন্দোলনের প্রত্নপ্রতিম। 'সে রাজনীতির প্রতি সমর্পিত প্রাণ।—রাজনীতির ব্যর্থতা রুহিতনেরও জীবনের ব্যর্থতা। আবার পক্ষান্তরে রুহিতনের ব্যর্থতা কেবল তার একার নয়, রাজনীতি এবং সময়ের ব্যর্থতা।' সে একটি অগ্নিবলয়ের বিকীর্ণ ইতিহাস।

ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু আত্মজৈবনিক hM hM Rx‡q উপন্যাসের মূল চরিত্র ত্রিদিবেশের ব্যক্তিজীবন ও কমিউনিস্ট পার্টি কর্মী হিসেবে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক জীবনাভিজ্ঞতায় ভারতবর্ষের ঘটনাবহুল চল্লিশের দশক সুবিশাল ক্যানভাসে ধারণ করেছেন। সময় ও রাজনীতির সমান্তরালে ত্রিদিবেশ-শিউলীর জীবনের বহির্বাস্তবতা ও অন্তর্বাস্তবতার মিথস্ক্রিয়া, এ উপন্যাসে সমরেশ বসুর অন্যতম শিল্পকৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ত্রিদিবেশের দেখা রাজনৈতিক জীবনের পটভূমির একদিকে রয়েছে সবিতাব্রত পণ্ডিত-ইন্দ্রনাথ-মোহন-অজয় যারা কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী। মোহনের দাদা রমণ, তার বাবা, সবিতা পণ্ডিতের মেশোমশাই ব্যারিস্টার নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, দয়াল মিশির, বৈজু প্রসাদ, ছোটন, শীতল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত। রয়েছে মধুমতী রায়, হিমাংশু ডাক্তার, সালমা, তুরাপ মিয়াঁ, অনিল ব্যানার্জি ও চন্দ্রনাথের মতো দলীয় ও দলনিরপেক্ষ উদারনৈতিক চরিত্র যাদের কাছে ভ্রান্ত পার্টিনীতির বদলে মানবতাই মুখ্য বলে বিবেচিত হয়।

কমিউনিস্টপন্থী নেতৃত্বের ক্ষমতাকেন্দ্র দখলের রাজনৈতিক চারিত্র ও সাধারণ মানুষের প্রতিবাদী সত্তাকে ব্যবহার করে কীভাবে দলীয় স্বার্থসিদ্ধির কৌশল গৃহীত ও কার্যকর হয়, সমরেশ বসু তার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন †kKj †Qov nv‡Zi †Lv‡R উপন্যাসে। 'দুই পয়সার লড়াই', 'হাতের শৃংখল মোচন ছাড়া হারাবার কিছু নেই', 'নিঃস্ব প্রহরের দিনগুলো', 'যাদের লড়াই তারাই নেতা', 'শিকল পরার ছল ?' 'কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি', 'পার্টি আর দিল্লির গোলঘর, চুষে খাবার যন্ত্র' ও 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে'–আটটি পৃথক পর্বে বিন্যস্ত এ উপন্যাসে—নাওয়াল আগারিয়ার ক্ষমতা-কেন্দ্রে পৌঁছে যাওয়ার ক্রম-উত্থিত ইতিহাস ও বিলুপ্তপ্রায় সত্তানুসন্ধানের সাহসী শিল্পরূপ নির্মাণে অগ্রসর হয়েছেন ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু।

†kKj †Qov nv‡Zi †Lv‡Rর শেষাংশ গীতময় বর্ণনা—জোলো বাতাস, নতুন আকাশ, জোনাকির অন্ধকারভেদী আঁকা ছবি, বহতা গঙ্গার নতুন স্রোত—সব মিলিয়ে এমনভাবে অন্ধকারছিন্ন আলোকবলয় সৃষ্টি করেছে, যার স্পর্শে পাঠক সীমাহীন এক আবেগে-বোধে, দর্শনে পৌঁছে যায়। সমরেশ বসুর সংকেতময় সংবেদ ও বোধের সঞ্চার-দক্ষতা অতুলনীয়।

১৯৪৭ সালের চৌদ্দই আগস্ট বিকেল থেকে বিশ আগস্ট রাত বারোটা পর্যন্ত পরিসরে, LwbZvয় বিন্যস্ত হয়েছে দেশবিভাগ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিয়ে বিভিন্ন চরিত্রের মত-অমত, অভিমত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ। সীমানা কমিশনের বণ্টনব্যবস্থা নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, হিন্দু-মুসলমানের জীবনে ঘনিয়ে আসা অস্তিত্ব সংকটজনিত দুশ্চিন্তা ও বিপন্নতা, সাম্প্রদায়িক রক্তাপ্লুত-সংঘাত, স্থান পেয়েছে LwbZvয়। সতু-বিজু-গোরার অভিজ্ঞতা বলয়ের চরিত্রসমূহের আলোচনাসূত্রেই সমরেশ বসু জাতীয় জীবনের একটি জটিল ও দুর্যোগপূর্ণ সময়কে রূপায়ণ করতে চেয়েছেন। সমগ্র উপন্যাসে রাজনৈতিক বিতর্ক, আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক ও ঐতিহাসিক ডিসকোর্সের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে আখ্যান-অংশ।

LwÐZvর উপসংহার অংশের বুনট (texure) ও বর্ণন (narrative) সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিভক্ত ভারতের তরুণ প্রজন্মের দৃষ্টিকোণ থেকে শরীরী আকর্ষণের দুর্নিবার উৎস মোতিকে সকলের আকাঙ্ক্ষার বস্তু হিসেবে কামনাময়ী, 'তার চলার ছন্দে একটা নাচের ভঙ্গি, যে-কারণে উদ্ধত বুকেও নাচের ছন্দ। প্রশস্ত সুঠাম নিতম্বে নাচেরই তাল'—হিসেবে বর্ণিত হলেও শরীরী-চিত্রকে সমরেশ বসু ভেঙে দিয়েছেন, 'অগ্নিশিখার মতো','প্রতিমার মতো আকর্ণবিস্তৃত আয়ত চোখ', 'আমি জমিন,' 'অলৌকিক দেবীমূর্তি', 'জমিনে আমার সালাম', 'তুমি পবিত্র', 'নগ্ন সুবর্ণ দেবীমূর্তি' প্রভৃতি বাক্যাংশ ও উপমান চিত্রের উদ্ভাবনায় ও ব্যবহারে। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে ও দেবীকল্পনায়, সামূহিক নির্জ্ঞানে নগ্নতা নিষ্কাম নান্দনিকতায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংস্কৃতি ভারতীয় ঐতিহ্যে সুলভই বলা চলে।

সমরেশ বসু উপন্যাস শেষের বর্ণনা-বুনটে স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যকার ভেদরেখা অবলুপ্ত করেছেন। সমগ্র আবহটা এমনি এক রহস্যময়তায়, কুহকে ভরা যে, জ্যোৎস্নাময় রাত্রি, মোতি-সতু এবং আলো-আঁধারের পরস্পর সঞ্চরণশীলতাকে মনে হয় বুঝি-বা স্বপ্নই, সম্মোহনই, অন্যদিকে তারা আবার বাস্তবই, বাস্তবেরই ভিন্ন রূপ। রাজনীতি-সমাজবীক্ষণ-মনঃসমীক্ষণতত্ত্বের রসায়নে সমরেশ বসুর উপন্যাস বোধ-সংবেদ-দর্শন ও কৃৎকৌশলে সুপ্রণীত ও স্বতন্ত্র। সাহিত্যসমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি সমরেশ সাহিত্য বিবেচনার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ : 'কিন্তু সমরেশ কোনোদিন কোনো ক্ষেত্রেই ভাবের ক্ষেত্রে জুয়াচুরি করেনি। না জীবনে, না সাহিত্যে।'

পরিশিষ্ট

সমরেশ বসু : জীবনপঞ্জি
সমরেশ বসু : গ্রন্থপঞ্জি
সমরেশ বসু-বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি
সমরেশ বসু-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাবলি
সহায়ক গ্রন্থসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

সমরেশ বসু : জীবনপঞ্জি

১৯২৪ ১১ ডিসেম্বর বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের রাজানগর গ্রামে সমরেশ বসুর জন্ম।

পিতা : মোহিনীমোহন ছিলেন পেশাদার প্রতিকৃতি-অঙ্কনশিল্পী, মাতা : শৈবলিনী।

লেখক ছদ্মনাম : কালকূট, ভ্রমর।

ডাকনাম : তড়বড়ি, প্রকৃত নাম : সুরথনাথ বসু।

সমরেশ বসু নামটি বন্ধু দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া। ঢাকা শহরের লক্ষ্মীবাজারের গিরিশ মাস্টারের পাঠশালায় শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি। এরপর গেন্ডারিয়ার গ্র্যাজুয়েট স্কুলে পড়ালেখা ও সাহিত্যচর্চার উন্মেষ। রবীন্দ্রনাথের "অনধিকার প্রবেশ" গল্প পড়ে উৎসাহিত হয়ে একই নামে গল্প লেখেন। পাঠ্য বইয়ের চেয়ে ছন্নছাড়া, বহির্মুখী জীবনের প্রতি আকর্ষণ। 'জয়নাল' (সহপাঠী), মনসুর (সহপাঠী) ও ইসমাইলের (মোটর ক্লিনার) মতো বালকের সঙ্গে সখ্য গড়ে ওঠে। ১৯৩৮ পর্যন্ত ঢাকার উপকণ্ঠে থাকেন যখন তিনি সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। দারিদ্র্যের মধ্যেও সাংস্কৃতিক আবহে বেড়ে ওঠেন। পিতার আকর্ষণ ছিল ভক্তিমূলক গান, মালসী গান, পূর্ববঙ্গের প্রচলিত লোকসংগীত ও ছবি আঁকার প্রতি। মা নিরলংকার, আটপৌরে ভাষায় বিস্ময় জাগানো ব্রতকথা শোনাতেন। এগুলোর পরিণামী সত্যবিজয়ী বক্তব্য সমরেশকে আকর্ষণ করত। তাঁর কাকা ছবি আঁকতেন।

১৯৩৯ ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা থেকে বুড়িগঙ্গার কোল ছেড়ে অগ্রজ মন্মথনাথ বসুর কাছে পড়ালেখার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটিতে গঙ্গার কোলে যান। ৬ ফেব্রুয়ারি নৈহাটির মহেন্দ্র স্কুলে ভর্তি। দাদার দৃষ্টি এড়িয়ে স্কুলের পড়ার চেয়ে শরৎচন্দ্র ও অন্য লেখকের লেখার প্রতি আগ্রহ। রেলের টিকিট কালেক্টার অসমবয়সী হামিদের সঙ্গে পরিচয়। সংগীতের সূত্রে উভয়ের সখ্য। বাঁশি বাজানো ও ছবি আঁকার প্রতি আকর্ষণ। হীরেন্দ্রকুমার রায়ের সম্পাদনায় হাতে লেখা 'বীণা' পত্রিকার প্রকাশকালে দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব। অষ্টম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন এবং ঢাকেশ্বরী কটন মিলে শিক্ষানবিশীর (ট্রেনি) কাজে যোগদান।

১৯৪০ পুনরায় ১৬ বছর বয়সে তীব্র জীবনাকাঙ্ক্ষায় নৈহাটিতে যাওয়া। কলকাতার নরেশ মিত্রের 'নাট্য নিকেতনে' (পরে নাম হয় 'বিশ্বরূপা') নাটকে অভিনয়, গান শোনা, গান শেখার মধ্যদিয়ে উদ্দাম জীবনযাপন। হাতে লেখা 'বাণী' পত্রিকা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। বন্ধু দেবশঙ্করের বোন হিলুর সঙ্গে মধুর সম্পর্ক ও সংক্ষিপ্ত প্রণয়চর্চা।

১৯৪১ বন্ধু দেবশঙ্করের দিদি পিতৃগৃহে বসবাসরত স্বামীবিচ্ছিন্না গৌরীর সঙ্গে পরিচয়। জন্ডিস ও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়া। গৌরীর আন্তরিক চেষ্টায় সুস্থ হয়ে ওঠা এবং তাঁর সঙ্গে হৃদয়গত সম্পর্ক স্থাপন। চিত্রশিল্পী সমরেশের ছবির, লেখক সমরেশের লেখার তাৎপর্য অনুধাবন করতেন তিনি। তাঁকে ক্রমাগত 'হয়ে উঠতে' প্রাণিত করতেন গৌরী।

সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে গিয়ে ২২ বছর বয়সী গৌরীকে নিয়ে ১৮ বছরের সমরেশ নৈহাটি ছেড়ে চার মাইল দূরবর্তী আতপুরের জগদ্দল এলাকায় চটকলের আবদুল মিস্তিরির বস্তিতে গিয়ে ওঠেন। পোলট্রি ফার্মের মুরগি, ডিম, আনাজের সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪২ জগদ্দলের কমিউনিস্ট পার্টির সাম্যবাদী শ্রমিক নেতা সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তের (সত্য মাস্টার) মাধ্যমে বামপন্থী রাজনীতিতে দীক্ষা গ্রহণ। তাঁরই পরামর্শে কদর্যপূর্ণ বস্তিজীবন ছেড়ে তরফদার পাড়ায় দু-টাকায় ঘর ভাড়া নিয়ে বসবাস। ডিসেম্বরে সত্যপ্রসন্নের চেষ্টায় ইছাপুর ফ্যাক্টরি ইনস্পেকটরেট অব স্মল আর্মস-এর অফিসে পাঁচসিকে রোজে ট্রেসারের চাকরি, পরে ড্রাফটস ম্যান-এ উন্নীত। মার্কসবাদী পত্রিকা 'জনযুদ্ধ'র সঙ্গে পরিচয় ও সংযোগ।

আতপুরের জুটমিলে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা। অফিসের 'উদয়ন' গ্রন্থাগারে খণ্ডকালীন চাকরিতে যোগদানের সুবাদে ম্যাক্সিম গোর্কি, কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস, সোলোকভ, অস্ট্রোভস্কি, ইলিয়া এরেনবুর্গ, এরিক মারিয়া রেমার্ক, লু-শ্যুন, লাও চাও, কৃষণ চন্দর, মুনশী প্রেমচন্দ, চেকভ, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধ ঘোষের সাহিত্য অধ্যয়ন এবং শিল্পের বিষয় ও উপকরণ সন্ধান। হাতে লেখা পত্রিকার জন্য নব উদ্যমে কাজ শুরু।

১৯৪৩ ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রথম সন্তান বুলবুলের জন্ম। ছুটির অবকাশে, কাজের শেষে রাত্রে, ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন এবং পার্টির কাজে চটকলগুলোর আশপাশে গঙ্গার ধারে ধারে ঘুরে বেড়ানো। নব্বই বছরের বেশি বয়সী নবকুমার দাশের কাছ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে তৈরি হওয়া চটকলের কাহিনি শোনেন যা পরবর্তীতে DËi½ উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে।

১৯৪৪ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ। মহাত্মা গান্ধীর শান্তিপূর্ণ অহিংস বিপ্লবে আস্থা স্থাপন। শান্তি মুখার্জীর মতো কপট বিপ্লবীদের স্বরূপ প্রত্যক্ষ এবং অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করে, তর্ক করে পার্টি নেতৃত্বের কোপে পড়া। নেতৃত্বের ভুল সিদ্ধান্তের দায়ভার বহন করেন সত্য মাস্টার। তাঁর হত্যায় সর্বস্বত্যাগী, দুঃখী, অসহায়, নির্যাতিত মানুষের সঙ্গে আত্মিক বন্ধন অনুভূত হয় সমরেশ মানসে। ব্যক্তিসত্তা ও শিল্পীসত্তায় শেকড়ায়িত হয় সাহিত্যবোধ।

১৯৪৫ ৪ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় সন্তান দেবকুমার বসুর জন্ম।

১৯৪৬ মাসিক 'পরিচয়' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় "আদাব" ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। তবে "শের সর্দার" নামে একটি ছোটগল্প দৈনিক 'স্বাধীনতা', পত্রিকায় ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয় বলে ড. নিতাই বসু KvjKU mg‡ik গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সম্ভাবনাময় সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত। এ সময়ে "আদাব" গল্পের সঙ্গে 'পরিচয়' পত্রিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামীর গল্প প্রকাশিত হয়। উত্তরকালের সাহিত্য সমালোচক বন্ধু সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সুরথকে সমরেশরূপে আবিষ্কারের পর "আদাব" গল্পের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং তাঁর পরামর্শ ও উৎসাহে সমরেশ তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখেন "প্রতিরোধ" গল্প, যেটি রুশ ও চেকভাষায় অনূদিত হয়। এ সময় থেকেই বামপন্থী প্রগতিশীল লেখক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন তিনি। bqbc‡ii gwU উপন্যাস রচনা।

১৯৪৭ অখণ্ড বাংলা ভূখণ্ড খণ্ডিত হওয়ার পর তেভাগার লড়াই, তেলেঙ্গানার লড়াই এবং সুন্দরবনের কৃষক আন্দোলনকালীন রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে কমিউনিস্ট রাজনীতিতে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। পার্টি নেতৃত্ব সেক্রেটারি পি.সি. যোশীর হাত থেকে রণদিভের হাতে চলে আসে। প্রাপ্ত স্বাধীনতা অন্যান্য সকলের মতো সমরেশের কাছেও মিথ্যা প্রমাণিত হয়। রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, গৌর ঘোষ, সোনা মিত্র, অজয় ব্যানার্জী, লছমন ও লোহি মিয়ার মতো বাম মতবাদে বিশ্বাসী মানুষ, শ্রমিক ও মজুরের সঙ্গে তাঁর সখ্য হয় এ-সময়। কমিউনিস্ট রাজনীতি উন্মত্ত অস্থিরতায় সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়ায় রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি অনাস্থার সূত্রপাত। এলাকাভিত্তিক পার্টি নেতৃত্ব সত্য মাস্টারের মতো মানুষের পরিবর্তে অযোগ্য, স্বার্থান্বেষী সন্ত্রাসপন্থী ব্যক্তির হাতে চলে আসায় সমরেশের রাজনীতি চেতনায় দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

এক কথায়, ব্যক্তিস্বার্থনির্ভর রাজনীতি প্রত্যক্ষ করে সমরেশ মানসে মতাদর্শগত ভাঙন ও সংঘাত সৃষ্টি হয়। এ সময়ে স্ত্রী গৌরী পার্টির কর্মী হিসেবে সমরেশকে সমর্থন করতে পারেননি। কাজেই রাজনৈতিক সন্ত্রাসের প্রশ্নে স্ত্রী গৌরীর সঙ্গেও সমরেশের আদর্শগত সংকট সৃষ্টি হয় যা দাম্পত্য জীবনকে প্রভাবিত করে।

সমরেশের জীবনের তৃতীয় নারী পার্টিসমর্থক বন্ধুর বোন ব্রাহ্মণ পরিবারের সুন্দরী, বিদুষীর সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক এবং ওই সূত্রে দাম্পত্য সংকট। আত্মজৈবনিক উপন্যাস hM hM Rx‡q-র মধ্যে এ সবের উপকরণ বর্তমান।

১৯৪৯ কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ৮ মার্চ হাতবোমা, এ্যাসিড বাল্ব নিয়ে চটকলের শ্রমিকদের দ্বারা ধর্মঘট করানোর জন্য গৃহীত পার্টির সিদ্ধান্তকে সন্ত্রাসবাদী কাজ মনে প্রতিবাদ জানানোয় পার্টির উর্ধ্বতন নেতাদের বিরাগভাজন হন।

৯ মার্চ পার্টির নিয়ম রক্ষা করতে অ্যাকশনে অংশগ্রহণ।

১৩ ডিসেম্বর পার্টির অন্যায় সিদ্ধান্তের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য দেখাতে ব্যর্থ হলে নেতৃত্বের ষড়যন্ত্রে কারাগারে নিক্ষিপ্ত। এক বছরের বেশি সময় কারাবাস এবং ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরির চাকরি থেকে বরখাস্ত।

কমরেডদের অসহযোগিতা, নির্মমতা ও সকল প্রতিকূলতার মধ্যে সমাজের অন্ত্যজ মানুষের কাছ থেকে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রাপ্তি।

DËi½ উপন্যাস এবং তিন অঙ্কের নাটক †jevi Awdmvi (পরে নাম পরিবর্তন করে দেন †cZ) রচনা। নাটকটির পাণ্ডুলিপি পরবর্তীকালে হারিয়ে যায়।

১৯৫১ কারাগার থেকে মুক্তিলাভ। অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে জেলমুক্ত প্রগতিশীল ও কমিউনিস্ট লেখকদের সভায় আমন্ত্রিত।

অধ্যাপক সনৎ বসু ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু সম্পাদিত 'ডাক' সাহিত্য পত্রিকায় ছাপা হয় 'অকাল বৃষ্টি' গল্প।

শচী সেনের বুক ওয়ার্ল্ড থেকে প্রকাশিত হয় DËi½ উপন্যাস। দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনে আলোকময় সম্ভাবনা। নৈহাটির বাসন্তী কেবিনে বইয়ের জন্য অপেক্ষমাণ বন্ধু সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমাশঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যজিৎ চৌধুরী, প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশ দে সহ অনেকের দ্বারা অভ্যর্থিত হন সমরেশ। সমরেশের স্বাদেশিকতাবোধ প্রত্যেক্ষ করে কবি বিষ্ণু দে কর্তৃক অভিনন্দনপত্র প্রেরণ।

১৯৫২ পিতা মোহিনীমোহনের প্রয়াণ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় এবং এ সূত্রে বেঙ্গল পাবলিশার্স, ডি. এম. লাইব্রেরির সঙ্গে যোগাযোগ।

'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় we wU †iv‡Wi av‡i প্রকাশ, গ্রন্থটি সত্য মাস্টারকে উৎসর্গিত। bqbc‡ii gwU উপন্যাস প্রকাশ। 'প্রবাহ' পত্রিকার ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় "ভোট দর্পণ" নামক রাজনৈতিক নিবন্ধ প্রকাশের প্রয়োজনে 'কালকূট' ছদ্মনাম গ্রহণ।

১৯৫৩ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ খারিজ। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় পৌর এলাকার পর্যালোচনামূলক ফিচার লেখক হিসেবে যোগদান। সহকারী ছিলেন লেখকবন্ধু সোমনাথ ভট্টাচার্য। জীবনকে সূক্ষ্মভাবে নতুন দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে শেখেন সমরেশ এ সময় থেকেই। তখন সম্পাদক ছিলেন সরোজ আচার্য। তাঁর পরামর্শে 'দেশ'-এ লেখা শুরু। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র সেন হলেও নীতিনির্ধারক ছিলেন সাগরময়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষ। 'দেশ' পত্রিকায় "গুণিন" গল্প প্রকাশিত হলে পার্টির বন্ধুদের বিরোধিতা। কারণ এটি বামপন্থী ভাবধারানির্ভর পত্রিকা নয়।

প্রদ্যোৎ গুহর অনুরোধে 'চতুষ্কোণ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় kxgZx Kv‡d উপন্যাস প্রকাশ। kxgZx Kv‡d 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক অনিল সিংহ ও 'ডাক' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর প্রধান অধ্যাপক সনৎ বসুকে উৎসর্গিত। gi ï‡gi GKv‘b, AKvj ewó গল্পগ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৫৪ ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখার ইচ্ছা থেকে কুম্ভমেলায় যাবার প্রস্তুতি। অর্থনৈতিক দিক চিন্তা করে সংবাদপত্রের কোনো দায়িত্ব নেয়ার কথা ভাবেন। এ কারণে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পরামর্শে বেঙ্গল পাবলিশার্সের মনোজ বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাঁর লেখা চিঠি নিয়ে 'যুগান্তর' পত্রিকার পরিমল গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু তাঁর তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষাপূর্ণ আচরণে ব্যথিত সমরেশ 'দেশ' পত্রিকার সাগরময় ঘোষের সামনে উপস্থিত হন। ঘটনাক্রমে সেখানে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র দোর্দণ্ডপ্রতাপসম্পন্ন কানাইলাল সরকারের সঙ্গে পরিচয় ও তাঁর আগ্রহের কথা জেনে উৎসাহিত বোধ করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ছবিসহ কুম্ভমেলার প্রতিদিনের সংবাদ পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে সমরেশ বেরিয়ে পড়েন প্রয়াগে কুম্ভমেলার উদ্দেশে। যাত্রাপথে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসি ভাষার অধ্যাপক ড. অরুণকুমার মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ। অধ্যাত্মবাদ নয়, দেশকে, মানুষকে তথা নিজেকে ও জীবনকে জানার প্রেরণায় তাঁর এ যাত্রা।

কুম্ভমেলা শেষে ফিরে এসে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় AgZK‡¤i mÜv‡b। 'পরিচয়' পত্রিকাতেও দু-একটি গল্প ছাপা হচ্ছিল। উত্তরকালে বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ।

১৯৫৫ পার্টি সদস্যপদের নবায়নে অনীহা। অর্থনৈতিক দিক থেকে জীবন সচ্ছল হয়ে ওঠে।

আতপুর থেকে নৈহাটিতে প্রত্যাবর্তন। গৌরী বসুর অক্লান্ত শ্রম-সহযোগে নতুন বাড়ি 'ফাল্গুনী' নির্মিত।

বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রায়ণের জন্য বিমল রায় AgZK‡¤i mÜv‡b-র চিত্রস্বত্ব কিনে নেন। যদিও প্রথমে নন্দলাল বসুর ইচ্ছে অনুসারে সত্যজিৎ রায়ের এটা চিত্ররূপ দেওয়ার কথা ছিল, শেষ পর্যন্ত শারীরিক অসুস্থতার কারণে পারেননি। পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কমে আসে। লংমার্চ ও মৌন মিছিলের মধ্যে কর্মকাণ্ড সীমিত।

পুনায় গিয়ে কথাসাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ। দ্বাদশবর্ষীয়া শ্যালিকা ধরিত্রীর প্রতি দৃষ্টিভরা অনুরাগের চিহ্ন। ckwiYx গল্পগ্রন্থ প্রকাশ।

'জন্মভূমি' পত্রিকায় গঙ্গা উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এ উপন্যাসের জন্য আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্তি। গ্রন্থাকারে গঙ্গা ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হলেও সাময়িকপত্রে প্রকাশসূত্রেই উপন্যাসটি আনন্দ পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়।

১৯৫৬ ml‘vMi উপন্যাস প্রকাশ। গ্রন্থটি কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। lô গল্পগ্রন্থ FZ প্রকাশ।

১৯৫৭ গ্রন্থাকারে M½v উপন্যাসের প্রকাশ। উৎসর্গ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

wÎavi উপন্যাস প্রকাশ।

১৯৫৮ মনোমুকুর গল্পগ্রন্থের প্রকাশ। মা-কে উৎসর্গ করেন। দেশ পুরস্কার লাভ।

১৯৫৯ †‘ lqvj wjwc গল্পগ্রন্থের প্রকাশ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬০ ewNbx I ivbxi evRvi উপন্যাস প্রকাশ। ewNbx উৎসর্গ করেন প্রেমেন্দ্র মিত্রকে।

L‡R wdwi †mB gvb‡l উপন্যাস প্রকাশ।

গৌরীর জন্য অপরাধবোধ ও ধরিত্রীর প্রতি প্রেমের টানাপোড়েন। এই দুয়ের সমন্বয়ে শিল্পীসত্তায় বিবেকের পীড়ন।

১৯৬১ cvnvox Xj, meYv গল্পগ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৬২ wQbevav উপন্যাস প্রকাশ। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ।

wbRb ^mK‡Z উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

'išÍ PovB উপন্যাস প্রকাশ। উপন্যাসটি শ্রীমতী চৈত্রালী মুখোপাধ্যায় ও শ্রী হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত ।

†kl 'ievi উপন্যাস প্রকাশ। শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্যকে উৎসর্গ করা হয় উপন্যাসটি।

১৯৬৩ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে দুই AiY¨ উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গীত। kvj‡Nwii mxgvbvq উপন্যাস প্রকাশ।

১৯৬৪ †divB উপন্যাস প্রকাশিত হয় আনন্দ পাবলিশার্স থেকে। উৎসর্গ সোমনাথ ভট্টাচার্য।

ami Avqbv উপন্যাস প্রকাশ।

পার্টির সঙ্গে চূড়ান্ত মতপার্থক্য। 'আনন্দবাজার' পত্রিকার বরণীয় লেখককে পার্টি সমর্থকরা মেনে নিতে চাননি।

সক্রিয় উদ্যোগ ও প্রেরণায় নৈহাটি থেকে প্রকাশিত হয় 'ছোটগল্প : নব নিরীক্ষা' পত্র।

১৯৬৫ ¯YwcÄi উপন্যাস প্রকাশ। কন্যা বুলবুল ও জামাতা বিজনকে উৎসর্গ করেন। গৌরীর প্রতি কৃত অপরাধবোধে বিপর্যস্ত, অস্থির ও উদ্দাম জীবনযাপন, স্বেচ্ছানির্বাসন বলা যায়। তবু সামাজিক দায়িত্ব পালন। স্ত্রী গৌরীর সংগীত বিদ্যায়তন ফাল্গুনী-র কাজে পূর্ণ সহায়তা।

আনন্দ পাবলিশার্স থেকে weei উপন্যাসের প্রকাশ।

¯YwkLi cv½‡Y উপন্যাস প্রকাশ।

১৯৬৬ RMÏj উপন্যাস প্রকাশ। উৎসর্গ : বিষ্ণু দে।

wZb fe‡bi cv‡i উপন্যাস প্রকাশ। উৎসর্গ : শ্রী মন্মথনাথ বসু।

১৯৬৭ ১৪ মার্চ স্ত্রীর জীবদ্দশায় শ্যালিকা ধরিত্রী বসুকে বিয়ে করেন।

'দেশ' শারদীয় সংখ্যায় cRvcwZ উপন্যাস প্রকাশ। cvZK, ¯xKv‡iw³, AwMwe›', AvZ¥R Dcb¨vm I ebjZv গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত cvZK উপন্যাসের জন্য সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ, প্রকাশক মণীন্দ্র রায় ও সমরেশ বসুর বিরুদ্ধে মামলা হয়।

বুদ্ধদেব বসু ও সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে একযোগে 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় বিশেষ সুবর্ণ জয়ন্তী পুরস্কার লাভ।

১৯৬৮ ২ ফেব্রুয়ারি cRvcwZ উপন্যাসে অশ্লীলতার অভিযোগে সমরেশ বসু এবং 'দেশ' পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা করেন অমল মিত্র নামক আইনজীবী। PZaviv, ev›'v, †Kv_vq cv‡ev Zv‡i, Gcvi Icvi, c'‡ÿc, AwLi Av‡jvq উপন্যাস প্রকাশ। এপ্রিল মাসে পঞ্চম ও কনিষ্ঠ পুত্র উদিতের জন্ম।

৬ জুলাই সমন জারির ফলে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে হাজিরা। এক হাজার টাকা জামিনে মুক্তিলাভ।

Dhaka University Institutional Repository

১৬ অক্টোবর সাক্ষ্যগ্রহণের দিন এজলাসে উপস্থিত।

১৬ নভেম্বর আত্মপক্ষ সমর্থন করে লিখিত বিবৃতি দাখিল।

১১ ডিসেম্বর নিম্ন আদালতের রায় সীতাংশু ও সমরেশের বিপক্ষে চলে যায়। রায়ে ২০১ টাকা করে জরিমানা ও অনাদায়ে দু মাস কারাদণ্ডের ঘোষণা।

১৯৬৯ ১৭ ফেব্রুয়ারি ব্যাঙ্কশাল কোর্টের বা নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল।

১৫ সেপ্টেম্বর বিচারপতির জারি করা রুল- কেন দণ্ডাদেশ বাড়ানো হবে না সে-সম্পর্কে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রাপ্তি। AwPbci, Awj›‘, wgwQwgwQ, mPv‡‘i ¯‡‘khvÎv উপন্যাস প্রকাশ।

১৯৭০ উত্তর কলকাতায় দেশবন্ধু পার্কের কাছে একতলা ভাড়াবাড়িতে বসবাস। পশ্চিম বাংলার শহরে ও গ্রামে নকশাল আন্দোলনের ব্যাপকতার কারণে নিরাপত্তাহীনতা। পুলিশের বড়োকর্তা কর্তৃক কিছু দিনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থাকার পরামর্শ। সাগরময় ঘোষ ও অশোককুমার সরকারের সঙ্গে কথা বলে অশোকের দিল্লির গেস্ট হাউসে ধরিত্রী বসুকে নিয়ে অবস্থান। কয়েক মাস পরে পুনরায় অনুকূল পরিবেশে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।

১০ অক্টোবর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে লেখা "শরতে কৃষ্ণপক্ষ" নামক স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয় 'দেশ' পত্রিকায়।

নীহাররঞ্জন রায়ের evOvjxi BwZnvm গ্রন্থের প্রতি আকর্ষণ।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ও মতি নন্দীর লেখার প্রতি মুগ্ধতা।

we‡li ¯v‘, hwÎK, Ae‡PZb, QwUi dv‡‘, hvi hv fwgKv, AjKv msev‘, cZ‡ji †Ljv উপন্যাস প্রকাশ। গল্পগ্রন্থ gvbl-এর আত্মপ্রকাশ।

১৯৭১ সার্কাস রেঞ্জের বাসায় ওঠেন।

evYxaÿwb †eYe‡b, ZivB, wekvm, iw³g emšÍ, g‡LvgwL Ni উপন্যাস ও †Qov ZgmK গল্পগ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৭২ ২৭ জুন cRvcwZ উপন্যাসের মামলায় হাইকোর্টের রায় সমরেশের বিরুদ্ধে চলে যায়।

Avie mvM‡ii Rj †jvbv, AgZ we‡li cv‡Î, Qvqv XvKv gb, i¡cvqY, weKv‡j †fv‡ii dj, I‡‘i ej‡Z ‘vI, wbVi ‘i‘x, GKwU A¯úó ¯i উপন্যাস প্রকাশ। †PZbvi AÜKvi, awIZv, Kvgbv evmbv গল্পগ্রন্থ প্রকাশ।

২ ডিসেম্বর মা শৈবলিনীর মৃত্যু।

১৯৭৩ ২৮ ফেব্রুয়ারি আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং 'আনন্দবাজার' পত্রিকা গোষ্ঠীর প্রধান সম্পাদক অশোককুমার সরকার এবং 'দেশ' পত্রিকার সাগরময় ঘোষ মামলাটি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্য হাইকোর্টের অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন।

২৯ মার্চ আবেদন নাকচ।

৯ জুলাই সুপ্রিম কোর্টে পুনরায় আবেদন দাখিল।

২৪ আগস্ট আবেদনটি বিবেচনার জন্য ওঠে।

gb Pj e‡b, ¯YPÂ, cig iZb, cw_K, ivgbvg †Kejg, AÜKvi Mfxi MfxiZi, Akøxj, wÎaviv, ivYxi evRvi উপন্যাস এবং †nlvaÿwb Ges djewlqv গল্পগ্রন্থ প্রকাশ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৪ ২২ জুন 'দেশ' পত্রিকায় মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কৃত সলঝেনিৎসিনকে নিয়ে লেখেন 'হটাবাহার'—যার অর্থ বহিষ্কৃত।

e‡bi m‡½ †Ljv, gvbl kw³i Drm, ü'‡qi gL, jMcwZ, cvPxi, Ae‡k‡l, Avgvi Avqbvi gL উপন্যাস এবং we'¨jøZv, iRwKbx †cg গল্পগ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৭৫ ১১ অক্টোবর 'দেশ' পত্রিকায় "মৃত্যুহীন বিয়োগ" নামে স্মৃতিচারণামূলক নিবন্ধ লিখে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে সমরেশ সম্পর্কের স্বরূপ প্রকাশ।

nvi‡q †mB gvb‡l, Agvem¨vq Pv‡'i D'q, †cg bv‡g eb, wS‡j bMi, cvY cwZgv, bv‡Ui ¸iæ, nww‡q hvIqvi †bB gvbv, Ae‡iva, mhZòv, meR e‡b Av¸b উপন্যাস গল্পগ্রন্থ weixZ i½ এবং কিশোরগ্রন্থ †gv³vi'v'i †KZ ea প্রকাশ।

১৯৭৬ ৪ জুন বেলা এগারোটায় হৃদযন্ত্রের আক্রমণে ক্যালকাটা হাসপাতালে ভর্তি। সুস্থ হবার পরও অবসাদ ও ক্লান্তিবোধের কারণে পূর্বের উদ্দাম ও গতিময় জীবনধারায় পরিবর্তন।

স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সপরিবার মধুপুর গমন। এরপর দিল্লি। দিল্লিতে অবস্থানকালে শোভনা নাম্নী অসামান্য মেধা, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও সাহসী নারীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন।

'প্রসাদ' পত্রিকায় পৌরাণিক পটভূমিকায় লেখা AwšÍg cYq উপন্যাস প্রকাশ। RbK, evmšÍxi msmvi, †kl Aa¨vq, মরম ভরম রচনাও একই নামে প্রকাশিত হয়।

ডিসেম্বর মাসে 'আনন্দবাজার' পত্রিকা থেকে ইস্তফা দেন। gb †givg‡Zi Avkvq, wg‡U bvB Zòv, Zlviwms‡ni c'Zv‡j, m¼U, eviwejwmbx, evmšÍxi msmvi, AwšÍg cYq, †cg Kve¨ i³ উপন্যাস এবং গল্পগ্রন্থ bvPNi, KxwZbwkbx, KšÍx msev' প্রকাশ।

১৯৭৭ nww‡q cvIqv, g¨vK‡e_ : i½gÂ KjKvZv, ^PwZ, Avg gvnv‡Zv, c‡ii N‡i Avcb evmv, gnvKv‡ji i‡_i †Nvov উপন্যাস এবং গল্পগ্রন্থ †QvU †QvU †XD প্রকাশ।

১৯৭৮ প্রথমা স্ত্রী গৌরী বসুর অসুস্থতা।

১৩ আগস্ট নৈহাটিতে অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত ও অতনু চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বন্ধু অসিতকুমার ভট্টাচার্যের সহযোগিতায় এবং নৈহাটি ও কলকাতার সমরেশ অনুরাগীদের আগ্রহে আয়োজিত সমরেশ-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান।

AwPbci, weki¦‡ci cv½‡Y, Avb›'aviv, gixwPKv উপন্যাস প্রকাশিত।

১৯৭৯ ৩ জুলাই হৃদযন্ত্রের আক্রমণে কলকাতায় উডল্যান্ড নার্সিং হোমে ভর্তি। N‡ii Kv‡Q AviwkbMi, Ac'v_, cZ‡ji cvY, †kl Aa¨vq, fvbgZxi bei½ উপন্যাস প্রকাশ। কিশোরগ্রন্থ eÜ N‡ii AvIqvR, †mvbvjx cv‡oi inm¨ প্রকাশ।

১৯৮০ ১১ জুলাই গৌরী বসুর প্রয়াণ।

কালকূট নামে লেখা kv¤ উপন্যাসের জন্য আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্তি। gb-fwmi Uv‡b, wech¯Í, 'ûg‡Lv mvc, Uvbv-†cv‡ob, Rxeb hLb GKUvB উপন্যাস প্রকাশ। AÜKv‡ii Mvb, I Avcbvi Kv‡Q †M‡P, we‡K‡j †kvbv, weeig³ গল্পগ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৮১ hM hM Rx‡q, A¯xKvi I ivRavbx G·‡c‡m nZ¨vinm¨ উপন্যাস প্রকাশ।

১৯৮২ ১৯৭২ সালে বুকিং দেয়া রডন স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে ওঠেন এবং সার্কাস রেঞ্জের ফ্ল্যাটটি হয় সমরেশ বসুর কর্মক্ষেত্র। মাসিক পত্রিকা 'মহানগর' সম্পাদনা। ১৯৮৬ পর্যন্ত এর সম্পাদক ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

P‡jv gb i¡cbM‡i, wcÄ‡i AwPb cvwL, w`‘Mš Í, gvZZwšK, cbhvÎv উপন্যাস প্রকাশ।
রামকিঙ্করের জীবন অবলম্বনে †`‘wL bvB wd‡i-র তথ্যসন্ধানে শান্তিনিকেতন ও বাঁকুড়া গমন।

১৯৮৩ †Kv_vq †m-Rb Av‡Q, weRb wefB, AvKv• ÿv উপন্যাস প্রকাশ।

১৯৮৪ †kKj †Qov nv‡Zi †Lv‡R, AwfÁvb, h‡×i †kl †mbvcwZ উপন্যাস প্রকাশ।

১৯৮৫ ৬ জুন পনেরো দিনের জন্য মস্কো নিউজ ক্লাবের প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে রাশিয়া যাত্রা। সমাদৃত হন সেখানে এবং মস্কো বেতারে ভাষণও দেন।

২০, ২২, ২৩ আগস্ট cRvcwZ উপন্যাস নিয়ে মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে উত্থাপিত আপিলের শুনানি হয়। c_v উপন্যাস প্রকাশ। ev_vb এবং evQvB MÍ এ-বছরই প্রকাশিত হয়।

২৪ সেপ্টেম্বর আর. এস. পাঠক ও অমরেন্দ্রনাথ সেন নামক দু-জন বিচারপতি cRvcwZ অশ্লীল নয় বলে রায় দেন। দিল্লি ও গোয়ালিয়র ঘুরে আসেন।

১৮ নভেম্বর ভোরে হৃদযন্ত্রের সমস্যায় বেলভিউ নার্সিং হোমে ভর্তি।

১৯৮৬ ৩ এপ্রিল হরিদ্বার কুম্ভমেলায় যান। মেলা থেকে পাঠানো প্রতিবেদন 'অমৃতংগময়' নামে প্রকাশিত হয় 'আনন্দবাজার' পত্রিকায়।

সন্তোষকুমার ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার এক হাজার টাকা এবং শিরোমণি পুরস্কার দশ হাজার টাকা লাভ।

২৮ সেপ্টেম্বর জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে যান বইমেলা এবং ভারত-উৎসবে যোগদান করতে। সেখানে জার্মানি প্রবাসী বাঙালিদের দুর্গাপূজার উদ্বোধনও করেন তিনি।

১৮ অক্টোবর যান প্যারিসে।

a¨vb Ávb †cg, Reve, wZb ciæl, ‘kw‘b c‡i, D×vi উপন্যাস প্রকাশ।

১৯৮৭ জানুয়ারি মাসে স্বাধীন বাংলাদেশে গমন।

†h †Lv‡R Avcb N‡i, cY¨f‡g cY¨¯vb, †R¨wZgq kx‰PZb¨, cKwZ, Aw‘ ga¨ Aš Í, LwÐZv উপন্যাস প্রকাশ।

১৯৮৮ ২৬ ফেব্রুয়ারি ভুবনেশ্বর বইমেলা উদ্বোধন। ২৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতা প্রত্যাবর্তন। ১২ মার্চ বিকেল ৩.৪৫ মিনিটে কলকাতার বেলভিউ নার্সিংহোমে পরলোক গমন। ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রথমে ভর্তি হয়েছিলেন নবকুমার বসুর নার্সিং হোমে।

cYK¤, cbð, †gvngvqv উপন্যাস প্রকাশ।

Dhaka University Institutional Repository

সমরেশ বসু : গ্রন্থপঞ্জি

আলোচিত উপন্যাস

bqbc‡ii gwU	১৯৫২	একুশ বছর বয়সে রাইফেল ফ্যাক্টরির অফিসে বসে সমরেশ বসু এ উপন্যাস রচনা করেন ১৯৪৬ সালে। bqbc‡ii gwU তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস। মাসিক পরিচয়ে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ (১৯৫২) উৎসর্গপত্রে মুদ্রিত ছিল 'সাগরকে'। সমরেশ বসু এই নামে ব্যক্তিগতভাবে ডাকতেন গৌরী বসুকে। mg‡ik em iPbvejx 1, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৭; দ্বিতীয় মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮
DËi½	১৯৫১	গ্রন্থাকারে প্রকাশ। বইটি উৎসর্গ করা হয় প্রবীণ বন্ধু নবকুমার ঘোষ ও একালের বন্ধু সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। mg‡ik em iPbvejx 1, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রাগুক্ত।
we wU †iv‡Wi av‡i	১৯৫২	সমরেশ বসুর তৃতীয় উপন্যাস। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় সত্যমাস্টারকে। mg‡ik em iPbvejx 1, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রাগুক্ত।
kxgZx Kv‡d	১৯৫৩	বইটি উৎসর্গ করা হয় নতুন সাহিত্য সম্পাদক অনিল সিংহ ও ডাক পত্রিকার পুরোধাপুরুষ অধ্যাপক সনৎ বসুকে। mg‡ik em iPbvejx 1, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রাগুক্ত।
gvbl kw³i Drm	১৯৭৪	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪; mg‡ik em iPbvejx 7, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড : কলকাতা, অক্টোবর ১৯৮২
gnvKv‡ji i‡_i †Nvov	১৯৭৭	গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জুলাই ১৯৭৭। শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ ১৯৭৬। mg‡ik em iPbvejx 7, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

hM hM Rx‡q	১৯৮১	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রথম প্রকাশ। উৎসর্গ : স্বর্গতা গৌরী বসুর উদ্দেশে। mg‡ik em iPbvejx 6, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০২
†kKj †Qov nv‡Zi †Lv‡R	১৯৮৪	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮। পঞ্চম মুদ্রণ জুন ২০১১। উৎসর্গ : 'শ্রীদেবব্রত ভট্টাচার্য/ প্রীতিভাজনেষু'।
LwÐZv	১৯৮৭	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৮৭; চতুর্থ মুদ্রণ মে ২০১৪। উৎসর্গ : শ্রীযুক্ত অম্লান দত্ত/ শ্রদ্ধাভাজনেষু। : mg‡ik em iPbvejx 13, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৯

সমরেশ বসুর প্রবন্ধাবলি

সমরেশ বসু	: 'কালকূটের চোখে সমরেশ বসু' 'Kvj KU we‡kl msL¨vÕ, 'শব্দ', সাধনা বড়ুয়া সম্পাদিত, কলকাতা, জানুয়ারী ২০১১
_____	: "কেন গান্ধী," 'দেশ' ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭
_____	: "প্রসঙ্গ ভারতীয় কমিউনিস্ট (অখণ্ড) পার্টি ও আমি," 'দেশ' ২২ নভেম্বর ১৯৮৬
_____	: "নিজেকে জানার জন্যে," সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত 'দেশ' 'সমরেশ বসু স্মরণে,' কলকাতা, আনন্দবাজার প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ মে, ১৯৮৮

Dhaka University Institutional Repository

সমরেশ বসু-বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি

অমল হোড় (সম্পাদিত) : mg‡ik em : Rxeb I mwnZ¨, এ সি ই : কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৩

খোরশেদ আলম : mg‡ik emi Dcb¨vm mgq gvbl I wkí, অঙ্কুর প্রকাশনী : ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬

ঝুমা রায়চৌধুরী : K_vmwn‡Z¨ mg‡ik em : mvgwMK gj¨vqb (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), পূর্বাশা : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৭

দিপালী নাগ : Ges gvbl : mg‡ik emi Mí, বঙ্গসাহিত্য সংসদ : কলকাতা, রাসযাত্রা ১৪১২

নবকুমার বসু : wPimLv, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৫

নিতাই বসু : mg‡ik emi GKvšÍ mvÿvrKvi, মৌসুমী প্রকাশনী : কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৯

———— : KvjKU mg‡ik, জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স : কলকাতা, ১ লা বৈশাখ ১৩৯৪

নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় : cvK-ôweeiô c‡e mg‡ik em, পুস্তক বিপণি : কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

পারভীন আক্তার : mg‡ik emi wgw_K Dcb¨v‡mi welq I wkíi¡c, ধ্রুবপদ : ঢাকা ২০১২

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় : সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন : কলকাতা, আগস্ট ১৯৮৯

———————— : Dcb¨vm ivR‰bwZK, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯১

শম্ভুনাথ চক্রবর্তী : কালকূট সাহিত্যের সন্ধানে, সাহিত্যায়ন : কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৫

সত্যজিৎ চৌধুরী নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত বিজলি সরকার (সম্পাদিত) : mg‡ik em : ¯§iY mgxÿY, চয়নিকা : কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

মুকুল মণ্ডল : mg‡ik emi Dcb¨v‡m wekv‡mi msKU t_‡K DËiY, কাবতিকা : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৫

হিতেন্দ্র মিত্র : mg‡ik em : gw³ cšvi mÜvb, প্রাইমা পাবলিকেশনস : কলকাতা ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

সমরেশ বসু-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাবলি

অচিন্ত্য বিশ্বাস : "দেবাসুরের মন্থন : বিষণ্ন-নিষ্ক্রান্ত এক নায়কের কথা," স্বপন দাসাধিকারী সম্পাদিত mg‡ik em : gvb‡li K_vKvi, "এবং জলার্ক," : দীপান্বিতা, কলকাতা ২০০০

অনিল আচার্য : "সমরেশ বসুর রাজনৈতিক উপন্যাস", 'অপরাজিত' : কলকাতা, ৮ম বর্ষ, জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ১৯৮৮

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : "ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু", 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' : শ্রাবণ ও আশ্বিন ১৩৯০

অরুণ মিত্র : "সমরেশ", 'দেশ' সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত) সমরেশ বসু স্মরণে সংখ্যা ১৪ মে ১৯৮৭

অলোক রায় : "শিকড়ের সন্ধানে সমরেশ বসু", evsjv Dcb¨v‡m cZ¨vkv I cwß, পুস্তক বিপণি : কলকাতা, জুলাই ২০০০

অশোক সরকার : "জীবন বুনে চল রই হে", 'এবং জলার্ক', স্বপন দাসাধিকারী (সম্পাদিত), সমরেশ বসু সংখ্যা এক , জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৯

অশ্রুকুমার সিকদার : "বিশ্বাসের সংকট ও সমরেশ বসু", AvaywbKZv I evsjv Dcb¨vm, অরুণা প্রকাশনী : কলকাতা, জুলাই ১৯৮৮

অভিজিৎ নন্দী : "সমরেশ সাহিত্যের চলচ্চিত্র সম্ভাবনা", 'এবং জলার্ক', প্রাগুক্ত।

আনন্দ বাগচী : "সমরেশ : আদরা বনাম খসড়া", 'দেশ', সমরেশ বসু স্মরণে সংখ্যা, প্রাগুক্ত।

ঋত্বিক মল্লিক : "গল্পে নিম্ন শ্রেণীর মানুষ : সমরেশের বিশেষত্ব", 'এবং জলার্ক' প্রাগুক্ত।

কিন্নর রায় : "ভাঙা বন্দুকের স্বপ্ন", 'এবং জলার্ক', প্রাগুক্ত।

কিশলয় ঠাকুর : "যখন তুমি বাঁধছিলে তার", 'দেশ', সমরেশ বসু স্মরণে সংখ্যা, প্রগুক্ত।

গোপাল বসু : "নৈহাটির সমরেশ," 'অপরাজিত', ৮ম বর্ষ ১-৩ সংখ্যা, জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ১৯৮৮

গৌরকিশোর ঘোষ : "প্রিয় বন্ধু সমরেশ", 'দেশ', সমরেশ বসু স্মরণে সংখ্যা, প্রাগুক্ত।

চণ্ডীচরণ কর : "অন্তিম সাক্ষাৎকার", 'দেশ', সমরেশ বসু স্মরণে সংখ্যা, প্রাগুক্ত।

চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত : "কালকূট : মহাকালের সারথি", wg_-civ‡Yi fvOvMov, পুস্তক বিপণি : কলকাতা, এপ্রিল ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

জ্যোতি রায় : "আদাব থেকে বিবর", 'এবং জলার্ক,' প্রাগুক্ত।

তারক সরকার : "পুরাণের নবজন্ম : কালকূটের উপন্যাস", স্বপন দাসাধিকারী 'এবং জলার্ক' : mg‡ik em gvb‡li K_vKvi, পরিবেশক, পুস্তক বিপণি, ১০ ডিসেম্বর ২০০০

দিব্যেন্দু পালিত : "এক ধরনের আশ্রয়", 'দেশ', সমরেশ বসু স্মরণে সংখ্যা, প্রাগুক্ত।

দিব্যেন্দু পালিতের সঙ্গে সাক্ষাৎকার : 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ২০ মার্চ ১৯৮৮

দেবকুমার বসু : "বাবাকে নিয়ে", 'দেশ', সমরেশ বসু স্মরণে সংখ্যা, প্রাগুক্ত।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ : "সমরেশ বসুর উপন্যাস", 'এক্ষণ' শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৯

পল্লব সেনগুপ্ত : "কালকূটের পুরাণ-অন্বেষা", 'পল্লীগ্রাম', বৈশাখ ১৩৯৬

পার্থ চট্টোপাধ্যায় : "বুড়িগঙ্গা থেকে গঙ্গা" (সমরেশ বসুর সাক্ষাৎকার), 'কলেজ স্ট্রীট', কলকাতা, মে ১৯৮৭

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় : "ছোটগল্পে সমরেশ বসু", 'পরিচয়' শারদীয় সংখ্যা, ১৯৭৮

প্রমথ সেনগুপ্ত : "সমরেশ বসু : একের ভিতর দুই", সমরেশ বসু : মানুষের কথাকার, 'এবং জলার্ক", প্রাগুক্ত।

প্রসূন ঘোষ : "সমরেশ বসুর উপন্যাস", 'পুরবৈয়াঁ, আমন্ত্রিত সম্পাদক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদক পূর্বাণী ঘোষ, দশম বর্ষ। প্রথম সংখ্যা। ফেব্রুয়ারি ২০০৫

বরেন্দ্রকৃষ্ণ ধল : "শেষ ছবি", 'দেশ', সমরেশ বসু স্মরণে সংখ্যা, প্রাগুক্ত।

বাসব দাশগুপ্ত : "ব্যক্তির বিপন্ন অস্তিত্ব ও সমরেশ বসু", 'এবং এই সময়', জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৮

বিকাশ ভট্টাচার্য : "ছবির মানুষ", 'দেশ', সমরেশ বসু স্মরণে সংখ্যা, প্রাগুক্ত।

মায়া চট্টোপাধ্যায় : "ঘরোয়া পরিবেশে, ঘরোয়া আলাপ—সমরেশ বসু", 'এবং জলার্ক', প্রাগুক্ত।

রাজীব চৌধুরী : "কালকূট : শিল্পের অন্তরঙ্গ জীবন", 'এবং জলার্ক', প্রাগুক্ত।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় : "অমৃত পথের যাত্রী", 'দেশ', সমরেশ বসু স্মরণে সংখ্যা, প্রাগুক্ত।

শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায় : "আদাব : অভিশাপের দলিল", 'এবং জলার্ক', প্রাগুক্ত।

সত্যজিৎ চৌধুরী : "কালকূট সমরেশ : দ্বৈতাদ্বৈত" 'বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা', যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯১-৯২

সনৎ বসু : "উত্তরঙ্গ : উত্তরণ", 'দেশ', সমরেশ বসু স্মরণে সংখ্যা, প্রাগুক্ত।

——— : "মেঘরৌদ্র মেশামেশি", 'এবং জলার্ক', প্রাগুক্ত।

——— : সাক্ষাৎকার : "প্রসঙ্গ : সমরেশ বসু", নৈহাটি, ১৯৭৮

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : "সমরেশ : এক বন্ধনহীন পথিক", 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ২০ মার্চ ১৯৮৮

——————— : সাক্ষাৎকার : "প্রসঙ্গ : সমরেশ বসু", নৈহাটি, ১৯৭৮

——————— : "জীবন ও শিল্পের যুগলবন্দী" 'দেশ', mg‡ik em ¯§i‡Y msL¨v, প্রাগুক্ত।

——————— : ewsjv Dcb¨v‡mi Kvjvš Íi, দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ জুন ১৯৮০

Dhaka University Institutional Repository

———————— : "সমরেশ বসু : ব্যক্তি ও লেখক," সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত mg‡ik em iPbvejx খণ্ড ১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৮

———————— : "শ্রীমতী কাফে ইতিহাসের রাজপথে : ট্র্যাজিক উল্লাসে," Aciv‡ni Aefvm, দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৫

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : "সমরেশদা", 'দেশ', সমরেশ বসু স্মরণে, প্রাগুক্ত।

সুব্রত মুখোপাধ্যায় : "জীবন বুনা কর", 'দেশ', সমরেশ বসু স্মরণে, প্রাগুক্ত।

সোমনাথ ভট্টাচার্য : "সখা কথা রাখেনি", 'দেশ', সমরেশ বসু স্মরণে, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

অতুল সুর : ev0jv I ev0vjxi weeZb, সাহিত্যলোক : কলকাতা, ১৯৮৬

অপূর্ব্ব কুণ্ডু : evsjv I ev0wji w‘bcÄx (১৪৮৬-১৯৯৮), প্রভা প্রকাশনী : কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৮

অমলেশ ত্রিপাঠী : ¯vaxbZv msMv‡g fvi‡Zi RvZxq Ks‡Mm (১৮৮৫-১৯৪৭), আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড : কলকাতা, দশম মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪২০

অমলেন্দু সেনগুপ্ত : DËvj Pwjøk Amgvß wecøe, পার্ল পাবলিশার্স : কলকাতা, নভেম্বর ১৯৮৯

_____ : cRvqvi fvUvq lvU-mËi, পার্ল পাবলিশার্স : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯৭

অমিতাভ চক্রবর্তী : mv¤ú‘wqKZv : Drm I cmvi, পুস্তক বিপণি : কলকাতা ১৯৯৩

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : Kv‡ji cwZgv : evsjv Dcb¨v‡mi lvU eQi :১৯২৩-১৯৮২, দে’জ পাবলিশিং : কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯১

অলোক রায় সম্পাদিত : mwnZ¨‡Kvl : K_vmwnZ¨, বাগর্থ : কলকাতা ১৯৬৭

এ. আর. দেশাই : fviZxq RvZxqZvev‡‘i mvgwRK cUfwg, কে পি বাগচী কোম্পানী : কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ১৯৭৬

কমল চৌধুরী সম্পাদিত : ¯vaxbZv 50 †cwi‡q, দে’জ পাবলিশিং : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯

ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পাদিত) : gam‘b iPbvejx, mwnZ¨ msm‘ : কলকাতা, এপ্রিল ১৯৮৭

তপোধীর ভট্টাচার্য : evLwZb : ZË I c‡qvM, পুস্তক বিপণি : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৯৬

দেবেশ রায় : Dcb¨vm wb‡q, দে’জ পাবলিশিং : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯১

দেবীপদ ভট্টাচায : Dcb¨v‡mi K_v, সুপ্রকাশ : কলকাতা ১৯৬১

ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত : gvKmev‘x mwnZ¨-weZK, প্রথম খণ্ড, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী : কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ১৯৭৯

_____ : gvKmev‘x mwnZ¨-weZK, দ্বিতীয় খণ্ড, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী : কলকাতা,দ্বিতীয় মুদ্রণ আগস্ট ১৯৮১

_____ : gvKmev‘x mwnZ¨-weZK, তৃতীয় খণ্ড, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী : কলকাতা , দ্বিতীয় মুদ্রণ অক্টোবর ১৯৮০

পরিশিষ্ট

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : wew”QbZvi fwel¨r, প্রথম খণ্ড, প্রতিভাস : কলকাতা ১৯৮৮

———————— : wew”QbZvi fwel¨r, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রতিভাস : কলকাতা ১৯৯১

নজরুল ইসলাম : evsjvq wn›`-gmjgvb m¤úK, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স : কলকাতা ২০০১

নাজমা জেসমিন চৌধুরী : evsjv Dcb¨vm I ivRbxwZ, বাংলা একাডেমী : ঢাকা, আষাঢ় ১৩৮৭

পঞ্চানন সাহা : wn›`-gmjgvb m¤úK : bZb fvebv, বিশ্ববীক্ষা : কলকাতা ১৯৯২

পীযুষ দাশগুপ্ত : wkí I mwnZ¨ cm‡½ : gvKm †_‡K gvI, বাণী প্রকাশ : কলকাতা, মার্চ ১৯৯০

প্রদীপ বসু : bKkvj evoxi ceÿY, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স : কলকাতা ২০০০

বদরুদ্দীন উমর : fviZxq RvZxq Av‡›`vjb, নওরোজ কিতাবিস্তান : ঢাকা ১৯৮৭

————— : ag ms¯wZ I mv¤ú`wqKZv, চিরায়ত প্রকাশন : ঢাকা ১৯৯৩

বিপন চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি (অনুবাদ : আশীষ লাহিড়ী) : fviZel, ¯vaxbZvi c‡i 1947-2000, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ আগস্ট ২০০৬

বিমলানন্দ শাসমল : fviZ Kx K‡i fvM nj, হিন্দুস্তান বুক সার্ভিস : কলকাতা ১৯৯৩

বীতশোক ভট্টাচার্য ॥ সুবলসামন্ত সম্পাদিত : Rv-cj mvÎ, এবং মুশায়েরা : কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৬

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : †`kwefvM, cðvr I †bc_¨ Kwnbx, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা ১৯৯৩

ভীষ্মদেব চৌধুরী : Zvivk¼i e‡›`¨vcva¨v‡qi Dcb¨vm mgvR I ivRbxwZ, বাংলা একাডেমী : ঢাকা ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত : ¯vaxbZv DËi evsjv mwnZ¨, নবমন প্রকাশন : কলকাতা, ১লা ডিসেম্বর ১৯৮৯

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : ev¯Í‡ei KnK Kn‡Ki ev¯Íe, কাগজ প্রকাশন : ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০০৩

মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় : উপন্যাসে অতীত : ইতিহাস ও কল্পইতিহাস, থীমা : কলকাতা ২০০৩

রফিকউল্লাহ খান : evsjv‡`‡ki Dcb¨vm : welq I wkíiƒc, বাংলা একাডেমী : ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত : Dcb¨vm cm‡½, তুলি-কলম : কলকাতা, জুলাই ১৯৭১

শহীদ ইকবাল : ivR‰bwZK †PZbv : evsjv‡`‡ki Dcb¨vm, সাহিত্যিকা : ঢাকা ২০০৩

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : cÂv‡ki gš¦šÍi, বেঙ্গল পাবলিশার্স : তৃতীয় সংস্করণ ১৯৪৪

সত্যজিৎ চৌধুরী : mg‡ik em : Avgv‡`i ev¯Íe, একুশ শতক : কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩

সমরেশ বসু : †`wL bvB wd‡i (উপন্যাস), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুলাই ১৯৯৭

সরোজ দত্ত : K_vmvwnwZ¨K bvivqY M‡½vcva¨vq, রত্নাবলী : কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

পরিশিষ্ট

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : evsjv Dcb¨v‡mi Kvjvšĺi, দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ জুন ১৯৮০

সানজিদা আখতার : evsjv †QvUM‡í †'kwefvM (১৯৪৭-১৯৭০), বাংলা একাডেমী : ঢাকা, ১৪০৯/২০০২

সিরাজুল ইসলাম : evsjvi BwZnvm : Jcwb‡ewkK kvmb KvVv‡gv, বাংলা একাডেমী : ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৮৯

সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত) : †cŠiwYK Awfavb, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ : কলকাতা, পৌষ ১৪০৪

সুনীতি কুমার ঘোষ : নকশাল বাড়ি : একটি মূল্যায়ন, পিপলস্ বুক সোসাইটি : কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫

সুপ্রকাশ রায় : fvi‡Zi KlK we‡'vn I MYZwšK msMvg, ডি এন বি এ ব্রাদার্স : কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৮৯

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, দেবীপদ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) : kir iPbvejx, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, শ্রী গোপালচন্দ্র রায় পাবলিশিং : কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাঘ ১৪০৮

সৈয়দ আকরম হোসেন : iex›'bv‡_i Dcb¨vm : †PZbv‡jvK I wkíiƒc, ধ্রুবপদ : ঢাকা আগস্ট ২০১৬

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : ivRbwZi Awfavb, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৭

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : Zix n‡Z Zxi, মনীষা : কলকাতা, মে ১৯৮৬

Alfred Adler : *Understanding Human Nature*, tr. by W. Beran Wolfe, Fawcett World Library : New York, 1961 (First Published 1927)

Allen Walter : *The English Novel*, Penguine Publishers : 4th edn. 1962

: *The Novel To-day*, Longman : London 1955

A.R. Desai : *Social Background of Indian Nationalism*, Popular Prakashan Pvt. Ltd. : Mumbai, 6th Edition 2000

A. Lunacharsky : *On Literature and Art*, Progress Publishers : Moscow 1973

B.N. Pandey : *The Break-up of British India*, Macmillan & co. Ltd. : London 1969

C.H.Philips and Mary Doren Edited : *The Partition of India, Policies & Perspectives 1935-1947*, Wainwright : George Allen and Unwin Ltd. : London 1969

David Lodge : *Language of Fiction*, Routledge & K Paul : London 1966

: *The Novelist at the Crossroads*, Ark Paperbacks : London 1971

Elleke Boehmer : *Colonial & Postcolonial Literature*, Oxford : New York 1995

E.M. Forster : *Aspects of the Novel*, Rosetta Books : London 2010

Frank Johnson (edited) : *Alienation*, Seminar Press : NewYork, 1973

F. K. Stanzel : *A Theory of Narrative* (Translated by Charlotte Goedsche), Cambridge University press : London 1984

H.B. Letharp : *The Art of the Novelist*, Dodd : New Edition, 1928

Irving Howe : *Politics and the Novel*, A Horizon Press Book : New York, First Printing, march 1957

Carl Gustav Jung : Modern Man in Search of a Soul, Routledge : London and NewYork, 2002

L.P. Sinha : The Left Wing in India 1919-1947, Popular Praksahan : Mumbai, India, 1965

Leonard Jackson : *Literature, Psychoanalysis and the New Sciences of Mind*, Longman : England, 2000

Malcolm Bradbury and James McFarlane edited : *Modernism*, Penguin Books : NewYork, First Published 1976

Milan Kundera : *The Art of the Novel* (Translated by Linda Asher), Rupa & Co : Calcutta 1992

Niaz Zaman : *A Divided Legacy*, The University Press Limited : Dhaka, 1999

Palm Morris (edited) : *The Bakhtin Reader*, Arnold : London, 1994

Pelham Edger : *The Art of the Novel*, Macmillan : London, 1934

Percy Lubbock : *The Craft of Fiction*, Jonathan Cape : London, Reprinted 1968

Ralph Fox : *Novel and the people*, Foreign Languages Publishing House : Moscow, 1954

Robert Liddell : *Some Principles of Fiction*, Jonathan Cape : London, 1962

: *A Treatise on Novel*, , Jonathan Cape : London, 1947

Ross Murfen & Supryia M. : *The Bedford Glossary of Critical and Literary Terms*, Bedford : Ray Boston, New York, 2003

Sudipta Kaviraj : *The Unhappy Consciousness* (Bankimchandra Chattopadhyay and the Formation of Nationalist Discourse in India), Oxford University press : Delhi, 1998

ShlomithRimmon-Kenman : *Narrative Fiction*, Routledge : London and NewYork, 2nd edition 2002

Walter Kaufmann : *Existentialism From Dostoevky to Sartre*, The New American Library : New York, 1975

Wayne C. Booth : *The Rhetoric of Fiction*, The University of Chicago Press : Chicago & London, Eighth Impression, 1968